শতাব্দীর ত্রিপুরা

সম্পাদনা

নির্মল দাশ রমাপ্রসাদ দত্ত

শতাব্দীর ত্রিপুরা

শতাব্দীর ত্রিপুরা

ঃ সম্পাদনা ঃ

নির্মল দাশ রমাপ্রসাদ দত্ত

অক্ষর পাবলিকেশনস্

প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুবা

satabdir tripura
(a collection of contemporary essays on Tripura)
Edited by : Nirmal Das and Ramaprasad Datta

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৫
প্রচ্ছদ ঃ রূপা নন্দী ঘোষ

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 'বইঘর' ও অক্ষর সেলস্ কাউন্টাব জে বি রোড, আগবতলা, ত্রিপুবা

সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশনস, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ ☐ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০, email : akshar@yahoo.com

মূল্য ☐ ২০০ টাকা

উৎসর্গ

ত্রিপুরাকে ভালবাসেন যারা

ভূ মি কা

ত্রিপুরা ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও এখানে রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার একটি বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল অনেককাল আগে থেকেই। এক সময় দেশীয় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক সীমা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অনেকস্থান ছিল এ রাজ্যের অন্তর্গত রাজন্যবর্গ শাসিত ভূ-ভাগ। রাজনৈতিক বহু উত্থান পতন হয়েছে এ রাজ্যকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বাঙলা ভাষার দৃঢ় ভিত্তি কখনো শিথিল হয়নি। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস 'রাজমালা'র অন্যতম লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেছেন, "ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীনতম ইতিহাস রাজমালা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা ভাষা গৌরবান্বিত।"

বাঙলায় লেখা ত্রিপুরার যে প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথা জানা যায়, তার নাম হল 'রাজাবলী'। বলা হয়, এটি রচনা করা হয়েছিল, আজ থেকে আটশতাধিক বৎসর আগে। এই গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা হয়েছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ও। কিন্তু গ্রন্থটির কোন সন্ধান মেলেনা। তবে এটি ত্রিপুরায় রচিত তথা বাংলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থ। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুজন পণ্ডিত মহারাজা ধর্মমাণিক্যের সময়ে 'রাজ রত্নাকর' নামে একটি রাজ-ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এটির ভাষা ছিল সংস্কৃত। মহারাজা ধর্মমাণিক্য ৮৬৮ ত্রিপুরাব্দে [৮৬৫ বঙ্গাব্দে] ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই পণ্ডিতদ্বয়ই বাঙলা ভাষায় 'রাজমালা' প্রণয়ন করেন।

ত্রিপুরার রাজদরবারে দরবারী ভাষারূপে বাঙলাকেই ব্যবহার করা হতো। যাবতীয় রাজাদেশ বাঙলা ভাষাতেই প্রচারিত হতো। সরকারী নির্দেশ, হিসাব-নিকাশ, রেজেস্ট্রী ইত্যাদি কাজকর্মে বাঙলাভাষা গুরুত্ব পেতো। রাজাদের ব্যবহৃত সিলমোহরেও বাঙলা শব্দ বা অক্ষর মুদ্রিত হতো। ত্রিপুরার মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের (১৬১৫ খ্রীঃ) আজ্ঞা মোহরে মুদ্রিত ছিল শ্রী, স এবং ত্য (শ্রী সত্য) অক্ষর। মহারাজা গোবিন্দমানিক্যের (১৬৬০ খ্রীঃ) আজ্ঞা মোহরে মুদ্রিত ছিল 'রাম সত্য জয়'।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রে এডিকং কর্ণেল মহিম ঠাকুরের গলায় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে নির্মিত স্বর্ণমুদ্রা কণ্ঠহারের সঙ্গে ঝুলানো ছিল। তার মধ্যে মুদ্রিত বয়ানটি বাঙলায় লেখা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই স্বর্ণমুদ্রায় বাঙলা মুদ্রণ দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন।

গবেষকেরা বলেন, ত্রিপুরার রাজা-মহারাজাদের ঐতিহাসিক সূচনা পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। সে সময় থেকেই বাঙলা অক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়। তারও পরে বাংলা গদ্যের ব্যবহার শুরু হয় মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের সময় থেকে (১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ)। এখানে 'ব্রহ্মোত্তর' সনন্দ তাম্রপট্ট ঃ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য'-এর উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

(ত্রিদল বিল্বপত্রে শ্রী, স এবং ত্য খোদিত)

৭ স্বস্তি — শ্রী শ্রী যুক্ত কল্যাণ মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেশোয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনাং পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজলাতে শতদ্রোণভূমি 'শ্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম হইা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দ ১৫০৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।

[উদ্ধৃতি : রাজমালা; কৈলাসচন্দ্র সিংহ, অক্ষর, আগরতলা, পৃঃ ২৯৫]

পণ্ডিত জনের অভিমত, এ হল বাঙলা সতের শতকের প্রথমভাগে প্রচলিত বাঙলা গদ্যের প্রামাণ্য নজীর। ত্রিপুরা রাজ্যে 'ত্রিপুরাব্দ' আখ্যায় পরিচিত একটি সন সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের দলিল, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও মুদ্রায় শকাব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি, ত্রিপুরাব্দ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এবং কখনো কখনো বঙ্গাব্দও ব্যবহার করা হতো। তাই প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ত্রিপুরাব্দ ও অন্যান্য সন গুলির সম্পর্কিত হিসাব নিম্নরূপ :

ত্রিপুরাব্দ ১৩৮৬ + ৫৯০ = ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ
বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ + ৫৯৩ = ঐ ঐ
শকাব্দ ১৮৯৮ + ৭৮= ঐ ঐ

[রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬]

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এই (ত্রিপুরার) রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাঙলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা"

['রবি' সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্রসম্মেলন সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ]

কিন্তু কোন্ সময় থেকে কোন্ লেখকের দ্বারা ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চার লক্ষ্যে বাংলাগদ্যকে অবলম্বন করা হয়েছিল, সেই সময়সীমা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে পত্র-পত্রিকাও সাহিত্য সাময়িকীকে অবলম্বন করেই যে তার সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল এতে সংশয় নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রাধারমন ঘোষ সম্পাদিত 'বার্ষিকী' পত্রিকা (বার্ষিক, ১৮৭৬ খ্রীঃ, ত্রিপুরার প্রথম পত্রিকা), মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সম্পাদিত পঞ্চপণ্ডিত (মাসিক, ১৮৯০ খ্রীঃ), মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ সম্পাদিত ধূমকেতু (সাপ্তাহিক, ১৯০৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম করা যেতে পারে। এ সবই হল ত্রিপুরার পত্রিকার প্রথম দিককার কথা। তাছাড়া 'রবি' (ত্রৈমাসিক, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ, ১৯২৪ খ্রীঃ) সে সময়কার একটি বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখাও মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সে সব পত্র পত্রিকা তথা সাময়িকীতে মুদ্রিত বিবিধ রচনা বা প্রবন্ধের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। কেননা, সেগুলোর কোন সংখ্যারই এখন আর অস্তিত্ব রয়েছে কিনা বলা কঠিন। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে পত্রিকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ দিক্।

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় তথা সাময়িকীতে রচনাকারেরা বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যেগুলোর সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু ত্রিপুরাকে বিষয় করে তেমন কোন লেখা প্রথমদিকে প্রায় নেই বললেই চলে। স্বাধীনতা পূর্বকালে গণমুক্তি আন্দোলন ত্রিপুরার জনজীবনে, চিন্তাচেতনার জগতে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তখন রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁদের দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে ত্রিপুরার দিকে ফিরে তাকান। তখন থেকে ত্রিপুরাকেন্দ্রিক লেখালেখি গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সম্পাদিত প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রাজ্য থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থটি হল 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, - সম্পাদনা, স্বপন সেনগুপ্ত (জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৭৫)। এরপর প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন গুলি হল (২) ত্রিপুরায় শতাব্দীর প্রবন্ধচর্চা (১ম খণ্ড) — সম্পা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও ব্রজগোপাল রায় (ত্রিবেগ

প্রকাশনী, আগরতলা, ১৯৮৫), (৩) ত্রিপুরা প্রসঙ্গ — সম্পা, নির্লিপ গোদ্দার, পৌণমী, আগরতলা, ১৯৯৭। (৪) বিংশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা, সম্পা, নির্লিপ গোদ্দার, পৌণমী, আগরতলা, ২০০৪। (৫) ত্রিপুরায় শতাব্দীর প্রবন্ধ চর্চা (২য় খন্ড) — সম্পা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও ব্রজগোপাল রায়, (ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, ২০০৪) (৬) অন্বেষা — সম্পা, নিধুভূষণ হাজরা, আগরতলা, ২০০৪।

'শতাব্দীর ত্রিপুরা' প্রবন্ধ গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মূলতঃ ত্রিপুরা বিষয়ক রচনাকেই এখানে স্থান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আরোও উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধ নির্বাচনের সময়ে ত্রিপুরা থেকে বা ত্রিপুরার বাইরে থেকে 'ত্রিপুরা বিষয়ে'' প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলোকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য উপস্থাপন করতে গিয়ে এবং সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে বাছাই এর কাজটি যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। আবার অনেক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যস্রষ্টা এবং বর্তমানকালেও যারা লিখছেন তাঁদের অনেকের লেখা নির্বাচনের পরেও স্থানাভাব বিবেচনায় সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তাছাড়া বিষয় নির্বাচন করে আরো কিছু লেখার দায়িত্বও বিভিন্ন লেখককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের লেখাও হাতে না পাওয়ায় সে বিষয়কে এখানে স্থান দেয়া সম্ভব হয়নি।

এই রাজ্যে প্রবন্ধচর্চার সূচনা লগ্নে মোক্ষদাকুমার বসুর রচিত প্রবন্ধটি গ্রন্থের প্রথমেই জায়গা করে নিয়েছে। এই প্রবন্ধটি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। এর আগে লেখা ত্রিপুরাকেন্দ্রিক কোন রচনা আমাদের হাতে নেই। আর এই প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। আবার প্রথমদিকে স্থান লাভ করেছে এমন কিছু রচনা রয়েছে, যেসব রচনাগুলি রাজ্যের কিছু পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু অন্যত্র কোথাও, বা কোন পুস্তকে এগুলি স্থান লাভ করেনি। যেমন ঠাকুর সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মার 'ত্রিপুরা ভাষা ও রাধামোহন ঠাকুর' বা সঙ্গীতাচার্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার 'সঙ্গীত'। তাঁরা যে এক সময় লিখতেন, এই ক্ষুদ্র দুটি রচনায় সে পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ করার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন শিল্পরসিক ও আইনজীবী শুভাশিস তলাপাত্র ও 'গোমতী' সাময়িকীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কল্যাণ গুপ্ত। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রাচীন রচনাগুলি সংগ্রহ করেছি রমাপ্রসাদ গবেষণাগার থেকে। অন্যান্য রচনারও একটি অংশ সংগৃহীত হয়েছে রমাপ্রসাদ গবেষণাগার থেকে। রমাপ্রসাদ দত্ত ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও প্রবন্ধ বিন্যাসের কাজে পরামর্শ যুগিয়েছেন।

প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রবাসী (কলকাতা), ভারতী (কলকাতা), সমাজ, শারদীয় সীমান্ত, ত্রিপুরার কথা, গোমতী, ত্রিপুরা দর্পণ, পিলাক উৎসব স্মরণিকা (২০০২), পূর্বাভাস, শারদীয় নাগরিক, নন্দিনী, ত্রিপুরা (সাপ্তাহিক), দৈনিক গণঅভিযান (ও শারদ সংখ্যা), ভাষ্কর, আগরতলা প্রেসক্লাব স্মরণিকা, কোরক (কলকাতা) অমিতাক্ষর- শীর্ষক পত্র পত্রিকা তথা সাময়িকী থেকে। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারীর কাছে (যাদের পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী থেকে লেখা গ্রহণ করেছি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাছাড়া শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চাকমা প্রবন্ধ নির্বাচন ও লেখক পরিচিতির কাজটি সম্পাদনে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গ্রন্থে সংকলিত লেখক পরিচিতির সঙ্গে তাঁদের রচনার সংগ্রহ স্থলও উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরার বিদ্বজ্জন অনেকেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে লেখা দিয়েছেন তথা পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রচনা, এই গ্রন্থে মুদ্রণের জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন। তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বই সম্পাদনার থেকেও কঠিন কাজ হল একে পাঠকের হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সুহৃদোত্তম শুভব্রত বাবু এমন একটি দায়িত্ব আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটি মুদ্রণের কাজে রূপকার শিবানী দাস, রানা দাস, দীপা কর চৌধুরী ও মিন্টু কুমার নাথ — এদের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

গবেষণা গ্রন্থ বিবেচনায় যাবতীয় লেখায় লেখকদের নিজস্ব বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। শতবর্ষ আগে থেকে ক্রমান্বয়ে বানানের পরিবর্তন আগামী দিনের গবেষণায় একটি মূল্যবান বিষয়।

গ্রন্থ প্রকাশের শেষ কথাই হল পাঠক। ত্রিপুরা থেকে এ যাবৎ প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এই প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থটি যদি পাঠকেরা সাদরে গ্রহণ করেন তবে যাবতীয় শ্রম সার্থক প্রতিপন্ন হবে।।

নির্মল দাশ
রমাপ্রসাদ দত্ত
সম্পাদকদ্বয়

আগরতলা
১ জানুয়ারী, ২০০৫ইং

প্রকাশকের কথা

ত্রিপুরা এবং উত্তরপূর্ব ভারতে এত বেশী বিষয় রয়েছে যে, অনেক বিষয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই হয়ত এখনও প্রকাশিত হয়নি। এসব ভাবনা আমাদের কাছে চিরকালীন তাই অন্য গ্রন্থের মতো এর পেছনেও একটা চিন্তা কাজ করেছে-ত্রিপুরা নিয়ে, এই ত্রিপুরা থেকে বা ত্রিপুরার বাইরে থেকেও যেসব গদ্য-প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যে, সেসবকে একসাথে গেঁথে একটা গ্রন্থের রূপ দেয়া।

সেই চেষ্টায় নিয়ত সচেষ্ট থেকেছেন মূলতঃ বন্ধুবর নির্মল দাশ মহোদয় এবং তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করে গেছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় 'পল্টুদা' - রমাপ্রসাদ দত্ত মহোদয়। আমরা শুধু সূত্রধারের ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছি। জানিনা কতটা সফল হয়েছি।

উৎসুক এবং কৌতুহলী পাঠকদের প্রয়োজন সামান্য মেটাতে পারলেও সার্থকতা আসবে।

আগরতলা,
২০০৫ইং

শুভব্রত দেব
প্রকাশক

শতাব্দীর ত্রিপুরা

সূচীপত্র

মোক্ষদা কুমার বসু	স্বাধীন ত্রিপুরায় মণিপুরী দাস	১৩
নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা	ত্রিপুরার অন্তঃপুর	১৭
কালীপ্রসন্ন সেন	চাঁদ সুরুযের পুল	২৩
শীতল চক্রবর্তী	অন্যত্র ত্রিপুরার প্রসঙ্গ	২৫
নিবারণ চন্দ্র ঘোষ	ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায়	২৭
ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ দেববর্মা	সঙ্গীত	৪৩
নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	ত্রিপুরায় বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন	৪৪
সত্যরঞ্জন বসু	ত্রিপুরার ভাষাও সংস্কৃতির একদিক	৪৮
ঠাকুর সুধীর কৃষ্ণ দেববর্মা	ত্রিপুরা ভাষা ও রাধামোহন ঠাকুর	৫৪
শ্রীমতি	স্বর্গীয় ত্রিপুরা রাজ রাধাকিশোর মাণিক্য	৫৬
ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা	মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ও কয়েকটি অতীত স্মৃতি	৬০
কৃষ্ণপদ দত্ত	ত্রিপুরা বাংলার নবজাগরণের প্রভাব	৬৪
হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা	আদিম ত্রিপুরার জনকৃষ্টি	৬৮
তড়িতমোহন দাশগুপ্ত	তসলাম্ ফা ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব	৭৬
অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য	ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলন ঃ আদিযুগের রূপরেখা	৮৪
রমাপ্রসাদ দত্ত	রবি পত্রিকা ঃ ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্র রচনা ও পাঠান্তর	৮৮
অপরাজিতা রায়	সামাজিক মূল্যায়ণের নিরিখে নারী ও ত্রিপুরা	১০০
শক্তি হালদার	ত্রিপুরার দেবায়তন ও দেবমূর্তি	১০৯
বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী	সমরেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য লোক ঃ জেবুন্নিসা	১১৪
রবীন সেনগুপ্ত	ত্রিপুরার আলোকচিত্র চর্চার সেকাল ও একাল	১১৯
সরোজ চন্দ	স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা	১২৯
কার্তিক লাহিড়ী	ত্রিপুরার পুতুল নাচ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা	১৪০
শিশু সেনগুপ্ত	আগরতলা নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি	১৪৪
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	অবহেলিত উনকোটি	১৬১
রমেন্দ্র বর্মণ	আ মরি ককবরক ভাষা	১৬৪
মঞ্জরী চৌধুরী	ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প	১৭০
শিশিরকুমার সিংহ	কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী ঃ সমকালীন প্রেক্ষিতে	২১৭
সিরাজুদ্দীন আমেদ	ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি	২৩১
তপোধীর ভট্টাচার্য	ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস	২৪২
অমিতাভ চক্রবর্তী	রাজমালার ভাষারূপ ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা	২৫৭
যূথিকা বসু ভৌমিক	শান্তিনিকেতনের স্মৃতি	২৬৩
মহাদেব চক্রবর্তী	আদিবাসী ইতিহাস অনুসন্ধানের কিছু দিক	২৬৮
কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী	ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা ঃ রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বিচার	২৭৭

করবী দেববর্মণ	গোমতী যুগে যুগে	২৯২
জগৎজ্যোতি রায়	ত্রিপুরার সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাস	২৯৮
দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী	সমসের গাজী ঃ ত্রিপুরার মোগল আনুগত্যের নজরানা	৩১০
সুবিমল রায়	ত্রিপুরার হস্তশিল্প ঃ মিশ্র সংস্কৃতির অপূর্ব প্রকাশ	৩১৮
রাজকুমার জিতেন্দ্র জিৎ সিংহ	ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিত্য ঃ সেকাল ও একাল	৩২২
বিজয় কুমার দেববর্মণ	ত্রিপুরী নারীর ভূষণ	৩২৮
বিমল সিনহা	ত্রিপুরা চলচ্চিত্রের কথা	৩৩২
গোপেন্দু ভূষণ চৌধুরী	চিত্রশিল্প ও আমরা	৩৩৬
নলিনীকান্ত চক্রবর্তী	ত্রিপুরার বন, গাছপালা ও তাদের বৈশিষ্ট্য	৩৪২
অনুকূল সিংহ	বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী লোক সংস্কৃতি ঃ	৩৪৯
পদ্মিনী চক্রবর্তী	ত্রিপুরায় নৃত্যকলার সেকাল ও একাল	৩৫৪
দীপক ভট্টাচার্য	পিলাক ঃ ইতিহাসের আবৃত অধ্যায়	৩৬৪
শ্যামলাল দেববর্মা	ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ	৩৭৭
নির্মল দাশ	লোকসংস্কৃতি ভাবনা ঃ প্রেক্ষিত ত্রিপুরা	৩৮৪
লেখক পরিচিতি		৩৯৪

স্বাধীন ত্রিপুরায় মণিপুরী রাস

শ্রী মোক্ষদা কুমার বসু

অনেক দিন যাবতই মণিপুরী রাসের কথা শুনিয়া আসিতেছি। এবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানীতেই আসি— বাসস্থানের অতি নিকটে রাধানগর নামক পল্লীতে মণিপুরীদের রাসোৎসব হয়, মনে করি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার এই সুযোগ। রাসপূর্ণিমা— অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্না, অত্যন্ত ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না; মনে হয়, আর কোন পূর্ণিমায় বুঝি এমন শুভ্র জ্যোৎস্না উঠে না। অল্প অল্প শীত, একখানা সাধারণ শীতবস্ত্র গায়ে দিয়া কয়েকটা সঙ্গীবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাভিনয় দেখিতে চলিলাম

ত্রিপুরা রাজধানী একটি উপত্যকায় অবস্থিত – পশ্চিম দিক ভিন্ন আর তিনদিকেই, অতি নিকটে পাহাড়। আগরতলার উত্তর সীমা হইতেই একটু একটু করিয়া উচ্চ হইয়া একটা পাহাড় উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের পাদদেশেই রাধানগর নামক ক্ষুদ্র পল্লী, অথবা পাড়া। এই পল্লীও রাজধানীর মধ্যে একখানা ছোট মাঠ এবং একটা অতি ছোট জলস্রোত। এই স্রোতস্বিনীর উপরে বাঁশের মাচার একটা ৭/৮ হাত প্রশস্ত পুল। এই পুলের পর মাঠটুকু, তারপর পল্লীটা। একটা ছোট পুকুরের দক্ষিণে শস্যপূর্ণ একখানা সুদৃশ্য মাঠ, পুকুরের উত্তর পাড়ে সুন্দর কৃষ্ণচূড়া এবং অন্যান্য ঘনপত্রবিশিষ্ট শ্যামল বৃক্ষ। তাহাদের অন্তরালে একটা ঠাকুরবাড়ী দৃষ্ট হয়, সম্মুখে নাটমন্দির।

এই নাটমন্দিরটা রাসলীলার স্থান। আমি অনেক দিন অপরাহ্নে একাকী ঐ দিকে বেড়াইতে গিয়াছি, পুলটার উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকের মনোমোহন প্রকৃতির ছবির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তের সীমায় দূরে সবুজ গ্রাম, তাহার পরে নিকটে ও ব্যবধানে ক্রমে পাহাড়শ্রেণী, এদিকে ওদিকে বৃক্ষান্তরালে স্থিত ঘরবাড়ী, মনুষ্যের গোলমাল নাই। কচিৎ দু ২/১ জন রাস্তা দিয়া আসিতেছে, কিম্বা মাঠ হইয়া গাভী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পায়ের নীচে কুলু কুলু শব্দে একটু বেগে, কোন দিন বা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জলস্রোতটি প্রবাহিত হইতেছে পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত স্রোতটি পরিষ্কার দেখা যায়, উভয় পার্শ্বে শ্যামল শস্যক্ষেত্রমধ্য দিয়া তরল রজতপ্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, আর পশ্চিম দিকে অল্প কতকদূর পরেই তীরস্থিত ছোট ছোট বৃক্ষলতাদির আড়ালে নিজদেহ লুকাইয়াছে— এই সকলে মিলিয়া দৃশ্যটি বড় প্রীতি

প্রদ

আমাদের সম্মুখেই নাটমন্দির ; বেশ বড় একখানা আটচালা ঘর চারিদিকে খোলা। ঘর পাতা, ফুল, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা বেশ সাজান, চারদিকের বারান্দাটি বাদ দিয়া ভিতরের স্থানটি দুইটি বৃহৎ চক্রাকারে সজ্জিত, একটি বড় চক্রের মধ্যে আর একটি চক্র। কাষ্ঠ স্তম্ভগুলির মাথার দিকে অল্প প্রশস্ত লাল কাপড় দ্বারা চারিদিক বেষ্টিত। ভিতরের চক্রের মধ্যস্থলে কাগজও কাপড় দ্বারা সাজান। একটি উচ্চ কাষ্ঠাসন, তাহাতে শ্রীরাধাকে বামে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইবেন। এই কাষ্ঠ মঞ্চটি চারিদিকে ঘুরান যায়। এই চক্রদুইটির উপরিভাগ উপর হইতে ঝুলান পাতা দ্বারা সুশোভিত, ভিতরে দাঁড়াইলে মাথার উপরে কেবল পাতা দেখা যায়। বনভ্রম জন্মাইবার জন্যই এই সকল পাতা-লতার আয়োজন। ইহাতে স্থানটি সুদৃশ্য হইয়াছে এবং কতক পরিমানে আরণ্যশোভার বিভ্রম উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা যাইয়া দেখিলাম তখন ঠিক রাসলীলা আরম্ভ হয় নাই। একদল কৃষ্ণকায় লোক চক্রের মধ্যে খোলকরতালযোগে কীর্ত্তন করিতেছে। শুনিলাম তাহারা নিম্নশ্রেণীর মনিপুরী এবং কীর্ত্তন করা উহাদের ব্যবসা। তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশের কায়স্থদের ন্যায়, দে, দাস, দত্ত, সেন ইত্যাদি উপাধি আছে। তাহাদের রঙ কাল, নাসিকা ইত্যাদি বাঙ্গালীদের ন্যায়। বেশ নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছিল, বাঙ্গালীদের কীর্ত্তনের নাচের ন্যায় স্বেচ্ছানুরূপ লম্ফপ্রদান নয় এবং গানও উচ্চস্বরে নয়। সকলেই এক সুন্দর ভঙ্গীতে নাচিতেছিল, অল্প কয়েকজনের হাতে খোল, আর সকলের হাতেই করতাল। আমরা একটু দূরে বসিয়াছিলাম, চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছিল, এবং বাঙ্গলা গানের পদ কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। এই কীর্ত্তনটি রাসের মঙ্গলাচরণ।

ইতিমধ্যে একটি পুরোহিত যুবক ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে এক বার শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বিতীয়বারে শ্রীরাধার চন্দন কাষ্ঠময় মূর্ত্তি দুইটি কোলে করিয়া লইয়া সেই ঘূর্ণমান চক্রাকার মঞ্চে দাঁড় করাইয়া রাখিল। শ্রীরাধিকাকে গোপীদের মধ্যে একজন সঙ্গে করিয়া রাসচক্রে লইয়া যাওয়ার নিয়ম, কিন্তু অদ্যকার নর্ত্তকীদের মধ্যে ব্রাহ্মণবংশীয় কেহ না থাকায় পুরোহিতঠাকুরই লইয়া গেলেন। আবার শুনিলাম দারুময় রাধাকৃষ্ণের পবিবর্তে অনেক সময় বালক বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ রাধাকৃষ্ণের বেশ গ্রহণ করে।

ইহার পরেই একটি সুমধুর বংশীধ্বনি হইল। বংশীধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই ঠাকুরঘরের বারান্দায় এক পংক্তির পশ্চাৎ আর এক পংক্তি, এই প্রকার দুইজন করিয়া ১১টি পংক্তি সুসজ্জিতা বালিকা রাসমণ্ডপের দিকে মুখ করিয়া রাধাকৃষ্ণের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চতা অনুসারে তাহাদের শ্রেণীগঠন করা হইয়াছে, দেখিতে বড় সুন্দর, বড় হইতে ক্রমে ক্রমে ছোট। ১ম পংক্তিতে বোধ হয় ১২/১৩ বৎসরের বালিকাদ্বয়, ক্রমে কম হইতে শেষ পংক্তিতে বোধ হইল ৫/৬ বৎসরের দুইটি, অথবা তাহা অপেক্ষাও কিছু কম। বালিকাদের অঙ্গাবরণও বড় মনোহর—পোষাকটি যেন মাড়োয়ারদের ব্রজমায়ীদের এবং মনিপুরীদের পোষাকের মিশ্রণ। নীচে একটি ঘাগরার উপরে একটু খাট একটু আঁটা আর একটি ঘাগরা অথবা পেশোয়াজ, উভয়ই রঙীন (সকলেরই যে এক রঙ তাহা নহে) গায়ে একটি হাতকাটা কাঁচগুলির মত তাহার উপরে বক্ষস্থল হইতে কোমর পর্যন্ত খুব শক্ত করিয়া কয়েক পরতা সাদা কাপড় জড়ান, কানে কাহারও কৃত্রিম কাহারও স্বভাবের ফুল দুলিতেছে, মাথার উপরে চূড়ার মত করিয়া খোঁপা বান্ধা, তাহা হইতে পুষ্পগুচ্ছ সকল ঝুলিতেছে, এবং মাথার উপর দিয়া অবগুণ্ঠনরূপে একটু করা সাদা নেটের কাপড় মস্তক ও মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই আবরণটুকুতে একটি মানবাতীত ভাব আনিয়া দেয়, মনে হয় যাহারা নৃত্য করিতেছে তাহারা আমাদের মত কেহ নয়, অন্য রাজ্যের জীব, আমরা যেন ইন্দ্রজাল দেখিতেছি। আর ঐ ছিদ্রময় অবগুণ্ঠন থাকাতে অপেক্ষাকৃত কুরূপাদের দুঃখের লাঘব হয়, কারণ রাত্রিতে দীপালোকে ঐ কাপড় ফুটিয়া যে গৌরবর্ণের আভা বাহির হয় তাহাতে সকলকেই সুরূপা বলিয়া বোধ হয়, মুখাবয়বের তারতম্য কিছু লক্ষিত হয় না। হাতে সকলের একরূপ

অলঙ্কার নহে, কাহারও দুদিকে সোনার বালার মধ্যে কয়েক গাছা কালচুড়ী, কাহারও বা অন্যপ্রকার। অলঙ্কারের উপরিভাগে পরিস্কার ধব্‌ধবে্‌ আবরণহীন প্রকোষ্ঠ শোভা পাইতেছে। —এই বেশভূষা শেষ, তবে একটি কথা বলা হয় নাই মাত্র। এক স্কন্ধের উপর দিয়া আসিয়া পেশোয়াদের উপর পর্যন্ত একখানা জরীব কাজ করা আঁচলার মত ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে নানাস্থানে খুব ছোট ছোট এবং তাহা হইতে কিছু বড় বড় গোল এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আয়না এবং পাত্‌লা সোনালীরঙ্গের উজ্জ্বল শিকল ঝুলান আছে। এই জন্যই আলোতে বড় সুন্দর দেখায়, এবং একটু নড়িলেই শিকলগুলির অল্প অল্প শব্দও হয়। শুনিলাম পায়ে ও ঘাগ্‌রার নিম্নভাগে ঘুঙ্গুর বাঁধা আছে।

এই পোষাক সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। মনিপুরে ভাগ্যচন্দ্র (অন্য নাম জয়সিংহ) নামে এক রাজা ছিলেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মনিপুরে প্রথম বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্ত্তন করেন। এই রাজার কন্যাকে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিতামহ রামগঙ্গামাণিক্য বিবাহ করেন। দুই রাজ্যের এই প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রাসের গোপীদের যেরূপ পোষাক স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন ইহা সেইরূপ পোষাক। সেই সময় হইতে বেশের আর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। শুনিলাম স্বর্গীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর নিজে যে রাস করিতেন তাহার পোষাক ও গান ইত্যাদি অন্যপ্রকার হইত। তাঁহার কবিত্বময়ী কল্পনার বলে এই স্বর্গীয় প্রেমের উৎসবটিকে যতদূর সম্ভব মোহনরূপ দিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কাপড় পরাইয়া গায়ে একখানা কুসুমরঙ্গের পৃথক ওড়না বাঁধিয়া দিতেন, বালিকাদের মাথায় কোন আবরণ থাকিত না, কুন্তল শোভা ও সুকুমারবদনশোভা দর্শকের নয়ন রঞ্জন করিত ; এবং স্বর্গীয় কবি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় সুন্দর সুরে সুমিষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া রাসে গান করাইতেন। তাঁহার রচিত সুমিষ্ট ব্রজবুলী সকল এখনও রাসে গীত হয়।

হৃদয়োন্মাদক বংশীরবে সারি সারি গোপীগণ গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বদনার্পিত নয়না নীরবে মধুর ঠাসে কোমলভাবে আসিয়া দাঁড়াইল ; ক্ষণকাল পরেই সেই দ্বাবিংশতিকণ্ঠে এক মৃদু রবে ঝঙ্কার দিল ; সে ঝঙ্কার বস্তুতই যেন ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় শ্রুত হইল, গানের পদগুলি আমি বড় বুঝিতে পারিলাম না। সেই সুকুমার কণ্ঠগুলি এমনই একসুরে বাঁধা যেন ঠিক বোধ হইল কোন একটি বীনাযন্ত্রের তারে কেহ অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়াছে, তারটি মধুর ধ্বনি করিয়া একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এ যে দ্বাবিংশতিটি বিভিন্ন কণ্ঠ তাহা চক্ষে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হয় না। মনে হইতে লাগিল একটি মাত্র গলাই কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধ্বনি করিতেছে এমনি গলার মিল। গোপীবৃন্দের একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত সকল বিষয়েই যেন ঐক্য, একটি গলা কাঁপিলে প্রত্যেক গলাটিই ঠিক এক সময়ে এক সঙ্গে কাঁপিয়া উঠে ; একটি হাত কম্পন কিংবা একটি গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সকল হাতগুলি কাঁপে, সকল গ্রীবাগুলি যেন তাড়িত সংযোগে, সেই দিকে সেই মুহূর্ত্তে সেইরূপ আবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সকল বিষয়ে এইরূপ মিল আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষার বাহাদুরী বটে।

এইরূপে গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে গোপীগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইয়া থামিল। গোপীশ্রেণীর সম্মুখ হইতে একজন আধ আধ স্বরে কোমলভাবে দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিল। দূর হইতে বিশেষ কিছু বুঝিলাম না ; শুনিলাম উহা ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক। ইহার পরেই তাহারা সকলে মিলিয়া গান ধরিয়া বৃন্দাবন চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া রাসচক্রে নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রথমে কিছুকাল দুইটি গোপিকা শ্রীরাধা কৃষ্ণের অতি নিকটে নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে লাগিল, শেষে তাহারাও সকলের সঙ্গে মিশিল।

নৃত্যটি বড়ই শান্তিময় উত্তেজনার ভাব কিছুই নাই—স্নিগ্ধ ও মধুর। সময়, ঋতু ও ভাবের নৃত্যটির বড় সুন্দর সামঞ্জস্য। যেমন কোমল সময়, সুন্দর পরিস্ফুট পূর্ণিমা রজনী, যেমন কোমল ঋতু, শীতও নয় গ্রীষ্ম ও নয়, যেমন কোমলভাব - ক্রোধ নহে হিংসা নহে, প্রেম—নৃত্যটিও তেমন কোমল —প্রখরতার লেশবর্জ্জিত। গোপীরা কখনও বা একে অন্যের হাত ধরিয়া কখনও বা হাত ছাড়িয়া দিয়া বীনধ্বনিবৎ মধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে একটু অগ্রসর হইতেছে আবার একটু পিছু হাঁটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়াজ ও পুষ্পহার ইত্যাদি দুলিতেছে যেন তরঙ্গমালা একবার তটস্পর্শ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আবার তটসমীপে আসিতেছে —এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে।

এ দৃশ্য সে দিন অধিকক্ষণ দেখা হইল না ---সঙ্গীগণের ইহা নূতন নহে, তাঁহারা শীঘ্রই উঠিলেন - আমিও বাধ্য হইয়া উঠিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে ইহার ৫/৬ দিন পরেই ত্রিপুরাধিপতির আদেশে, একটি বেষ্টিতস্থানে, মহারাজার বসিবার দালানের সম্মুখে, পত্রপুষ্পশোভিত একটি সামিয়ানার নীচে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় এই রাসনৃত্যের আয়োজন হইল। শুনিলাম এ আয়োজন কলিকাতা হইতে আগত গুটি দুই সাহেব ও একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনুরোধে। মহারাজার অনুগ্রহে এই নৃত্যদর্শনে অনুমতি পাইয়াছিলাম, এবং পূর্বদিনের ক্ষোভ মিটাইয়া রাসচক্রের অতি সন্নিকটেই আসন পাইয়াছিলাম। আলোরও সে দিন অভাব ছিল না।

কিন্তু আজ যেন পূর্বদিনের ন্যায় তত ভাল লাগিল না। কতকটা এত নিকটে বসিয়াছিলাম বলিয়াই বুঝি এবং অন্যান্য কারণে সেদিনকার নৃত্যে যেমন একটি সংসারাতীত ভাব আসিয়াছিল আজ তাহা আসিল না। আজিকার পোষাক অন্যদিন অপেক্ষা নূতন ও মূল্যবান এবং জেরি বাদলা ইত্যাদি অধিক পরিমানে লাগান বলিয়া খুব চকচকে। অদ্যকার নর্তকীগণ সকলে কুমারী নহে—অধিকাংশই বিবাহিতা ললাটে সুবৃহৎ সিন্দুর বিন্দু শোভিতা —কেহ বা সন্তানবতী হইবে, বয়সে এমনই অনুমান হয়। আজিকার গ্রীবাভঙ্গীতে ও হস্তঘূর্ণনে তেমন কোমলতা ও ধীরতা নাই ; ব্যস্ততাও চঞ্চলতা।

আজ শেষ পর্যন্ত ছিলাম। ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই শেষ হইল। আজ রাধাকৃষ্ণ দারুময় নহেন—জীবন্ত একটি বালক ও একটি বালিকা। আজ একটি নূতন দৃশ্য দেখিলাম। নৃত্যের শেষভাগে বড় একটি সুন্দর ব্যাপার। গোপগণের পুষ্পবৃষ্টি। বৃন্দাবনলীলাএ পুষ্পবর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই হইয়াছিল। বর্তমান লীলায় দর্শকগণও বঞ্চিত হন নাই। গোপগণ সুমধুর ব্রজভাষার পদ গাহিতে গাহিতে এবং নাচিতে নাচিতে মধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অজস্র পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের প্রতিও বর্ষিত হইল। মহারাজের শরীর পুষ্পে ভরিয়া গেল— সাহেবদের এবং আমাদেরও প্রায় তদ্রূপ। এ ব্যাপার আরম্ভ হইবার একটু পূর্বেই একজন লোক আসিয়া প্রত্যেক গোপকে একখানা সাদা চাদরে বাঁধিয়া অনেকগুলি ফুল দিয়া গেল। তাহারা সেই চাদরখানা শরীরে জড়াইয়া "পুষ্প বরিষে" ইত্যাদি পদ সম্বলিত একটি গান গাহিতে গাহিতে অঞ্চল হইতে ফুল লইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময় তাহারা এমনই উন্মত্ততার সহিত নৃত্য করিতেছিল, বোধ হইল যেন তাহারা দিশেহারা হইয়াছে। পুষ্পবৃষ্টির সৌন্দর্য এই যে বিনা আয়াসে স্বেচ্ছায় যেন পুষ্প বর্ষিত হইতেছে - গানের তালে তালে তাহারা হাত ঘুরাইয়া নাচিতেছে আর ঐ হাত ঘুরানোর সঙ্গে সঙ্গে হস্তাভ্যন্তর হইতে পুষ্পগুলি ঠিক ঈপ্সিত স্থানে পতিত হইতেছে। গোপগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইদিকে (একদিকে দর্শকদিগের প্রতি অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে : মনে হইতে লাগিল, প্রাঙ্গনে কত ফুলের ফোয়ারা ছুটিয়াছে; — সে বড় সুন্দর দৃশ্য।

বৈশাখ মাস

ত্রিপুরার অন্তঃপুর

নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা

আজ বৈশাখের পহিলা। উষার শালিখ ও কাকের আহ্বান বাণীকে আজ কেহ অবহেলা করিতে পারিলেন না —সকলেই জাগরিত হইলেন।

অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একে একে পুষ্করিণীর ঘাট-সমূহকে নিজ নিজ উপস্থিতি দ্বারা সরসতা প্রদান করিলেন। এ পর্যন্ত কাহারও মুখে বিমর্ষতা বা রাগের আভাস নাই ; সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোবিনেবশ করিলেন । কোনো অন্তঃপুরিকা দাঁড়াইয়া কেহ বা প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ; এবং কোনো কোনো পরিচারিকা আপন পার্শ্বস্থিত পুঞ্জীকৃত বাসনের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতুপাত্রগুলির পরিষ্কার ব্যাপার শেষ করিয়া আপন কর্ত্তব্যভারের লঘুতা সম্পাদন করিতেছে।

অন্তঃপুরের বৃদ্ধা শ্রেণীর এক জন, এই মাত্র আপনার পিতলের ঘটীটি হাতে করিয়া ঘাটে পদার্পণ করিলেন। তিনি বাৎসল্যের সুরে আজিকার দিবসের মহত্ত্ব ঘাটের সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, কহিলেন—আজ তোমরা কাহারো সহিত বিবাদ করিও না, আমোদ আহ্লাদে সময়ক্ষেপ কর — বিষণ্ণতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আজিকার দিবস যাহার নিকট যেভাবে আবির্ভূত হইবে, তাহাকে সম্বৎসর সেইভাবে কাটাইতে হইবে। অতএব সাবধান, সকলে প্রীতিতে সম্মিলিত থাক; যদি কেহ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে, তাহাকে মার্জ্জনা করিও— তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। বৃদ্ধার এই সদুপদেশ সেইসময় যে সকল সরলা শিরোধার্য্য করিল, তাহারা বলিল— আজ এই শুভ বর্ষারম্ভে আমরা কাহারো সহিত ঝগড়া করিব না, কেহ আমাদের দুই কথা কটু বলিলেও তাহা গ্রাহ্য করিব না;—আজ একটি দিন অসহিষ্ণু হইয়া কেন সারা বৎসর উত্তেজনায় কাটাইবে? আর এক দল যাহারা মর্ত্ত্যভূমির অধিবাসিনী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যা তাহারা কহিল —আমরা কাহারো প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিব না, তবে মন্দবাণীকে পরিপাক করিবার সামর্থ্য বোধ হয় আমাদের থাকিবে না —সমস্ত বৎসর ভরিয়া অন্যের বাক্যবাণ সহ্য করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ইহার পর অমনি এক জন ত্রয়োদশবর্ষীয়া পরিচারিকা বলিয়া উঠিল যে, সে কাল বহু যত্নে একটি কুসুমগুচ্ছ রচনা করিয়াছিল ; রাত্রে ঘুমাইবার আগে তাহাকে তাজা রাখিবার জন্য কুয়ার ধারের বেড়ার কিনারে ঘাসের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; তাহার এই কার্য্যটি কাল অবলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করে ; আজ আর সেখানে কুসুমগুচ্ছটি পাওয়া যাইতেছে না ; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই অবলা তাহা চুরি করিয়াছে। সে তাহার ঘরে যাইয়া যথাসম্ভব ঐ গুচ্ছের অনুসন্ধান করিবে এবং যদি তাহা অবলার নিকট অথবা তাহার সম্পর্কিত কোনো পদার্থের সহিত দেখিতে পায়, তবে সে সত্য সত্যই

তাহার সহিত ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারিবে না। একদল রমণীকর্তৃক আপনার স্নেহপূর্ণ উপদেশ অবজ্ঞাত হওয়ায়, বৃদ্ধা ইতিপূর্বেই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে ত্রয়োদশীর এই উদ্ধত বাচালতা তাহার সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল —তাঁহারই দ্বারা ঘাটে সর্বপ্রথম রাগের অভিনয় হইয়া গেল। বৃদ্ধা এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে, রাগের মাত্রা আরো বাড়িয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া, আবক্ষ নিমজ্জিত অবস্থায় সূর্য্যদেবের উদ্দেশে কয়েক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিলেন।

বেলা প্রায় প্রহর অতিক্রম করিতেছে। সূর্য্যদেব বেশ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনেক লোক ঘাটে আসিয়া কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ত্রয়োদশী পরিচারিকা, যাহার মন তৈজস পরিমার্জ্জন ব্যাপার অপেক্ষা কুসুমগুচ্ছই অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কাজ অল্পই অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর তলপ জানাইয়া গেল। ছোট কাকীমা মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন দানসংক্রান্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৈশাখ মাস প্রত্যহ এক একটি সবস্ত্র জলপূর্ণ কলসী দান করিবেন এই উপলক্ষ্যে আজ সেও যেন কাজকর্মে অন্যান্য দাসীর সহায়তা করে। সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দভাবে ঘর্ষনকার্য্য চালাইতে লাগিল। বলাবাহুল্য সে সময় তাহার মুখে পরাধীনতার দুঃখচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দাসী আবার আসিল, এবার কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে তাহাকে বলিল — তোমাকে ডাকিতে কতবার আসিব ! এখনও তোমার কাজ শেষ হয় নাই! মনে আছে, বাসনঘষা ছাড়া তোমার আরো কাজ আছে।" পরিচারিকাটির রুক্ষ স্বরে ত্রয়োদশী অত্যন্ত পীড়া পাইল — তাহার চক্ষু কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইল, ভ্রযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া গেল। সে সামান্য বিকৃত কণ্ঠে কহিল —"আমি কি বসিয়া আছি? দেখিতেছ না আমি কাজ করিতেছি ?" অপরাধীর এই শ্রুতিবিরস রাগিণী আদেশবাহিকাকে বড় বিস্মিত করিল, সে তাহার ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া আরো বড় করিয়া বলিল বাঃ তুমি বেশ লোক ত! বৎসরের প্রথম দিনে আমার সঙ্গে এমনি করিয়া বুঝি ঝগড়া বাধাইবে ? কলহভীতা পরিচারিকা এ কথা বলিয়া তথায় আর দাঁড়াইল না।

যে সকল সরলমনাঃ অন্তঃপুরিকা বৃদ্ধার সদুপদেশ প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন এক্ষণে তরকারী সংগ্রহ করিতে বাগানে প্রবেশ করিলেন। এই বাগানটি তাহার প্রচুর উদ্যমশীলতার পরিচায়ক। ইহা তাহারই ঘরের সম্মুখে পনেরো বর্গহস্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাগানে প্রবেশ করিয়াই অন্তঃপুরিকাটি অত্যন্ত হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন — কে আমার একটা বেগুন লইল ! দেবতার জন্য কাল দু'টা বড় বড় বেগুন বাছিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার একটা কোথায় গেল ! অতিরিক্ত কোন কথা তাহার মুখে আসিল না। বিষন্নবদনে বারান্দায় ফিরিয়া তিনি হৃতাবশিষ্ট বার্ত্তাকুটিকে ভাজার উপযুক্ত করিয়া কুটিতে বসিলেন। এমন সময় অষ্টমবর্ষীয়া দাসী-কন্যা লক্ষ্মী আসিয়া তাহাকে অতি বিনীতভাবে কহিল —মা আপনার বাগানের একটা বেগুন আমার মা পাড়িয়াছে। আজ তাহার অনেক কাজ, শীঘ্র আহারের সময় পাইবে না ; তাই বেগুনটির দ্বারা সে কোন প্রকারে চারিটি খাইয়া তাড়াতাড়ি কাজে চলিয়া গিয়াছে। এবং এই কথা আপনাকে জানাইতে বলিয়া গিয়াছে। আমার মা ঐ বেগুনটি পাড়িবার পূর্বে অনেক বার আপনার খোঁজ করিয়াছিল। (প্রণাম করিয়া) মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" অন্তঃপুরিকাটি কিঞ্চিৎ করুণামিশ্রিত বিরক্তির সহিত বলিলেন —"আমাকে যে তোরা তালাস করিয়াছিলি বলিতেছিস্ তা' আমি কি প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম ?" বড়ই দুঃখের বিষয় আজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইল না— সহসা নৈরাশ্যজনিত যে বিষন্নতা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রভুত্ব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

এদিকে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ স্নান-পবিত্র হইয়া তরকারী কুটিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের কেহ

বা বারকোসে কেহ বা বৃহৎ থালায় কর্ত্তিত তরকারীগুলি পর্যায়ে ক্রমে স্তূপাকার করিতে লাগিলেন। বড় মাতৃদেবী তরকারী কুটিয়া শেষ করিয়াছেন। উপহার নির্দ্দেশ মত একজন চাকর তরকারী বিন্যস্ত বারকোসখানি লক্ষ্মীনারায়ণদেবের মন্দিরে লইয়া চলিল।

এই অবসরে জ্যেষ্ঠ দৈবজ্ঞ নূতন পঞ্জিকা হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি এবার মাতৃদেবীর অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে পঞ্জিকা শুনাইবার ভার লইয়াছিলেন। ইহার আগমনে কতিপয় অন্তঃপুরিকা বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য তথায় একত্রিত হইল। দৈবজ্ঞঠাকুর কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি পঞ্জিকা পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

একজন প্রৌঢ়া অন্তঃপুরিকা দাঁড়াইয়া পঞ্জিকা শুনিতেছিল ; অথ সত্যযুগোৎপত্তির অর্দ্ধেক বিবরণ শুনিয়াই সে আপনা আপনি ছোট করিয়া মণিপুরী ভাষায় কহিল যে, এবার বৎসরের রাজসিংহাসন কাহার অধিকৃত হইল এবং না জানি তস্য মন্ত্রীই বা কে হইলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী একজন রমণী কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে থামাইয়া বলিল — "আহা ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না — সকল কাজেই ইহাদের প্রয়োজনের সহিত গুরুতর সম্পর্ক তাই পঞ্জিকার সত্য ত্রেতার কথা যদিও তাহার শুনিবার ইচ্ছা ছিল তথাপি কর্মের তাড়নায় ঐ সকল যুগের কথায় কোন নূতনত্ব নাই, এই দোষোরোপ করিয়া সে চলিয়া গেল।

ক্রমে দৈবজ্ঞ ঠাকুর "অথ রাজাদানয়নং" পাঠ করিয়া তাহাদের কার্য্যকারিতার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখমণ্ডলকে কখনো হর্ষোৎফুল্ল এবং কখনো ভীতিম্লান করিয়া তুলিল। তারপর, যাহাদের অদৃষ্ট বর্ষচক্রের, সমুদ্রে অথবা গগনে পড়িল, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দ্বারা তাহাদের সেই সকল দোষ দূর করিবার নিমিত্ত বস্ত্র, ছত্র, কুম্ভ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা হইল। একজন প্রৌঢ়া রসাতলে ডুবিয়াছিল, তাহার এই দোষের শান্তির নিমিত্ত দেবজ্ঞঠাকুর যেমন সোনার নাম করিলেন অমনি পৌঢ়া রমণটি ঠাট্টা করিয়া বলিল —"ঠাকুর, তুমি বড় লোভী ; তোমার লাভের জন্য সোনার নাম করিতেছ"। অনেকে হাসিয়া উঠিল। বস্তুতঃ এই সকল ব্যবস্থিত দান-ব্যাপার শেষ না হইলে তাঁহাদের কাহারো মনে আর শান্তিশ্রী বিরাজ করিতেছে না।

আজ অন্তঃপুরের অনেকেই কেহ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, কেহ বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া, দেবতাকে কিছু না কিছু প্রদান করিয়াছে। কোনো কোনো অন্তঃপুরিকা দেবতার পরমান্ন রাঁধিকার জন্য আট আনা পয়সা, তরকারীবাহী চাকরদের হাতে গচ্ছিত করিয়াছে। অন্তঃপুরের নিতান্ত দরিদ্রা দাসীও এক সাজি সমঞ্জরী তুলসীপত্র ও যথাসম্ভব দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ বা অক্ষমতা প্রযুক্ত আপনাদের মনের মতন উপহার দেবতাকে উৎসর্গ করিতে না পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিল। আর যাহারা তুলসীপত্রের সাজিখানি লোকের অভাবে বাহিরে পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা এবং ভক্তি নিয়োজিতা অন্তঃপুরিকার দল, পুষ্পরিণীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছোট কাকীমার জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফুল ও সমঞ্জরী তুলসীপত্র ঠাকুরকে সমর্পণ করিল এবং তাহাকে চামর ব্যজন করিয়া প্রসন্নচিত্তে মন্দির পরিত্যাগ করিল। আর এক ছোট

কাকীমার স্থাপিত পিত্তলের মহাদেবীমূর্ত্তিও আজ গো-দুগ্ধে স্নাত হইয়া এইরূপে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিলেন —ইহার সম্মুখে ভূমিসংলগ্ন কলিকা হইতে গঞ্জিকার ধূম উত্থিত হইতে লাগিল।

বারোটার পর অন্তঃপুরের প্রায় সকলেরই আহার শেষ হইয়া গেল। অতঃপর —পাকস্থলীর শীতলতা প্রাপ্তির পর, বিবাদ বিসম্বাদের আর তেমন আশঙ্কা ও রহিল না। এইরূপে বৎসরের প্রথম দিন অন্তঃপুরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিল।

বিকাল বেলা। পিতামহী মহোদয়া তাহার কয়জন বৃদ্ধা পরিষদ লইয়া নূতন পঞ্জিকা শুনিয়া শেষ করিয়াছেন ; এখন তিনি বারান্দায় বসিয়া পান চিবাইতেছেন। এমন সময় পিতৃদেব বৈঠকখানা হইতে আসিয়া একখানি সুসজ্জিত ফুলের সাজি মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করিয়া তাহার চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিলেন, এবং এই প্রণামের বিনিময়ে মস্তকে পৃষ্টে স্নেহের চুম্বন লাভ করিয়া স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। স্নিগ্ধ প্রদোষে মাতাপুত্রের এইরূপ মধুর মিলন অন্তঃপুরের মাধুর্য্য বাড়াইত।

যাহা হউক, পিতৃদেব বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিতামহীদেবী হাত-পা ধুইয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ও তাহার স্বহস্ত রোপিত তুলসীদেবীর সমীপে বিবিধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তারপর পুনরায় বারান্দায় বসিয়া তিনি জয়দেবের রচিত "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং" ও "বেদানুদ্ধরতে" প্রভৃতি ভগবানের দশবিধ অবতারের স্তোত্র ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পিতামহদেব এদিকে শুভাগমন করিলেন। আমরা একদল পৌত্র-পৌত্রী তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম। মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতামহ মহোদয় প্রদীপ ক্ষীণ করিয়া দিয়া আমাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকটি কথার পর, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মধুর স্বরকে মধুরতর করিয়া, আমাদের জ্যেষ্ঠ দুইজন খুল্লতাতপুত্রীকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া কৌতুকভরে তাঁহাদের কিশোর হৃদয়ের নবীন প্রেম যে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এতৎ সম্বন্ধে দীর্ঘ গৌর-চন্দ্রিকা সমাপ্ত করিয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে প্রশ্ন করিলেন— তাঁহাদের বাকচাতুর্য্যের অবধি থাকিল না। ইহাতে পিতামহী মহোদয়া যেন বৃদ্ধবয়সের দাম্পত্য উঁহাদের দ্বারা শিথিলীকৃত হইবার সম্ভাবনায় দম্পতীবিদ্বেষের ভাণ করিয়া উঁহাদিগকে কিছু কঠোর বচন শুনাইয়া দিলেন। পিতামহীদেবীর এই আপাতদৃষ্টিতে কপট ক্রোধের অন্তরালে কোন প্রকৃত ক্রোধের ছায়া লুক্কায়িত ছিল কি না কে জানে? ইহার পর পিতামহ মহোদয় যেন বড়ই আমোদ পাইলেন— তিনি হাসিয়া অস্থির হইলেন।

আমাদের আর একদল, যাহাদের বয়স ছয় হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের প্রতিধ্বনি করিল, এবং কেহ কেহ বা প্রকৃতির সরলতাবশতঃ আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গীদিগকেই প্রণয়ের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সত্যের মর্যদা রক্ষা করিল। যদিও পিতামহ ও পিতামহী দেবীকে ভালবাসি বলিয়া প্রকাশ করিতেই উহারা অভিভাবিকাদের দ্বারা শিক্ষিত হইত, তথাপি পরীক্ষাস্থলে অনেক সময় উহাদের স্বাভাবিক মনের ভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়িত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে "বেলভাতা" ব্রত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের অন্তঃপুরে এই ব্রত সন্তানের মঙ্গল কামনায় গৃহীত হইয়া থাকে, এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগের শনিবারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিন্তু ব্রতচারিণীগণ সমগ্র বৈশাখ মাস সূর্য্যদেবের অস্তাগমনের পর আর অন্নগ্রহণ করেন না।

বৈশাখ মাসে আমাদের অন্তঃপুরে একটা বিশেষ খেলার নিয়ম আছে; তাহার নাম "ঘিলা খেলা"। এই খেলা মণিপুরী মহিলাদের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। খেলার উপরকরণগুলি যদিও আদিম নিবাসে কাষ্ঠময় ও শৃঙ্গজ ছিল, আমাদের অন্তঃপুরে আসিয়া তাহারা হস্তিদন্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আদিমত্বের মায়া যে অপরিত্যাজ্য তাহারই প্রমাণ স্বরূপ দুই চারিটা শৃঙ্গময় উপকরণের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

বাজী ধরিয়া এই খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পক্ষে মাতৃদেবীগণ ও অপরপক্ষে কাকীমাগণ। দুই চারিজন বৃদ্ধাও উভয় পক্ষে যোগদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরস্পরের মধ্যে প্রায় বিশহাত ভূখুমি ব্যবধান রাখিয়া এক এক দিক অধিকার করিয়া লইলেন। খেলার সামগ্রীগুলি সহজে গড়াইবার নিমিত্ত তথায় পাতলা

করিয়া বালক বিস্তারিত হইল। প্রথমে মাতৃদেবী পক্ষের একজন বৃদ্ধা বক্রভাবে দাঁড়াইয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত তিন ইঞ্চি উচ্চ ঘুটিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না, কাজেই তিনি পুনরায় উহাকে নিক্ষেপ করিবার অধিকারিনী হইলেন। এবারেও তাহার সফলতা লাভের পর উপবিষ্ট হইয়া সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কুলার আকৃতি বিশিষ্ট খেলার উপকরণকে মধ্যমা অঙ্গুলীর সাহায্যে তিনি ঐ ঘুঁটির আঘাত করিতে পারিলেই একখানি চিক্কণ বংশ শলাকায় চিহ্ন পড়িয়া যাইবে নতুবা সপক্ষের অন্যান্য ক্রীড়ণশীলদিগকে পর্য্যায় ক্রমে ঐরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই কথা ছিল, যে দলে এরূপ একশত মার্ক পাইবে তাহাদেরই বাজী জিত হইবে। এক পক্ষের অপরাগতায় (miss হইলে) অপর পক্ষ ঐরূপে একশত মার্ক লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দুই দিনের খেলায় দেখা গেল, কাকীমাদের জয়লাভের আশা অত্যন্ত অল্প। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল বিষম নিরুৎসাহের কালিমা মণ্ডিত হইল— তাহারা খুব গম্ভীর হইলেন। বস্তুতঃ পরদিন তাহাদিগকেই পরাজয় স্বীকাব করিতে হইল। কিন্তু কাকিমাদের ইচ্ছায় সেই দিনই উভয় পক্ষের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া নিয়মমত আবার খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে বিজয়গৌরব তাহাদের মুখমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করে, শান্তভাবে তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন কেহ কেহ বা পরাজয়জনিত রাগের সহিত অশান্তভাবে খেলার উপরকরণগুলিকে চালনা করিয়া আপনাদের দুর্ব্বলতা সকলের গোচরীভূত করিলেন। এবং এই কারণে এবাব একটি দুর্ঘটনাও ঘটিয়া গেল — কাকীমাদের পক্ষের একটি গোলাকার ক্রীড়াসামগ্রী কুচালিত হওয়ায় একজন বৃদ্ধা দর্শিকার কপালে আঘাত করিল। বৃদ্ধা বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ; আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি কপালে হস্তরক্ষা করিয়া, প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায় বৃদ্ধার সহসা উত্থিত উচ্চ ক্রন্দধ্বনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথাকার সকলের হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ অনেকেই হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ অনেকেই বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন ; কেহ কেহ বা ঈষৎ হাসিতে হাসিতে প্রাচীনার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি জন তরুণী যাহারা হাসি থামাইতে পারিতেছে না, তাহারা বেগে সেই স্থান ত্যাগ করিল। বৃদ্ধার আঘাতের স্থান ফুলিয়া কিছু উচু হইয়াছে দেখিয়া অনেকে আক্ষেপ করিলেন; ছোট কাকীমা তাহার নিকটবর্ত্তী এক গ্লাস জল আনিয়া দিয়া বৃদ্ধাকে উহাতে জলপট্টি দিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

তিন দিনের খেলার পর এই পালায় কাকীমাদের জয়লাভ হইল। এবং উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীকৃত শাড়ীর অর্পণ-প্রত্যার্পণ হইয়া গেল। বৃদ্ধারা সাদা পাড়ের ধুতি পাইলেন। এই উপলক্ষ্যে কাকীমাদের পক্ষের একজন বৃদ্ধা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, উহাদেব খেলার স্থান সুবিধাজনক ছিল না বলিয়াই প্রথমবার তাহারা হারিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বিপক্ষ অমনি উত্তর করিলেন — তোমাদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া আমাদের দয়া হইয়াছিল —খেলায় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমাদেব দয়া হইয়াছিল—খেলায় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমরা কখন উচিত মনে করি নাই. তাই অবহেলা করিয়াছি। তর্ক বিতর্কের মধ্যে ছোট কাকীমা হাসিয়া বলিলেন —

আগের বাজী বাঘে খায়

শেষের বাজী কৃষ্ণে পায়।

একজন চাকরের হাতে ঝুলায়মান খাঁচার ভিতর কয়েকটি শুক-শিশু বিকালবেলায় সহসা অন্তঃপুরে দেখা দিল। ইহাদের বহুতর গ্রাহিকাও জুটিয়া গেল। কিন্তু যে চারিজন অতিরিক্ত শুকপ্রিয় অন্তঃপুরিকা পূর্বেই এই বৈশাখী ছানার জন্য চাকরকে মূল্য দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যতীত অন্য সকলকেই শুক-প্রাপ্তি সম্বন্ধে

নিরাশ হইতে হইল। তখন তাহারা এই শলাকাপক্ষ কচি ছানাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানা রূপ সমলোচনা করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিলেন না।

কিন্তু এই ছানাদিগকে দেখিয়া যাহাদের প্রকৃতই তোতা পালিবার ইচ্ছা বাড়িয়াছিল, তাহারা ঐ চাকরকে তোতার ছানা আনিবার জন্য ফরমাস দিল ; কেহ কেহ বা এজন্য পুরস্কার ঘোষণাও করিল।

এই বৈশাখের কচি ছানার অধিকারিণীগণ খুব প্রফুল্লিত। তাহারা সুবিধামত প্রহরে প্রহরে জল নিষিক্ত তণ্ডুল দ্বারা ছানার কোমল গলদেশে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন যথেষ্ট শুক-ভক্ত অন্তঃপুরিকা ছানার জননীরূপে মুখে মুখে খাদ্য প্রদান করিয়া ছানাকে বড় করিবার উপায় অবলম্বন করিল। আর যাহারা এই শাবকগুলির নিকট দিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মুখনিঃসৃত "ভজ মন দিবা রাত্র শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র" অথবা "চক্রধর কৃষ্ণ জগত করতা ত্বরিত তরাও; কৃষ্ণ তুমি সে ভরসা" ইত্যাদি বাক্যে অন্তঃপুরের এক প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

কালপ্রবাহে "বেল ভাতা" ব্রত উদাপনের দিন আনিয়া ফেলিল। দ্বিপ্রহরে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ এবং মাতার প্রতিনিধিগণ একটি ঘরে সমবেত হইলেন। একে একে তাহারা সকলে কদলীপত্রে স্থাপিত চিত্রিত ঘটকে ধান-দূর্বা প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন, এবং ঘটের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীর সংলগ্ন শলাকায় ফুলের মালা ও নূতন কাপড় ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর তাহারা কিছুক্ষণ বাহিরে আসিয়া যথানিয়মে দেবতার ভোগ লাগাইলেন। শেষে মাতৃদেবী তাহার চিকুর প্রান্তসহ দক্ষিণহস্ত দ্বারা ঘটের নিম্নস্থ কদলীপত্র ও উৎসর্গিত অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্রকে ঈষৎ স্থানচ্যুত করিয়া প্রসাদ গ্রহণের প্রস্তাবনা করিয়া রাখিলেন।

এদিকে পুরোহিত ঠাকুর চন্দ্রাতপছায়ায় দুর্গাপূজা করিতেছিল। তাঁহার সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট শালগ্রামশিলা ও জল মিশ্রিত দুগ্ধের কুণ্ড এবং তাহার পার্শ্বে একটি কামিনী বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছাগ বলির পর পুরোহিতঠাকুর যজ্ঞ সমাপন করিয়া সিংহাসনটিকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে ব্রতচারিণীগণ এখানে আসিয়া ধান, কাজল, সিঁদুর দুর্ব্বা ও ফুলের মালা কামিনী বৃক্ষকে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং এই রূপে "বেলভ্যাতা" ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

আর পাঁচ প্রহর অতীত হইলেই জ্যৈষ্ঠ মাসের অরুণ পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত করিবে।

চাঁদ সূরুযের পুল

শ্রীকালী প্রসন্ন সেন, বিদ্যাভূষণ

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নগরী ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত অগণিত প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্নের মধ্যে চাঁদ সূরুযের পুল' এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই পুলটি উদয়পুর নগরী হইতে ত্রিপুরা সুন্দরী পীঠদেবীর মন্দিরে গমনের প্রাচীন পথে মগড়াছড়ার উপর অবস্থিত। পুলটি ইষ্টক নির্মিত এবং সুদৃঢ়। ইষ্টকের গঠন দৃষ্টে বুঝা যায়, পুলটি সুপ্রাচীনকালের নির্মিত। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসনকালে প্রাচীন রাস্তার সন্নিহিত পশ্চিম দিক দিয়া একটি নূতন রাস্তা নির্মিত হওয়ায়, উক্ত পুল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে ; এই রাস্তা নির্মাণের পূর্ব্ব হইতেই পুলটি পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এখন তাহা জঙ্গলাবৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

এই পুলটি কতকালের প্রাচীন এবং কাহার নির্মিত স্থানীয় লোকের জানা নাই। সুতবাং তাহা নির্ণয় করা কঠিন সমস্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে এই সেতু চাঁদ সূরুযের পুল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। চাঁদ সূরুষ নামক কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা নির্মিত হইযাছিল —পুলের আখ্যাদ্বারা ইহাই সূচিত হয়। ত্রিপুরার ইতিহাস বা প্রাচীন কিম্বদন্তী দ্বারা ত্রিপুরায় এই নামের কোনও রাজা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' এবং আরাকানের ইতিবৃত্ত 'রাজোয়াং' গ্রন্থে পাওয়া যায়, শাক্যবংশীয়গণ ১৪৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর রাখচাঁই বা রাক্ষিয়াং বংশীয় চন্দ্রসূর্য্য নামক জনৈক মঘ নৃপতি আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার বংশধরগণ চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিহিত ছিলেন ; ইহাদের রাজত্ব ১৬৯ বৎসর স্থায়িত্ব লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফো-কুও-কি (Fo-Kwo-Ki) গ্রন্থে লিখিত আছে মহারাজ চন্দ্রসূর্য্যের রাজত্বের তিন শতাব্দী পরে তিনি আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের পর ৪১৫ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যাত্রায়ই তাহার আরাকান ভ্রমণ ঘটিয়াছিল। ফা-হিয়েন এর বাক্য অবলম্বনে হিসাব ধরিলে মোটামুটিভাবে স্থির করা যাইতে পারে, চন্দ্রসূর্য রাজা খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদে রাজত্ব করিয়াছেন। ১৫০ খ্রীঃ অব্দে তৎকর্তৃকআরাকানে এক মহামুনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই ঘটনা চন্দ্রসূর্য্য রাজার কাল

নির্ণয় পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরাকানবাসিগণ চন্দ্রসূর্য রাজাকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মনে করে, ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। বুদ্ধদেব এই রাজার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানে চন্দ্রসূর্য্যবংশীগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহা ত্রিপুরাব্দ প্রচলনের অন্যূন দুই শতাব্দী পূর্ব্বকালের কথা। এই সময় রাঙ্গামাটি প্রদেশ প্রদেশ (উদয়পুর সহ) রাখচাঁই বংশীয় (রাজমালার মতে লিকা বংশ) রাজার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রসূর্য্য রাজাও এই বংশীয় ছিলেন। সুতরাং তৎকালে আরাকান হইতে রাঙ্গামাটি প্রদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ একই বংশের হস্তগত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই বংশীয় রাজাকে জয় করিয়া ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক মহারাজ যুঝারু ফা রাঙ্গামাটী প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের অঙ্কগত করিয়াছেন।

সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উক্ত চন্দ্রসূর্য রাজা, অথভা তদ্বংশীয় অন্য কোনও রাজা কর্ত্তৃক চাঁদ সুরুষের পুল নির্মিত হইয়াছিল। চাঁদ সুরুষ শব্দটি চন্দ্র সূর্য নামেরই অপভ্রংশ ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এতদ্ব্যতীত এই পুলের তথ্য নিরূপণের অন্য কোনও সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। উদয়পুরস্থ ত্রিপুরার বহুসংখ্যক কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও পুলটি 'চাঁদ সুরুষয' নামের দ্বারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষাও প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে।

---

* But the most important trophy of all was the great Mohamuai image cost by Chandra Suriya about 50 A.D, and long coveted by the Burmans.

(Burma History-P.137)

অন্যত্র প্রাচীন ত্রিপুরার প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম. এ, বিদ্যানিধি

"রাজমালায়" কিরাত স্থানে ত্রিপুর রাজগণের আদি পুরুষে উপনিবিষ্ট হন লিখিত হইযাছে। এই কিরাত স্থান তন্ত্রের উল্লেখ করতোয়া নদী হইতে আরম্ভ ঃ—

"করতোয়াং সমারভ্য" —শক্তি সঙ্গমতন্ত্র—৭ম পটল।

করতোয়া নদী উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে প্রবাহিতা এবং ইহা প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের "চিরন্তন পশ্চিম সীমা" (কামরূপ শাসনাবলী" —শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদন এম্ এ প্রণতি ভূমিকা, ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী তদীয় ভৌগোলিক বিবরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সংস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ —

"The name on this land (Kirrandia indicates that it was inhabited by the Kirata, a people which we find in the great epic settled in the neighbourhood of Lauhitya or Brahmaputra."

ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত এই কিরাত স্থানের যোগ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য উক্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায় ঃ-

"There is a still survivign tradition in Tripuri (Tippera), precisely where Ptolenmy places his kirradia that the first name of the country was Kirat. (J.A.S Bengal., Vol XIX, Long –Chronicles of Tippera p 536) M.C. Gindles "Ancient India in described by Ptolenmy –Edited by. S.N. Majumder Shastri M.A. P. R.S. p 194

মহাভারতেই "কিরাত" স্থলে ত্রৈপুর নামের উল্লেখ আছে যথা —

"প্রাগ্জ্যোতিষাদনুনৃপঃ কোললোহথ বৃহদ্বগঃ।

মেখলৈস্ত্রৈপুরৈশ্চৈব বর্বরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।"

এখানে কিরাতের দ্রহ্যবংশীয় রাজা ত্রিপুরের নামে কিরাত "ত্রৈপুর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।"প্রাগ্জ্যোতিষাদনু" উল্লেখ হইতে উক্ত কিরাত যে প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ ব্রহ্মপুত্রের উর্দ্ধ প্রদেশে

অবস্থিত। সুতরাং কিরাত বা ত্রৈপুরা ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদেশে সংস্থিত ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মহাভারতের সময় স্বনামখ্যাত ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষির মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কামরূপ প্রদেশে তখন অন্য কোনও রাজার অধিকার থাকা কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। অথচ কামরূপের ইতিহাসে তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। বরঞ্চ মহাভারতের বৃত্তান্ত ও কামরূপের ইতিহাস হইতে তথায় ভগদত্তের ও তদ্বংশীয়দের একাধিপত্য রাজত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

তন্ত্রেও "ত্রৈপুর" নামের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে ঃ —

"লোহিত্যে ত্রৈপুরশ্চৈব জয়ন্তাখ্যং সুদঙ্গকম্ ।।" (বিশ্বকোষধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্ম খণ্ড।)

জয়ন্ত (জয়ন্তিয়া) সুসঙ্গর সহিত উল্লিখিত হওয়ায় "ত্রৈপুর যে ইহাদেরই সন্নিকটবর্ত্তী স্থান, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। লৌহিত্য সাগরেই নিকটবর্ত্তী জনপদ বলিয়া সভাপর্ব্বের ভীমসেনের দিগ্বিজয় বর্ণনায় বুঝা যায়।

তারপর তন্ত্রেই "ত্রিপুরা নামেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় —"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদোদেবী ত্রিপুর সুন্দরী ।। পঠীমালাতন্ত্র (রাজমালায় উদ্ধৃত)

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবীচ ত্রিপুরা মতা" শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রচূড়ামণি।।

এইরূপে তন্ত্রে একবাক্যে ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে ত্রিপুরা নামের প্রয়োগহেতু দক্ষিণ পূর্ব্বে ত্রিপুরা দেবীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নরপতিদিগের রাজ্য বিস্তারের দ্বারা ত্রৈপুর স্থলে উহার ত্রিপুরা নামকরণ হইয়াছিল ইহাই প্রতীয়মান হয়। দুইটি তন্ত্রেরই এক ত্রিপুর দেবীর পীঠস্থান বলিয়া বর্ণন হইতে ইহাই যে ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রকৃত পীঠস্থান তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না।

চৈনিক পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসিয়া ত্রিপুরাকে সুবিস্তৃত রাজ্যই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"In those days–'time of Yuang Chwang Hien Sang) the State of Tippera, included the southern and eastern part of sylhet and the Western and southern part of Cachar". (Journal of the Royal Asiatic society, 1930 January)

শ্রীহট্টের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ও কাছাড়ের পশ্চিম দক্ষিণাংশ তখন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটি কিরাত স্থানেরই নিকটবর্ত্তী।

উপরিউক্ত প্রাচীন প্রসঙ্গ সকল হইতে ত্রিপুরা রাজ্য কিরূপে কিরাত স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হইয়া ক্রমে বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট আভাসই পাওয়া যাইতে পারে ।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায়

শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.এল.এল.বি.

প্রাক- স্বাধীনতা যুগের ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যই ছিল প্রাচীনতম। পৌরাণিক কাহিনী বাদ দিয়া ঐতিহাসিক যুগে অবতরণ করিলেও আমরা দেখি, গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা একটি পরাক্রমশালী ও বিশিষ্ট রাজ্য মধ্যে পরিগণিত। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের লাট্ - প্রস্তর লিপির পাঠোদ্ধার হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, সম্রাট অন্যতম প্রত্যন্ত -রাজ্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতেও কর আদায় করিয়াছিলেন। তৎকালীন ত্রিপুরাকে "তৃপুরা" বা "ত্রীপুরা" বলা হইত। সমুদ্রগুপ্ত ৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বেও যে ত্রিপুরা একটি গণনীয় রাজ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

মিবার রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেন। এই ভট্টার্ক সেনাপতির পিতামহের সময়েও ত্রিপুরারাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কাজেই ত্রিপুরারাজ্য মিবার রাজ্য হইতেও প্রাচীনতর ছিল ।

বীররাজ নায়ক জনৈক প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বর গঙ্গার পশ্চিমতীরে ত্রিপুর পতাকা প্রোথিত করিয়া এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করার জন্য (৫৯০) ৫১২ শকাব্দ হইতে "ত্রিপুরাব্দ" প্রবর্ত্তিত করেন । ৬৯৯ শকাব্দে শ্যান রাজার ভ্রাতা শ্য মুলং মাগুয়াং নগরী হইতে দূত স্বরূপ ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন ।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তদেশ বর্ত্তমান ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলারই সমতলক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তিশালী রাজ্যও ছিলঙ্গ ১৩৩৮ সালে তদানীন্তন ব্রিটীশ ত্রিপুরার গুনাইঘর গ্রামে প্রাপ তাম্রশাসন ও মুদ্রার ঐতিহাসিকগণ কতৃক পাঠোদ্ধার হইতে আমরা অবগত হইয়াছি যে খৃ: ৬ষ্ট শতাব্দীতে গুনেকাগ্রহার (বর্ত্তমান গুনাইঘর) অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর শৈব নৃপতি কীর্ত্তিমান বৈন্যগুপ্ত রাজত্ব করতেন ঙ্গ আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে এই অঞ্চলে শান্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য্য গুপ্তাব্দের ১০৮ শতকে এবং খৃষ্টাব্দের ৫০৬ শতকে বোধিসত্ত্বের সেবাপূজা করিতেন । এখানকার এই ভিক্ষুসঙ্ঘ বৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল।

নরপতি বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং শৈব হইয়াও অসাধারণ উদারতা বশত: রাজদণ্ড নামক স্থানীয় এক সামন্ত

রাজার অনুরোধক্রমে, বোধিসত্ত্বের মন্দিরে ধূপ-দীপ প্রদান আর সঙ্ঘস্থিত ভিক্ষুদের আহার্য্য ও বস্ত্র এবং ঐ অঞ্চলের রুগ্নব্যক্তিদের ঔষধ এবং পথ্যের জন্য ১১ পাঠক অর্থাৎ ৪৪০ দ্রোণ ভূমি "অগ্রহার" (ব্রহ্মোত্তর)' স্বরূপ শান্তি দেবের নামে বোধিসত্ত্বকে দান করেন ঙ্গ দানপত্রের মুধা-বিদা করিয়াছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক নরদত্ত নামক একজন করণ কায়স্থ ।

যৎকালে বৌদ্ধগণ ভারতের স তের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় বাংলায় মাথা গুজিতেছিল, তৎকালে ত্রিপুরা তাহাদিগকে গ্রহণ জন্য বাহু সম্প্রসারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই ঙ্গ খৃষ্টীয় ষ,ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিপুরা জেলায় মহাযান বৌদ্ধ মত বদ্ধমূল হইয়াছিল ।

ত্রিপুরভূমি- চম্পিতলা (চাঁপিতলা) গুনেকাগ্রহার (গুনাইঘর), কর্ম্মান্তনগর (বড়কাম্তা), রোহিতাগিরি (লালমাই), বাঘউরা, ময়নামতী, পট্টিকেরা (পাটিকেরা), চুগুা (চুর্ন্টা), কুগুা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্রগুলির প্রভাবের বহুনির্দশন কালের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিয়া আজ লোকলোচনের গোচরীভূত করত ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপাদান যোগাইতেছে । ত্রয়োদশ শতকে পট্টিকেরা (বর্ত্তমান পাটিকাড়া) রাজ্যে সহজযান মত প্রচলিত থাকার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে ।

ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে এক সময় বৌদ্ধমত যে প্রবল ছিল তাহা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে । গুনাইঘর গ্রামে লোকনাথ বোধিসত্ত্বেব মূর্ত্তি, ধামতিগ্রামে প্রচারকরূপী বুদ্ধমূর্ত্তি (সারানাথের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তকরূপী বুদ্ধমূর্ত্তির ন্যায়, বিহার মণ্ডল গ্রামে বৌদ্ধ জম্ভল মূর্ত্তি (জম্ভল-জলদেবতা, বরুণ) ভারেল্লা গ্রামে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি (বর্ত্তমানে পিহর গ্রামে রক্ষিত) বরকাম্তায় বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমনের মূর্ত্তি, পিহর গ্রামে বৌদ্ধ মরীচি মূর্ত্তি, ময়নামতী পাহাড়ে বর্ত্তমান নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রমের স্থান হইতে শথাধিক বৎসর পূর্ব্বে উদ্ধার প্রাপ্ত ধ্যানী বৌদ্ধমূর্ত্তি, ময়নামতী পাহাড়ে গোবিন্দ চন্দ্র রাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসভবনের পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ সরোবর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত বৌদ্ধ জম্ভলমূর্ত্তি, কুমিল্লা শহরে কাত্যায়নী কালী বাড়ীতে রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তি, ময়নামতী পাহাড় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত এবং বর্ত্তমানে কুমিল্লা শহরে স্বর্গীয় মহারাজ কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ীতে রক্ষিত যুবরাজ জয়চন্দ্রের নামাঙ্কিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি সকল, এবং কৈলাইন গ্রামে বরুণ প্রস্তরে (বেলেপাথরে) নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রভৃতি বহু প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে । এতদ্ব্যতীত অনেক মূর্ত্তি পূর্ব্বেই ঢাকার যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল ।

আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের ষষ্ঠ শতকে "কমলাঙ্ক" নামে পরিচিত ছিল । চিন পরিব্রাজকে হুয়েন্ সাঙ্গ তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে (খৃষ্টীয় ৭ম শতকের পূর্ব্বার্দ্ধে) Kia-no-lone-kie (কমলাঙ্ক = কুমিল্লা) ও Tolopti (ত্রিপুরা) রাজ্য দ্বয়ের বর্ণনা করিয়াছেন । শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ পাটিকাড়া নামক স্থানে "কমলাঙ্ক" রাজ্যের রাজধানী ছিল ।

বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত আশারফ্পুর নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও চৈনিক পর্য্যটক ইৎ সিঙ্গ বা আই সিঙ্গ এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত (৭ম শতাব্দীর পরার্দ্ধে) সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে "কর্ম্মান্তনগরে" (বর্ত্তমান বড় কামতায়) বৌদ্ধ খড়গ বংশের রাজধানী থাকার কথা বলিতেছে । উক্ত আশরফ্পুর গ্রাম ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিশন, ময়মনসিংএর, কিশোরগঞ্জ সবডিভিশন ও ঢাকার নারায়ণগঞ্জ সবডিভিশন-এই তিন মহকুমার সংযোগস্থলে অবস্থিত । গ্রামটি নারায়ণগঞ্জ সবডিভিশনের অধীনে, কিন্তু ত্রিপুরা জেলার বরদাখাত পরগণার অন্তর্গত ।

কুমিল্লার পূর্ব্বদিকস্থ মিঞার বাজারের নিকটবর্ত্তী দৌলবাড়ী (নামান্তর জম্বুরা গ্রাম) গ্রামে যে অষ্টভূজা

চেম লিপ্তা পিত্তল নিষিমর্তা "সবর্নী" মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহার নিম্ন ভাগে পাদদেশে আসনের মধ্যে দেবারি খড়গ ও রাণী প্রতিভা দেবীর নাম উৎকীর্ণ আছে ।

"দৌলবাড়ী" "দেউল" শব্দের অপভ্রংশ । এই মূর্ত্তিটি চণ্ডীমুড়া পাহাড়েব চণ্ডীমন্দিরে স্থাপিত হইয়া ছিল । সেই গান হইতে হইা অপহৃত হইয়াছে ।

চৈন ভ্রমণকারী ইৎসিঙ্গ বা আইসিঙ্গ বলেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা: অধ্যক্ষ শীল ভদ্র এই খড়গ বংশেরই রাজকুমার ছিলেন । মহামহোপধ্যায় ডা: সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় - সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার একবিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় বলিয়াছেন,- "আচার্য্য শালভদ্র সমতট প্রদেশের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন । কাহারও মতে বর্ত্তমান কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমতট প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ।

অসাধারণ নৈয়ায়িক ও অশেষ শাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শীলভদ্র ধর্ম্ম পালের অবসর গ্রহণের পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হন । ৬২৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গ শীল ভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । চৈনিক ভ্রমণকারী সেঙ্গ চি ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৌদ্ধ রাজা রাজভট্টকে সমতটের সিংহাসনা রূঢ় দেখিয়াছিলেন । খড়গ বংশের রাজকুমার রাজভট্রের পীড়া শান্তির জন্য একটী পিতলের সূর্য্য মূর্ত্তি আচার্য্যকে দান করা হয় ঙ্গ সেই সূর্য্য মূর্ত্তিও ঐ দৌলবাড়ী গ্রামে সর্বানী মূর্ত্তির সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছিল । সেই সূর্য্য মূর্ত্তি এখনও চণ্ডীমুড়ায় আছে । তাহাতেও একটী উৎকীর্ণ লিপি আছে। পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।

ইৎসিঙ্গ বা আইসিঙ্গ বলিয়াছেন, সমতটের এক রাঝদানীতে ২৮টি শঙ্ঘাবাম এবং এই গুলিতে দুই সহস্রাধিক শ্রমণের বাস ছিল ।

চণ্ডীমুড়া বোধ হয় প্রাচীন চণ্ডীগড় ছিল । প্রবাদ এই ভগবতী চণ্ডীদেবী এই স্থানে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় পর্য্যন্তও ত্রিপুরা জেলায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল ।

৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গানগরস্থ প্রধান বৌদ্ধ বিহারের প্রধান লামা - তারানাথ - ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য তথাগতনাথ ও শান্তিনাথ নামক যে দুইজন লামাকে পাঠান - তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, র্তকালেও রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল ।

ভারত বিভক্ত হওয়ার প্রাক্কালেও লালমাই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী লগ্নসার, আইল্যারা প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১০,০০০ বৌদ্ধ ছিল ৫ , ৬ টি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার বা দেবালয় বা স্থানীয় কথায় "কেংঘর" ছিল এবং প্রত্যেক বিহারেই বুদ্ধমূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থার জন্য শ্রমণ ছিল ।

বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপি প্রকাশ করিতেছে যে, দশম শতাব্দীর শেষভাগে সমতট প্রথম মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল । কোন কোন ঐতিহসিক মনে করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের "চন্দ্রবংশের" আদি জন্মভূমি ছিল "রোহিতসিরি" বা বর্ত্তমান লালমাই, এবং এই বৌদ্ধ রাজ বংশের জনৈক নরপতি "লয়হচন্দ্র" দশম শতাব্দীতে এইখানে রাজত্ব করিতেন, এবং তদধীন সামন্তরাজ কুসুমদেবের হস্তে কর্ম্মান্তনগরের (বড়কামতার) শাসন ভার ন্যস্ত ছিল । "মহারাজ ওয়ো" বা "মহারাজোয়ং" নামক প্রাচীন ব্রহ্ম ইতিহাস গ্রন্থ একাদশ শতকে ব্রহ্মরাজ অলোরথের সমকালে তৎপ্রত্যন্তদেশে Patickara (পাটিকাড়া) রাজ্য বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ করিতেছে। পাটিকাড়ার জনৈক রাজকুমার ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ্যে গিয়া ব্রহ্মরাজ "খ্যানশিশা" বা "খ্যানশিখার"

কন্যার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। কিন্তু ব্রহ্মদেশের অমাত্যবর্গ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের প্রতিবন্ধকতায় এই পরিণয় সংঘটিত হইতে না পরিলেও এই প্রণয় প্রসূত "আলংশিশু" ব্রহ্মসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৭৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন, এবং ব্রহ্মসিংহাসন দুই শতাব্দীকাল এই বংশের অধিকৃত ছিল। এই বংশীয় নরপতিগণ পাটিকাড়া রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ময়নামতীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পটিকাড়া রাজ হরিকালদেবের লুপ্ত কাহিনী প্রকট করিয়াছে।

১১৪১ শকাব্দের একটী তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইতে জানা যায়, রণবঙ্কমল্ল নামক একজন নরপতি কমলাঙ্ক, পাটিকাড়া প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ "ঐতিহাসিক" কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় অনুমান করেন, "রণবঙ্কমল্ল" মহারাজোয়ং গ্রন্থে উল্লেখিত পাটিকাড়া রাজ বংশেরই জনৈক নরপতি ছিলেন। আধুনিক মেহেরকুল, গঙ্গামণ্ডল ও তৎসন্নিহিতগুলি এই রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।

ত্রিপুরা জেলার গণেশপুর গ্রামের শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত এবং ডা: নলিনীকান্ত ভট্টশাল ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত ভবানীদাসের ভণিতাযুক্ত "ময়নামতীর গান" নামে পরিচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, চন্দ্র উপনামধেয় একটী রাজবংশ তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের উপর আধিপত্য করিতেন। মেহারকুল শহরে (ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মেহেরকুল পরগণা) তাঁহাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল। রংপুর জেলা হইতে ডা: গ্রীয়ারসন সাহেব কর্ত্তৃক "মাণিক চন্দ্র রাজার গান" সংগৃহীত হইলে উত্তরবঙ্গেই মাণিক চাঁদ, ময়নামতী ও গোবিন্দ চন্দ্র রাজার লীলাক্ষেত্র বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু "ময়নামতীর গান" ও "গোর্খাবিজয়" আবিষ্কৃত হওয়ার পর গ্রায়ারসন প্রমুখ পণিডতগণের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দুর্ল্লভ মল্লিকের ভণিতাযুক্ত "গোবিন্দ চন্দ্র গীতে" বা "গোপী চাঁদের গীতেয়" আমরা দেখতে পাই, "পাটীকানগর" গোবিন্দ চন্দ্রের রাজধানী ছিল। দুর্ল্লভ মল্লিকের ছড়া প্রাচীনকালে ত্রিপুরাতে প্রচলিত ছিল। কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ও "রাজা গোপীচাঁদের গীত" বাল্যকালে বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড় অবস্থিত। পরমসিদ্ধা রাণী ময়নামতী এইখানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এইস্থান ময়নামতী নামে পরিচিত হইয়াছে।

রাণী ময়নামতী চারিস্থানে চারিটী বাড়ী ছিল। প্রথম বাটী শ্রী হট্ট জেলাস্থ, ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন উত্তব পশ্চিমদিকে অবস্থিত তরফ পরগণায় দ্বিতীয় বাটী - চট্টগ্রামে, তৃতীয় বাটী - বিক্রমপুরে এবং চতুর্থ বা সর্ব্বশেষ বাটী - "ময়নামতীতে" ছিল।

দুর্ল্লভ মল্লিকের "গোবিন্দ চন্দ্রগীতে" আমরা দেখি

" অব্রেথা হইল সিদ্ধা খেতির উপর।
একনাম রাখি জাকে মেহাকুল সহর ।।
আৰ্দ্ধ(আদ্য ?) মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুরে সহরে ।।
আর আছে আইধ্য (অদ্য) মাটী তরপের দেশ।
চাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ ।।

গোবিন্দ চন্দ্র যে মেহারকুলের রাজা ছিলেন। তাহা দুর্ল্লভ মল্লিকের পুঁথির নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি দুইটী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, -

"খেনেক রহ বসুমতি খেনেক রহ তুমি ।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি ।।"
রাজা গোবিন্দ চন্দ্র একজন পরাক্রমশালী নৃপতি
ছিলেন । চল্লিশ জন রাজা তাঁহাকে কর দিত ।
তাঁহার বৈভব সম্বন্ধে ময়নামতীর পুঁথিতে আছে,
"এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া ।
নয়ানগর এরি জাবে উনশত বানিয়া ।।
বাপের মিরাশ এরি জাইমু গৈরব সহর ।
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর ।।
তুমি মা এর যত বাড়ি কলিকানগর
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছে মেহারকুল সহর ।।
চল্লিশ রাজাএ কর দেও আমার গোচর ।
আমা হোতে কোন জন আছে এ ডাঙ্গর ।।

"নয়ানগর" সম্ভবত: ত্রিপুরা জেলারই অন্যতম মহকুমা "নবিনগর ।" নবিনগরে তৎকালীন সমৃদ্ধির ইঙ্গিতও আমরা এখানে পাই । এক নবিনগরেই সেই সময় উনশত জন উল্লেখযোগ্য বণিক ছিল : "কামলাক" নগরের নাম বোধ হয় কুমিল্লারই নামান্তর কমলাঙ্ক হইতে ভস্তুত ।

রাণী ময়নামতীর ময়নামতী স্থিত বাটীর চতুর্দ্দিকে উনশতটী রাজবাটী ছিল । স্থানীয় প্রবাদ এই যে ৯৯ জন চন্দ্রবংশীয় রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । আবার কেহ বলেন রাণী ময়নামতীই তাঁহার নিজ বাটীকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে এই উনশতটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । স্থানীয় অঞ্চলে এই সকল বাটীর অবস্থিতিস্থান "উনশত রাজার বাটী" নামে পরিচিত । আবার ইহাও কেহ কেহ বলেন যে, ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়শ্রেণী শালবান বা সলমন রাজা, আনন্দ রাজা, বৌদ্ধ মাণিক চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্র রাজা প্রভৃতি বহু সামন্ত রাজগণের লীলাভূমি ছিল । গোপীচন্দ্রে জননী ময়না বা ময়নামতীর কন্যা লালময়ীর বা লালমতীর নামানুসারে লালময়ী বা লালমাই পাহাড় পরিচিত হয় ।

সাহিত্য বিশারদ মৌঃ আব্দুল করিম সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন, "সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মহাশয় যে লেখিয়াছেন, - "এখানে বিস্তর ময়না পাখী পাওয়া যাইত বলিয়া এ স্থানের নাম ময়নামতী হইয়াছে" -- তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার ।

উত্তরদিকে ময়নামতী পাহাড়স্থ ত্রিপুরার মহারাজদের বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে কোট বাড়ার ("কোট" অর্থ "কেল্লা") ১ মাইল ক্ষিণে "শালবানপুর" পর্য্যন্ত (রাজা গোবিন্দ চন্দ্রে গুরু নাথপন্থী সাধক যোগী হাড়িফা সিদ্ধার পিতা রাজা শালবানের নামানুসারে শালবান গ্রামের নামকরণ হয়) - এই ৭/৮ মাইল ব্যাপী স্থানে বর্ত্তমান ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়ে প্রাচীন শহর, বহু বিহার ও দেবালয়, বহু রাজবাড়ী ও সরোবর বা দীঘি, কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় ।

এখানে যে একটি সমৃদ্ধশালী প্রাচীন শহর ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থান নেই ।

ময়নামতী পাহাড়স্থ ত্রিপুরাধিপতি শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের বাংলার অতি নিকটেই

ভূগর্ভে পঞ্চ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি ইষ্টকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রবাদ এই যে, ময়নামতী ও গোরক্ষ নাথ এই গুহার মধ্যেই ধ্যান করিতেন ।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় সৈন্য বাবিনীর এক প্রধান কেন্দ্র এখানে ছিল । তাহাদের দ্বরা ঐস্থান খনিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় প্রত্নতত্বের অনেক এউপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইগুলি কুমিল্লার রামমালা পুস্তকাগারে রক্ষিত হয় ।

উর্গানগরে প্রধান বৌদ্ধ লামা তারানাথের সংগৃহীত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতেও জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় ১৭ /১৮ জন রাজা সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

ত্রিপুরা জেলা সমতট প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ˚ কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতানুসারে ত্রিপুরা প্রাচীন আর্য্যগণের আখ্যাত সুক্ষদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল । কবি চূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুক্ষদেশকে মহাসাগরে "তালিবান শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । চীন পরিব্রাজন হিয়োন সাঙের (হিউ-এন্-সঙের) ভ্রমণ বৃত্তান্ত "সিউ-কি' গ্রন্থে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সাগরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াটার্স সাহেব হিউ-এন্-সঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, "কমলাংকে" সমতটের দক্ষি-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল । "তাঁহার বিবেচনায় এই অঞ্চলের আদিম আধিবাসীগণ এই জল অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশকে "তুইপ্রা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহাদের ভাষায় জলকে "তুই" বলে। এই "তুই" শব্দের সহিত "প্রা" সংযুক্ত করিয়া "তুইপ্রা" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সেই "তুইপ্রা" হইতে "তিপ্রা" এবং "তিপ্রা" হইতে ক্রমে "তযপুর", "ত্রীপুর" ও "ত্রিপুরা" শব্দের উৎপত্তি।" এই "তুই" শব্দ সংস্কৃত "তোয়" শব্দের অপভ্রংশ কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য কারণ ত্রিপুরা জাতির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগ্‌বাসী কুকি, কুইমি, খেয়াং, বঞ্জগী ও পংখু জাতি জলকে "তুই" বা "তোই" বলে । কেবল সিন্ধুগণ "তি' বলিয়া থাকে । সিন্ধুগণ দ্বারা "তিপ্রা" নামকরণ ও নিতান্ত বিচিত্র নয়।"

কিন্তু ত্রিপুরা জেলার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার সাদারল্যাণ্ড "Calcutta Review"র পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে, ৩২৫ পৃষ্ঠায়, স্মার্ট সাহেব তাঁহার "Report on the Districts of Tipherah"র ১ম পৃষ্ঠায়, কেপ্টেইন্ লেউইন্ সাহেব তাঁহার "Hill Tracts of Chittagong" গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় এবং হান্টার সাহেব তাঁহার "Stattical Account of Bengal" গ্রন্থের ষষ্ঠখণ্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় "ত্রিপুরা" নামোৎপত্তির অন্যরূপ ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতানুসারে "ত্রিপুরাসুর" হইতে "ত্রিপুরা" নামের উৎপত্তি........ কিংবা ত্রিপুরাসুর নির্মিত তিনটি পুরী হইতে ত্রিপুরা নামের উদ্ভব; অথবা ভগবতী ত্রিপুরা সুন্দরী হইতে ত্রিপুরা নামের এউৎপত্তি, কিংবা (ত্রিপুর) রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তার (মহারাজ ত্রিপুরের) নামানুসারে এই দেশ ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন শৈবযোগী বা হঠযোগী মীননাথের শিষ্য ও মৎস্যেন্দ্র নাথের গুরু ভ্রাতা গোরক্ষনাথ, আর রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের গুরু ছিলেন হাড়িফা সিদ্ধা । রাজা গোপীচন্দ্র জননী ময়নামতীর উপদেশানুসারে চুরাশিসিদ্ধার অন্যতম তান্ত্রিক হাড়িফা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ।

ময়নামতীর ব্রহ্মজ্ঞানী - হঠযোগী ছিলেন । উত্তর ভারতের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দজীর প্রণীত "ভজনমালাএএএ গ্রন্থের কয়েকটি ভজন হইতে আমরা রাণী ময়নামতী ও গোবিন্দ চন্দ্রের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাই ।

ময়নামতীকে গোপীচাঁদকে বলিতেছেন, -

বানজারা তাল - ৩

'মৈনামতী বচন উচারা

সুন গোপীচন্দ্র পিয়ারা ।। টেক ।। মৈনা

জিনকী কংচন সোকায়া । ধন জৌবন রূপ সত্তায়াজী ।

সব হোগয়ে ক অহারা ।। সুন

ইয়হ রাজ্য সংপদা ভারী । সব হোয পলকমে

ন্যারীজী । তজ মায়া মোহ পসারা ।। সুন

সৎ গুরুকী শরণ সিধারো । কর যোগ অমর -

তন ধারোজী । মিটে জন্মমরণ সংসারা । সুন

ও নাথ জলন্ধর যোগী । নিত ব্রহ্মানন্দসে

ভোগীজী । কর সেত্তা হো নিস্তারা । সুন

গোপীচন্দ্র উত্তর করিতেছেন, - বমজারা তাল - ৩

''গোপীচন্দ্র চন্দ বাল তুমারা ।

গুরুনাথ করো নিস্তারা ।। টেক ।। গোপী

মুঝে মতো জ্ঞান বতায়া । তজ রাজ্য শরণ মে

আয়াজী । সব ঝুটা জনত পসারা ।। গুরু

সুন্দর তন ভূপতি ভারে । সব কাল (সময়) নাশ কর

ডারেজী । মুঝে লগে মৌত (মৃত্যু) ডর ভারা । গুরু

মঁয় শুনা যোগবল ভারী । সব কাল প.. ভয় -

হারীজী । ভব বন্ধন মেটত হারা ।। গুরু ।।

মুঝে সাধন যোগ বতাত্তা । করুণা কর্ শিষ্য

বতাত্তোজী । ব্রহ্মানন্দ চরণ শিরধারা । গুরু ।

হাড়িফা সিদ্ধা গোপী চাঁদকে বলিতেছেন,-

বনজারা-তাল ৩

কহে নাথ জলন্ধর ধ্যানী -

সুন গোপীচন্দ সুজানা ।। টেক ।। কহে

জব মূলবদ্ধ (ষট্ চক্রের প্রথম নাড়ীটী)

দৃঢ় লাত্তে । তব উলট পত্তন চড়

জাত্তেজী । সব দশমে দ্বার সমানী ।। স্তন

দিন দিন জব যোগক ধারা । তব শুধু হোয় তন

সারাজী । ভূমী জল তত্ব সুকানী । সুন

ফির চন্দ্রকলা রস ভীনা । সব হোয় শরীর
নবীনাজী । অজরামর সিদ্ধি নিধানী
মর করকে ফির জো জীবে । সোই প্রেম রসায়ণ
পীবেজী । ব্রহ্মানন্দ পরম সুখখানি । সুন

ময়নামতীর ছড়ার আলোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি, শৈবযোগী নাথেদের আদিগুরু মীননাথও তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ ত্রিপুরারই লোক ছিলেন । জনৈক রুষীয় পণিডত বলিয়াছেন, নাথেরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ময়নামতী পাহড়েই মীননাথের বাড়ী ছিল, সেখানেই তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন ।ময়নামতীর পুঁথিতে আছে, -

"চারি সিদ্ধা এ শাপ পাইল দুর্গাদেবীর পাশে ।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে ।।
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে ।
কানুফা পাইল শাপ ড়াড়ার সহরে ।।
হাড়িফা এ পাইল শাপ তোমা সেবিবার ।
সে কারণে হিন্য কর্ম্ম করে তোমার ঘর ।।"

"শ্রী চান গাৰ্জী" নামক জনৈক মুসলমান লিপিকারক কত্তৃক লিপিবদ্ধ এবং জনৈক হাড়ির নিকট হইতে সাহিত্য বিশারদ মৌঃ আব্দুল করিম কত্তৃক সংগৃহীত শেখ ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত বঙ্গভাষার অমূল্য গ্রন্থ "গোর্খ-বিজয়" পুঁথিতেও আমরা পাই, মীননাথ কদলীনগরে গমন করিয়া সেখানে মঙ্গলা, কমলা প্রভৃতি ষোল শত কদজলীর মেয়ের প্রলোভনে মায়াবদ্ধ হইয়াছিলেন ।

কাণকা বলিতেছেন, -

বড়াই না ছাড় গোর্খ জী-অ কোন ফলে ।
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে ।।"
....
তত্ত্বকথা কহি আমি সুনরে গোর্খাই ।
হেন বুদ্ধি কর রক্ষা পাউক মীনাই ।।
প্রত্যুত্তরে গেরাক্ষনাথ বলিলেন,-
"তোর গুরু বন্দী হৈছে মেহেরকুল দেশ ।
নিশ্চয় জান মুই তাহার উদ্দেশ ।।
মেহেরকুলেতে আছে জ্ঞানী জে ডাকিনী ।
মৈনামতী নাম তান রাজার ঘরণী ।।
....

কাণফা চলিয়া গেল মেহেরকুল দেশ ।

গোর্খনাথ চলি গেল মীনের উদ্দেশ ।।"

কাণফা স্বীয় গুরু হাড়িফার অনুসন্ধানে মেহেরকুল গমন করিলেন এবং গোরক্ষনাথ কদলীনগরে মীননাথকে কামিনী কাঞ্চনের মায়াপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন ।

কদলীর নগরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন । আমাদের মনে হয়, কদলীর দেশ অর্থাৎ "বন কলিকা" বা স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ এবং সম্ভবত. তাহা প্রাগ্ জ্যোতিষপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান কামাখ্যা । মীননাথের মেহেরকুল হইতে কামাখ্যা গমনই স্বাভাবিক ।

হাড়িফা সিদ্ধার বাড়ী ময়নামতী পাহাড়ে শালবানপুর গ্রামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে । হাড়িফার পিতার নাম ছিল শালবান । বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ সরোবর একনও রহিয়াছে। এইখানে হাড়িফা সিদ্ধার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। "ব্রহ্মাযোগ" নামক একখানা অপ্রকাশিত নাথ সাহিত্য আছে যে, চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ এই শালবানপুরেরই অধিবাসী ছিলেন । এই "ব্রহ্মাযোগ" নামক গ্রন্থটী কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী দিশাবন্দ গ্রামের এক বৈরাগী বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল ।

বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মমাশয় বলেন, - "মাণিক চন্দ্র রাজার গান", "গৌবিন্দ চন্দ্র গীত", "ময়নামতীর গান", "মীনচেতন", বা "গোরক্ষ বিজয়" এক শ্রেণীর গাথা । প্রথম তিনটি গাথা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাদের মূলে শিব শক্তির উপাসক কন্‌ফট্ যোগীদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয় ।

যোগীদের ছড়ায়ও আমরা গোপীচাঁদের নাম পাই । মৌলবী আব্দুল করিম সাহেবর আবিষ্কৃত আর একটী নামহীন মুসলমান দরবেশী গ্রন্থেও পাটীকাড়াব উল্লেখ পাওয়া যায় ।

"পরগণে পাইটকরা স্থানে গোএঅএ সাল ।

তালিপ তলপ শিষ্য পণ্ডিত বিশাল ।।"

ময়নামতীর শক্তিশালী রাজা, রূপ-লাবণ্যবতী মহিষীগণ পরিবৃত অষ্টাদশ বর্ষীয় গোপীচাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণ, শাক্যসিংহের সন্ন্যাসের ন্যায়ই ভারতবাসীব হৃদয়-মন অভিভূত করিয়াছিল । এই অপূর্ব্ব ঘটনা দিকে দিকে, দেশে দেশে প্রবাদের মত প্রচারিত হইয়াছিল । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ নিজ নিজ দেশে গোবিন্দচন্দ্রের জন্মভূমিতে গৌরবের দাবী করিতেছিল । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে গোবিন্দচন্দ্রে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল ।

কামরূপ অঞ্চলের "শিরেগীত", মালিক মুহম্মদ বিরচিত, হিন্দীভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ "পদুমাবতী", সুধাকর দ্বিবেদীর রচিত উপাখ্যান, লক্ষ্মণদাস বিরচিত হিন্দী গাথা, বিশ্বেশ্বর বসুর সংগৃহীত উত্তরবঙ্গের আধুনিক গাথা, তিব্বতীয় গ্রন্থাদি, মাণিক গাঙ্গুলীব "ধর্ম্মমঙ্গল" প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকারে মাণিকচন্দ্র ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান পাওয়া যায় ।

ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন, E. E. Glazier. "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" লেখক, 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব" প্রবন্ধে রায় বাহাদুর * শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয়, "গৌড়ের ইতিহাস" লেখক, ** ধর্ম্মানল ভারতী, "ঢাকার ইতিহাস" লেখক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এবং Journal of the Asiatic Society of Bengal. রংপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীডার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ও যার .

যারভাবে ইহাদের জন্মভূমি ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছে। কিন্তু কাহারও সঙ্গে প্রায় কাহারও মিল নাই।

আজ "ময়নামতীর গান" ও "গোর্খা বিজয়ের" আবিষ্কার সেই সকল কাহিনী ও আলোচনার অলীকত্ব ও অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যাহা হউক, ত্রিপুরারই এক রাজার এত বড় প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা ত্রিপুরার পক্ষে কত বড় গৌরবের কথা।

"মাণিক চাঁদের গান" পাঠে আমরা জানিতে পারি, ইহারা ক্ষেত্রীকুলের বেনিয়া বংশসম্ভূত ছিলেন।

"বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল হেলাতে হারামু।" "ময়নামতীর গানের আভ্যন্তরিক প্রমাণাদি দ্বরা এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়।" ধর্মানন্দ মহাভারতীর মতে গোপীচন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। আর দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় ইহাদিগকে রাজবংশী বলিয়াছেন।

ত্রিপুরায় উদ্ভুত তান্ত্রিক বৌদ্ধভাবাপন্ন শৈবযোগী বা নাথ যতিগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যোধপুরের "মহামন্দির" নামক নগর সেই সুদূর স্থানেও নাথাদের প্রতিপত্তির সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ আজও বর্ত্তমান আছে। যোধপুরাধিপতি মানসিংহ দেবনাথযোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আজও নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা প্রতিপালিত হয়। তিব্বতে গোরক্ষনাথ পূজিত হন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও জলন্ধরনাথ বা হাড়িপাসিদ্ধ (নামান্তরে বালপাদ) - এক একজন এক একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কানুপা সিদ্ধার অন্য নাম ছিল কৃষ্ণাচার্য্য। B H Hodgson সাহেব, Journal of the royal Asiatic - অষ্টাদশ খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। Wilson's Religious seets of the Hindus গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায়, Hartland's Primitive Paternity গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫-৬ পৃষ্ঠায় Temple সাহেবের গ্রন্থে Eiot সাহেবের N. W. Province গ্রন্থে Crooke সাহেবের Popular Religion & Folk Lore of Norther India Indian Antiquary Jouranl of the Asiatic Society of Bengal প্রভৃতি গ্রন্থে এবং "পঞ্চরক্ষা", মারাঠী ভাষায় রচিত "জ্ঞানেশ্বরী", "ভক্তমণি সম্প্রদায", "সন্তলীলামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে ও "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থেও ন থযোগীদের বিভিন্নতথ্য বিভিন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এই নাথযোগীদের নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া মাণিক চান্দ, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রে কীর্ত্তি কাহিনী সমগ্র ভারতময় বিচরণ করিয়াছে।

হিন্দীভাষার সুপ্রাচীন গ্রন্থ "পদুমাবতিতে" আছে, বাংলাদেশের রাণী ময়নামতী বিক্রমাদিত্য ও যোগী ভর্তৃহরির ভগিনী ছিলেন। ভর্ত্তৃহরি (ভরথরি) কল্যাণ নগরের চালুক্য বিক্রমাদিত্যের ভাই ছিলেন। ভর্তৃহরি (হিন্দুস্থানের ভরথরি) ও বিরাট ঐশ্বর্য্য ও তদানুসঙ্গিক বিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই হিন্দুস্থানীদের মতে গোপীচাঁদ বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। বারণসীতে মুদ্রিত "(বড়া) ভরথরী চরিত্রে" ও ইহারই সমর্থন পাই।

দাক্ষিনাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোড়, তাঁহার বঙ্গবিজয় অভিযানে উড়িষ্যার নবপতিকে এবং বাঢ়ের অধিপতি ধর্ম্মপাল ও বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত তিরুমলয় পর্ব্বতস্থ চোলশ্বরী দেবার মন্দিরের নিকটে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে তাঁহার বিজয় কাহিনী ক্ষোদিত করাইয়া রাখেন।

Dr Hultzsch এই উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ।

ঐতিহাসিকদের মতে ঐ স্তম্ভলিপি রাজেন্দ্র চোড়ের রাজত্বের ৯ম ও ১২শ রাজাঙ্কর মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হয় । সুরেশ্বরের "শব্দপ্রদীপ" গ্রন্থের আলোচনায়ও বোঝা যায়, তাঁহার প্রপিতামহ দেবগণ ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ১১শ শতাব্দীর ১ম ভাগে গোবিন্দাচন্দ্রের রাজ্যসভার প্রধান রাজবৈদ্যরূপে বর্তমান ছিলেন । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার "রামচরিতে'র ভূমিকায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তদ্দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হয় । "গৌড়ের ইতিহাস" গ্রন্থ বলে গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক ১০১২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হন । উক্ত গ্রন্থে হইতে আমরা এই সংবাদও পাই যে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র ৯৭০-৯৯০ এবং গোবিন্দচন্দ্র ১০০৫-১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ।

তবে "গৌড়ের ইতিহাস" মন্তব্য করিয়াছে যে, গোবিন্দচন্দ্রে রাজধানী পাটিকানগর রঙ্গপুর জেলাস্থ ভিমলা থানার অন্তর্গত বর্তমান পাটিকাড়াতে ছিল - তাহা ভ্রান্ত ।

"ময়নামতীর গানে" আমরা পাই, সাধু লখিন্দর মহারাজ মাণিকচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন । চাঁদসদাগর ও তৎপুত্র সাধু লক্ষীন্ধর বোধহয় গোপীচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন । কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপী চন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশচন্দ্র ও চাঁদসদাগর অভিন্ন ব্যক্তি ।

ত্রিপুরা জেলাস্থ দোল্লাই পরগণার উজানী গ্রামে আজিও বেহুলার পিতা সাহ রাজার বাসভবন প্রদর্শিত হইয়া থাকে । তৎসম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী তথায় প্রচলিত আছে । যে বটবৃক্ষে সাহ রাজা তাঁহার সদাগরী নৌকাদি বন্ধন করিতেন, প্রাচীন লোকেরা বলেন, সেই বৃক্ষের দ্বাদশটি শাখা ছিল । এখন বৃক্ষটি জীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার একটিমাত্র শাখা অবশিষ্ট রহিয়াছে । ইহারই নিকটবর্তী একটি সরোবর বিপুলার সরোবর নামে প্রসিদ্ধ। এই সরোবরে গর্ভে ২ হাত দৈর্ঘ্য ১ হাত প্রস্থ ও ১ হাত বেধ বিশিষ্ট একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে । লোকে ইহাকে বেহুলার পাটা বলিয়া নির্দ্দেশ করে । পুতাটীও ইহার নিকটেই ছিল । এখন উহা পুষ্করিণীর জলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । স্থানীয় এইরূপ প্রবাদও আছে যে, এই গ্রামে একটি সরোবর মধ্যে একটি লোহার মাঞ্জুষ বা লোহার বাসরও ছিল । উহা এখন সরোবরের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । আখাউড়ার উত্তরে চম্পকনগর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানেও একটি লোহার মাঞ্জুষ ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং সদাগর চন্দ্রধরের সম্বন্ধে বহু উপকথা প্রচলিত আছে । ডিঙ্গভাঙ্গা এবং ধনাগোদা গ্রামও এই জেলায় আছে । ঘোড়াধারী গ্রামের একস্থানে চাঁদসদাগরের নৌকাডুবির চিহ্ন প্রদর্শিত হয় । বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে উল্লিখিত আছে, সদাগর চন্দ্রধরের মধুকর ক্ষীরোদ নদী যাতায়াত করিত । প্রাচীনকালে ক্ষীরোদ নদী ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়ের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত ছিল । কালক্রমে নদীটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে । কিন্তু আলেখার চর বিন্দিয়ার চর (নদীর ঘাট) (বিন্নন্দিয়া অর্থ সৈন্য, সাধিনের বাঁধ, লোয়ার চর, মনঘাটা, (নদীর ঘাট), কুরপাই (নদীর কুর) ইত্যাদি নামের দ্বারা এই গ্রামগুলি যে এককালে নদীর সংশ্রবে ছিল তাহা অনুমিত হয় । গৌরিপুরের কাছাকাছি ইছাপুরা গ্রামের নিকট "ক্ষীরাইর খাল" নামক একটী ক্ষুদ্র খাল এখনও বর্তমান আছে । ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণাংশে ও লালমাই পাহাড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত ঘোষনগর গ্রামে পুষ্করিনী খননের সময় নৌকা, নৌকার মাস্তুল ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে । ঘোষনগর গ্রামে এবং ইহার নিকটবর্তী লালমাই ও ময়নামতী পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ অতি শ্বেতবর্ণের একরকম প্রস্তর খণ্ড দেখা যায়, যাহার উৎপত্তি একমাত্র নদীতেই হইয়া থাকে । স্থানীয় লোকেরা এইগুলিকে গণ্ডশীলা বলে । লালমাই পাহড়ের বিভিন্ন স্তরগুলি পরীক্ষায় বুঝা যায় ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, লালমাটীর পাহাড় বলিয়া ইহার নাম লালমাই হইয়াছে (মাই অর্থ মাটী) ।

এই চন্দ্রবংশেরই জনৈক রাজা জয়চন্দ্রের সভাকবি নাথের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভবানীনাথ বা দ্বিজ ভবানীদাস "লক্ষ্মন দিগ্বিজয়" বা "রামভিক্ষে", "রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ", "ময়নামতীর গান" প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন

করেন। "লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়ের" উক্তি অনুসারে রাজা জয়চ্ছন্দের আদেশে লোকহিতার্থে ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে অনুদিত "লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়" তিনি প্রনয়ন করেন।

"জয়চ্ছন্দের নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন।।"

....

"মহারাজা জয়চ্ছন্দ করাইল পদবন্ধ।

তরাইতে পাতকী সকল।"

"ময়নামতীর গান" পালার মতন করিয়া কীর্তনীয়ার গান করিত। অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীতে "ময়নামতীর গান" রচিত হইয়াছিল।

কাণা হরিদত্তকৃত প্রথম মনসামঙ্গল ও ময়নামতীর গান প্রায় সাময়িক রচনা। ময়নামতীর পাহাড়স্থ বর্ত্তমান নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম তৈয়ার হওয়ার কালের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে বহুমূর্ত্তির সঙ্গে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মীত একটি ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পাদদেশে "যুবরাজ শ্রীজয়চন্দ্রস্য" এই একটিমাত্র পংক্তি উৎকীর্ণ ছিল।

সেই মূর্ত্তিটি মহারাজ কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ীতে ছিল। ময়নামতী পাহাড় হইতে ২ মাইল কি ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে ভারেল্লা গ্রামে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, গণেশ মূর্ত্তি ও নটেশ্বর শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। নটেশ্বর শিবমূর্ত্তিটি ঢাকার যাদুঘরে আছে। ইহার পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় লয়হচন্দ্র নামক এক নরপতির কর্ম্মান্তপাল (কর্ম্মান্ত নিবাসের তত্ত্বাবধায়ক রাজ কর্মচারী অর্থাৎ বাণপ্রস্থাবলম্বীদের তত্ত্বাবধায়ক) কুসুমদেবের পুত্র ভারুদেব এই র্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এই উৎকীর্ণ লিপির অক্ষরগুলির আকার আলোচনায় মনে হয়, এই লিপি ১০ম কি ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা মধুসূদন কর্ত্তৃক ক্ষোদিত হইয়াছিল এবং ইহার রচয়িতা ছিল রেতেক নামক জনৈক ব্যক্তি। ইহার শুদ্ধ পাঠোদ্ধার করেন ডাঃ রাধামোহন বসাক ও ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। ইহা ঢাকা মিউজিয়মে আছে।

ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিটির পিহর গ্রামে এক নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ছিল। গণেশমূর্ত্তি ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিটির বাহনস্থানীয় সিংহটি কুমিল্লায় অনুকূল চন্দ্রের রায়ের বাড়ীতে ছিল।

কুমিল্লা হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে গোমতীর উত্তর পাড়ে পাঁচথুপী নামক একটি গ্রাম আছে। স্বতঃই অনুমান হয় যে, পাঁচথুপী নামটি "পঞ্চস্তূপ" শব্দেরই অপভ্রংশ। পূর্ব্বে গ্রামটি আরও অনেক বড় ছিল। এখন ইহার সীমা সঙ্কুচিত হওয়ায় একটি স্তূপও নিজ পাঁচ থুপী গ্রামে নাই। তবে ইহার চতুষ্পার্শে ৪/৫ টি স্তূপ বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে একটি স্তূপে অনেক ইট থাকায় কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহা ইটালা নামে পরিচিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে "হরচন্দ্র" নামক একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এখনও এই স্তূপের উপর একখানি ইষ্টকালয় অটুট অবস্থায় আছে। ইহা একটি দেবালয় ছিল বলিয়া মনে হয়।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, চট্টগ্রাম শহরের দয়াময়ের দেবালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত লিপির অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সতীশ শিকদার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায়, এই উদ্ধারপ্রাপ্ত লিপি সম্পর্কীয় দানপত্রে উল্লিখিত জনপদগুলির কোন কোন অংশের ইটাল্লার নিকটবর্তী জনপদগুলির নামের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ রহিয়াছে।

চন্দ্র রাজাদের অন্যতম শ্রীচন্দ্র রাজার একখানা অগ্রশাসন বলে যে, - পূর্ণচন্দ্র এই রাজবংশের আদি নৃপতি ছিলেন । সুবর্ণচন্দ্র প্রভৃতি আরও কতিপশ রাজার নামও ইহাতে উল্লিখিত আছে । ঐ তাম্রশাসনে তাহাদের রাজধানীর কোন নির্দ্দেশ নাই । উহা বিক্রমশীলা বিহার হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও বিক্রমশীলা বিহার কখনও ঐ রাজাদের জয়স্কান্দাবার হইতে পারে না । উহাতে মাণিক চন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের নাম নাই

*কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন, "প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন । রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে প্রাচীনকালে ভবচন্দ্র নামে অন্য একজন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

খৃ: ১৩শ শতাব্দীতে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ছেং যুম্‌ফাই বা নামান্তরে কীর্ত্তিধরই মেহেরকুল (প্রাচীন কমলাঙ্ক বা পাটীকাড়া রাজ্য) জয় করেন । মহারাজ বিজয় মাণিক্য বঙ্গ ও ব্রহ্মরাজ্যের মধ্যস্থিত সমগ্র সুহ্ম দেশের একছত্র নরপতি ছিলেন । মহারাজ ছেংযুম্‌পা (কীর্ত্তিধর) ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী কোন রাজাকে পরাজিত করিয়া মেঘনা নদ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন ।

বাঙ্গালীর ত্রিপুরায় আসিবার বহু পূর্ব্বে এদেশে আরাকানীদের বসবাস ছিল । আজকাল বহুস্থানে মগের খনিত অর্থাৎ আরাকানীদের খনিত বহু দীঘিকা ও সরোবর রহিয়াছে । "মেঘনা" ত্রিপুরা জেলার একটি সুবৃহৎ নদ । ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরার সীমাস্বরূপ । এই নদের এউত্তরভাগ বরাক বলিয়া পরিচিত । কিন্তু দক্ষিণ অংশ "মেঘনা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় "মেঘনা" নামে কোন শব্দ নাই । সেইজন্য কেহ কেহ ইহার একটা অর্থ বাহির করার জন্য টানা হেঁচড়া করিয়া ইহাকে "মেঘনা" নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে । এই নদের "মেঘনা" নাম প্রকৃতপক্ষে আরাকানী দেওয়া । আরাকানের "মেনাম্", "মেকং" ইত্যাদি নামের সহিত "মেঘনা" নামের অতি নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে । মগেরা কেরোসিন তৈলের প্রশ্র বণকে "ছেইতা কুণ্ড" বলে । আমরা মনে করি "সীতাকুণ্ড" নামটিও আরাকানীদের "সেইতা কুণ্ড" হইতে আসিয়াছে।

বগাইসাইর পরগণার দৌলবাড়ী গ্রামে আবিষ্কৃত অষ্টভূজ শক্তিমূর্ত্তির পাদপীঠে নিম্নোক্ত লিপি উৎকীণ৪ দেখা গিয়াছিল ,-

"স্বস্তি শ্রী খড়্গোদ্যমো নাম নরাধিরাজ: ।
তৎসুনুরাসীদ্ ভুবিজাত খড়গ: ।।
তদাত্মজো দানপতি: প্রতাপী
শ্রীদেবখড়্গো ভূপতিবর: ।
তৎসুতো বিজিতারি খড়গ রাজস্তস্য
মহাদেবী মহিষী শ্রীপ্রভাবতী সর্ব্বানীং
প্রীতিভক্ত্যা হেমলগ্নামকারয়ৎ শ্রী: ।।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, এক সময় এতৎ প্রদেশে খড়্গবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন ।

লালমাই পাহাড়স্থ কোটবাড়ী হইতে আধমাইল দক্ষিণে ভোজরাজার কোট ও ভোজরাজার দীঘিকা এবং দীঘিকার পশ্চিমে ইষ্টক ভবনের ধ্বংসাবশেষ ভোজ নামক রাজার এবং ভোজ দীঘিকার উত্তরদিকে "আনন্দ সাগর" এবং পুষ্করিনীর পশ্চিম প্রান্তের প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ "আনন্দ" নামক রাজার স্মৃতি বহন করে ।

বাঘাউরা গ্রামের প্রাচীন পুষ্করিনী হইতে প্রাপ্ত চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি, - "ওঁ

সম্বৎত মাঘ দিনে ২১ শ্রী মহীপাল দেবরাজ্যে কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিল্লকিন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য বসুদত্তস্য মাতাপিত্রো-রাত্মন: পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে "- অর্থাৎ নৃপতি মহীপালের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে সমতট দেশের অন্তর্গত বিলকীন্ন" নিবাসী লোকদত্ত নামক জনৈক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বণিক কর্ত্তৃক মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বর্ত্তমান "বিল-কেন্দু-আই" গ্রামটিই "বিল্লকীন্ন । ঐ লিপিটি "কুটিল বা সিদ্ধ মাতৃকা" অক্ষরে উৎকীর্ণ।

এতে বুঝা যায়, ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ("সমতটের" অন্তর্ভূক্ত) খৃ: ১১শ শতাব্দীতে পালবংশীয় গৌড়াধিপতি প্রথম মহীপালের শাসনাধীন ছিল ।

সমতট- বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ - Vincient Smith's History' "বরকামতা" গ্রামটিই ছিল সমতট প্রদেশের তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজধানী -"করুমন্ত ।" বরকামতায় প্রাপ্ত এক শিলালিপিও তাই বলে । নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ও Vincient Smith এর সঙ্গে একমত ।

তবে আবার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা বলেন, এতদঞ্চলের নাম ছিল সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য "কমলাঙ্ক ।" বরকামতায় মৃত্তিকা স্তুপোপরিস্থ শিলাস্তম্ভ এই মতের সমর্থক ।

সংস্কৃত রাজরত্নাকর, শ্রীহট্টের ইতিহাস মেজর চালর্স ষ্টুয়ার্ট প্রণীত বঙ্গের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে জানা যায়, ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা তুগাল খাঁ - ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী ভূম্যাধিকারী হীরাবন্ত খাঁর সাহায্যের জন্য "জাজিনগর" (নুরনগর পরগণার অন্তবর্তী কসবা থানার নিকটস্থ "জাসিসার") আক্রমণ করিয়া ছেংখুমপা মহিষী ত্রিপুরার মহারাণী "ত্রিপুরা সুন্দরী" কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হন ।

জেলা ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ (ময়নামত) পালবংশীয় ছাড়া খড়গবংশীয় রাজগণেরও অধীন ছিল। তদনন্তর চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি চন্দ্ররাজগণ আসেন । তাঁহারা "মিহিরকুল" বা মেহেরকুল পরগণায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ।

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্ম্মচারী বীরমণি হাজারী চৌদ্দগ্রাম পরগণার পূর্ব্বদিগস্থ খণ্ডল পরগণায় একটা পুষ্করিনী খনন করাইবার সময় এক প্রস্তর নির্মীত শিবশক্তির মূর্ত্তি পায় । তাহাই আগরতলার "উমা মহেশ্বর" হইাতে উৎকীর্ণ আছে,-

"ওঁ শ্রীতড়ঙ্গ চন্দ্র দেব পাদীয় সম্বৎ ১৮
মাঘদিনে ১৯ ভূতৃতা কারিত উমা মহেশ্বর ভট্টারক:
র্খাচতঞ্চ কেম্লো কের্নোত ।।"

শ্রীতড়ঙ্গ চন্দ্র দেব পাদের অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যকালে মাঘ মাসের ১৯ তারিখে রাজা স্বয়ং এই উমা মহেশ্বর ভট্টারকের মূর্ত্তি করাইলেন, কোম্নাক নামক শিল্পী হইা নির্মাণ করিল । শ্রী তড়ঙ্গদেব পাল বংশীয় রাজা ছিলেন।

সত্য সত্যনারায়ণ, গৌর একেরই বহুরূপ; কিন্তু স্বরূপ এক ।

পরিব্রতা ধর্ম্ম ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য সোপান । কারণ পতিব্রতা ধর্মটা রামঠাকুর ধর্মদর্শনের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে । পতিব্রতা ধর্মের ব্যাখ্যা আমরা বেদবাণী প্রথম খণ্ডের ৫৭ সংখ্যক পত্রে পড়েছি যে, -"অনন্যাশ্চিয়ন্তো মাং যে জনা: পর্যু পাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম্ ।।
গীতা ৯/২২

এই যে ভাব ইহা ছাড়া আব কিছুই চায না, জানে না, অন্য কিছুব দবকাব নাই ।ইহা ঐশ্বয্য প্রলোভনেব আবাহনকেও তুচ্ছ কবে, তাহাকেই পতিব্রতা ধর্ম বলে । গুরুধ্যানং তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মোময়ো ভবেৎ' ইত্যাদি। 'গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব গুরুগতি, গুরুবেব পবং ব্রহ্ম - তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম ' ইত্যাদিতে পতিব্রতা জাগাইযা বাখিযাছে । অর্থাৎ অদ্বৈতভাব হৃদযে বাখা ।" তা হলে সংক্ষেপে বলতে গেলে পতি প্রাপ্ত হবাব জন্য যে ধর্মাচবণ কবা তাই পতিব্রতা ধর্ম্ম পতিধর্ম্ম ধবে থাকলে সদ্গতি লাভ তো হযই উপবন্তু এতে পাথি৪ব অভাববোধ চিবতবে বিনষ্ট হযে যায । তাতে আব অন্য আকৃতি থাকে না । তখন পতিব্রতী পবমাণুবক্তিতে নিজকে উর্দ্ধ শিখবে উঠিযে বেখে পবমেব চবম আন্দ অনুভব কবে । আমি ব আমিত্ববোধ তখন বসাতলে গিযে পাতিব্রত্য বোধ তন্মধ্যে এসে বিবাজ কবে । এমন কি কর্ম্মবন্ধন ভয কেটে যায তখন ভক্ত পতিব্রতায আসীন হয ।

শ্রীশ্রীঠাকুবও বলতেন পতিব্রতাব সত্যতা প্রভাবে কোনটাবই অভাব থাকিতে পাবে না । সত্যধর্ম সত্যপবা ভগবান নিত্য নিকটস্থ থাকিযা, অকপট শক্তিদান কবিযা, পতিব্রতাব বক্ষা সাধন কবিযা থাকেন ।ইহা বেদজ্ঞ ঋষিগণেব আঢ্য প্রতিজ্ঞা সন্দেহ নাই । পতিব্রতাব স্বধর্ম আসলে, নিত্য উন্মুখ থাকিযা কাল যাপন কবেন । 'এক সত্যং পবমং ধীমহি ।' পতিব্রতা ধর্ম সাধাবণ সুখেব লোভে নাশ কবিযা থাকে ঐশ্বর্য বৈভব, ধন জন বত্নাদিকে মাত্র পতিধর্মেব ব্যাখ্যা কবতে তাব স্বরূপ বলা আছে যে, - "It is easier for camel to go through the eye of a needle than for a roich man to enter into Kingdom of God (Holy Bible New Testament S, Mark, Ch, 10, Para 25)

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুবেব পতিব্রতা ধর্ম্মেব ব্যাঘাৎ বা বাধা ধর্ম্মবীব যিশুব উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য গীতায অনুরূপ তত্ত্ব বযেছে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত ২/১৬।" এ পতিব্রতা সত্যে নিবদ্ধমন দ্বাবা "পবম পবিত্র" যোগাযোগ হয - ।

পবম কি ? তা হলো - পবম 'সত্যিব্রত ধর্ম্ম ।' শ্রীশ্রীদযানিধি ঠাকুবেব বাণীতেই বযেছে - "স্থিব বস্তুব সঙ্গ না আইযা, পতিসেবা হাবাইযা নানবিধ উপায সৃষ্টিব দ্বাবা কেহ সন্ন্যাসী, কেহ জাপক, কেহ যোগী, কেহ ভোগীরূপ ধাবণ কবিযা, আশু সুখ অনুভূতি দ্বাবা সর্ব্বতোভাবে ব্যবসাযী বুদ্দিব আবৃত হইযা যায । এই সকল কেবল মাযামন্ত্র জানিবেন । সকল উদ্দেশ্য বিধান ছাডিযা একমাত্র পতিসেবায নিত্য নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা কবিবেন । বর্ত্তমানে পতিসেবাই পবম পুরুষার্থ, ইহা ছাড়া আব কিছুই নাই ।" তা হলে পতিব্রতা ধর্ম্ম জগতেব মুখ্য সোপান । এতৎ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে ধর্মবাজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুব ততবেশী প্রসাব দেন নি । তাঁব শ্রীমুখ নি সৃত বাণীতে বযেছে "অতএব পতিব্রতা ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন সহাযে কৃতকার্য সম্পাদন হইতে পাবে না। মনেব সুখবোধ যাহা হয, তাহা কেবল প্রকৃতিব বিকাব মাত্র, ক্ষমস্থাযী ।"

"পতিব্রত ধর্মই সত্যব্রত" এটা শ্রীশ্রীঠাকুব অনেক সময বলতেন । ভগবৎ সেবাদ্বাবা মানুষেব মনেব আববণ মুক্ত হযে যায - মাযা - নির্মোক ঝবে পড়ে যায । দযাল ঠাকুব বলেন - "পতিসেবা কবিতে কবিতে অনিত্য বস্তুব আবববণ মুক্ত হইযা যায । পতিসেবায সতত বত থাকিতে থাকিতে পবমানন্দ জাগবণ হইযা সকল দু খেব কর্ষণ থাকে না । এই জন্যই সেবাপবা ভক্তিতে সকল অশান্তিব শান্তি হইতে পাবে ।" তদগত চিত্ত হযে থাকলে জগতে অভুতপূর্ব্ব আনন্দবস ধাবায অবগাহন কবা যায । পবম বসতমেব ভাবনায বসাস্বাদনই কবা যায । আসল কথাটি এই যে, শ্রীশ্রীসত্যনাবাযণেব চবণ স্মবণই -পতিব্রতা ধর্ম নামে অভিজ্ঞাত হযেছে । কাবণ শ্রীশ্রীঠাকুবেব ধর্মদর্শনে শ্রীশ্রীসত্যনাবাযণেব পূজা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হ।। এ ধর্ম চিন্তায পাতিব্রত ধর্ম ও সত্যনাবাযণ সেবা সমপার্য্যযভুক্ত বলেই বিবেচিত হচ্ছে । আবো সূক্ষ্মভাবে' চিন্তা কবলে জ্ঞানগম্য হবে

যে, গুরুকে এবং তার নামকে আশ্রয় করিলেই অতির অর্থাৎ গোবিন্দের আশ্রয় হইল । আশ্রয় অর্থ পদ বা চরণ।"

(শ্রীরাম-পূজা-পৃঃ ৬০)

তাঁরই আশ্রয় আমর তাই কামনা করছি কায়মনোবাক্যে। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র যে পতিব্রতা ধর্ম জগতে প্রচার করে গেছেন তার কেন্দ্রস্থলে আজ তিনি নিজেই বিরাজমান পরিশেষে ঋগ্বেদের সূক্তটিই স্মরণ করে তাঁর শ্রীচরণ শরণ নিচ্ছি - "

"তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা-শাস্মহে পুরুহূত ।
সখে বসো জরিভৃভ্যঃ ।। ১০ ।।"
অর্থাৎ -
স্মরি তোমায় পুরুহূত
জগজ্জনের বরেণ্য,
গাহি তোমার সূক্ত কত -
তুমিই মোদের শরণ্য ।

সঙ্গীত

সঙ্গীতাচার্য্য ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা

সঙ্গীত বলিতে লয, সুব ও ছন্দ একত্রে সন্নিবেশিত হইযা যে অবস্থা ধাবণ কবে তাহাকেই বুঝায, এই অবস্থা অতি সুন্দব, এই সুন্দবাবস্থাকে আস্বাদন কবাব জন্যই সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনাব প্রযোজন হইযা থাকে এবং এই সুন্দবাবস্থাব ভিতব প্রবেশ কবিযা নিজেকে সুন্দব কবিযা তোলাই সঙ্গীত, শিক্ষা ও সাধনাব মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এই উদ্দেশ্যকে অবস্থায পবিণত কবিতে হইলে নির্ম্মল নিষ্কাম সঙ্গীত সাধনাব দবকাব। এই সাধনায মানুষকে লইযা যায সূক্ষ্মপথে এবং মানুষই এই পথেব অধিকাবী। সেই সূক্ষ্মপথ যখন সূক্ষ্মানু সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইযা দৃষ্টি বা চিন্তাব অগোচব হয তখন আইসে অনুভূতি। অনুভূতি আসিলে পব হয ভাবেব সৃষ্টি, ভাব সৃষ্টি হইলে পব ভাবোন্মাদ হইযা মানুষ নিজকে হাবাইযা ফেলে, তখন তাহাব মান অভিমান, ছোট বড, আপন-পব জ্ঞান থাকে না, তখনই তাহাকে সমজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয। এই জ্ঞানলাভ কবিলে মানুষ হইযা যায মুক্ত, মুক্ত পাওযাব জন্যই সাধনা হয তাহাব সাথী, কিন্তু সাথী হওযা চায খাঁটী অর্থ নির্ম্মল নিষ্কাম, তাহা না হইলে সাথী হইযা পবে মুক্ত পথেব কন্টক সাথীকে খাঁটী কবিযা তোলা নিজেবই দাযিত্ব, অতএব সঙ্গীত সাথীটি হওযা চায খাঁটী তাহা হইলেই সাথীটি লইযা যাইবে। সত্যসুব বা শব্দ বা ধ্বনিব অনুসন্ধানে অর্থাৎ যে সপ্তসুব কডি কোমল শ্রুতি, সূক্ষ্ম শ্রুতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শ্রুতি ইত্যাদি ইত্যাদি সুব একত্র হইযা একসুবে পবিণত হইযা আছে, তাহাব কাছে, তথায পঁহু ছিলে পবই মানুষ বুঝিতে পাবে যে, সুব সপ্ত নয, সুব এক অর্থাৎ একমেবাম্দ্বিতীয নাস্তি। যাহা সপ্ত সুব অর্থাৎ দ্বিতীয সুব ইহাই মিথ্যা সুব অর্থাৎ বে-সুব। যাহা এক সুব ইহাই সত্য সুব। এই সুবটি কি এবং ইহা কোথায লয প্রাপ্ত হয লয প্রাপ্তেব স্থানটিব বা কি তাহাব উত্তব গীতায ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাদ অর্থাৎ শব্দ বা ধ্বনি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিযাছেন যথা —

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দসা যো ধ্বনি ঃ।
ধ্বনিবন্তর্গতং জ্যোতি তজ্যোতিবতগতং মনঃ।
তন্মনো বিলযং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পবম পদং।।

ও তজ্যোতিব অন্তর্গত যে মন ইহা ব্রহ্মেতে লয প্রাপ্ত হয, সেই লয স্থান বিষ্ণুব পবম পদ জানিবে।
(উত্তর গীতা)

ত্রিপুরায় বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন

নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজারঞ্জক ত্রিপুরাধিপতি কিরীট ৫০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাব সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সে-সময়ে ত্রিপুরায় এক নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূচনা হয়। উপর্য্যুপবি অনাবৃষ্টির দরুণ রাজ্যের কৃষিকর্ম ব্যাহত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া প্রজাপুঞ্জেব মধ্যে হাহাকাব রোল উঠে। প্রজাবৎসল রাজা কিরীট (মতান্তরে ডুঙ্গুর ফা) বিপদ মুক্তির কোনরূপ উপায় না দেখিযা এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান কুপিত হওয়ায় দেশে এইরূপ দুর্যোগে আসিয়াছে। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল যে, ভগবানের কৃপা ভিন্ন দৈব রোষানল হইতে মুক্তি নাই। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সঙ্কটত্রাণ মানসে এই শান্তি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালে ত্রিপুরার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব থাকায যজ্ঞের কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। রাজা কিরীট প্রথমে পার্শ্ববর্তী কামরূপ রাজ্যে অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু কামরূপে নিষ্ঠাবান বাহ্মণের অভাব না থাকিলেও সঙ্কল্পিত বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড বিশারদ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দুস্প্রাপ্য ছিল। প্রতিবেশী বঙ্গদেশেও (গৌড়) এরূপ ব্রাহ্মণ বিবল ছিল ; কারণ এই ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে বঙ্গদেশে রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক প্রথম বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায রাজা কিরীট অনন্যোপায় হইয়া উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইবার বাসনায় মিথিলাপতির নিকট দূত প্রেরণায় কবেন। তৎকালে বলভদ্র নামক আর্য্যধর্ম সংরক্ষক রাজা মিথিলার অধিপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর নৃপতির আকুল অনুরোধ রক্ষা করে পাঁচজন বেদজ্ঞ মৈথিলী ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরার যাইয়া যজ্ঞকর্ম সম্পাদন কবিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ত্রিপুরা রাজ্য সদাচারবর্জ্জিত দেশ বলিয়া তৎকালে জনশ্রুতি থাকায় উক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায গমন করিতে উৎসাহবোধ করেন নাই; পক্ষান্তবে প্রতিপালক রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতেও বেদনা অনুভব করেন। অবশেষে তাঁহারা স্থিব করেন যে, কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভব না করিয়া, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ত্রিপুরার প্রেরণ করিয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থাদি জ্ঞাত হওয়ার পর ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হইবে। সেমতে একজন লোক মিথিলা হইতে সুদূর ত্রিপুরায় রওয়ানা হন। ব্রাহ্মণদেব ঐ প্রতিনিধি যথাসময়ে ত্রিপুরার আগমন করিয়া রাজ্যের সম্যক অবস্থা অবগত হন এবং অনতিবিলম্বে মিথিলার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে জানান যে, ধর্মকর্মে ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট ও পবিত্র দেশ। এখানে দেব দ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অতিশয় প্রবল। বিশেযতঃ বরবক্রাদি নদ-নদীর পবিত্র জল প্রবাহে ত্রিপুরা শুদ্ধ-স্নাত। যাহারা ত্রিপুরাকে

সদাচারবর্জ্জিত দেশ বলেন, তাঁহার নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃ একথা বলেন। প্রতিনিধির উক্তিতে ভ্রান্তি নিরসন হওয়ার পর ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায় আসিয়া রাজা কিরীটের সঙ্কল্পিত শান্তি-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সম্মত হন।

অতঃপর সুদূর মিথিলা হইতে বৎস গোত্রীয় শ্রীনন্দ, বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি, এবং পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম এই পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৫১ ত্রিপুরাব্দে (৬৪১ খৃঃ) শুভলগ্নে ত্রিপুরায় আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। রাজা কিরীট এই প্রকার মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় ব্রাহ্মণগণ তাহাকে 'আদি ধর্ম পা' উপনামে ভূষিত ও সম্মানিত করেন। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত 'ভানুগাছ' পরগণার 'মঙ্গলপু' গ্রামে রাজা কিরীটের শান্তিযজ্ঞ মহা আড়ম্বরে সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞ কুণ্ডের চিহ্ন 'হোমের গাত' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং ধর্মনিষ্ঠ রাজা কিরীটের অতীত পুণ্যকীর্ত্তির স্মৃতি বহন করিয়া গ্রামবাসীগণকে আজিও বিস্মিত ও অভিভূত করে।

উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের হেতু সম্পর্কে তাত্ত্বিক পণ্ডিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন -- "রাজ প্রাসাদোপরি একটি অশুভ পক্ষী উপবেশন করিয়াছিল ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শান্তির জন্য ত্রিপুরাধিপ, মন্ত্রীগণের পরামর্শে শাকুনিক ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং দেখা যায়, এই যজ্ঞের হেতু সম্পর্কে দুইটি বিপরীত মত আছে। এই প্রবন্ধে প্রথম মতটি অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে ত্রাণের উপলক্ষ্যটিকে অনুসরণ করিয়াছি।

যাহা হউক ত্রিপুরাধিপতির সঙ্কল্পিত শান্তি যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্মতির জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হইলে নৃপতি কিরীট অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজ্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনার কথা অতিশয় বিনম্রভাবে প্রকাশ করেন। রাজার এই আকুল আবেদন ব্রাহ্মণগণ শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ত্রিপুরার আকর্ষণীয় স্নিগ্ধ মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে এবং প্রজাসাধারণের ভক্তি প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া এদেশে ঘর বাঁধিবার আকাঙ্খাই ব্রাহ্মণগণের চিত্তে জাগরূক হইয়াছিল। কাজেই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণ এদেশের অধিবাসীরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা কিরীট তাম্রশাসন দ্বারা পঞ্চব্রাহ্মণকে পঞ্চখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই ভূমিকে আজিও 'পঞ্চখণ্ড' বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। উক্ত দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই নামের সঙ্গে 'স্বামী' উপাধি ব্যবহার করিতেন।

উক্ত পঞ্চখণ্ড ভূমিদান প্রসঙ্গে যে তাম্রশাসনে দানপত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে বিধৃত আছে। প্রতিলিপিটি এইরূপ —

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশা শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম পা,
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষ্ তপস্বিষু।
বৎস বাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ,
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতিপুরুষোত্তমাঃ ।
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী,
দক্ষিণনাস্যঞ্চ পূর্ব্বাস্যাং হাঙ্কনা কৌকিকাপুরী।
এতন্মধ্যাং সশস্যাং যাং টেঙ্গরি কৃকিকষিতাং
প্রাগলভ্য দত্তাং তদ্ভূমিং তেযু পঞ্চ তপস্বিষু।
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে,
ত্রিপুরা চন্দ্রাবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তাপত্রিকা।"

ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্ম পা এইভাবে দানপত্র দ্বারা মিথিলাদেশীয় পঞ্চতপস্বীকে পঞ্চখণ্ড ভূমি দান করিলেন। এই ভূমির চৌহদ্দী হইল—পশ্চিম ও উত্তরদিকে বক্রগামনী ক্রোশিয়া (ক্রোশিয়ারা বা কুশিয়ারা)

নদী, দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে হাঙ্কানা নামক কুকী পল্লী ; এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ ভূমি টেঙ্গরী সম্প্রদায়ের কুকিগণ কর্ত্তৃক কর্ষিত হইত। ইহা ৫১ ত্রিপুরা সনে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে দানপত্র সম্প্রদান পূর্বক পঞ্চ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়। উত্তরকালে এই ভূমিই পঞ্চ খণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীহট্ট কালক্রমে মুসলমানধিকারে চলিয়া গেলে পঞ্চখন্ড ও ত্রিপুরার শাসনবর্হিভূত হইয়া যায়।

আদি ধর্মপার নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ ভূমি লাভ করার পর প্রশংসিত ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধিলেন ; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা বৈষয়িক কতকগুলি অসুবিধা বোধ কবিতে লাগিলেন। তাহাদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডেব পবিধি সঙ্কুচিত হইল। এ সমস্ত অসুবিধা দূবীকবণার্থে তাহাবা স্বদেশ হইতে বিভিন্ন গোত্রের দূরীকরণার্থে তাঁহাবা মিথিলা হইতে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগল্য, স্বর্ণকৌশিক, ও গৌতম গোত্রীয আরও পাঁচঘর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এবং তৎসহ সদাচারী ভৃত্য ও নরসুন্দর ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক আনয়ন করিয়া স্ব স্ব গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণ সকলেই কালক্রমে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং বিশেষ সম্মানিত হন। প্রথমাগত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এবং পশ্চাদগত অপর পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণগণ সকলেই বৈদিক সাম্প্রদায়িক নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রতিবেশী গৌড়রাজ্যের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সকলেই বৈদিক সাম্প্রদায়িক নামে খ্যাতি লাভ করেন প্রতিবেশী গৌড়রাজ্যের বৈদিক ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ড ও কুলাচার প্রথার সঙ্গে পঞ্চখণ্ডের বৈদিক ব্রাহ্মণদেব অনেক পার্থক্য ছিল। কণৌজী ও মৈথিলীরীতির মৌলিক পার্থক্যেব জন্যই এরূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণ এবং তাহাদের উত্তরপুরুষগণ ক্রমান্বয়ে এতদ্দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চায় এই বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ সুদূর অতীতকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত স্বীয় কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। পবম নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চখণ্ডের পশ্চাদগত কাত্যায়ন গোত্রীয বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেকালে দেশব্যাপী কিংবদন্তীর মত প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মিথিলানিবাসী পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জানা যায়, ন্যায় শাস্ত্রের বিতর্কে ও পাণ্ডিত্যে রঘুনাথ তাঁহার গুরুর প্রতিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া গিযাছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'নীলাবতীটীকা', 'বুৎপত্তিবাদ', 'পদার্থখণ্ডন', 'তত্ত্ব চিন্তামণি- দীধিতি', 'আত্মতত্ত্ব বিবেক টীকা', 'প্রামাণ্যবাদ', 'নানার্থ বাদ', 'ক্ষণভঙ্গুর বাদ' 'আখ্যাত বাদ', 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য টীকা', 'গুণ-কিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি', 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-টীকা', 'ন্যায় নীলাবতী প্রকাশ দীধিতি', 'ন্যায় লীলাবতী বিভূতি', 'ব্রহ্মসূত্র বত্তি', 'মলিম্লু চু-বিবেক' প্রভৃতি বিখ্যাত। রঘুনাথ শিরোমণি অবিরাম শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

তিনি শিক্ষা ও শাস্ত্রচর্চ্চার ক্ষেত্রে যে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রভাব দীর্ঘকাল যাবত এতদ্দেশে বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার উত্তরপুরুষদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম, গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রামগঙ্গা সিদ্ধান্তবাগীশ, তারাকিশোর স্মৃতিরত্ন তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়া বৈদিক সম্প্রদায়ের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। প্রশংসিত জগদ্বিখ্যাত শিরোমণি সম্পর্কে এবং তাঁহার উত্তরপুরুষ তথা প্রতিবেশী পণ্ডিতবর্গের অবদান বিষয়ে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় রঘুনাথ শিরোমণি নিবন্ধে লিখিয়াছেন —"এতাদৃশ জগদ্বিখ্যাত শিরোমণি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ..... যে সকল মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা কেবল শ্রীহট্টের নহে, সমস্ত বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছেন। এই জন্য পণ্ডিত সমাজে এখনও এই প্রবাদবাক্ শ্রুত হওয়া যায়—

সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
চট্টলে চোত্তমঃ নাস্তি শ্রীহট্টে নাস্তি মধ্যম ঃ।।"

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পাঠে জানা যায়, শ্রীশ্রী মন্মাহপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব উল্লিখিত বৈদিক সম্প্রদায়ের বৎস গোত্রীয় তপস্বী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুন্ধরা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মণেরা ঋক্ সাম, যজু —এই তিন বেদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বাৎস্য ও পরাশর গোত্রীয়রা ঋগ্বেদীয়, ভরদ্বাজ গোত্রীয়রা সাম বেদীয় এবং কৃষ্ণাত্রেয় ও বৎস গোত্রীয়রা যজুর্বেদীয় ছিলেন। যজুর্বেদের দুই শাখা অর্থাৎ 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' — এই দুই ভাগে ছিলেন যথাক্রমে কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস্য গোত্রীয়রা। শ্রীহট্টে বৈদিক-বাসন পূর্ব্ব ভারতের একটি সামাজিক বিবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধনমূলক ঐতিহাসিক ঘটনা ও কীর্ত্তি। শ্রীহট্টের 'পঞ্চখণ্ড' যে ত্রিপুরা রাজ্যেরই অন্যতম প্রত্যঙ্গ ছিল একথায় পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্ব ভারতে মুসলমান শাসনাধিকার প্রসারিত হওয়ার পূর্ব্বকাল পর্যন্ত দক্ষিণ শ্রীহট্ট নোয়াখালী এবং কমলাঙ্ক (আধু নিক কুমিল্লা জেলা) স্মরণাতীতকাল হইতে স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রাচীন ত্রিপুরার সমতলভুক্তিরূপে চিহ্নিত থাকিয়া পূর্ব্বভারতের অন্যতম গৌরবস্থল ছিল —ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত। সুতরাং ধর্ম্ম সংরক্ষক ত্রিপুরাধিপতি কিরীটের বৈদিক বাসনরূপ মহৎ কীর্ত্তি কেবলমাত্র ত্রিপুরারই নয়, সমগ্র দেশেরই গৌরবের বিষয়।

টীকা ঃ

এই প্রবন্ধের তথ্য বিশ্লেষণে 'রাজমালা' বৈদিক সংবাদিনী, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, আসামের বিশেষ বিবরণ, কামরূপ শাসনাবলী, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (১১শ ভাগ/১ম সংখ্যা/১৩১১ বাং) প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

— নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরার ভাষা ও সংস্কৃতির একদিক

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

সম্পদকে অবহেলা করিয়া নিঃস্ব হইতে কেহ না চাহিলেও অবহেলায় যে ফল তাহা পাইতেই হইবে। প্রয়োজন ও পরিণামবাদীদের তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য বস্তুকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভাব-এর শাব্দিক রূপ ভাষা। ইহার অনুশীলন ইহাকে সমৃদ্ধ করে, পুষ্ট করে। আনুসঙ্গিকরূপে ভাষা জাতীয় সংস্কৃতিকে নানা ধারায় বহাইয়া দেয়, তখন তাহার রূপের প্রকাশ বৈচিত্র্য! ইহাকেই লালন, পোষন করা জাতির জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি।

আজ বিস্মৃতির গহ্বরে পতিত হইলেও ত্রিপুরার আদিবাসীরা তাহাদের ভাষাকে সমৃদ্ধি দানের জন্য সেই কোন্ যুগ হইতে বাংলা ভাষাকেও রাজোচিত সম্মান দিয়া আসিতেছে —যাহার ব্যবহারিক গঠন ভাষাকে এক অভিনব রূপ দান করিয়াছে, সাহিত্য গঠন করিয়াছে। অধুনা দুস্প্রাপ্য 'রাজাবলী'' ত্রিপুরায় রচিত অন্যতম প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ। কমপক্ষে ইহা আটশত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

অভিনব কথা এই আদিবাসীদের নিজেদের ভাষা, এই বাংলা ভাষায় অভ্যুদয়ে কোনও প্রকার ক্ষুণ্ন হয় নাই। তাহার ধারা অম্লান থাকিয়া তাহাদের সঙ্গীত, লোক গাথা ও কাহিনীর মাধ্যমে, স্বাধীন চিন্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মানকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই সাক্ষ্যই দান করিয়াছে। লেখ্য ভাষা না হইলেও ত্রিপুরা ভাষা বাংলা ভাষার পাশাপাশি চলিয়া উভয়তঃ নিজ নিজরূপকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই আগরতলা সহরে অনেকেই 'ভইনারী খেল্‌বনি' (বোন্ বহিন্ খেলা অর্থাৎ সই-পাতান), 'দাদা ডাঙ্গর 'দাদা ছুট' —ইত্যাদি ভাষা শুনিয়াছেন। ইহা যেমন নূতন ভাষার অভিব্যক্তি। ব্যাকরণজ গণ্ডীর বাহিরে স্বচ্ছন্দগতি নির্ঝরিনীর মত প্রাকৃতিক কোমল পরশে, বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই সেদিন পর্যন্তও অব্যাহতভাবে সৃষ্টির প্রেরণা লাভে ভাষা বঞ্চিত হয় নাই। ইহাই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের এক দিক।

ভাষাগত এই সৃষ্টির-উন্মাদনা জাতীয় জীবনের শিল্প সৃষ্টির অভিনব পন্থাকে কোন্ সুদূর হইতে সাক্ষ্য দান করিতেছে। সেই সুবরায় রাজা প্রচার করিলেন রিয়া বয়নে 'মাছি পাখনা' নমুনা (মাছির পাখায় রং-এর বৈচিত্র্যের নমুনা) যে মেয়ে তুলিতে পারিবে তাহাকে রাজরাণী করা হইবে —হইয়াও ছিল তাই। ইতিহাসের

পরবর্ত্তী অধ্যায়েও অনুরূপ উন্মেষনার উদাহরণ নৃত্যে, গীতে, বেশ-ভূষা-বিন্যাস ইত্যাদিতে বিশেষভাবেই অনুসন্ধিৎসুর চোখে পড়িবে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে এখানকার মেয়েদের নৃত্যকুশলতাই তাহাকে শান্তিনিকেতন নৃত্য-শিক্ষার প্রেরণা দান করিয়াছিল এবং ত্রিপুরার নৃত্য শিক্ষকই সেখানে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ইহাও ক্ষুদ্র ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্যের আর এক দিক। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ধারায় ইহা পরিব্যপ্ত। ইহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকা চলে না। যাহারা বর্ত্তমান আগরতলা সহর দেখিয়া ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিতে চান তাহাদের ভুল হইবে। কারণ এই সহর কয়েক দিন আগেও সরকারী কাগজপত্রে 'নূতন হাবেলী' বলিয়া বর্ণিত ছিল। কাজেই নূতন অধিবাসী অথবা কর্মচারীদের পক্ষে ত্রিপুরার ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পূর্বে ইহার কোন ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়।

ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যদিও আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়, তবে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে যে মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরাধিপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং তন্ত্রে ত্রিপুরা সুন্দরী পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও ত্রিপুর ভৈরব মহাদেবের বিষয় উল্লেখ আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ঠিক কোন্ সময় হইতে ত্রিপুরার বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়া রাজভাষার মর্য্যাদা দান করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করার সুবিধা নাই। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয় 'রাজমালা' দ্বারা —ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ইতিহাসের একটু বৈশিষ্ট্য এই যে সেই তথাকথিত অন্ধকার যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, বিবৃত হইয়াছে। সমসাময়িক অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে এইরূপ সন্নিবেশ আছে কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুরাজ্যেরও হিন্দু পরিবারের যে ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় তাহা অসাধারণ।

রাজমালা প্রণয়নকালেই ত্রিপুর ভূপতিগণ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। সমগ্র মহাভারত মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের আদেশে অনুদিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে কাশীরামদাসের অনুবাদ মহাভারত। মাহারাজ ধন্য মাণিক্য 'উৎকল খণ্ড' ও 'যাত্রারত্নাকর নিধি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, ইহাও চারিশত বৎসর পূবের কথা। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের আজ্ঞায় 'বৃহন্নারদীয় পুরান' অনুদিত। ইহা ছাড়া 'কৃষ্ণমালা' 'চম্পক বিজয়' 'শ্রেণীমালা' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় ক্রম ইতিহাস রচনা ত্রিপুরায় বঙ্গভাষাভাষীর বিশিষ্ট নিদর্শন।

এই সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিচয়ও বহুলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সংস্কৃতি কেবল মার্জ্জিত রুচি ও আচরণে সীমাবদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে একটা জাতির ভাব-সাধনা, শিল্পকলা, সমাজবোধ ইত্যাদি সামগ্রিকভাবেই আসিয়া পড়ে। ত্রিপুরাব রাজ পরিবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অতি পুবাতন শ্রদ্ধাবান সেবক ও বাহক। তাহারই অভিব্যক্তি আমবা আধুনিককালে বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথেব ঘনিষ্ঠতায় পরিচয় পাইয়া থাকি।

"আজ একথা গর্ব্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্ত্তে বন্ধুভাবে স্বীকাব করে নেওযাতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গোরব বর্ত্তমান ভারতবর্ষেব কোনো রাজকুল আজ পর্যন্ত পান নি। এই সম্মিলনের যে একটা ঐতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি সে কথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা বাজাবা তাকে রাজৈশ্বর্যের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখ স্মৃতির দক্ষিণ সমীরন তুমি বহন করে এনেছ"।[১]

কবির লেখনীতে তাই ত্রিপুরা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে— "রাজর্ষি", "বিসর্জ্জন', "মুকুট' ইত্যাদিতে। কবির "দেশীয় রাজ্য" ২ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিয়াছেন —

"আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আফিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগাকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে—এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন— দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে"। এই জন্যই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ ব্যবস্থার জন্য সদা উৎসুক থাকিতেন। এই রাজ্যের সর্বপ্রকার রাজকার্য্যে—বাংলা ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আজ এই আট বৎসরের মধ্যেই ইহা অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরার রাজচিহ্ন ও ষ্ট্যাম্পে বাংলা ভাষারই প্রাধান্য মুদ্রায় বাংলা ভাষা ও অক্ষর উৎকীর্ণ। ত্রিপুরেশ্বরগণের শীলমোহর—('আজ্ঞা' ও 'পদ্ম' মোহর) বাংলা অক্ষরে অঙ্কিত। অধিকাংশ তাম্রশাসনে ও শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইলেও অক্ষর বাংলা। দেবনাগর অক্ষরে কোনও তাম্রশাসন দেখা যায় নাই। তাম্রফলকে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাংলাভাষা প্রয়োগও বিরল নহে। বাংলাভাষায় প্রস্তরফলকও পাওয়া যায়।

রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় "ত্রিপুরায় বঙ্গভাষার প্রভাব" প্রবন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন— "ত্রিপুরশ্বেরগণের প্রদত্ত সনদে পূর্বাপরই বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হহয়া আসিতেছে ; তবে, কাল ধর্মে সেহ ভাষায় অনেক উর্দ্দূ শব্দ মিশ্রিত হহয়াছে, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যত আছেই। সেকালে সকল দেশেই দালিলিক বাঙ্গলা ভাষায় এবম্বিধ ভাষান্তরের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল ; বর্ত্তমান কালেও দলিলের ভাষা সেইভাব বর্জিত নহে। ত্রিপুরার দরবারী ভাষা, সকল ক্ষেত্রে ঠিক বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ না হইলেও অন্যান্য প্রদেশের আমলাই ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাহতে পারে।"

সারা ভারতে যখন ইংরাজী ভাষার প্লাবন—সেই প্লাবনের ঢেউ-এ ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ ত্রিপুরাব রাজকর্মচারীদেরও ডুবাইয়া ফেলিবার চেষ্টা যে না হইত এমন নয়। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যেই ইংরাজী ভাষার সরকারী কার্য্যে (পররাষ্ট্র বিভাগ ব্যতীত) লেখাপড়া চিরাচরিত ও প্রচলিত প্রথার প্রতিকূল বলিয়া বিশেষ আইন দ্বারা কর্মচারীদের এই অভ্যাসকে দমন করিয়াছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোর, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের শাসনকালেও খাস সেরেস্তা হইতে লিখিত ও মৌখিক আদেশ দ্বারা কর্মচারীদের সতর্ক করিতে হইয়াছে। রাধাকিশোর তৎকালীন রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ইংরাজী ভাষায় আদেশাদি প্রচার করিতে দেখিয়া, তাহাকে লিখিয়াছিলেন —

"এখানে আবহমানকাল রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

এই প্রসঙ্গে রাজাজ্ঞার অনুলিপি ও রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইতেছে। রাজ্যে সতীদাহ নিবারণ করিয়া বীরচন্দ্র মাণিক্যের আদেশ ঃ—

"রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে —

হুকুম হইল যে, —

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়"।

রাজ আজ্ঞায় নিজকে "এপক্ষ" বলিয়া অভিহিত করা হয। প্রথম পুরুষের ব্যবহার কমই দেখা যায়। "রাজখান্দান" ব্যবহার রাজবাড়ীতে সর্বদাই শোনা যাইত। রাজকার্য্যের ভাষা মধ্যে "ইসিমনবিশি রহিত" একটু নূতন শুনাইলেও বিশেষভাবে রাজাজ্ঞায় প্রচারিত হইতে দেখা যায়। "খুন্দা" প্রদান ঠিক উপাধি দান নহে। রাজকার্য্যে পদাধিকার বলে 'উজীর' 'নাজির', সামাজিক হিসাবে 'সরদার' 'কবরা' 'ঠাকুর' ইত্যাদি প্রদানকে 'খুন্দা' প্রদান বলা হইত। "অবগতি ও আচরণের জন্য আফিস হায়ে পাঠান যায়"। "বন্দোবস্তের দরুণ কত টাকা অগ্রিম সেলামী আমানত আছে লিখার কারণ ইহার প্রতিলিপি" "পদোচিত প্রচলিত সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন"— ভাষার ব্যবহারিক গৌরবই দান করিতেছে।

রোবকারী ছাড়াও মেমো হিসাবে আদেশাদি প্রচারিত হইত। রাধাকিশোর মাণিক্যের ১৩১৫ ত্রিং তারিখ ১৩ই কার্ত্তিকের আদেশ ঃ—

"বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা আকস্মিক কোন গুরুতর বিপৎপাতে রাজ কর্মচারীগণ অভাব বশতঃ সরকারের সাহায্য প্রার্থী হইলে তাহাদিগকে স্ব স্ব বেতনের অনধিক পাঁচগুণ পর্যন্ত টাকা বিনা সুদে হাওলাত দিতে পারা যাইবে।

উক্ত হাওলাতের টাকা গ্রহীতাদিগের মাসিক বেতনের অনধিক এক-চর্তুথাংশ পর্যন্ত পরিমাণে মাস মাস কর্ত্তণ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে আদায় করিতে হইবে।" ইত্যাদি। এই আদেশের ভাষা এমন কি বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলের সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা হইতেও পৃথক প্রতীয়মান হইবে।

রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষার ক্রম বিকাশ ভাষাবিদ্‌গণের অনুসন্ধিৎসার বিশেষ ক্ষেত্র। ভাষা ব্যবহারে মর্যাদাবোধের একটা অন্তঃসলিলা ধারা সর্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই ভাষা যদিও ঠিক অন্য ভাষার, বিশেষ করিয়া ইংরাজীর আক্ষরিক পরিভাষা নয়, কিন্তু এই ব্যবহারিক সংমিশ্রিত ভাষা বিষয় বস্তুকে সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করে। রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, কথোপকথনে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার না করিয়া পূজ্যজনকে মর্যাদাদান ইহা রাজ-পরিবার হইতে অধিবাসীদের মধ্যে অনুক্রমিত হইয়াছিল। এক গেলাস জল দিয়া অথবা একটি পান আগাইয়া দিয়া পূজ্য ব্যক্তিকে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া পান খাইতে মর্জ্জি হয়'— ইত্যাদি ভাষা এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যেও বিশেষ করিয়া ত্রিপুরী নিম্ন কর্ম্মচারীদের এখনও ব্যবহার করিতে দেখিয়া মার্ধুয্য মণ্ডিত সামাজিক পরিবেশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ব্যবহারিক শৈলী ত্রিপুরার নিজস্ব, অন্য কোথাও ইহা শুনা যায় না। তবে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার মণিপুরীদের মধ্যে আছে— তাহা সামাজিক স্তর- ভেদে ব্যবহৃত বলিয়াই শুনিয়াছি।

প্রকৃতির স্নেহ আবেষ্টন হইতে আমরা যতই দূরে সরিয়া যাইয়া সভ্য সাজিতেছি ততই যেন কৃত্রিম ভাষা

ও রীতিনীতিতে বাস্তব সত্যকে ঢাকিবার প্রয়াসই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই বোধ হয় সংস্কৃতির প্রগতি বলে! আজ তাই ত্রিপুরায় শুনিতে পাই নূতন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট হইতেছে— সব কিছুই নূতন করিয়া গঠন করা হইতেছে। কিন্তু তাহারা জানেন কি যে কিছু কাল আগেও প্রকৃতির কোমল পরশ যেমন যেমন ঋতু বহন করিয়া আনিত অধিবাসীরা নৃত্যে, গীতে, বংশীধ্বনিতে, ফুলসজ্জায় তাহাদের আবাহন করিয়া নিজেদের ধন্য করিত। বর্ত্তমান কলেজ টিলার উত্তরাংশ রাসমোহন টীলা বলিয়া পরিচিত ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, সেখানকার আম্রকুঞ্জে যে বাৎসরিক ফুলের হাট বসিত তাহার প্রত্যেকটীর রচনাশৈলী বর্ণ-বিন্যাস এক একটী শিল্প নিদর্শন। তাহারই রেশ কোনও কোনও স্থানীয় পরিবারে আজও পাওয়া যায়। সভ্যতার আলোকে এই সমস্ত হারাইয়া আমরা বাস্তবিক সমৃদ্ধ হইতেছি কিনা চিন্তনীয়।

বীরচন্দ্র মাণিক্য একাধারে সুকবি, ললিত কলাবিৎ 'অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ' সাধক ছিলেন। তিনিই যদু ভট্টকে 'তান-রাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 'এহেন রসিক চূড়ামণি; সাহিত্যের পাকা জহুরী মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবার বহু গুণীব্যক্তির সমাবেশে ভরপুর ছিল; সুবিখ্যাত তানসেন বংশজাত বীন-কার কাশেমালী খার রবাব বীনা ঝঙ্কারে ধ্বনিত — কবি মদন মিত্রের কবিতা ধারায় প্লাবিত — যদু ভট্টের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীত, পঞ্চানন মিত্রের পাখোয়াজ সহযোগে মুখরিত ছিল। সর্ব্বোপরি বৈষ্ণব সাহিত্য রসিক রাধারমন ঘোষের বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত আলোচনার মণি-কাঞ্চন যোগ সংঘটন করিয়াছিল। বীরচন্দ্রের দরবার তদানীন্তন ভারতের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী আশ্রয় করিয়া অজস্র কবিতা ও গান লিখিতেছিলেন এবং মনোহর সাই রাগিনীর মনোমোহিনী শক্তির সাধনায় তন্ময় থাকিতেন'।[৩]

এহেন সমাবেশের সঙ্গীত, সাহিত্য ও ললিত কলার অনুশীলনের প্রবাহ রাজ অন্তঃপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ জনগণকে পর্যন্ত রসে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই স্রোত আজও অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই ত্রিপুরার ললিত-কলা-শিল্পের বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। সঙ্গীতের উদাত্ত ভাবধারা জনগণের চারিত্রিক ঔদার্য্য বাড়াইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ধারা যদি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতিকেই অস্বীকার করিয়া নিজেদেরকে হেয় করা হইবে। দেশ ও জাতির ইহা ভাবিবার কথা।

এই প্রবাহের অন্য ধারায় দেখিতে পাই বাংলা হরফে শ্রীমদ্ভাবগত ও বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রন হইয়া বিতরিত হইয়াছে। এই সংস্কৃতিগত বিরাট দান বীরচন্দ্রের অম্লান কীর্ত্তি। ইহাই বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার প্রাথমিক সুযোগদান—যাহা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

অনেকেই হয়ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে বাংলা-দেশে ফৌজদারী দণ্ড-বিধি আইন প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে বাংলা ভাষায় 'চলৎ দণ্ডবিধি' আইন প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও উহা স্থানীয় আইন হিসাবে পরিগণিত। বিচার বিভাগীয় পুরাতন 'রায়' গুলি ত্রিপুরার রাজ ভাষা বাংলার বিশিষ্ট নিদর্শন শাসন ও বিচার বিভাগীয় পরিভাষাগুলি প্রাচীন কাল হইতে যে রূপ গ্রহণ করিয়া দেশের জন-গণের সহজবোধ্য করিয়াছিল—তাহা লোপ পাইবার পথে আসিয়াছে —ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা এ ক্ষুদ্র সংকলনে সম্ভবপর নয়। দু'একটা উদাহরণ অনুসন্ধিৎসুগনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবে আশায় উল্লেখ করা গেল। 'জমা' ও 'সেহা' অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির বাসনায় মোকদ্দমার অপীল নিষ্পত্তির কাগজের খোলাসা (বিস্তারিত বিবরণ) —বাবত (বিস্তারিত বিবরণ) 'জওয়াব' 'আইন আমলে' 'আইন মোতাবেক আমলে 'কৃতার্থ' চিট 'সরাসরি' (মোকদ্দমার রকম)। শাসন বিভাগে বিশেষভাবে বাজস্ব ও সাধারণ পূর্ত্ত পুলিশ

হিসাব ইত্যাদি বিভাগে যে সমস্ত আদেশে পরিভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা এক স্বতন্ত্র সাহিত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর বিভাগীয় কার্য্যে যে সমস্ত আদেশাদি প্রদান করিতেন তাহা পাণ্ডুলিপি আকারে রাজস্ব বিভাগে ছিল ; ইহাও বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য। এই সংগ্রহের আর একটা দিক —সমগ্র আদেশগুলি তৎকালীন সমাজ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি মূলক রাজ্যগঠনের ইতিহাস বলিলেই ঠিক বলা হইবে।

দেশ ও জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধারাকে রক্ষণাবেক্ষণই জাতির জীবনী শক্তির পরিচারক। আজ সেই ভাষার অনাদরকে ত্রিপুরার জনগণের প্রান স্পন্দন বলা যায় কি ? ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই কর্ণেল মহিম ঠাকুর বর্ণিত এই কাহিনীটুকু বিশেষভাবে অনুধাবন করিবেন আশা করি।

"আমার কলিকাতা পাঠ্য জীবনে (১৮৮৫খৃঃ) একদিন স্বনামধন্য এবং চিরস্মরনীয় দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে যাই ; তখন আমার বাবুয়ানা বেশের মধ্যে সোণার চেইন ও ঘড়ি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় উচিত বক্তা তিনি একটু বিরাগভাবে আমার সোণার চেইনের মধ্যে দোদুল্যমান মোহরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —ও "মোহরটা কিসের মোহর?" আমি কম্পিত কলেবরে তাহার নিকট এই মুদ্রাখণ্ড দেখাইলে তিনি পাঠ করিলেন—"শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণপদে শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যদেব —শ্রীশ্রীমতী গুণবতী দেব্যা।" বৃদ্ধ তখন লাফাইয়া উঠিলেন। এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকেডাকিয়া বলিলেন— "তোমরা দেখ আমার বঙ্গভাষা রাজভাষা! বাঙ্গলা অক্ষরে এই স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছে।" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় মিলিয়া তদানীন্তন মহারাজা বীরচন্দ্র বাহাদুরের নিকট পত্র লিখিয়া মহারাজকে "বঙ্গভাষা সম্বর্দ্ধনী সভার" পৃষ্ঠপোষকরূপ পাইবার জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাহারা সে সুবিধা পাইয়াছিলেন বহু বৎসর পর্যন্ত।" (ত্রিপুরা বঙ্গভাষা)।

আর আজ ?

---

(১) মহারাজ বীর বিক্রম কিশোরের শান্তিনিকেতন এ গমন উপলক্ষে কবির আশীর্বচন পত্র হইতে ইহা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় সংগৃহীত ও বিশ্বভারতীর অনুমোদনে ব্যবহৃত।

(২) "রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতেই স্থানিক সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের কথা সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই; ত্রিপুরাই অগ্রসর হইয়া এই কার্য্যে নামিল রবীন্দ্রনাথকেই উহার আদর্শ পুরোহিত স্থানে সভা অলংকৃত করিবার জন্য আহবান করিল। (১৭ই আষাঢ় ১৩১২) সভার উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথ "দেশীয় রাজ্য" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড ১২৩ পৃঃ

(৩) কর্ণেল মহিমঠাকুর লিখিত 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

ত্রিপুরা ভাষা ও রাধামোহন ঠাকুর

ঠাকুর সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মা

ঠাকুরলোকদের মধ্যে রাধামোহন ঠাকুর একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া রাজকার্য্যে উন্নতি করিয়া সেসন আপিস আদালতের বিচারপতি এবং সৈনিক বিভাগের প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়া উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় ধৈর্য্যশীল ও জেদি লোক ছিলেন, যে কার্য্যই হউক, জানি না বলিয়া চিন্তা করিতেন না। সমস্ত কার্য্যই তিনি অতিশয় চিন্তা ও বিচার পূর্ব্বক করিতেন। এই চরিত্র বলে তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া জন সাধারণের দ্বারা প্রশংসা ভাজন হইয়া ছিলেন।

মাথার উপর রাজ কার্য্যের ভার লইয়াও তিনি অলিখিত ত্রিপুরা ভাষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য অতিশয় মনোযোগের সহিত কক বরকমা এবং ত্রৈপুর ভাষাভিধান নামক কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার জাতির হাতে অমূল্য জিনিষ দিয়া গিয়াছেন। এই রূপ আলেখ্য ত্রিপুরা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিতে যাওয়া অতিশয় কর্ম্মঠ লোকের প্রয়োজন। যে ভাষা পরের ভাষা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া আছে এরূপ দুরহ কার্য্যে হাত দিতে যাওয়া অতিশয় ধৈর্য্যশীল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে সময় ত্রিপুরা ভাষায় যাহার কথা বলি তাহারাও মাতৃ ভাষার প্রতি বৈমাতৃ সুলভ মনোভাবে দ্বারা তাঁহাকে কেহই সহায়তা পর্যন্ত করে নাই। তাহা না হইলেও শিক্ষার আলো প্রদায়ক মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মাত্র চিন্তাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনিও ইহার শিক্ষার ও বিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। সে সময় যাহারা বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া উপযুক্ততা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা মাতৃভাষায় কথা বলা দূরে থাকুক, আরও ঘৃণা ও লজ্জাজনক মনে করিয়াছিল। এইরূপে তাঁহার নিজেদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া পরের নকলরূপী হইয়াছে। যে জাতি নিজেদের মাতৃভাষার কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে এই স্বাধীন ভারতে তাহাদের স্থান কোথায়? বিশ্বের সকল জাতিই নিজেদের মাতৃভাষায় লেখা পড়া শিখিয়া জাতিকে চিনিতে পারে। আমরা কাহার ভাষায় কথা বলি —একথা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

মানুষকে চিনিতে পারা যায় তাহাদের নামের দ্বারা, সেরূপ ভাষার দ্বারাই জাতিকে চিনিতে পারা যায়।

সমস্ত দেখিয়াই দূরদর্শী রাধামোহন ঠাকুর ত্রিপুরা ভাষার মুল ভিত্তি স্থাপন করিয়া ত্রিপুরা ভাষার জনকের স্থান লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক, এখন তাঁহাকে আমরা ত্রিপুরা ভাষার জনক বলিতে পারি। তাঁহার এই মহৎ কার্য্য সুদূর প্রসারী। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি পড়িয়া দেখিলে

সেকথা স্পষ্টরূপ জানা যায়। এখন ত্রিপুরা ভাষার উন্নতি কল্পে সমস্ত ত্রিপুরীগণের অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। সকল আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কল্পে গর্ভণমেন্টও মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের ত্রিপুরা ভাষার উন্নতি ও বিস্তার কল্পেও শিক্ষা দেওয়ার কার্য্য ত্রিপুরীগণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুরূহ কার্য্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া ত্রিপুরীদের কর্ত্তব্য। জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশেষ ভাবে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

ত্রিপুরীদের এখন নিজেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভিতরে প্রকৃত সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুসন্ধান লইতে হইবে। সেখানেই তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকাইয়া আছে। তাহাকে দরদের সহিত জাগাইতে হইবে। এই রূপহীন ত্রিপুরা ভাষার রূপ প্রদানকারী ত্রিপুরা ভাষার জনক মহাশয় রাধামোহন ঠাকুরের পদাঙ্কটিকে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি দুস্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে, বইগুলিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার একান্ত প্রয়োজন আছে।

স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

শ্রীমতী

গতবৎসর আমাদের পক্ষে প্রকৃতই দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। প্রজাবিদ্রোহ রাজকোষ দৈবনিগ্রহ সকলে মিলিয়া দেশকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। বঙ্গমাতার বিখ্যাতনামা যে সকল সুসন্তান গতবর্ষে অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া আমাদিগকে শোক নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন, ত্রিপুররাজ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এমন দানশীল, সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সরলচেতা, অমায়িক পাজা প্রায় দেখা যায়না। সেকালের রাজাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ গল্প কথা শুনা যায় ইহাতে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইত। ইনি স্বাধীন রাজা হইয়াও বাঙালীর ঘরের লোক ছিলেন, তিনি শুভকার্য্যের উৎসাহদাতা — গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। দেশের লোক সুখে দুঃখে তাহার সহানুভূতি লাভ করিত, তাঁহার দর্শন প্রার্থনায় গিয়া, কাহারও খাতায় নাম লিখিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। সকলকেই যোগ্য সমাদরে তিনি গ্রহণ করিতেন, সকলেই তাঁহার স্নেহ বন্ধুতার অধিকারী ছিলেন। পাছে কাহাকেও মনরপীড়া প্রদান করেন, এই ভয়ে তিনি তাহার সামান্য কর্মচারীর নিকটেও যেন সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। কোন কর্মচারীও তাঁহার নিকট কোন ভয় সম্ভাষণ পান নাই। অতিরিক্ত কোমলতাই বরঞ্চ তাঁহার স্বভাবের দুর্ব্বলতাস্বরূপ দাঁড়াইয়া ছিল ঃ—

বঙ্গসাহিত্যের ইতি কিরূপ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার উন্নতি সংকল্পে তিনি অকাতরে কিরূপ দান করিতেন তাহা সকলেই অবগত। আজ তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব যেরূপ শোকাকুল দেশও সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত। আশাকরি তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী পিতার সদ্গুন নিজের উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের এই শোক ভবে কথঞ্চিত প্রশমন করিবেন। মহারাজের গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহার একজন সুপরিচিত। মহিলা যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

— ভারতী সম্পাদিকা

মহারাজ আমাদের কেবলমাত্র প্রভু ছিলেন না পিতৃস্বরূপ ছিলেন। এই দুর্ঘটনা বজ্রাঘাতের মত আমাদের আহত করিয়াছে।

১৫ই ফাল্গুন অশুভক্ষণে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সোমবার প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়া মঙ্গলবার রাত্রে কাশী যাত্রা করিলেন। কলিকাতার অনেক করণীয় কার্য্য ছিল, ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ করিবেন —আর ফিরিতে হইল না।

পূর্ণ বার বৎসরকাল মহারাজ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন—মহারাজের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হৃদয় তেমনি

উদার ছিল। রাজ্যের উন্নতি করিব বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বিপত্তির জন্য মহারাজের অনেক সাধ পূর্ণ হয় নাই। মহারাজের রাজত্বকাল আগরতলায় একটি সুন্দর প্রাসাদ, হাঁসপাতাল, স্কুল, রাজকুমার বোর্ডিংঅফিস প্রভৃতির জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন রাস্তা, দীঘি, সুন্দর সুন্দর বাংলা ও কর্মচারীদের আলয় প্রভৃতিতে রাজধানীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মহারাজের হৃদয় করুণার আধার, দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। বিকালে মহারাজ প্রতিদিন বায়ুসেবনে বাহির হইতেন—একদিন দেখিলেন একটি রোগকাতর ভিখারিনী পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। —মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া রোষকষায়িত লোচনে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইহাকে দেখিতেছ, এ কেন এমন করিয়া পড়িয়া আছে —তোমরা আছ কি করিতে। ডাক্তারের আর সেদিন মহারাজের সহিত বায়ুসেবনে যাওয়া হইল না। অনেক বলা কহায় মহারাজ চলিয়া গেলেন ডাক্তার উপস্থিত থাকিয়া রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া তাহার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া মহারাজকে জানাইয়া তবে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

মহারাজ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কাহাকেও সহজে কঠিন কথা বলিতেন না ; নিতান্ত বিরক্ত হইলে কেবল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কর্মচারীদের আদেশ করিতে হইলে বিনীতভাবে আদেশ করিতেন। বিশেষ দরকারে একজন কর্মচারীকে লিখিতেছেন —"দুইটি কথা শুনিয়া যেয়ো, আমি অপেক্ষা করিয়া আছি। —কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি তোমায় দেখি না কেন ?" তাহার খাসের কর্মচারীদের তিনি কিরূপ জ্ঞান করিতেন তাহা তাহার নিম্নলিখিত পত্রে জানিতে পারিবেন। "তুমি ত জানই, যিনি বাড়ীর কর্তা, পূজার সময় স্বজন পরিজনদিগকে এইরূপ কাপড় বা অন্য কোন বস্তু দিয়া থাকেন। শ্রীমান শ্রীমতীসহ এইগুলি আমার আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়ো।"

মহারাজার মৃত্যুর তিন চারি দিবস পূর্ব্বে তাহার একজন কর্মচারীর কলিকাতাব বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়—রোগসংবাদ শুনিয়াই কাশী হইতে মহারাজ টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে ২০০্ পাঠাইয়া দেন — মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বলেন— সে গেল — তাহার জন্য বড় বেদনা পাইলাম, সে আমাকে ত প্রভু মনে করিত না, পিতৃস্বরূপ জ্ঞান করিত —তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার, তাহাব সন্তানদের শিক্ষাব ভাব সকলি আমার। শ্রাদ্ধের সময় স্মরণ করাইয়া দিয়ো খরচ দিতে হইবে।"

মহারাজ ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লিখিতেছেন, "ফুল পাইয়াছি। আমি ফুলেব অতিশয় পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুলেরই সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি অষ্টপ্রহর আমার চতুষ্পার্শে ফুল ছড়াইয়া রাখিতে ভালবাসি! সামান্য উপহার পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতেন—লিখিতেছেন তোমার প্রেরিত ফুল ও মিষ্টান্ন উপহার পাইয়া অতিশয় আহলাদ সহকারে গ্রহণ করিলাম।"

অনেক ভাল ডাক্তারের অপেক্ষা মহারাজ চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। ডাক্তারি কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি টোটকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ সর্ব্বদা যত্নে মহারাজ রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। কর্মচারীদের কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তারের উপর ডাক্তার পাঠাইয়া ঔষধপথ্য দিয়া অনুসন্ধান লইতেন। ইদানীং মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। লিখিতেছেন "বাস্তবিক আমার ধাতু রোগপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবার শীতারম্ভে দূর স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া কিছুকাল বাস করিয়া দেখিব এরূপ মনে করিয়া আছি।" বিদ্যার প্রতি মহারাজের অতিশয় অনুরাগ ছিল। গ্রন্থকারগণ নূতন পুস্তকাদি পাঠাইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাহাদের সসম্মানে পুরস্কৃত করিতেন।

সাধারণ সভাসমিতিতেও মহারাজ কখনো দানে বিমুখ ছিলেন না। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে

মহারাজ কখনো "না" বলিতে জানিতেন না। খেয়ালখাতায় মহারাজকে একবার লিখিতে অনুরোধ করায় মহারাজ লেখেন 'ছাত্রজীবনে কবিতা টবিতা লিখিতাম এখন মন কঠিন হইয়া গিয়াছে তোমাদের অনুরোধে দুই ছত্র লিখিয়া দিলাম—

সুখের নিলয় প্রেম সুমধুর
কোন অবাধ্যতা তাহাতে নাই ;
আত্ম ভোগ সুখ স্বার্থ অভিমান
প্রেমিক হৃদয়ে না পায় ঠাঁই।

মহারাজ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। এবার কাশী যাইয়া তিনি সধবা কুমারীপূজাদি করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা প্রীত হইয়া মহারাজকে ধর্মার্ণব উপাধি দিয়াছিলেন।

স্বস্তিবিধিবিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নতমহারাজা-
ধিরাজক্ষত্রিয়কুলতিলকচন্দ্রবংশ বর্তংশ ত্রিপুরাধিপতিবিষম
সমরবিজয়ি শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমতুরাধাকিশোর মাণিক্যদেববর্ম্ম-
বাহাদুর মহোদয়শ্রীশ্যামসুন্দচরণারবিন্দ মকরন্দমধুক রষু।
বারাণসেয়বিষুধবৃন্দানাং শুভাশীরাশয়ঃসমুল্লসন্তুতরাম্।
মহারাজ, কালবশাদিদানীং ক্ষীণপ্রায়েষু বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মেষু নষ্টপ্রায়েষু চ দ্বিজকুলপালনৈকব্রতেষু রাজন্যবর্গেষু ভর্বানেবৈকঃ ক্ষত্রিয়কুলসুধাসলিলনিধেঃ শীতরশ্মি বর্ণাঃশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণাপরায়ণঃ পরিদৃশ্যাতে। অতঃ স্মরহরনগরীনিবাসিনো। বয়ং ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচরণাম্বুজ লোলুপতাং বর্ণাশ্রমধর্মসংরক্ষণতঞ্চ পরতাং চ দৃষ্ট সন্তুষ্ট হৃদয়াঃ সন্তো বিবিধগুণাগণাভিরামং ভবন্তং "ধর্ম্মার্ণব" ইত্যুপাধিনা ভূবয়ামঃ।

আশাস্মহে চ সপবিজনস্য শ্রীমতোমহাবাজস্য সকুশলং দীর্ঘমায়ুরিতিশম্। সম্বৎ ১৩১৫ চৈত্র কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াম্।

যে কর্মচারীর যত্নে এই সকল ধর্মকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন।

মহারাজের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল, বুঝি তাই জন্য মহারাজ এই শোচনীয়রূপে অকস্মাৎ প্রাণদান করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গের অন্তরে অন্তরে করুণা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দুর্ঘটনার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ কাশীত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। রিজার্ভ গাড়ীর অভাবে বিলম্ব হইয়াছিল। শোচনীয় ঘটনার দিন ষ্টেশনে গাড়ী প্রস্তুত —রাত দশটায় মহারাজ ট্রেনে উঠিবেন, সন্ধ্যা ৬টায় এই বিপত্তি—৮টায় সব শেষ।

কাশীতে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ ব্যতীত মহারাজের পুত্র বা আত্মীয় কেহ সঙ্গে ছিলেন না—রাজ্যেশ্বর রাজ্য ছাড়িয়া কোন্ বিদেশে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে আগরতলা ফিরিয়া গিয়াছেন।

অনেকদিন হইল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুরকে স্মরণ করিয়া যে

গানটী রচনা করিয়াছিলেন তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম।

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুর পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা
দীনজন দুঃখহরণ অভয় তব বাণী
ক্ষীণজন ভয়তারণ নিপুণ তব পাণি
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস ঢালা
গুণি রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে—
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা!"

গানটি লিখিতে লিখিতে যেন মহারাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি— আর অধিক কি লিখিব।

মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ও কয়েকটি অতীত স্মৃতি

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা

মহাকালের পথ যাত্রায় দূরত্ব নির্দেশক প্রস্তর ফলক বা মাইল ষ্টোনের মত সুপ্রাচীন মহা বনস্পতি নীরবে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোড়ার থেকে শুরু করে শাখা - প্রশাখায় চিহ্নিত হয়ে আছে দীর্ঘকালের বহু বসন্ত আগমনের নবপল্লব পুষ্প উদ্‌গমনের শিহরণ গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রের তীব্রতা, কাল-বৈশাখীব প্রচণ্ড ঝড়েব আলোড়ন আব বর্ষায় বিরামহীন বারিধারার স্নিগ্ধতা। তেমনি আয়ুষ্মান ব্যক্তিও রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনেব, সমাজ জীবনের বহু পরিবর্তনের এবং দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বহু সাক্ষ্য বহন করে মানব সমাজে বাস করে থাকেন। মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরার ইতিহাসে তেমনি একজন পরম শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। ঘটনাবহুল তাঁর জীবন অতীত ও বর্তমান ত্রিপুরার ইতিহাসের যেন একটি অধ্যায়। ত্রিপুরার রাজনীতি, রাজ্য পরিচালনা, সাংস্কৃতিক জীবন জীবন দেশেব সর্ব বিষয়ের সঙ্গেই একদিন তাঁর বিশেষভাবে যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীত্ব ও আবো অনেক গুরুদায়িত্বভার তাঁকে সময়ে সময়ে বহন করতে হয়েছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তাঁব সঙ্গে দেখা কববাব জন্য শান্তিনিকেতনে একবার এসেছিলাম। উত্তরায়ণে শ্যামলী নামক মাটির ঘরে তখন তিনি বাস করছিলেন। সকালেব দিকে শ্যামলীতে গেছি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তখন গিয়ে দেখলাম তিনি নিবিষ্ট মনে টেবিলের উপব ঝুঁকে কি একটা লিখছিলেন। চুপটি করে আমি অপেক্ষা করে আছি। তারপরে মুখ তুলে তিনি জানালার বাইরের দিকে যখন তাকালেন আমি সুযোগ বুঝে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে প্রণাম করতেই আমাকে দেখে একটি মোড়া নিয়ে নিকটে বসতে বললেন।

তিনি যা বরাবর করে থাকেন তেমনিভাবে সর্ব প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবলেন লালু কেমন আছে ইত্যাদি। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরার ও বাইরের অনেকের নিকটে লালুকর্তা নামে পরিচিত। তাঁর পিতা মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথ সেই কাবণে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে অপত্য স্নেহের চোখে দেখতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের কুশল বার্তা পাওয়ার পরে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বললেন "দেখ, প্রাচীনকালে ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যাদি পড়ে আমাদের মনে ভারতীয় রাজাদের যে সুমহান চিত্রটি মনে ফুটে ওঠে পুরান তারা যে মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পেয়েছিলাম তোদের ত্রিপুরার মহাবাজাদের মধ্যে। বর্তমানকালে ভারতীয় অনেক রাজাদের আর্থিক প্রাচুর্যের সমকক্ষ হয়ত তাঁরা নন, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তাঁরা অনেক উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বালক ব্রজেন্দ্র কিশোরের শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ

প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন ইংরাজ শাসিত ভারত দেশীয় রাজ্যের রাজকুমারদের শিক্ষা বিষয়ে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে অপরাধী বলে চিহ্নিত কয়েকজন যুবককে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করায় ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়কে ভাল চোখে দেখত না। এইসব কতকগুলি কারণে ব্রজেন্দ্র কিশোরের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বালক ব্রজেন্দ্র কিশোরের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন যার জন্য তিনি সর্বদা তাঁর শিক্ষা, তাঁর চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়ে যত্ন নিতেন, তাঁকে উপদেশ দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে ব্রজেন্দ্রকিশোর একবার বলেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসা, তাঁর স্নেহপূর্ণ উপদেশ লাভের সৌভাগ্য আমার জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে অনেক সহায়তা করেছে।" ত্রিপুরার মন্ত্রীপদে থেকে যখন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যকে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন তখনও রবীন্দ্রনাথ পত্রের দ্বারা তাঁকে রাজকার্য বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এইসব পত্রাবলী মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকে ছাপান হয়েছে। রাজ্যের উন্নতিকামী, ন্যায়পরায়ণ, বিচার বুদ্ধির দ্বারা কাজকার্য সম্পন্ন করতে তিনি সর্বদা আগ্রহী। অন্যায় করা বা কাজে ফাঁকি দেওয়াকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।

ব্রজেন্দ্র কিশোরকে কর্মবীর আখ্যাটি অনায়াসে দেওয়া চলে। তাঁর মত সর্বকর্মে পারদর্শী ব্যক্তি জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি পারেন না এ হেন কোন কাজ নেই। কাঠের কাজের সুদক্ষ একজন শিল্পী। তিনি এক সময়ে গৃহের অনেক ভাল সুন্দর আসবাবপত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি একজন ভাল গাড়ী-মেকানিকও। তাঁর নিজের গাড়ী বিকল হয়ে গেলে কখনও মেরামতের জন্য কারখানায় দিতে হয়নি। তিনি নিজেই মেরামত করে নিতেন। যারা তাঁর সঙ্গে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে ছিল তারাও পরে এই কাজ শিখে এক একজন ভাল মেকানিক হয়ে উঠে। যন্ত্রপাতি, ছোট কল কবজা মেরামত নিজেই করে থাকেন, কোন দোকানে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও নিজের বাড়িতে সুন্দর বাগান রচনা করার প্রতি ও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে। আগরতলা শহরে তাঁর পৈতৃকসম্পত্ত বিরাট বাড়ির পরিবেষ্টনের দক্ষিণ পাশে নূতন একটি পাকাবাড়ি তৈরী করান তার সংলগ্ন জমিতে সুন্দর একটি বাগান রচনা করেন। লেখক তাঁর ইচ্ছানুক্রমে বাগানের মধ্যে একটি রেলিং গড়বার জন্য আধুনিক ধরনের একটি নক্সা একবার এঁকে দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর একজন সাহায্যকারী ও ভৃত্যদের নিয়ে নিজেই একদিন সকালের দিকে রাজ মিস্ত্রিরির কাজে লেগে গেলেন। কেউ সিমেন্ট বালি মিশিয়ে মশলা তৈরী করে দিচ্ছে, কেউ রোদে ছায়া দেবার জন্য তাঁর মাথার উপরে খোলা ছাতা ধরে আছে। নিজে তিনি একটি মোড়ার উপরে বসে নিবিষ্ট মনে রাজ মিস্ত্রিরির কাজ করে চলেছেন। তখন বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে। আগরতলায় কুঞ্জবনের কাজ করে দিকে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য বহু বাড়িঘর নিয়ে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ঢাকার থেকে মাঝে মাঝে বড় বড় আমেরিকান সৈন্যাধ্যক্ষগণ আসতেন আগরতলায় আহত সৈনিকদের দেখতে ও যুদ্ধ বিষয়ে নানা খবরাখবর নিতে। এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র কিশোরের পরিচয় থাকাতে তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করে যেতেন। তাদের মধ্যে জেনারেল, মেজর জেনারেল পদের অফিসাররাও থাকত। মহারাজ কুমার যখন একদিন সকালের দিকে তপ্তরোদে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাগানের রেলিং গড়ায় কাজে ব্যস্ত তখন ঢাকার থেকে আমেরিকান কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনাধ্যক্ষ এসে উপস্থিত এবং মহারাজ কুমারের এই অবস্থা ও কাজ দেখে তাঁরাত সবাই অবাক। তাঁদের একজন নাকি বলেছিলেন "মহারাজ কুমার, আমরা কাগজে কলমে হয়ত নক্সা করে দিতে পারি কিন্তু হাতে ধরে রাজ মিস্ত্রিরির মত রেলিং গড়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য কাজ।" তিনি কাজ করতে সর্বদা ভালবাসেন। আলস্যে জীবনযাপন করা তাঁর ধাতে সয়না। খেলা ধূলা বিশেষ করে টেনিস খেলায় তিনি বেশ পারদর্শী। বন্যপশু শিকারেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বহুদিন পূর্বে ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকায় বিরাট একটি দাঁতলা হাতি অনেক লোককে হত্যা করে এবং গ্রাম্য ঘর বাড়ি ভেঙ্গে প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তোলে। এই হাতিটিকে মারবার জন্য যারাই না চেষ্টা করেছে তাদের সকলকে হয়ত মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়েছে। কিম্বা দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। এইসব কারণে লোকদের এই হাতি সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে এই হাতি একটি

দেবতা হাতি। আত্মীয় স্বজনের শত বাধা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বন্য হাতীটিকে মারতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। শেষ পর্যন্ত হাতীটিকে তিনি বন্দুকের গুলিতে মারতে সক্ষম হন। কিন্তু সেই যাত্রায় অল্পের জন্য তিনি নিজেকে হাতির কবল থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সেই শিকারে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁদের একজনের কাছ থেকে শিকারের গল্পটি শুনেছিলাম। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সেই হাতি শিকারের কাহিনীটি। শুনতে ও ভয় হয়। ত্রিপুরার গভীর জঙ্গলে আরো তাঁর নর খাদক বাঘ, হিংস্র বন্য মহিষ, শূকর ইত্যাদির শিকার কাহিনীগুলি যেমন বিপদসংকুল ঘটনায় পূর্ণ তেমনি রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ। জিম করবেটের কুমায়ুনের মানুষ খেকো বাঘের কাহিনীর চেয়ে কোন অংশেই এই কাহিনীগুলি কম আকর্ষণীয় নয়। দুর্দান্ত বন্য পশুকে হত্যা করতে গেলে কি প্রকার মনের দৃঢ়তা, সাহসিকতা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় ব্রজেন্দ্র কিশোরের শিকার কাহিনীতে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর বন্যপশু শিকারের অপূর্ব অভিজ্ঞতার গল্পগুলি আজও অলিখিতই রয়ে গেল। মানুষ হিসাবে মহারাজ কুমার অতি মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও সৌজন্যপূর্ণ অক্রোধ ব্যক্তি। ভৃত্যকুলদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও অযথা তাদের সেবার প্রত্যাশী তিনি ক্রোধ বর্জনের উপলক্ষ্য করে তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনার কথা একবার তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। ত্রিপুরার একজন রাজ কর্মচারী সহ মধ্য ভারতে অবস্থিত মহারাজ কুমারগণের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চলেছেন। তখন পথের কোন এক স্থানে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি রাজপুত্রকে দেখে খুব আনন্দিত হন এবং কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসা করার পরে কথার প্রসঙ্গে বলেন "রাজপুত্র, আমাকে কিছু দান করতে হবে এই কথায় রাজপুত্র যতটা না চিন্তিত হন তার চেয়ে রাজকর্মচারীটি বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁর হাতে যে অর্থ ছিল তা খরচমত সব হিসাব করা টাকা এর থেকে কি করে সাধুকে অর্থ দান করবেন। আর যদি দিতে হয় তবে রাজপুত্রের পদমর্যাদানুসারে বেশ একটা মোটা সংখ্যায় টাকা দিতে হয়। কি করা যায় এ নিয়ে উভয়েই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বামীজি হয়ত উভয়ের মনের কথা তখন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বল্লেন "আমি দান স্বরূপ তোমাদের নিকট কোন অর্থ চাই না, আমি চাই রাজকুমার তাঁর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এইসব মানব প্রবৃত্তির থেকে আমাকে একটি দান করুন।" তার উত্তরে রাজকুমার বল্লেন "আমি এখন বালক মাত্র, আমি হয়ত আমার প্রবৃত্তির মধ্যে একটি আপনাকে দান করব, কিন্তু পরে যদি তা পালন না করতে পারি তবে কথার খেলাপের জন্য কে পাপের ভাগী হবে?" তবু স্বামীজির কথায় রাজকুমার সেইদিন তাঁর ক্রোধকে দান করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর সেই দানের মর্যাদা আজীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাটি খুব ছোট্ট হলেও এই দানের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব যে কি ভীষণ, তা মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনি নিজের পরিবার, পরিজনও সন্তনাদির প্রতি সর্বদা স্নেহপরায়ণ। কখনও তাদের প্রতি কোন প্রকার কটূক্তি বা কঠোর মন্তব্য কিম্বা দৈহিক নির্যাতনের দ্বারা শাসন করেন না।

শিক্ষা সমাপ্ত করে যখন আগরতলায় ফিরে এলেন তখন যুবক রাজপুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর নিজ রাজ্যে কোন একটা গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করবার কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে ছিল কাজ করবার প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ এবং দেশের উন্নতি সাধনের কল্পনা। কুঞ্জবনে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে বুদ্ধ বিহার মন্দিরটি আছে তারই পূর্বদিকে সামান্য উঁচু টিলার বিস্তৃত এলাকা নিয়ে ফলের বাগান করতে শুরু করে দিলেন। ভাল জাতের আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, গোলাপ, সফেদা, এলাচি ও লঙ্কা আনারস এমনিতর বহু প্রকার ফলের গাছে বাগানটি পূর্ণ! বর্তমানে লঙ্কা আনারস ত্রিপুরার একটি উল্লেখযোগ্য ফল। সর্ব প্রথমে ত্রিপুরায় মহারাজ কুমারই এই আনারসের প্রবর্তন করেছিলেন। তখনকার দিনে লালুকর্তার ফলের বাগানের কথা প্রায় সকলেই জানত। পরবর্তীকালে এই বাগান প্রচেষ্টার বৃহৎ রূপ হল আগরতলা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে চা বাগান করার মধ্যে। লিমিটেড, কোম্পানির দ্বারা এই বাগানটি পরিচালিত হত। কোম্পানির প্রধান ছিলেন রাজকুমার এবং তাঁর সহকারী পরিচালক ছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্য। চা বাগানের সঙ্গে মুরগী ও ছাগল পালনের ও ব্যবস্থা ছিল। দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে মহারাজ কুমারের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরায় ও দেশলাই তৈরীর জন্য মহারাজ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা। এই ব্যাঙ্ক ও দেশলাইয়ের

ফেক্টরীর কাজ এক সময়ে খুব ভালভাবে চলেছিল। এই কাজে প্রধান সহকারী কর্মী ছিলেন সদ্যালোকান্তরিত তাঁর আত্মীয়প্রতিম সত্যরঞ্জন বসু।

মহারাজকুমার একজন সুনিপুণ আলোকচিত্র শিল্পী। প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য, মানব মূর্তি চেহারা এবং ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলির ভাল ভাল তাঁর তোলা আলোকচিত্র আছে। অপেশাদারী চলচ্চিত্র ক্যামেরা দিয়ে নিজের পরিবার ও পরিজনের এবং ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ কালের ঘটনাগুলিকে ফটোতে তুলে রেখেছেন। আলোকচিত্র গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই আগরতলায় বেড়াতে আসেন। তবে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ও মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালেই আগরতলায় তিনি বেশী এসেছিলেন। রাজ অতিথিরূপে কবির আগরতলায় থাকার ব্যবস্থা হত কুঞ্জবন প্রসাদে কিম্বা মালঞ্চাবাসে। তখনকার দিনে কুঞ্জবন এলাকা ছিল জন বিরল নিস্তব্ধ ও রমানীর সৌন্দর্যে আবিষ্ট। এই পরিবেশে বাস করতে কবি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতেন। এই অতীত দিনের সুখস্মৃতির কথা পরবর্তীকালে অনেকবার লেখকের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। আগরতলায় এলেই তাঁর স্নেহাস্পদ লালু কর্তার বাড়িতে একবার মণিপুরী রাসনৃত্যের আয়োজন করলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজের কন্যারা ও পরিবারের অন্যেরা। তখনকার দিনে রাজ অন্তঃপুরে নৃত্যগীতের প্রচলন থাকায় রাণীদের মধ্যেও কেউ কেউ এ বিষয়ে পারদর্শিনী ছিলেন। কন্যারা তাঁদের কাছেই নৃত্যের তালিম পেয়েছিল। তাছাড়া নৃত্য শিক্ষক ছিলেন মণিপুরী নৃত্য শিল্পী নবকুমার সিংহ। রাসনৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন রাসনৃত্যে শিক্ষাদানের সহায়তা করেছেন নবকুমার সিংহ। পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্র কিশোরের চেষ্টায় নৃত্যশিল্পী নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। শান্তিনিকেতনের মত অনুকূল পরিবেশও রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিসূচক উৎসাহে নবকুমারের নৃত্য প্রতিভা স্ফুরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে ইটালীতে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেই ভ্রমণে ব্রজেন্দ্র কিশোরকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বকবির দলভুক্ত হয়ে বিদেশে যাওয়াতে ইউরোপ ও ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মনিষীদের সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ ব্রজেন্দ্র কিশোর পেয়েছিলেন। ফ্রান্সের রোমাঁ রোলাঁ, শিল্পী মাদাম কার্পেলে ইংলন্ডের বিখ্যাত চিত্র শিল্পী রোদেন স্টাইন এবং আরো অনেকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের কর্ম তৎপরতা যখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে সংসারের লাভ লোকসানের আকর্ষণ শিথিল হয়ে যায়, দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে তখন অতীতকালের স্মৃতি, জীবন সংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতাও জ্ঞানই কেবলমাত্র শেষ বয়সের সম্পদ বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং যার মূল্য অনেকখানি, তাই কথায় বলে, বৃদ্ধস্য বচনম গ্রাহ্যম।

ত্রিপুরা বাঙলার নব-জাগরণের প্রভাব

কৃষ্ণ পদ দত্ত

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত সুবৃহৎ স্মারকগ্রন্থে কবির সঙ্গে ত্রিপুরার সুদীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও যোগাযোগের বহু অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্য বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীর অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই এই মূল্যবান গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। সেদিক থেকে গ্রন্থটি সকল বঙ্গভাষীর নিকট নিঃসন্দেহে সমাদর লাভ করবে। বিশেষ করে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যমন্ডিত ইতিবৃত্ত নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁরা এই গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক উপাদান প্রভূত পরিমানেই পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের যে দিকটি বর্ত্তমান লেখকের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ মনে হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে। আমার বক্তব্যটি সংক্ষেপে এই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে যে রেনেসা বা নবজাগণের উন্মেষ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে তার প্রভাব ত্রিপুরার রাজঅন্তঃপুরে প্রকৃষ্টভাবে অনুভূত হয়েছিল। অবশ্য তৎসঙ্গে স্বীকার্য্য এই কথাও যে, নব জাগরণের অন্তর্নিহিত ভাবধারা আত্মস্থ করার পক্ষে উপযুক্ত মানসক্ষেত্র ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের মধ্যে হতিমধ্যেহ প্রস্তুত ছিল এবং তা ছিল বলেই অনেক সময় অধস্তন রাজপুরুষদের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানকার রাজ পরিবারের সংযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখত স্মারক গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বাঙ্গলাদেশ ও ত্রিপুবার আত্মিক যোগের" উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, এই আত্মিক যোগাযোগ আকস্মিক নয়—খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিপুবাব রাজা রত্নমাণিক্যের বাজত্বকালে তা গড়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাসেব অনেক পতন-অভ্যুত্থান সত্ত্বেও উভয রাজ্যের মধ্যে আত্মিক সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল।

বাংলার রাষ্ট্রসীমার বাহিরে প্রধানতঃ বঙ্গসংস্কৃতির সংস্পর্শে অরণ্য রাজ্য ত্রিপুরায় বহু যুগ ধরে যে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য যে কোন অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করবেন। এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখলে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণের হেতু বোঝা যাবে।

পুরুষানুক্রমিক ভাবে বাঙলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার রাজাদের অনুরাগের উল্লেখ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।" প্রসঙ্গতঃ মহারাজ রাধাকিশোরের একটি উক্তি স্মরণীয়। বঙ্কিমের বঙ্গ দর্শন পুনঃ প্রকাশের কাজে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের কাছ থেকে উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছিলেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্বার্থাভিসন্ধির অপবাদ পর্যন্ত শুনতে হয়েছিল। মর্মাহত কবিকে উদ্দেশ করে রাধাকিশোর লিখলেন ঃ বঙ্গদর্শনের দরুণ যে সহায়তা আমি করিতেছি তাহা আপনার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধুভাব দরুণ নহে - বঙ্গভাষার প্রতি কি আমার কোনরূপ কর্ত্তব্য নাই, কি ইহাতে অধিকার নাই?"

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটে মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে। অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজবংশের পরিচয় ইতিপূর্বেই ঘটে ছিল। এই পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও উল্লেখ করেছেন। যতদূর জানা যায় বীরচন্দ্রের পিতামহ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কলিকাতার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হন। দুঃখের বিষয় ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের যোগাযোগের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি আগরতলাবাসী ত্রিপুরার পুরাকাহিনীর জনৈক প্রবীণ তথ্যনিষ্ঠ গবেষকের মুখে একটি দলিলের উল্লেখ শুনেছি। উক্ত দলিল থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারী চাকলা রোসনাবাদের সংলগ্ন একটি ভূসম্পত্তি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ক্রয় করেছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে পরিচয়ের এই বৈষয়িক সূত্রটির উল্লেখ কৈলাস সিংহের রাজমালায় পাওয়া যায়।

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বীরচন্দ্রের অন্তরঙ্গতার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যখন কেবল তাঁর আত্মীয়স্বজন ও নিকটতম বন্ধুদের মধ্যেই আবদ্ধ রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশের সেই প্রদোষকালে সুদূর ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি "ভগ্নহৃদয়" এর অপরিণত কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশে কলিকাতায় দূত প্রেরণ করেন ---এ সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু বাঙলা দেশের সে যুগটাই কি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ছিল না ?

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশে নবজাগরণের এক পর্যায় ঘটে। রামমোহনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর বীরচন্দ্রের জন্ম হয় এবং ১৮৯৬ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বীরচন্দ্রের জীবনের এই সাতান্ন বৎসর বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কাল ---রেনেসাঁ যুগের মধ্যপর্ব জাতীয় চেতনার উন্মেষে যে পর্বের পরিসমাপ্তি। নবযুগের এই পর্বের বৈশিষ্ট্য সুবিদিত। বিভিন্ন সূত্রে এই নবজাগৃতির প্রাণবাণী রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবধান অতিক্রম করে ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। সত্যবটে এর সব কিছুই মহারাজ বীরচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেন নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বাঙলাদেশে আইন বলে রহিত হয়ে যাবার পরও তিনি এই মর্মান্তিক কুপ্রথার বিরুদ্ধাচরণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহের সর্বশেষ ঘটনা উপলক্ষে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে তার পত্রবিনিময় প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, তৎসহ উল্লেখযোগ্য এই কথাও যে, ভারতবর্ষের সকল সামন্ত রাজা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষভুক্ত থাকলেও ত্রিপুরার মহারাজা বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানে অসম্মত হন। ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য এই অসম্মতির নবযুগের প্রবক্তাদের ক'জন সেদিন বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন?

ত্রিপুরা রাজবংশের সুপণ্ডিত লেখক নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা রচিত স্মৃতি কাহিনী "আবর্জ্জনার ঝুরি" তে বীরচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবন-সাধনার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় যা অনত্র দুর্লভ। রচনাটি

আংশিকভাবে ১৯১৭ সালে অধুনা লুপ্ত "ত্রিবেণী" সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপচন্দ্রের মতে বীরচন্দ্র "নব্যরুচিমান, শিক্ষাপ্রবনচিত্ত স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন"। এই প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য এই যে, বীরচন্দ্রের যখন বাল্যকাল তখনও বাঙলার চিন্তা ও মননশীলতায় রাজা রামমোহন রায়ের অপ্রতিহত প্রভাব। মহারাজ শৈশবে ফারসি ও ইংরেজি অধ্যয়ন করেছিলেন। নবদ্বীপের স্মৃতিকাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, বীবচন্দ্রের বাজত্বকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নূতন আলোক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। মহারাজকুমারদের ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য যিনি শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি সে-যুগের "নূতন আদর্শে গঠিত যুবক" — নাম আনন্দ বিহারী সেন।

বলা বাহুল্য বাঙলা দেশের মত ত্রিপুবা বাজ্যেও নব যুগের নূতন আদর্শের প্রতি প্রাচীন পন্থীরা খড়গহস্ত ছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র লিখেছেন যে, নবযুগের শিক্ষার বীরচন্দ্রে অতি-পক্ষপাতিত্ব নিয়ে ঘরে ঘরে অনুকূল - প্রতিকূল উভয়বিধ আলোচনা হত। পাছে ইংরাজী বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশে বাধাকিশোরেব সাহায্যেব উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর দানের কথা সুবিদিত। অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত হলেও জাতীয় যাদবপুর শিক্ষায়তনে রাধাকিশোরের দানের কথা একেবারে অজানা নয়। পুনরোক্তি হলেও বলা প্রয়োজন যে, বাঙলাদেশে নবযুগের এইপর্বে বিভিন্নমুখী গঠন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নব জাগ্রত জাতীয় চেতনা ও স্বদেশী বোধেরই প্রকাশ ঘটেছিল। সঞ্জীবনীর মধ্য দিয়ে (বাধাকিশোর সঞ্জীবনী পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন) কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী বর্জনের কথা প্রচার করেছিলেন। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীর দুর্জ্জয় প্রতিবোধেব সংকল্প ভাষা পেয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের আর্থিক অসঙ্গতিব ভাবনায় আকুল হযে উঠেছিলেন কারণ তাঁর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানাচার্যেব সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। আর একথা কার অজ্ঞাত যে, ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনার প্রকাশকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের উদ্ধত আচরণের প্রত্যুত্তরেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

স্বদেশীয় সাধনায় বাঙলাদেশের এই সকল গঠন মূলক প্রচেষ্টায় রাধাকিশোরের গোপন সাহায্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের প্রতিদান মাত্র মনে করা অসঙ্গত—কারণ বাঙলার নবযুগের আদর্শ ও কর্মোদ্যোগের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগের দৃঢ়তা না থাকলে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্য কখনও তা সম্ভব হত না। একথা স্মরণ রাখলে রাধাকিশোরের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের অন্যতম কারণ জানা যাবে।

বস্তুতঃ পক্ষে ত্রিপুরার রাজপরিবারের উপর "স্বদেশী কবি" রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে ইংরেজরা সুদৃষ্টিতে দেখেনি এমন ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। "গর্ভমেন্টের নির্বাচিত একজন পরিদর্শকের হস্তে জমিদারী শাসন ও কতক পরিমানে আয়ব্যয় নিয়ামনের ভার" অর্পণের সর্তে ইংরাজ সরকারেব কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবে আশংকিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে লিখলেনঃ "গোড়াতেই ইংরেজের নাম শুনিয়া ভয় হয়। ঐ জাতের হস্তে নিশ্চিত মনে আত্মসমর্পণ করা কোন মতেই চলে না।" আবার অন্য এক প্রসঙ্গে লিখলেনঃ "ম্যাকলিন সাহেবকে (চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার) শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা আর এক প্রস্তাব। আমার নিকট ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।" পত্রান্তরে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্ব নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন যিনি তাঁর নিজের ভাষায়, "কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির যে সংস্কার কার্য্য লইয়া গবর্নমেন্টকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হইয়াছে তাহার মূলে ছিলেন। এককালে স্বদেশী "Moverment এর নেতা" বলে ইংরেজদেব কাছে চিহ্নিত এই ব্যক্তিটি সুপ্রসিদ্ধ রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বৎসর ত্রিপুরায় কার্যভার গ্রহণ করেন সে বৎসর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংকল্পে বাঙলা দেশের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজদের প্রতি রাধাকিশোরের প্রকৃত মনোভাব আভাষে-ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। ইংরেজ রাজ প্রতিনিধির উদ্দেশে লিখিত অন্ততঃ একটি পত্রে তাঁর তেজোদ্দীপ্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রহস্যচ্ছলে তিনি একবার কর্ণেল মহিম ঠাকুরের শিকার ও ছবি তোলার নেশার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন ঃ "ইংরেজ গোরা সিপাইদের ন্যায় মানুষ না শিকার করে এই ভয়।" উক্তিটি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত পূর্ণ।

নবজাগরণের সমাপ্তি পর্বে বাঙলা দেশের বিশিষ্ট নায়কদের সংস্পর্শে মহারাজ রাধাকিশোর নূতন যুগাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন ত্রিপুরার কল্যাণে তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বাঙলাদেশে ও ত্রিপুরার তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল - আর তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে তিনি স্বীয় সংকল্পে কতদূর সফল হয়েছিলেন তা-ও আজ বিচার্য নয়। ১৮৯৭ সালে তদানীন্তন।

পলিটিক্যাল এজেন্ট জন কেনেডির উদ্দেশ্যে তিনি যে ব্যক্তিগত গোপনীয় পত্র লেখেন তাতে তাঁর যুগাদর্শে উদ্বুদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বালিকা বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন এবং রাস্তা নির্মাণ ও আইন প্রণয়নের কথা তিনি সে সময় চিন্তা করেছিলেন। কয়েক বৎসর পর আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত কারিগরী বিদ্যালয়ের (উডবার্ণ আর্টিজান স্কুল) জন্য শান্তিনিকেতন থেকে জনৈক সুদক্ষ জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত করে এনেছিলেন।

বলা বাহুল্য রাধাকিশোরের এই সমুদয় গঠনমূলক ও সংস্কারধর্মী কর্মোদ্যোগ নবযুগের বাঙলার কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে প্রত্যঙ্গ যোগাযোগের ফল। নবজাগৃতির ভাবধারা আত্মস্থ করার যে প্রয়াস বীরচন্দ্রের আমলে শুরু হয়েছিল রাধাকিশোরের রাজত্বকালে সুসংহত কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় তার শুভপ্রকাশ ঘটে। ত্রিপুরার জনসাধারণের হাতে তারা নিঃসন্দেহে এক পরম ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন। দারিদ্র ও সামাজিক অনগ্রসরতার মধ্যেও যে মহৎ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ত্রিপুরাবাসী মাত্রই সগৌরবে চিরকাল বহন করবেন।

আদিম ত্রিপুরার জনকৃষ্টি

হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা

সসাগরা ধরণীর অধিশ্বর সম্রাট যযাতি ব্রহ্মশাপে জরাগ্রস্ত। কিন্তু তার রয়ে গেছে ভোগের স্পৃহা। যৌবনের সুখ ভোগের অতৃপ্ত বাসনা। কিন্তু জরা ব্যাধি মুক্ত না হলে সম্ভব হবে না যৌবনের সুখ ভোগ। এই জরা ব্যাধির মুক্তি তখনি সম্ভব যদি তাঁর পঞ্চপুত্রের কেউ গ্রহণ করে এ ব্যাধি। দীর্ঘকাল যৌবনসুখ ভোগের পরও পিতার যদি থাকে ভোগের অতৃপ্ত বাসনা তবে যৌবনের প্রারম্ভে কোন পুত্র নিজ যৌবনের বিনিময়ে গ্রহণ করবে পিতার জরা? সকলেই হয়না শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। তাই যযাতি যখন জানতে চাইলেন কোন পুত্র তার যৌবনের বিনিময়ে বিনিময়ে গ্রহণ করবে পিতার জরা। পঞ্চপুত্রের যদু, তর্ব্বসু, দ্রুহ্য অনু জ্যেষ্ঠ চারপুত্র অস্বীকার করল পিতার জরা গ্রহণে, ক্ষুব্ধ হলেন যযাতি। অবাধ্য তার পুত্রকে দিলেন নির্বাসন । পিতার নির্বাসন আদেশ অন্য তিন ভাইয়ের মত মাথা পেতে নিল দ্রুহ্য। অনেক পথ পদব্রজে অতিক্রম করে ভাগীরথীর সাগর সঙ্গমে এক দ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন দ্রুহ্য। ক্রমে মহর্ষি কপিলের আদেশে তিনি এই দ্বীপে স্থাপন করলেন ত্রিবেগ নগরী।

তারপর কালের আবর্ত্তে কেটে গেছে কত বছর। দ্রুহ্যের পর এক এক করে ধরা থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁর বংশের অনেক রাজা। কিন্তু রয়ে গেছে তাদের অনেক কীর্ত্তি। বংশের কীর্ত্তি যশকে সাগরদ্বীপের বাইরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ চিন্তা জাগল দ্রুহ্যের পঞ্চবিংশতিতম বংশধর প্রতর্দ্দণের মনে। তিনি এলেন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কিরাতদেশ বিজয়ে। বাহুবলে জয় করলেন কিরাত রাজা। স্থাপনা করলেন নবরাজ্য পাট। শৌর্য্যে বীর্য্যে পরাক্রমে প্রতর্দ্দন দুই ত্রিবেগ রাজ্য সুশাসনে রাখলেও তাঁর চতুর্থ উত্তর পুরুষ মিত্রারি পারলেন না এ দুই রাজ্যকে সুশাসনে রাখতে। ব্যভিচারী রাজকার্য্যে উদাসীন মিত্রারির প্রধান অমাত্য সুরজিৎ প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নিয়ে নিলেন নিজে। মিত্রারি হারালেন প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্য। তারপর থেকে যুদ্ধবিগ্রহ, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে মিত্রারির নবম পুরুষ মহারাজ দৈত্যের রাজত্বকালও হল শেষ নব ত্রিবেগ রাজ্যে। রাজ পুত্র হবে রাজকীয় মহৎ গুণের অধিকারী। কিন্তু তারও হয় ব্যতিক্রম। সেই ব্যতিক্রমের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করল দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর। প্রজাবৃন্দ শৈব। শিব তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। সেই পূজা অর্চ্চনা বন্ধ হল ত্রিপুরের আদেশে। করতে হবে রাজার পূজা, পররাজ্য আত্মসাৎ, পরস্ত্রীহরণ, প্রজাপীড়নে অতি বাহিত হয় অত্যাচারী ত্রিপুরের দিন, মাস, বৎসর।

মানুষের অন্তরের বেদনায় আত্মার ক্রন্দনে, ভক্তের আকুল আহবানে বুঝি ধ্যানভঙ্গ হল ত্রিশূলী শঙ্করের। আবির্ভূত হলেন শঙ্কর। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

নিহত হলেন রাজা ত্রিপুর শিবহস্তে। রাজাহীন হল রাজ্য। অপুত্রক ত্রিপুরের শূন্য সিংহাসনের কে হবে অধিকারী। কে রক্ষা করবে রাজ্য। সৃষ্টি হল বিশৃঙ্খল সমগ্র রাজ্যব্যাপি। উপায়হীণ সকলে, আবার সুরু হল শঙ্কাহব শংকরের আরাধনা সাতদিন সাতরাত্রি যাগযজ্ঞ নৃত্যগীতে।

তুষ্ট আশুতোষ। তাঁর কৃপায় জন্ম নিল ত্রিলোচন ত্রিপুরের বিধবা মহিষী হীরাবতীর গর্ভে। ত্রিলোচন হলেন রাজা, শান্তি ফিরে এল রাজ্যে। ত্রিলোচনের গুণ গরিমা, শৌর্য্য বীর্য্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। ত্রিলোচন যখন শাসন করছেন রাজ্য প্রবল পরাক্রমে ; তখন হীনবল বৃদ্ধ হেরম্বাধীপতি জর্জরিত বহিঃশত্রুর আক্রমণে। ভাবলেন রাজা, কন্যাদান করে ত্রিলোচনের সাহায্যে করবেন রাজ্যরক্ষা। হেরম্বের দূত এল বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ত্রিলোচনের সভায়। গ্রহণ করলেন ত্রিলোচন হেরম্বের প্রস্তাব। উপস্থিত হলেন ত্রিপুররাজ হেরম্বরাজ্যে। বিবাহ উৎসবে মেতে উঠল হেরম্ব নগরী।

মানুষ মরণশীল। যত শক্তি, বলবীর্য্যই থাকনা কেন মৃত্যুকে কেউ পারে না ঠেকিয়ে রাখতে। মহাবলশালী রাজা ত্রিলোচনকেও একদিন বিদায় নিতে হল ধরা থেকে। বিদায় নিল ত্রিলোচনপুত্র দাক্ষিণ, রাজ্যভার পুত্র তৈদাক্ষিণের হস্তে দিয়ে। ত্রিলোচনের উপযুক্ত বংশধর তৈদাক্ষিণ। তৈদাক্ষিণের যশোগাথা ছড়িয়ে পরল পর রাজ্যে ও নিজ রাজ্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে। তৈদাক্ষিণের গুণগাথায় মুগ্ধ হলেন মণিপুররাজ। কন্যার পাণিগ্রহণের আমন্ত্রণ নিয়ে নিজে এলেন মণিপুর রাজ তৈদাক্ষিণের দরবারে।

মহাবৈষ্ণব মণিপুর রাজ, গোবিন্দজীর নিত্যসেবা ব্যতীত গ্রহণ করেন না অন্নজল। ত্রিপুরাযাত্রায় তাই সঙ্গে নিলেন গোবিন্দজীর বিকল্প বিগ্রহ রাধামাধবজী আর নিলেন পূজারী ও সেবায়েতবৃন্দকে। পথে পথে হবে ভোগ, পূজা আরতি। রাজাকে যেমন সসম্মানে স্বাগত জানালেন তৈদাক্ষিণ তেমনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন রাধামাধবজীর পূজা অর্চ্চনার। দুই রাজা মিলিত হলেন দরবারে। মণিপুর রাজ্যের সম্মানে মণিপুর রাজ্যের মনোরঞ্জনে নৃত্য গীতের হল আয়োজন দরবারে।

আনন্দ অনুষ্ঠানশেষে মণিপুররাজ ব্যক্ত করলেন তাঁর আগমন উদ্দেশ্য। মণিপুর রাজদুহিতার পানি গ্রহণের হৃষ্টচিত্তে সম্মতি দিলেন ত্রিপুররাজ তৈদাক্ষিণ। স্বাগত জানালেন সভাসদগণ এ প্রস্তাবে। মনের আনন্দে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন মণিপুরের রাজা কন্যাসম্প্রদানের আয়োজন করতে। কিন্তু রয়ে গেল রাধামাধবজী, তার পূজারী ও সেবক সেবিকাবৃন্দ। কারণ বৈষ্ণব কুলোদ্ভবা মণিপুরদুহিতাও গোবিন্দজীর নিত্য পূজা ছাড়া গ্রহণ করেন না অন্নজল। রয়ে গেল পূজারীবৃন্দ আর সেবায়েতের দল মণিপুরদুহিতার জন্যে। যিনি আসছেন তৈদাক্ষিণের মহিষী হয়ে। রাজ আজ্ঞায় রাধামাধবজীর পূজা অর্চ্চনার হল সকল ব্যবস্থা। স্থাপিত হল বসতি রাধামাধবের পূজারী আর সেবক সেবিকাবৃন্দের। সুরু হল নিত্যদিন রাধামাধবের পূজা আরতি আর সেবক সেবিকাদের নৃত্য গীত নিবেদন দেবতার উদ্দেশ্যে।

কালের অমোঘ বিধানে একদিন যেমন তৈদাক্ষিণ বিদায় নিল, তেমনি এক এক করে বিদায় নিল আরো অনেক রাজা ত্রিপুরা থেকে। তাদের কেউ যেমন রাজার ছেলে রাজা আবার কেউ অপুত্রক রাজার ভাই আরোহণ করেছিলেন ত্রিপুরার সিংহাসনে। কিন্তু তারা সকলেই সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছিলেন তৈদাক্ষিণের রাজ্যপাট, সুশাসনে শাসন করেছিলেন প্রজাপুঞ্জকে। কিন্তু কোন কিছুই বুঝি থাকে না নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থিতিশীল। তাই তৈদাক্ষিণের ৬৬তম পুরুষ রাজা প্রতীতের রাজত্বে এল ব্যতিক্রম।

হেরম্বরাজের দূত এল প্রতীতের দরবারে আমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে। আমাদের রাজ্য পৃথক হলেও আমরা আত্মীয় পরস্পরের তাই আমাদের মধ্যে সন্ধি হলে শত্রুরা সাহস পাবেন না আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। ত্রিপুর রাজ প্রতীত মেনে নিলেন এ যুক্তি। বিদায় নিলেন হেরম্বদূতকে এই আশ্বাস দিয়ে যে প্রতীত যাবেন হেরম্বরাজ দর্শনে। তারপর ত্রিপুররাজ মিলিত হলেন হেরম্বাধীপের সঙ্গে। তারা চুক্তিবদ্ধ হলেন পরস্পরের অনাক্রমণের। ঠিক করে নিলেন নিজ নিজ রাজ্যের সীমা। কিন্তু সেদিনও অভাব ছিল না চক্রান্তকারীর। এ দুই বলশালী রাজার মিলনে ভীত হল পার্শ্ববর্ত্তী অন্য সব রাজা। ভাঙ্গতে হবে এ মিত্রতা। সৃষ্টি করতে হবে শত্রুতা। তাদের দূত নিয়ে এল নৃত্যগীতপটিয়সী এক সুন্দরী রমনী হেরম্বদরবারে।

সুন্দরীর নৃত্য পারদর্শিতায় মুগ্ধ হলেন হেরম্ব আর ত্রিপুর রাজ। দুজনের মনে জাগে সুন্দরীকে পাওয়ার বাসনা। কিন্তু প্রতীত নিয়ে এল রমনীকে নিজ রাজ্যে আর তার সাথে নিয়ে এল নিজের দুর্ভাগ্য। আশাহত হেরম্বরাজ আক্রমণ করলেন ত্রিপুরা রাজ্য। বলবীর্য্যে প্রতীত ছিলেন না দুর্বল, কিন্তু রমনীব মোহে রমনীর চক্রান্তে সুন্দরী নর্ত্তকীকে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন অরণ্যে।

এমনি যশোগাথা ও মসিলিপ্ত উত্থান পতনের বহু কাহিনী রয়েছে ত্রিপুরার পাহড়ে কন্দরের কিংবদন্তীতে। কিংবদন্তীর স্রোত বেয়ে সৃষ্টি হয় ইতিহাসের। প্রত্যেক ইতিহাসেরই থাকে একজন প্রথম পুরুষ। সেই প্রথম পুরুষের কাল থেকেই সুরু হয় ঐতিহাসিক যুগ। তেমনি আমাদের রত্ন রফা বা রত্নমাণিক্য, প্রতীতের ৩২ তম উত্তরপুরুষ যার রাজত্বকাল থেকে সুরু হল ত্রিপুরার প্রথম ঐতিহাসিক যুগ । খোদাই হল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ ত্রিপুরার।

রত্নফা বা রত্নমাণিক্য, গৌরেশ্বর সুলতান সামসুদ্দিনের প্রিয় পাত্র তিনি। ত্রিপুরাধীশগণের মাণিক্য উপাধি প্রথম গ্রহণ করেন রত্ন ফা সুলতানের কাছ থেকে। রত্নমাণিক্য দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন গৌড়ে : আকৃষ্ট হয়েছিলেন গৌড়ের শিক্ষা দীক্ষায়। তাই তিনি বহু বাঙ্গালীকে প্রথম নিয়ে এলেন ত্রিপুরায় সুলতানের অনুমতি নিয়ে। কিন্তু তাহলেও তার সপ্তম বংশধর ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে প্রথম রচিত হয় পাঁচালী বাংলা ভাষায় ত্রিপুরাতে। ধন্যমাণিক্যের প্রথম নিয়ে এলেন নৃত্যগীতপারদর্শী লোকদের মিথিলা থেকে নিজের দেশবাসীকে শিক্ষা দেবার জন্যে।

কিন্তু এই নৃত্যগীত চর্চা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয় ধন্যমাণিক্যের ৩১তম উত্তর পুরুষ মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে। ত্রিপুরার আদিম জনকৃষ্টি তার নিজস্ব ধারার মধ্যেই শেষ করেনি তার পথ চলা। কিন্তু তাহলেও বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে যত বিস্তৃত লাভ করেছিল এই কৃষ্টি সমন্বয় সেরকম আর দেখা যায়নি তার পুর্ববর্ত্তী কোন রাজার সময়ে। এক কথায় কৃষ্টির ক্ষেত্রে বীরচন্দ্র ত্রিপুরার নব-রূপকার । ভারতের বহু গুনী জ্ঞানী স্থান পেয়েছিলেন বীরচন্দ্রের দরবারে। ভারতবিখ্যাত বীণকার ওস্তাদ কালে খাঁ স্থান পেয়েছিলেন দরবারের বীণাকার রূপে। মনিপুরী সংস্কৃতির যে চর্চা ত্রিপুরাতে ছিল প্রবাহিত সেই ধারাকে নতুন করে তিনি সাজিয়ে নিলে নিজের মনের শিল্প রসের ধারায় যার ফলে মনিপুরী নৃত্য ত্রিপুরার নিজস্ব আঙ্গিকে আজো প্রতিষ্ঠিত।

মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্ব কালেই ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে বঙ্গসাহিত্য, ভাষা,ও সংস্কৃতি। ত্রিপুরার বিশ্রুত মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন তার একনিষ্ঠ সাধক । তিনি রচনা করেছেন বহু বৈষ্ণব গীত কাব্য। নিজেই করেছেন তাতে সুরের সংযোজন। বাঙ্গলা এবং ফার্সি দুই ভাষাতেই মহারাজ বীরচন্দ্রের ছিল সমান বূৎপত্তি কিন্তু তাহলেও বাঙ্গলা ভাষাকে তিনিই গ্রহণ করেন রাজভাষা রূপে। বঙ্গ সাহিত্য, কাব্যে তার এমন একটা গভীর অন্তরদৃষ্টি ছিল যার ফলে বালক কবি রবীন্দ্রনাথের সাধারণ লেখা 'ভগ্নহৃদয়' কবিতার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বঙ্গ সংস্কৃতির আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবের প্রথম আলোক রশ্মি। তিনিই প্রথম বালককে কবি আখ্যায় ভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মধ্যে করলেন সেতু বন্ধন।

সেই সেতু বেয়ে রবীন্দ্র পদস্পর্শে ধন্য হল ত্রিপুরা বীরচন্দ্রের সুযোগ্যপুত্র রাধাকিশোরের রাজত্বকালে। তখন থেকে রবীন্দ্র কাব্যে গানে নিজেকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চেষ্টা করল ত্রিপুরা। তখন যা ছিল সীমিত আজ তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে।

ত্রিপুরা সংস্কৃতি শুধু রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করেনি। ছায়া সুনিবিড় গ্রামবাঙ্গলার মেঠো পথে যে উদাসী বাউল প্রাণ মাতান সুরে গেয়ে চলে গান আপন খুশীতে, বাংলার মাঝি বেয়ে চলে নৌকো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে গ্রামের বুকে আর ভেসে আসে সন্ধ্যা বাতাসে পল্লী বধূর হৃদয়ে উদাস করা মাঝির ভাটিয়ালির সুর। সেই বাউল ভাটিয়ালিকেও আপন করে নিয়েছে ত্রিপুরা আপন কৃষ্টির মাঝে। বাউল ভাটীয়ালির উদাসী সে সুর ধারাকে আপন করে নিয়েই ত্রিপুরা কিন্তু শেষ করেনি তার গতি। বাউল ভাটিয়ালির প্রাণ মাতান সুর লহরীকে ভারতের বিদগ্ধ সমাজের কাছে নূতন রূপে সাজিয়ে ধরেছিলেন ত্রিপুরার কৃতি সন্তান কুমার শচীন দেববর্ম্মণ। আর এর ফলে ত্রিপুরাও বহিঃ ত্রিপুরার বিভিন্নস্থানে বাউল ভাটিয়ালির প্রসারতা তার জন্যে ত্রিপুরাই পারে শুধু গৌরবের দাবী করতে।

অতীতের কিংবন্তীর কাল থেকে স্মৃতির গোচর ইতিহাসের কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সে মিলনে ক্ষেত্র রচনা করেছে ত্রিপুরা নিজের বুকে সে মিলনে আদিম জন কৃষ্টির আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করেছিল বিভিন্ন কৃষ্টিকে অকপটে। সেদিন হয়ত কবিগুরুর সেই বাণী "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"। এই রকমই একটা কিছু চিন্তা হয়ত তার ছিল, হয়ত ভেবেছিল লাভবান হবে আদিম জন কৃষ্টি। কিন্তু এই মিলনে তার ভবিষ্যতের রূপ সম্পর্কে হয়ত কোন চিন্তাই জাগে নি আদিম জন কৃষ্টির মনে তার যদি জাগত তাহলে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সে উদার হৃদয়ে আলিঙ্গন করত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

সেই কিংবদন্তির কালেও আমরা দেখেছি বাইরের কৃষ্টির সঙ্গে নিজস্ব আদিম জন কৃষ্টি ও সমানভাবে ত্রিপুরার বুকে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের কাল সুরু হবার সাথে সাথে ত্রিপুরার জন কৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনের আড়ালে চলে যেতে লাগল। এই অগুণ্ঠনের আড়াল নিবিড় থেকে নিবিড়তর হল মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকে। একথা যেমন সত্যি যে মহারাজ বীরচন্দ্র কৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার নব-রূপকার তেমনি বলতে গেলে তাঁর রাজত্বকাল থেকে ত্রিপুরার আদিম জন কৃষ্টি অর্থাৎ তার নৃত্য গীত ভাষা ইত্যাদি সব কিছুই অবহেলিত হয়ে মৌন ব্যথায় আত্ম গোপন করল পাহাড়ে কন্দরে। বীরচন্দ্র মাণিক্য যেমন বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করলেন রাজ ভাষা রূপে তেমনি তার পাশে স্থান দিতে পারতেন নিজের ত্রিপুরা ভাষাকে। ঠিক তেমনি আদিম থেকে ত্রিপুরার কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে হয়ে যায় রাজ প্রাসাদ কেন্দ্রিক। রাজকীয় সম্মান না পেলে তার কোন মূল্য নেই। তাই বীরচন্দ্রের দরবারে যেমন বাইরের গুণিজনদের সমাগম হয়েছে, উন্নতমানের কৃষ্টির সমাদর তেমনি অবহেলিত হয়েছে সম্ভাবনাময়, ত্রিপুরার নিজস্ব কৃষ্টি।

এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে 'সম্ভাবনাময়' কথাটার উপর। সম্ভাবনাময় আমি বলছি এ কারণে যে ত্রিপুরার আদিম জন কৃষ্টিতে যে গানের সুর যে নৃত্য আছে তাকে নিয়ে যদি দরদ দিয়ে একটু অনুশীলন হত তাহলে আমার মনে হয় এই সুর, এই নৃত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করত। আর কারণ হিসেবে বলা যায় যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের গানে 'সারং রাগের প্রভাব অত্যন্ত প্রখরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাদের গানে কেবলমাত্র 'অস্থায়ী' ব্যতীত আর কিছু নেই। একটি সুরের মধ্যেই আরোহী অবরোহী সীমাবদ্ধ। আর নেই কোন স্বরলিপি । এখন তাদের এই সুরকে নিয়ে কেউ যদি

অনুশীলন করে 'অন্তরা' ইত্যাদি সংযোজিত করে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে স্বরলিপি তৈরী করতে তাহলে হয়ত দেখা যেত ভারতীয় সঙ্গীত জগতে 'সারঙ্গ' রাগের আভাষ যুক্ত নতুন একটা রাগ জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু রাজকীয় পৃষ্ঠ পোষাকতার অভাবে তিমির অন্ধকারেই রয়ে গেল একটা সম্ভাবনা।

তেমনি নৃত্যের বিষয় নিয়ে বলতে গেলে একথা অনস্বীকার্য্য যে আমাদের উপজাতি প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক একটা নিজস্ব নৃত্য ধারা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তখন তাকে বাধ্য করেছিল পাহাড়ের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে, এবং দীর্ঘদিন আত্মগোপনের ফলে আজকের দিনে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাদের নিজস্ব নৃত্যের এতটুকু চিহ্ন পাওয়া যাবে না এমন কি একটা নিজস্ব নৃত্য ধারা যে ছিল আজ তারা অনেকে ভুলেই গেছে।

যেমন দারলং সম্প্রদায়। তারা জানে না তাদের কোন নিজস্ব নাচ আছে। অথচ একটি যুদ্ধের, আর একটি তাক্কালের উপর নাচ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধের নাচটি ঢাল আর বল্লম নিয়ে তারা নাচত। তাক্কালের উপর নাচটা ছিল অদ্ভুত। তাক্কালের যে দিকটা ধারাল সে দিকটা উপর দিকে রেখে, অপর দিকটা মাটির মধ্যে পুঁতে দেয় তাক্কালের অর্দ্ধেকটা পর্যন্ত। এভাবে সারি সারি কয়েকটা তাক্কাল পুঁতা হয়ে গেলে ধারাল অংশটায় উপর তারা নৃত্য করে, সঙ্গে বাজে একটা তাল যন্ত্র, অথচ পা থাকে অক্ষত। পা না কাটার প্রধান কারণ নাকি তাল। তালের একটু ব্যতিক্রম হলে পা কেটে যাবে। কাজেই যন্ত্র বাদককে হুঁশিয়ার হয়ে বাজাতে হয়। দারলং বস্তিতে গিয়ে এ নাচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, যুদ্ধের একটা নাচ ছিল একথা তারা শুনেছে বটে, তবে তাক্কালের উপর নাচের কথা শুনেনি। এ আলোচনার সময় ৯০/৯৫ বৎসরের এক দারলং বৃদ্ধ সেখানে এসে উপস্থিত হলে সে স্বীকার করল তাক্কালের উপর নাচের কথা। দারলং সম্প্রদায়ের প্রায় সকলে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তবে কিছু লোক যারা খৃষ্টান হয়নি সে রকম এক বস্তিতে আজ থেকে প্রায় ২৯/৩০ বৎসর আগে আকস্মিককভাবে একদিকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, এবং সেখানেই এ নৃত্য দেখায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু আজ সে নৃত্য অবলুপ্ত।

তারপর আচলংদের একটি নাচ। সেটাও সত্যি অত্যন্ত উপভোগ্য। অথচ তাও আজ অবলুপ্ত। নোয়াতিয়াদের উপর একটি অংশ আচলং। আচলং ছেলে এবং মেয়েরা একসঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করে। অবশ্যি সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্যই যৌথ নৃত্য। একক কোন নৃত্য দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের "গড়াইয়া" নৃত্য দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের "গড়াইয়া" নৃত্যে কেবলমাত্র পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করে থাকে। আচলং ছেলে মেয়ে ; যে কয়জন নীচে অংশ গ্রহণ করে, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে ছাতা। নাচের তালে তালে একই সঙ্গে সকলের ছাতা খুলে যাবে আবার তালে তালে একই সঙ্গে? বন্ধ হয়ে যাবে। এ রকম যে একটা নাচ আছে, নোয়াতিয়াদের মধ্যে বেশির ভাগই আজ তা জানে না। তেমনি ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক একটা নিজস্ব নৃত্য ধারা ছিল যা আজ বেশির ভাগই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে বর্ত্তমানেও কিছু পাওয়া যায় ত্রিপুরীদের মধ্যে তাদের আছে "লেবাং বুমানি, আথুক রমমানি', 'মশক' বুমানি ইত্যাদি দুতিনটি নিজস্ব সম্প্রদায়গত নাচ কোন এক সম্প্রদায়ের নিজস্ব নাচ না বলে ত্রিপুরী গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত সম্প্রতায়ের নাচ বলাটাই হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। ত্রিপুরী গোষ্ঠীভুক্ত বলছি একারণে যে কথিত আছে গড়াইয়া পূজাটা ছিল কুকি সম্প্রদায়ের নিজস্ব পূজা। এক সময়ে ত্রিপুর সৈন্য কুকিদের যুদ্ধে পরাজিত করে গড়াইয়া দেবতা ছিনিয়ে নিয়ে আসে, তখন থেকে কুকিদের প্রতিজ্ঞা হল যতদিন ত্রিপুরীদের পরাজিত করে তাদের মাথা কেটে এনে তা-দিয়ে উনুনের মাথা তৈরী করে রান্না করে খেতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তারা উনুনের কোন মাথা রাখবে না, আর ত্রিপুরীদের পরাজিত করে গড়াইয়া দেবতাকে যতদিন পর্যন্ত ফিরিয়ে আনতে না পারবে তারা গড়াইয়া পূজা করবে না। সেই অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত

দেখা যায় কুকি গোষ্ঠীভুক্ত যত উপজাতি সম্প্রদায় আছে তাদের চুলের কোন মাথা নেই এবং তাদের কোন সংক্রান্তি থেকে সুরু করে সাত দিন পর্যন্ত হবে গড়াইয়া পূজা। এই পূজা উপলক্ষে সাত দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে শুধু মাত্র নাচে গানে উৎসব করবে। এ উপলক্ষে যে নাচ হয় তাকেই গড়াইয়া নাচ বলা হয়। গড়াইয়া নাচের মধ্যে ২২টি ঢং এর প্রচলন আমি দেখেছি। এবং তার জন্যে আছে 'খাম' বা ঢোলের পৃথক পৃথক বোল। এই বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচের ঢং এরও হয় পরিবর্তন। যেমন মনে করুন—ঘেঘেনে ঘেচাং ঢাং ঢাং চাং এই বোলে ঢোল বাজার সময় নৃত্য শিল্পীরা যে ঢং এ নাচল, আবার যখন ঢোল বাজল 'ঘেঘেন চাং ঘেঘেন চাং চাং চাং চাং ঘেঘেন চাং তখনি আবার নাচের ঢং এরও হল পরিবর্তন । এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তিত প্রত্যেকটি ঢং এর রয়েছে পৃথক পৃথক অর্থ। কোনটা স্নানের, কোনটা কাপড় কাচার, আয়না দেখে কেশ বিন্যাস আর কোনটা পাখী তার বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে ইত্যাদি ২২ রকমের ঢং এর ব্যবহার, যদি ও আমাদের দৃষ্টিতে তা মার্জিত নয়।

কিন্তু বর্তমানে একথা অনস্বীকার্য যে, ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য বলতে রিয়াং নৃত্যকেই শীর্ষে স্থান দেওয়া চলে। কারণ সম্প্রদায়গত ভাবে একমাত্র রিয়াংগণই নৃত্যটাকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অপরিহার্য ভাবে বজায় রেখেছে নিজস্ব ধারায় এবং তার মধ্যে একটা মাধুর্য্যও পাওয়া যায়।

রিয়াংদের নাচের মাধুর্য্য হল কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের নিম্নাংশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচের সঙ্গে মৃদু পদ চাল্লনা, সত্যি উল্লেখ্যযোগ্য। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রিয়াং নাচের মধ্যে উদ্দামতা বা চোখ মুখ অথবা হস্ত মুদ্রা খুঁজতে গেলে দর্শকদের নিশ্চই নিরাশ হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেটুকু হস্ত মুদ্রা আছে সেটা কোন অর্থবহ নয় তবে একথাও জোর দিয়ে বলা যায় যে বিদেশীর কাছে ভারতীয় অনেকে যে 'টুইষ্ট' নাচে শিখতে যান, বা টুইষ্ট নাচের অনুকরণে নৃত্য করে থাকেন, যা আমাদের দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, তার চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের 'টুইষ্ট' নাচ যে কোন বিদেশীকে আমাদের রিয়াংগণ শেখাতে পারে যা সত্যি নয়নাভিরাম মৃদু পদ চাল্লনার সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে নিম্নাংশ এমনভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে যাতে অপূর্ব একটা হিল্লোলে হিল্লোলিত হয় কোমরের নিম্নাংশ। কিন্তু যেটা অদ্ভুত সেটা হল পেটের অংশ ছাড়া কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত উর্দ্ধাংশ এক চুলও নড়বে না। কোমর থেকে পা পর্যন্ত নিম্নাংশের সঙ্গে মিল রেখে যেভাবে শুধু মাত্র পেটের অংশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচায় বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। পেট ছাড়া কোমরের উর্দ্ধাংশ যে নড়ে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কলসীর উপর নৃত্য দেখলে। নৃত্যের আসরে কয়েকটি মাটির কলসী বসিয়ে দেওয়া হল। কুপি জ্বালিয়ে বোতলের মুখে বসিয়ে দেওয়া হল। কুপি জ্বালিয়ে বোতলের মুখে বসিয়ে সে বোতল মাথায় নিয়ে কয়েকটি মেয়ে কলসীগুলির উপর উঠে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে। এবং সে অবস্থাতেই কলসী থেকে নেমে সমস্ত আসরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে এক সময় আসর থেকে ধীরে ধীরে চলে যায়। কিন্তু নৃত্যের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাথায় বোতল বা বোতলের মাথায় বসান কুপি পরবে না। তাদের এ নাচ দেখলে মনে হয় নিবিড় বনানী ঘেরা পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদু মৃদু হাওয়া তারি পরশে যেন হিন্দোলিত হচ্ছে বনানী। আর নৃত্যে তাদের মৃদু পদচালনা দেখলে মনে হয় শীতের পাহাড়ী ছেবার জল যেন তির তির করে বয়ে চলেছে আপন ছন্দে।

এখন স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে জাগে। তাদের নাচে উদ্দামতা নেই কেন ? তাদের নাচেত মেয়ে এবং ছেলেরা একসঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করে থাকে। মেয়েদের নৃত্যে উদ্দামতার অবকাশ নেই বলেই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের নৃত্যে উদ্দামতা দেখা যায় না। কেবল মাত্র গড়াইয়া নাচের মধ্যেই একটু উদ্দামতা পাওয়া যায় এবং গড়াইয়া নাচে কোন মেয়ে অংশগ্রহণ করে না। এখন দেখতে হবে মেয়েদের নাচে উদ্দামতা থাকে না কেন ? সাধারণভাবে তার দুটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যায়। একটি হল—অতীতে তারা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস

করত তখন গোষ্ঠীর সকলে মিলেই একত্রে জুম চাষ করত। জুমের ধান কাটা হলে সমস্ত এনে জমা করা হত গোষ্ঠী পতি বা সর্দ্দারের বাড়ীর আঙ্গিনায়। তারপর সেখানে উঁচু করে তৈরী হত একটা বাঁশের মাচাং, সেই মাচাং এর উপর সমস্ত কাটা ধানের শিষ ছড়িয়ে দেওয়া হত। ধানের শিষ ছড়ান হয়ে গেলে মেয়েরা মাচং এর উপর উঠে যেত ধান মাড়াইয়ের জন্যে। নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা বাদ্য যন্ত্র বাজাত আর মেয়েরা তালে তালে মাচাং এর উপর পা ঘষে ঘষে ধান মাড়াই করত। মাচাং এর ফাঁক দিয়ে মাড়াই করা ধান নিচে এসে জমা হত। এভাবে সমস্ত ধান মাড়াই হয়ে গেলে, সর্দ্দার তখন ধানগুলি সকলের মধ্যে বন্টন করে দিত। অনেকের মতে তা থেকেই নৃত্যে পায়ের মৃদু সঞ্চালন। অবশ্যি এটা সত্যি কথা যে অনেক রিয়াং বাড়ীতে আহত মেয়েরা পা দিয়ে ধান মাড়াই করে। অপর আর একটি কারণ হল —প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পোষাক। তাদের নাচ গান প্রধানত জুম কেন্দ্রিক। জুমের কাজের মধ্যে তাদের নাচ গান চলে। জুম বাছনির সময় একদিকে ঢোল বাজে সঙ্গে চলে গান, অপরদিকে তালে তালে জুম বাছনির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা নৃত্য করে। বাড়ীর আঙ্গিনায় ও যে তারা নৃত্য করে না তা নয়। কিন্তু বাড়ীর আঙ্গিনা ও যেমন অসমতল তেমনি জুমের জায়গাও অসমতল, তার উপর আছে স্থানে কাটা বাঁশের অসংখ্য গুড়ি। তার মধ্যে নাচতে গেলে সংযত পদ চালনা ছাড়া উপায় নেই। উদ্দামতা আনতে গেলেই হাত পা কেটে যাবে। তার উপর অসমতল জায়গায় পরে গিয়ে পা ভাঙতে পারে। তার উপর রয়েছে প্রতিবন্ধক তাদের পোষাক। রিয়াং মেয়েরা কাপড় পরে হাটুর উপর পর্যন্ত তা কাপড়ের কোমড়ের দু'পাশে গুঁজে দেয়। আর বুকে থাকে একটা বক্ষ বন্ধনী যাকে তারা রিয়া বলে। তা পরে তারা বুকের দু'পাশে দু'মাথা গুঁজে। এখন এরকম পোষাক পরে কোন মেয়ের পক্ষে নৃত্যে কোন রকম উদ্দামতা আনা যে কিছুতেই সম্ভব নয় এ কথা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কাজেই তাদের নাচে সঙ্গত কারণেই উদ্দামতার কোন স্থান নেই। এখন কোন কারণটা যুক্তি গ্রাহ্য তা নির্ণয় করবেন গবেষক।

মণিপুরী নৃত্য প্রকৃত পক্ষে লোক নৃত্য। কিন্তু আজ তা ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসাবে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন হল একটা লোক নৃত্য কি করে ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। মণিপুরী নৃত্য, রিয়াং নৃত্য অথবা যে কোন লোক নৃত্যই বলুন ১০/১২ মিনিটের বেশী দেখার পরই এক ঘেয়ে লাগবে তার মধ্যে যত সৌন্দর্যই থাকুক না কেন। কারণ হল ১০/১২ মিনিটের পর দেখা যাবে একই ঢং বারে বারে ফিরে আসছে— নতুন কোন বৈচিত্র্য বা বিস্তার নেই। মণিপুরী নৃত্যও প্রকৃতপক্ষে তাই। কিন্তু তাহলেও আজ তা ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসেবে সু[illegible]। সমগ্র ভারতে হচ্ছে তার চর্চা। ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে জাতি লাভ করেছে গৌরবোজ্জ্বল আসন। এই সম্মানের মূলে রয়েছেন একদিকে মণিপুরী শিল্পী, চিন্তাশীল স্রষ্টা ও গবেষকগণ আর অপর দিকে রাজানুকূল্য। এই দুইয়ের সম্মিলত প্রচেষ্টায় মণিপুরী লোক নৃত্য আজ ক্লাসিক্যাল নৃত্যে পর্যবসিত।

প্রথমে বলা যায় মণিপুরী নৃত্যের পোষাক। আমি যতদূর জানি মণিপুরের স্বর্গত মহারাজ চূড়াচাঁদের সময়ে বর্তমান মণিপুরী নৃত্যের পোষাকের প্রবর্তন হয়। তিনিই এ পোষাকের উদ্ভাবক। নিজের সংস্কৃতির উপর কত গভীর মমত্ববোধ থাকলে, তার উন্নতির জন্যে কত গম্ভীর আগ্রহ থাকলে এমন একটা উদ্ভাবনা সম্ভব হয়, সমগ্র ভারতে প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এ পোষাক দেখলেই বলে দেওয়া যাবে মণিপুরী নাচের পোষাক। বর্ত্তমান নাচের পোষাক উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরী মেয়েরা সব সময় যে কাপড় পরত নাচের সময়ও তাই ব্যবহার করত।

মণিপুরী মেয়েরা পূর্বে যে কাপড় পরে নাচত সে কাপড় পরার পদ্ধতি আর আমাদের পাহাড়ের মেয়েদের কাপড় পদ্ধতি একই রকম কোমরের দু'পাশে দু'মাথা গুঁজে। আগেই বলেছি এ অবস্থায় নৃত্যে উদ্দামতা আনার কোন সুযোগ না থাকায় মণিপুরী মেয়েদের নৃত্যেও থাকে না উদ্দামতা। এই লোক নৃত্যের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন নৃত্য আঙ্গিকের মিশ্রণ ঘটিয়ে ক্লাসিক্যাল নৃত্য পর্যায়ে

উন্নত করা সম্ভব হয়েছে তার প্রধান কৃতিত্ব বলতে গেলে মহারাজ চূড়াচাঁন্দের পোষাক উদ্ভাবন। নৃত্যের পোযাকটাই এমন একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা নিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন নৃত্য আঙ্গিকের সহজ অংশগুলির সংমিশ্রনের সহায়ক হয়েছে' মণিপুরী মেয়েদের নৃত্যে পদ চালনার মধ্যে থাকে না কোন উদ্দমতা থাকে না কোন বৈচিত্র্য, সেই ধারাকে বজায় রাখলে অনুশীলনে যত সহজ হবে তার পরিবর্ত্তে নতুন আঙ্গিকের প্রবেশ ঘটাতে গেলে তত সহজ হবে না, কাজেই নাচের পোষাক এমনভাবে তৈরী হল যেটা পরলে কোমর থেকে পা পর্যন্ত দেখবার সুযোগ থাকবে না। কাজেই সে অংশে কোন নৃত্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণের প্রয়োজনও রইলনা যার ফলে তাদের চিরাচরিত ধারা বজায় রয়ে গেল। আর দর্শকের দৃষ্টি ও রক্ষা পেল একঘেয়েমি দৃশ্য দেখার হাত থেকে তার পর চোখ মুখের অভিব্যক্তি . মণিপুরী নৃত্যে চোখ মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই সেই পদ্ধতিকে বজায় রাখার জন্যে নিজের পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত একখণ্ড মসৃন উড়না দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাব ফলে চোখ মুখের অভিব্যক্তি বুঝবার কোন উপায় থাকে না। এখন বাকী রইল গলার নিচ থেকে কোমরের উর্দ্ধাংশ আর দুটি হাত। এইটুকুর মধ্যে লাস্য নৃত্যের অনায়াস লব্ধ কিছু দেহ সঞ্চালন আর হস্ত মুদ্রার সংমিশ্রন ঘটিয়ে নিজস্ব একটা ঢং সৃষ্টি করে নিল যা আজ ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্য জগতে মণিপুরী নৃত্যও গৌরবোজ্জল আসন অধিকাব কবতে সমর্থ হয়েছে।

তবে একথা দৃঢ়তাব সঙ্গে বলা যায় সে এত সব সত্ত্বেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীষ ধন্য না হলে এত সহজে ভারতের গুনি সমাজে সমাদৃত হতে পারত না আর তারও মূলে রয়েছে ত্রিপুরাব রাজানুকুল্য । কবিগুরুর ত্রিপুরার শুভ পদার্পন উপলক্ষে দরবাবে যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে মণিপুরী নৃত্য দেখে আকৃষ্ট হয় কবির শিল্পী মন। তারপর তিনি শান্তি নিকেতনে এ নৃত্য চর্চ্চার ব্যবস্থা করে শান্তিনিকতনে অধ্যয়নের একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর কবিগুরুর অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজই নির্বাচন করে পাঠান ত্রিপুরা থেকে মণিপুরী নৃত্যের প্রথম অধ্যাপক শান্তি নিকেতনে।এখানে একথা বললে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে কবি গুরুর ত্রিপুরায় পর্দাপন উপলক্ষে দববাবে নৃত্য গীতেব আসরে যদি রিযাং নাচও পরিবেশিত হত তাহলে কে বলতে পারে কবির দৃষ্টিতে তারও যে একটা বিশেষ মূল্যায়ন হত না ?

আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের লোক নৃত্য বিশেষ করে রিয়াং নৃত্যেরও মূল কাঠামোকে বজায় রেখে সামঞ্জস্য পূর্ণ বিভিন্ন নৃত্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যদি নব কলেবরে সাজান যায় এবং নাচের জন্য পোষাকেরও উদ্ভাবন হয় তাহলে এ নৃত্যও ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসাবে ভারতের বুকে গৌরবোজ্জল আসন লাভ করতে পারে। শুধু ভারত কেন, বহির ভারতেও অনেক বিদেশী এ নৃত্য চর্চ্চায় আগ্রহী হত। কারণ মূল কাঠামোতে রয়েছে উন্নত মানের ট্যুইষ্ট নাচের ঢং।

তসলামফা ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার তসলামফার কথা মনে পড়ছে। আমার পরিচিত জগতের মধ্যে এমন একটি অভূত-পূর্ব চরিত্রের কোন উদাহরণ আমার মনে আসে না। একদিকে শিশুর মত সরল অন্যদিকে ক্রোধী, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা পরায়ন। বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল তুলনাটি তার উপর প্রযোজ্য হতে পারে। গভীর অরণ্যের পরিবেশে প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া তার প্রথম জীবনের শিক্ষার পাঠ। বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তার জীবনে আসেনি। যৌবনে চলার পথে চৌধুরী বা রায়ের অবিচারের বিচারের তিনি এক ভুক্তভোগী। তথাপি রায়ের আশ্রম ছাড়া গতি নাই! রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে রতনমনি সাধুর আশ্রয়ে এসে কিভাবে তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল সে কথাই আজ সংক্ষেপে লিখতে বসেছি।

[illegible] সম্পন্ন তসলামফার (তসলামের পিতা) ভাল নাম রাজপ্রসাদ রিয়াং চৌধুরী। কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকশিত হয়। রাজনীতির শিক্ষা তিনি কাজের ভেতর থেকেই গ্রহণ করেন। তার সরলতা, আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ ভাবে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতি মমতা বোধ, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং দলের প্রতি আনুগত্য তাকে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার একজন মন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

লেখা পড়ার সঙ্গে পরিচিয় হীন অতি অনগ্রসর রিয়াং সম্প্রদায়ের এক শক্তিমান যুবক। তসলামফা খগেন্দ্র রায়ের (রিয়াং সম্প্রদায়ের রাজার সমতুল্য) নির্দেশে বাধ্য হয় রতনমনির দলের কেম্পে বা দুর্গে যেতে হয়েছিল সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হয়ে। রতনমনি তাকে জাদু করেছিলেন অথবা তাঁর সাধনা লব্ধ শক্তির বিশেষ অংশ তাকে দান করেছিলেন কিনা জানা নেই! তসলামফা সেইদলের একজন কর্মী হয়ে গেলেন। মহারাজ কর্তৃক বিদ্রোহ বা আন্দোলন দমনের পর রতনমনির রিয়াং শিষ্যগণ গৃহদাহে গৃহহীন গভীর পার্বত্য জঙ্গলের অধিবাসী। বন্দী হয়ে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করে অনাহারে অর্ধাহারে পায়ে হেঁটে সুদূর উদয়পুর, অমরপুর বিলোনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল হতে আগরতলায় হাজির হয়ে শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। আবার গৃহে, যে গৃহ নেই, ফিরে যেতে হয়েছে। তাদের সেই দুর্দশা। দারিদ্র্য ও সীমাহীন কষ্ট ও বেদনা কল্পনা করেই অনুভব করতে হবে। বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটময় মুহূর্তে সহানুভূতি বা সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহীদের দ্বারদেশে কারও উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। মহারাজ যে অধিক সাজা না দিয়ে ক্ষমা করেছেন ইহাই যেন তাদের সাত পুরুষের ভাগ্য ! সেই বিশ্ব যুদ্ধের সময় এমন সাহস কার যে তাদের পূনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য দাবী

করবে। অরুন্ধতীনগরের মিশনারীদের পক্ষ থেকে (হয়ত দফায় দফায়) ১০,০০০ টাকা তাদের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে অর্থ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। জানা যায় এই সাহায্যের সর্ত ছিল খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে এই অর্থ দান হিসাবে গণ্য হবে অন্যথায় ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

আগরতলা বিশিষ্ট ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্মা ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশের মিসিপ। তিনি বগাফার শিক্ষত যুবক খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরীদের সমর্থক ছিলেন। উদয়পুরের ঈশ্বার রিয়াং চৌধুরী ও তার পুত্রগণও ছিল লেখাপড়া জানা। এই সব শিক্ষিত চৌধুরীদের পক্ষে দাড়ান হরচন্দ্র ঠাকুর। সম্ভবত তার প্রচেষ্টায় খগেন্দ্র রায়ের দল রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। কার্যাত খগেন রায় কাঞ্চন না হলেও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষীবাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত হয় তখন খগেন রায়কে রক্ষীবাহিনী গঠন করার ভার দেওয়া হয়। ফলে তিনি কার্য্যত (Defecto) রায়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন কোন লিখিত আদেশ না থাকা সত্বেও। অন্যদিকে রতনমনির তথা দেবীসিং রায়ের (রায় কাঞ্চন) সমর্থকও আগরতলার ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। মিসিপ ঈশানচন্দ্র দেববর্মা (ঠাকুর) ছিলেন রতনমনি গোষ্ঠীর সমর্থক। তিনিও রিয়াংদের কোন অঞ্চল বা গোষ্ঠীর মিসিপ ছিলেন। তিনি তখন বয়সের ভারে বৃদ্ধ। রাজ দরবারে তার বোধহয় বিশেষ প্রতিপত্তি ছিলনা। বিদ্রোহের অবসানে রতনমনির নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ আগরতলায় দরবার করতে এসে বা উপদেশ আদি নেওয়ার জন্য ঈশান ঠাকুরের বাটির বহিরাঙ্গনে অবাঞ্ছিত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করত। ঠাকুর সাহেবই তাদের প্রধান সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন। সম্ভবত তিনিই তাদিগকে উপদেশ দেন রতনমনির রিয়াং আন্দোলন মহারাজের বিরুদ্ধে নয় খগেনরায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে— এটি প্রমাণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সম্ভবত তাদের সমবেত দরবারের ফলেই ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে মহারাজ তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। (তারিখটি ' ত্রিপুরা ত্রিশ থেকে আশি' জীবন চক্রবর্তীর বই থেকে নেওয়া) এটি সঠিক তারিখ হলে সেই সময় শ্রীশচীন্দ্র লালা সিং, শ্রীবীরেন দত্ত জেলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন । কমিশন গঠনের আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের অবদান আছে বলে জানা যায় না।

ঐ সময় আগরতলায় সাধারণত যে সব রিয়াং নেতা আসতেন তার মধ্যে ছিলেন দুইজন বিদ্রোহী দলের মন্ত্রী, দুই তিন জন সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধান কর্মকর্তা তসলামফাও সেই দলের একজন। তার অদম্য সাহস, কর্মক্ষমতা ও কতর্ব্য নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির ফলে অপেক্ষাকৃত নবাগত তসলামফা অতিদ্রুত দলের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেন। ১৯৪৬ ইং সালে রতনমনির দলের প্রধানগণ ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসার পর কিভাবে তসলামফা দলের নেতা হয়ে উঠেছিলেন তা লেখার পূর্বে রতনমনি ও রিয়াং বিদ্রোহের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে ভাল হয়।

১৯৩০ সালের পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিবাসী শৈব সাধু রতনমনি ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিষ্য গ্রহণ করা শুরু করেন। নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের খুশীকৃষ্ণ ও আরও অনেকে সেকালের শিক্ষিত রিয়াং তার শিষ্য হয়। শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৬ ইং সালে খুশীকৃষ্ণ তার স্বরচিত ত্রিপুরী বা রিয়াং ভাষায় রচিত রতনমনির প্রশস্তি সহ ভক্তি গীতি, আগরতলা হতে ছাপিয়ে নিয়ে বিলি করতে শুরু করেন। জমায়েতে সম্মিলিত ভক্তি গীতি ও ভাষণ রিয়াং সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তির হৃদয় জয় করে। রতনমনির ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়ে এক শক্তিশালী ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠে।

বিলোনীয়া বগাফার খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরী বিত্তশালী শিক্ষিত এবং সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী সময়ে রিয়াং সম্প্রদায়ের রাজা বা রায় কাঞ্চন হওয়ার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সময়ে

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণ দ্বারা বিবাহও শ্রাদ্ধাদি কার্যসম্পন্ন করার জন্য মহারাজা প্রচেষ্টা নেন। নব্য শিক্ষিত সে যুগেই আলোক প্রাপ্ত খগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও রিয়াং সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ড করাবার অগ্রগন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমাজকে নূতনভাবে ঢেলে সাজাবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রতনমনির শিষ্যদেব সঙ্গে খগেনরায়ের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। খুশী কৃষ্ণের একটি গান সেই ইঙ্গিতই দেয়। রিয়াং ভাষার গানটি এই - এবার তুমি এর ফল ভোগ করবেই/হরিনাম একবারও নাও না/ তোমার হৃদয় শূন্য/পায়ে জুতা পরেছ/হাতে ঘড়ি বেঁধেছে/ মাথায় সুগন্ধী তৈল মেখে / কি আনন্দ পেলে ? /হাতিঘোড়া চড়ে, রথী মহারথী সেজে / আর সুন্দর হতে চেয়ো না। / মাংস হাড় আলাদা হয়ে /ভস্ম স্তূপে রূপান্তরিত হবে/বস্ত্র বলেন এসব আর চেয়ো না/ নিজেকে নিজে যাচাই করো/সুখী তুমি অবুঝ হয়ো না/জগতে সব মিছা। খগেন্দ্র চৌধুরী যে এই গান শুনার পর রতনমনির দলের পেছনে লাগবেন সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯৩৯ ইং সনে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কোন সময়ে রাজ্যরক্ষী বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন মহারাজ অনুভব করেন। অন্যান্য আনুসংগিক কারণেও হয়ত মহারাজ অতিবৃদ্ধ রায়কাঞ্চন দেবী সিং রিয়াং চৌধুরীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহারাজ মিসিপ হরচন্দ্র ঠাকুর ও অন্যান্যদের উপদেশ অনুযায়ী যুগ উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত খগেন চৌধুরী মহাশয়কে কাগজেপত্রে না হলেও কার্যত রায় কাঞ্চন অর্থাৎ রিয়াং সম্প্রদায়ের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। খগেন চৌধুরী নিজের ইচ্ছামত নূতন সমবয়স্ক চৌধুরীদের নিয়ে কার্যে ব্রতী হন। এর ফলে দেবী রায়ের প্রভাব খর্ব হল না পুরাতন উজির নাজির প্রভৃতিও ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হলেন। এদের মধ্যে অনেকেই রতনমনির শিষ্য বা সমর্থক ছিল। তারা রুখে দাঁড়াল। রতনমনি তার শিষ্য ও সমর্থকদের যে সংগঠিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধির উপদেশ দেবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খগেন্দ্র রায়ের সঙ্গে অসহযোগ শুরু হল। রাজ্যরক্ষী বাহিনীতে অতি অল্প সংখ্যক রিয়াং যুবকই অংশ নিল। রায় কাঞ্চন বদলা নিলেন। শুরু হল সামাজিক বিচার এবং রতনমনির দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার । রতনমনি মহারাজের নিকট বিচার প্রার্থী হয়েও তাঁর সাক্ষাৎপান নি । একবার মহারাজ রতনমনিকে ধরে এনে বা ডাকিয়ে এনে তার সাধুত্ব এবং সরলতায় বিশ্বাস করে উপদেশ দিয়ে সসম্মানে ছেড়ে দেন। শেষবার ধরেআনার পর আগরতলায় তার। সমর্থককেরা রতনমনিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। শিষ্যগণ প্রচার করে রতনমনি মাছি হয়ে বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে রাঁয় কাঞ্চনের ক্ষমতা প্রাপ্ত খগেন চৌধুরী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্নকারী সমাজ বিরোধীদের সায়েস্তা করার জন্য সামাজিক বিচার সহ নানা পন্থা অবলম্বন করলেন। আবেদন নিবেদন ও অপোষ আলোচনা ব্যর্থ হলে ১৯৪৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে রতনমনির, অমরপুর উদয়পুর ও বিলোনীয়ার শিষ্যগণ সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তারাই অত্যাচারী অপরাধীদের বিচার করবেন। মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে কাজের বিভাগ করে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনী গঠন করা হয় এবং ৫ জন সেপাপতিও নিযুক্ত করা হয়। কয়েকটি ক্যাম্প বা আবাসস্থল বা দুর্গ গঠন করা শুরু হয়। স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উদয়পুরে সংবাদ পৌঁছে রিয়াং স্বদেশী ডাকাতেরা ডাকাতি করে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করছে; জোর করে রিয়াংদের রতনমনির দলের সভ্য বা শিষ্য করে ডাকাতের দলে ভর্তি করছে। শহরে আশ্রয় প্রাপ্ত আসামীদের ধরার জন্য যে কোন মুহূর্তে উদয়পুর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। বিরাট লুসাই বাহিনী তাদের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই পৌঁছে যাচ্ছে। জাপানী গুপ্তচরদের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ আছে এবং সেই সুবাদে অস্ত্রশস্ত্রও ডাকাতেরা সংগ্রহ করেছে।

খগেন রায় ও চৌধুরীদের পক্ষ থেকে যে সব গুপ্তচর পাঠান হয়েছিল তারাই হয়ত এইসব গুজব সংবাদ নিয়ে আসত অথবা গুজব হাওয়ায় ভেসে উদয়পুর পৌঁছত। রাজকাঞ্চন কর্তৃক পাঠান এমন একজন গুপ্তচর ছিলেন রাজপ্রসাদ চৌধুরী বা তসলাম ফা (তসলামের পিতা)। তিনি আর ফিরে যায় নি। জানা যায় সেই সময় ফা খগেন রায়ের বাড়ীতে বা খামারে শ্রমিক (বেগার শ্রমিক) ছিলেন। শ্রমিক হিসাবে কয়েকবার

শাস্তিও ভোগ করেছিলেন। রতনমনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি নব জন্মলাভ করেন। গুরুর শান্ত শীতল ছত্রছায়ায় থেকে দলে তিনি অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯৪৩ সনের শ্রাবণ মাসে সরজমিনে তদন্ত করার নির্দেশ প্রাপ্ত উদয়পুরের থানার দারোগাবাবু বন্দী হওয়ার সংবাদ আগরতলা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ তার বডিগার্ড বাহিনীর সৈন্যদের নির্দেশ দেন এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আরাকার যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার জন্যই বোধহয় মহারাজের নিজস্ব-বডিগার্ড বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। এক বাহিনী সৈন্য উদয়পুরে হয়ে তুইচার বুহা ক্যাম্প আক্রমণ করে, তৎপর ডম্বুর পর্যান্ত যায় বিদ্রোহীদের বন্দী করার জন্য অন্য সৈন্যবাহিনী বিলোনীয়া হয়ে বগাফা ও পরে লক্ষ্মীছড়া গিয়ে ভোজনরত বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। সৈন্যবাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে মোট ৮ জনের মৃত্যু ও দুইজন আহত হয়। রতনমনির স্বদেশী দলের আন্দোলনের অবসান ঘটে।

রতনমনি আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন, সাহায্যের জন্য তারা যেন কংগ্রেস কমিটি, আর্য সমাজ এবং লুসাইদের খৃষ্ট সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। খৃষ্ট সমাজের সঙ্গে বোধ হয় সহজেই যোগাযোগ হয়ে যায়। কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীর সাহায্য পাওয়ার কিছুকাল পর রিয়াং সম্প্রদায়ের নেতারা অনুভব করল মিশনারীরা রতনমনিকে বস্তু বিষু হিসাবে গ্রহণ না করে পরে শুধু বিষুকেই রাখতে চায় অর্থাৎ রতনমনির প্রচারিত ধর্মকেই ররবাদ করে দিয়ে খৃষ্টান বানাতে চায়। এইসব নানা সমস্যার মুশকিল আসানের আশায় তারা মাঝে মাঝেই আগরতলা এসে প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিল। আর্য সমাজের সাক্ষাত তারা পায় নি। ঠাকুর সমাজের সহানুভূতিশীলেরা তেমন কিছু কার্যকরী সাহায্য বা পথ নির্দেশ দিতে পারে নি। তেমন এক পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৬ সনের কোন সময়ে রতনমনির দলের প্রতিনিধিরা কংগ্রেস ভবনে সভাপতি শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও পরিচিত হয়। সেই সময় থেকেই দলের প্রধান মুখপাত্র স্বর্গীয় রাজপ্রসাদ চৌধুরী। তসলাম ফা তখনও ভাল করে বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত না হয়ত ভাল করে আমাদের বক্তব্যও বুঝতে পারত না। কিন্তু তার সহজাত বুদ্ধি ছিল প্রখর। শচীনবাবুর বক্তব্য শুনার পর আমাদের সঙ্গে আলাদা আলাপ করে কংগ্রেসের আন্দোলনটি কি, বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করত। সেইসব একক বা যুক্ত আলোচনায় অনুভব করেছিলাম তাদের মনে তখনও প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। রাজপ্রসাদ প্রতিহিংসা পূরণ করতে চায় খগেন চৌধুরীকে বন্দী করে এনে বিচার করে। শক্তি রায় রিয়াং ছিল প্রধান সেনাপতি। অতি ক্রুদ্ধ প্রকৃতির লোক। তার বাসনা এখনই এই ছত্রভঙ্গ দল নিয়েই মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করা, এবং মহারাজকে ধরে এনে বিচার করা যায় এমন কোন শক্তি বা প্রক্রিয়া কংগ্রেসের আছে কিনা জানতে চায়। তার বক্তব্য সুরু হওয়ার সঙ্গে এমন এক আক্রোশের চেহারা তার চোখে মুখে ফুটে উঠত যে, যার ফলে তার দীর্ঘ বক্তব্য থেকে শুধু সারাংশটি গ্রহণ করা সম্ভব হত। আমার উপদেশ— প্রথমে সংগঠন শক্তিশালী করা, তারপর উপযুক্ত সময়ে সারা দেশের সঙ্গে আন্দোলনে নামতে হবে —শুনে তার চোখে মুখে স্পষ্ট অবজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠত, এবং দু একবার বাইরে থুতুও ফেলে আসত। বোধ হয় ঘৃণায়, তবু তিনি অনেকবার এককভাবে আমার নিকট এসেছেন। বয়স্ক গোরা থাং চৌধুরী একটু সাব্যস্তের লোক, বাস্তববাদী। সাদা আচকান পরে তিনি ঘুরাঘুরি করতেন। আর মত ছিল সরকারের নিকট হতে অর্থ সাহায্য আদায় করে শক্তি সংগ্রহ করা। কিভাবে গরীব রিয়াংদের জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তার উপদেশ ও ব্যবস্থাই তিনি চাইতেন। আবার মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করার দাবী তার ছিল না।

১৯৪৬ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে আমাকে এবং মিসিপ, ঈশান চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে নিয়ে এক সঙ্গে ডম্বুর তীর্থের পৌষ মেলায় যাওয়ার পূর্বে তসলামফা ভুলেও আমাকে বলেনি যে সঙ্গে করে মিসিপি মহাশয়কে নিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে ফা বলেছিল কংগ্রেসের প্রচারের জন্যই এই যাত্রা এবং আমি

ছাড়া আগরতলা হতে আর কেহ যাচ্ছে না। এমন কথাই তিনি বলেছিলেন। আমার ধারণা, তার রাজনৈতিক সহজাত বুদ্ধির প্রভাবেই তিনি এমনভাবে বলেছিলেন ! তার স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অন্য একটি ইচ্ছাও ছিল—শক্তিরায়ের প্রভাবকে খর্ব করা । ফা এ বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলেনি । আমি প্রকৃত ঘটনাটি জেনেছিলাম ঈশান ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হতে। ঠাকুর সাহেব আমাকে জানালেন শক্তি রায ডম্বুর তীর্থে পৌষ মেলায় কাকেও কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়াকর্মের সুযোগ দেবে না। সে প্রয়োজন হলে জোর করে তা বন্ধ করবে। সরকারের নিকটও এ ধরণের সংবাদ পৌঁছেছিল এবং অমরপুরের দারগাবাবু পুলিশ সহ ডম্বুরে উপস্থিত ছিল। এমন কাজ করলে রাজ সরকার তাগিদকে বন্দী বা দায়ী করবে ফা তা সহজাত বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছিল এবং এ ধারণাও ছিল যে এখন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় হয় নি তিনি সেকারণেই মিসিপকে নিয়ে গেলেন শক্তিরায়ের এই অতি উগ্র উৎসাহ বন্ধ করার জন্য, এবং সবাই যে শক্তি রায়ের পক্ষে নয় তার প্রমাণ রাখার জন্য। অন্যদিকে আমাকে নিয়ে গেলেন কংগ্রেস পক্ষের বক্তব্য রিয়াংদের কানে পৌছাবার জন্য যে কংগ্রেসেব কথা গুরুদেব বিদায়কালে বলে গিয়েছিলেন।

অতঃপর ফা শচীনবাবু লেখক ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে পাহাড়ে পরিভ্রমণ করা সুরু করেন, এবং ১৯৫০ সালে বগাফার রিয়াংদের এক বৃহৎ সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার সময় ফা-ই প্রধান বক্তা। আর সব শ্রোতা। শক্তিরায় আমাদের সঙ্গে যেত না। গ্রাম্য সভায় অধিকাংশ শ্রোতা বাংলা বুঝতে পারত না। কোন মহিলাও আলোচনা সভার ত্রিসীমানায় আসত না। শক্তিরায় কংগ্রেসের প্রভাবের বাইরে রতনমনির ভক্তদের নিয়ে সংগঠন করার চেষ্টা করেছিল। সে সফলকাম না হয়ে কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়টি আমার নিকট আরও স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৫২ সনের পর যখন শক্তিরায আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে যায়। তিনি আমাকে অথাৎ কংগ্রেসকে অতি ক্রুদ্ধভাবে গালাগালি করে যান তাব পছন্দ মত আন্দোলন না করার জন্য। আমি বুঝেছিলাম তসলাম ফা কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে শক্তিবায়ের পায়ের তলার মাটি অর্থাৎ নেতৃত্ব খতম করে দেয গুরুর শিষ্যদের মধ্যে। তাব মত প্রধান সেনাপতির পক্ষে তসলামফার নেতৃত্বের অধীনে কাজ করা সম্ভব হয় নি। তিনি পরে সাধু হয়ে লংতরাই এ বাস করতে শুরু করেন। তসলামফার নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানই তাকে পথ দেখিয়েছিল। এ যুগে শুধু গুরুর নাম নিয়ে রিয়াং সম্প্রদায়েরও উন্নতি হবে না, রিয়াং সম্প্রদায়ের উন্নতির বা মুক্তির পথ পাওয়া যাবে কংগ্রেসের সাহায্যে এবং সহযোগিতায়, এই বাস্তব ধারণা তার হয়েছিল। পূর্ব প্রতিহিংসার পশুটি তার মনের কোনে সুখে বা দুঃখে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছিল।

তসলাম ফা ছিল স্পষ্ট বক্তা। আমাদের মত মনের ভাব গোপন করে কথা বলার কায়দা তার জানা ছিল না। যাকে যা বলা উচিৎ মনে করত সামনা সামনি বলে দিত। ১৯৫২ সনের পর বগাফাঞ্চলে রিয়াং দরিদ্র পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ মাত্র শুরু হয়েছে। ডি.এম, মিঃ রাম্মুনী নিজে সরেজমিনে গিয়ে মাঝে মাঝে কাজের তদারক করেন। কর্মচারীদের বিশ্রাম ও অবস্থানের জন্য একটি অস্থায়ী ঘরও করা হয়েছে। বিলোনীয়া থেকে একজন অফিসার মাঝে মাঝে গিয়ে একরাত্র অবস্থান করেন কাজের অগ্রগতি এবং জুমিয়া পরিবার নির্বাচনের জন্য। তসলাম ফার মতে তার পানাদির প্রতি আসক্তি প্রবল এবং ফার সঙ্গে সর্ব বিষয়ে মতেব অমিল। ফার দাবি তার মত অনুযায়ী জুমিয়া পরিবার পূনর্বাসন পাবে। অফিসারের ইচ্ছা এই বাছাই এর কাজ তিনি করবেন। তসলামফা আগরতলা এসে শচীনবাবু এবং ডি. এম, কে সব অবস্থা জানায়। শচীনবাবু তাকে এখন অফিসারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার উপদেশ দেন। ফা বোধ হয় পূরাপুরি খুসি হয় নি। ডি, এম মহাশয় কোনদিন পরিদর্শনে যাবেন জানিয়ে দেন। তসলাম ফা আমাকে নিয়ে যায় তাকে পূনর্বাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ তার পক্ষে দো-ভাষির কাজ করাব জন্য । ফা ও অফিসারের সম্পর্ক প্রায় সাপ ও

নেওলের মত। ডি এম, সাহেব পৌছাব পব পবস্পব প্রায সাপ ও নেওলের মত। ডি, এম সাহেবের নিকট উপস্থিত হল। তসলামফা বাগত স্বরে মকাবাদির অভিযোগ করে বসল। এমন অভিযোগের সম্পূর্ণ বযান ভাষান্তর কবতে আমার ভদ্রতা ও রুচিতে বাধল, আমি সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ কবলাম। আমার ফাঁকি ফা-ব জাগ্রত দৃষ্টিতে ধরা পরে গেছে। দু'ভাষির কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধমক দিল এবং পুনর্বার সম্পূর্ণভাবে সব কথা বলার দাবী করল। আমি মৃদু হেসে বলা সুরু করলে আমাকে ক্রুদ্ধভাবে জানিয়ে দিল এসব অভিযোগ হাসির ব্যাপার নয়। অফিসার মহাশযও ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ফা-ব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন চাঁদার নামে বিরাট অঙ্কের ঘুষ খাওযার। উত্তরে ফা অতি সাহসের সঙ্গে অভিযোগ স্বীকার করে বক্তব্য রাখলেন —পাহাড অঞ্চলে কোন দোকান নেই। কর্মচারীরা এলে তাদের খাওযার ব্যবস্থা করতে হয। ডি, এম বা অন্য কেউ এলে চা খাওয়াতে হয়। তাকে দরবার করার জন্য আগরতলা ও বিলোনিযা মাঝে মাঝে যেতে হয়। সে গরীব মানুষ টাকা পাবে কোথায ? সবার কাজ সবাই স্বেচ্ছায় চাঁদা দেয। সভা করেই চাঁদা আদায করা হয় এবং চাঁদা দাতারাও মাঝে মাঝে এসে খায। সে হিসাব রাখে। চাঁদা আদাযের মধ্যে, অন্যায়টি কোথায ? আমার নিকট উপভোগ্য ছিল সবল অশিক্ষিত স্পষ্ট বক্তা ফা ব সাহসের বাচন ভঙ্গীটি। লোকান-ঝুকানোর কিছু নেই। অফিসারকে কতবার খাওযান হয়েছে তার সংখ্যা এবং ডি, এম, শচীনবাবুকে কতবার চা খাওয়ান ইত্যাদি সংখ্যা যে অনর্গল বলে যাচ্ছে। লেখাপড়া জানা আমরা এমন অবস্থায় হয়ত অনেক মোলায়েম করে ভাষার চাতুর্যে বিষযটি উপস্থিত করতাম। তসলাম ফা-ব সে বালাই নেই। তার এই চাঁছা ছোলা কথায় শেষ পর্যন্ত তসলাম ফা-ব জয় হল। বুদ্ধিমান ডি, এম সাহেব চাঁদা আদায বন্ধ করার উপদেশ দিয়ে তসলাম ফা-কে কিছু রাস্তাঘাট এবং পুনর্বাসনের জন্য বনজঙ্গল কাটার কন্ট্রাক্টরি পাইয়ে দেওযার ব্যবস্থা করলেন। শচীনবাবুই অফিসারকে বদলি করতে মত দিলেন না কৌশলে তসলাম ফার ইচ্ছা পূরণ হল। অন্য কারোর অভিযোগ অফিসারের বিরুদ্ধে যাই থাকুক মানির 'ম'কারের প্রতি তার আসক্তি ছিল না অর্থাৎ ঘুষ না খাওযার বিষযে তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

তসলামফার স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রখর। ঐ সব ঠিকাদারির টাকা আদায়ের জন্য তাকে আগরতলা আসতে হত। বিলের অর্থের পরিমাণ, আগম হিসেবে বা আংশিক বিল হিসাবে পাওযা হিসাব থাকত তার মনে। আগরতলা এসে ডি এম, অফিসে যাওযার পূর্বে কংগ্রেস ভবনে এসে সেই মনে রাখা সংখ্যাগুলিকে যোগ বিয়োগ করিয়ে মোট প্রাপ্য টাকার হিসাবটি তিনি অডিট বা পরীক্ষা করিয়ে নিতেন। কিন্তু নিজের বয়সের বেলায তার স্মৃতিশক্তি ছিল অপূর্ব । প্রথম সাক্ষাতের পর ফা-কে তার বযস জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন তিনি জানেন না। অনুমান করে বলতে বলায তিনি বললেন তিন কুডি চার কুডি হবে বোধ হয।

তসলাম ফা ঠাকুর বা কুমার সম্প্রদাযের অফিসার বা কর্মচারীদের কর্তৃত্ব বিশেষ পছন্দ করতেন না। কুমার হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বা হরিকর্ত্তা মহারাজের আদেশে ল্যাফটেনেন্ট হিসাব রিয়াং বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েছিলেন । পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে রিয়াংদের সাহায্য সংগঠন ও পুনর্বাসনে নানা প্রকারে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু ফা-ব মন তার প্রতি বিরূপ ছিল। হরিকর্ত্তার সৎ উপদেশও তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং অন্যের নিকট হতে উপদেশের বিষযবস্তুটির যাচাই করে নিতেন।

কেউ বলেন মানব জীবনে পুরুষকারই প্রধান। কারও বক্তব্য ভাগ্য বা দৈব সহায় না থাকলে শুধু পুরুষকারে কিছু হয না। ইংরাজী প্রবাদ বলে God helps him who help himself বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে ভগবানের অহেতুক কৃপা বা করুণা, কার উপর কখন বর্ষিত হবে তা ভগবান ছাড়া কেউ জানেন না। এ সব কথা আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। 'মাটির কাছাকাছি' পার্বত্য জুমিয়া (কৃষক শব্দটি বোধ হয় লেখা চলে না) তথাকথিত অশিক্ষিত একনিষ্ঠ সমাজসেবক ও কংগ্রেস কর্মী তসলাম ফা-ব জীবনে ভাগ্য ও পুরুষকার কিভাবে তার যাত্রা পথকে সুগম ও মহিমামন্ডিত করে দেয সে কথাও লিখে রাখার বিষয।

১৯৫৭ সন। নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গেছে। কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত হয়ে গেছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার ৫/৬ দিন বাকি। কাঞ্চনপুর আঞ্চলিক পরিষদের প্রার্থী লেখাপড়া জানা চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত। ঐ কেন্দ্রে তখন চাকমা সম্প্রদায়ের ভোটার বেশি, তার পর বিয়াং সম্প্রদায়। তারপর অন্যান্য সম্প্রদায়। কাঞ্চনপুর থেকে সংবাদ আসতে শুরু করে কংগ্রেস প্রার্থী তার নিজের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রের উচ্চ শিক্ষিত চাকমা সম্প্রদায়ের নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে আঁতাত করেছে। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উপরের অর্থাৎ সংসদের ভোট নির্দল প্রার্থীকে দেওয়ার জন্য প্রচার করবে অন্যদিকে নির্দল সংসদপ্রার্থী পরিষদের ভোটটি চাকমা কংগ্রেস প্রার্থীকে দেওয়ার আবেদন রাখবে। এই অশুভ আতাতে খাঁটি কংগ্রেস কর্মীগণ বিক্ষুব্ধ হয়। সংবাদ পেয়ে শচীনবাবু ও সুখময়বাবু কেন্দ্রটি ঘুরে এসে রায় দিলেন বিয়াং প্রার্থী না হলে এই কেন্দ্রে কোন প্রকার মোকাবিলা করা যাবে না। যদি বহু চাকমা সম্প্রদায়ের শিক্ষিত কংগ্রেস কর্মী এই মনোনীত প্রার্থীর কাজে বীতশ্রদ্ধ তথাপি তাদের মধ্য হতে প্রার্থী মনোনীত করা ঠিক হবে না। ঐ কেন্দ্রেও উপযুক্ত শিক্ষিত বিয়াং প্রার্থী নেই। কাজেই তসলাম ফা-কেই মনোনয়ন দিতে হবে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এ সিদ্ধান্ত রূপায়িত করার দায়িত্ব আমার। তসলম্ ফা-কে বগাফা থেকে আনাবার জন্য জিপ গাড়ী পাঠান হল প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে। হাতে সময় নেই। মনোনয়ন পরিবর্তন করার জন্য দীর্ঘ টেলিগ্রাম দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে পাঠান হল, ফোনেও যোগাযোগ করা হল। শ্রীমোহন লাল রায়কে প্রস্তুত রাখা হলো তসলম্ ফার সঙ্গে ধর্মনগর গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য।

এও এক ধরণের যুদ্ধ প্রস্তুতি। তসলম্ ফার জন্য আমরা কংগ্রেস ভবনে অপেক্ষমান। আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম তাকে কাঞ্চনপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে। তসলম্ ফা তার স্বভাসিদ্ধ সরল ভঙ্গিমায় বললেন তার পক্ষে এখন কাঞ্চনপুর গিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়ান সম্ভব হবে না। তিনি উপেনবাবুর পক্ষে দাঁড়িয়ে বগাফার ভোটের কাজ করছেন। কাজ শেষ না করে গেলে উপেনবাবুর ক্ষতি হবে ! ফার এই সহজ সরল আকাংখাহীন বক্তব্যে কংগ্রেস অফিসে অপেক্ষমান বন্ধুরা হেসে উঠল। আমি তাকে এই দাঁড়ান অর্থ কী এবং কী যে হতে যাচ্ছে, কি তাকে করতে হবে সব বুঝিয়ে বললাম এবং মোহনবাবু যে তাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করবেন তাও জানিয়ে দিলাম। সার্থবুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন বা অজ্ঞ ফা-র চিন্তা উপেনবাবুর কি হবে, তিনি যে তার উপর নির্ভর করে সব ভার তাকে দিয়েছিল। বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন নেই। তসলম্ ফা কাঞ্চনপুর নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা এবং তার ও দলের বন্ধুদের সহায়তাও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি জয়লাভ করলেন ।

তার কৌতুক প্রিয় রসিকতার শক্তিও বেশ সরস ছিল। বিজয়ী ফা জয়লাভের পর কংগেস ভবনে বসে বেশি জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের তার করণীয় কী বুঝে নিচ্ছে। তেমন আড্ডায় একদিন আমাকেও বসতে হল সকলের অনুরোধে। কয়েকজন বলতে শুরু করল ফা এবার তুমি মন্ত্রী হয়েছ, তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজন সেক্রেটারী দরকার, তুমি একজন সেক্রেটারী রাখ। তসলাম ফাও বেশ মজা করে হেসে উত্তর দিচ্ছে। সর্বশেষে বাধ্য হয়ে ফা বলল "যদি ভড়িৎ বলে তবে আমি অবশ্যই নেব"। ঘরে বসে কয়েকটি অবিবাহিত মেয়ে কর্মীও আনন্দ উপভোগ করছিল। সবাই আমাকে অনুরোধ করতে শুরু করল। দু একজন ইঙ্গিতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির নাম বলার জন্য অনুরোধ রাখল। আমিও রহস্য করার জন্য তখন বললাম ফা একজন সেক্রেটারী তুমি নাও। ফা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল তুমি যখন বলেছ তখন অবশ্য নেব, বল কাকে নিযুক্ত করি। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখে উত্তর দিল আমি কি জানি না তার মন কার সঙ্গে বাঁধা পরে আছে ? সমস্ত ঘরে তুমুল হাস্যরোল। ফা প্রকৃত পক্ষে 'তার মন কোথায় হামাইছে আমি জানে' বলেছিল হাসি ঠাট্টার এমন সরস উত্তর আমার স্মৃতিতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

তসলাম ফা ব টাকাব হিসাবেব স্মৃতিশক্তি ভাল থাকলেও R PC এব অর্থ তিনি মনে বাখতেন পাবেন নি। ফা বাঙলাব সহি কবতে পাবত কিন্তু লেখা ছিল অস্পষ্ট। সবাব অনুবোধ তিনি ইংবাজীতে সহি কবা শিখে নেন। এই সহিও আনুসংগিক বিযয নিয়ে তাব বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা কবা হয ১৯৬২ সনেব নির্বাচনে জযলাভেব পব। বহু বিযাবসেল দিয়ে তাকে শিখিয়ে দেওযা হলেও তিনি কোর্টে গিয়ে R PC এব অর্থ ঠিকভাবে বলতে পাবেন নি। মোকদ্দমাব বিষয়ে তাঁকে সামান্য মিছে কথা বলাব প্রযোজন হয়েছিল। এই সামান্য মিছে কথা বলতে তাব আপত্তি ছিল। তিনি কিছুতেই বাজী হননি। সকলে মিলে অনেক অনুবোধ কবে তাকে বাজী কবান হয়েছিল এবং তোঁতা পাখিব মত উকিল মহাশয কোন প্রশ্নেব পব এই সামান্য মিছে কথাটি বলতে হবে, তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কোর্টে গিয়ে ফা সেই সামান্য মিছে কথা বলতে পাবেনি। তাব স্বভাবতই তাকে এ কার্য্য হতে বিবত কবেছিল। উকিলবাবু তাব এই অসাফল্যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে সওযাল জবাবেব সময নূতনভাবে যুক্তি প্রদর্শন কবতে হয়েছিল। সত্যপ্রিয ফা-ব কোন ক্ষতি হয নি। তিনি নির্বাচন যুদ্ধে জযলাভ কবেছিলেন, তেমনি নির্বাচনী মামলাযও জযলাভ কবলেন।

দুইবাব মন্ত্রীত্ব লাভ কবাব পবও তিনি মন্ত্রী সুলভ মর্যাদাব জন্য লালাযিত ছিলেন না। তাব সীমিত জ্ঞানেব বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। কখনও দম্ভ কবে নিজেব ক্ষমতাব সীমানা অতিক্রম কবেন নি। ইংবাজী না জানা সত্বেও কোন ফাইলেব বিষযবস্তু ভাল কবে না বুঝে সহি কবেন নি। কখনও কোন ফাইলেব বিষয়ে তাব সন্দেহ উপস্থিত হলে তিনি সহকর্মী মন্ত্রীদেব পবামর্শ নিয়ে সহি দিতেন। তিনি তাব পি এ কে না চটাবাব জন্য তাঁকে কার্যান্তবে পাঠিয়ে সেই অবসবে তাব ব্যাখাব মূল্যাযন মাঝে মাঝেই কবে নিতেন সহকর্মীদেব কাছ থেকে। যাব জন্য যে কাজটি কবতে হবে তা অফিসাবদেব বলে কয়ে বেশ আদায কবে নিতেন। তাব ব্যবহাব ছিল অমাযিক আপন জনেব মত। সকলকেই তিনি তুমি বলে সম্বোধন কবতেন, প্রতিদানে তাবা তুমি বলেই সখ্যতা বা আত্মীযতা স্থাপন কবত। তসলম্ ফা তিনবাব নির্বাচন যুদ্ধে জয লাভ কবেন।

১৯৭২ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব জন্য পেনসন দেওযাব প্রথা চালু হলে তসলাম্ ফা সঙ্গীদেব নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময সেনগুপ্তেব নিকট আবেদন কবতে থাকেন বতনমনিব বিদ্রোহে ক্ষতিগ্রস্তদেব জন স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন দানেব জন্য এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদনও কবে। সুখমযবাবু সহানুভূতিব সঙ্গে বিযাং বিদ্রোহীদেব পেনসন দেওযাব জন্য ভাবত সবকাবেব নিকট আবেদন বেখে তাদিগকে পেনসন দেওযাব ব্যবস্থাব জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কবেন। কিন্তু ভাবত সবকাব বিযাং বিদ্রোহেব প্রকৃত ইতিহাস জানাব পব পেনসন দানে স্বীকৃত হয নি। ত্রিপুবা সবকাবকে তাদেব নিজস্ব আয হতে পেনসন দেওযাব উপদেশ দেন। কেন্দ্রীয সবকাবেব আর্থিক নিযন্ত্রণ তখন ত্রিপুবা সবকাবেব প্রতি অতি কঠোব। নূতনভাবে ট্যাক্স বৃদ্ধি কবে অর্থ সংগ্রহ কবতে না পাবলে বিযাং সংগ্রামীদেব পেনসন দেওযা সম্ভব নয। অর্থ সংকটেব জন্য এই পবিকল্পনা গ্রহণ কবা সম্ভব হযনি। ১৯৭৭/৭৮ সালেব ত্রিপুবা বিধানসভাব নির্বাচনেব সময তসলাম ফা বামফ্রন্টেব সদস্যদেব সঙ্গে সমঝোতায আসেন, বামফ্রন্ট জযী হলে বিযাং বিদ্রোহীদেব পেনসন দেওযা হবে বলে আশ্বাস দেওযা হয। তসলাম্ ফা বামফ্রন্টকে জযী কবাব জন্য সর্বপ্রকাব সাহায্য কবেন। নির্বাচনে জযলাভেব পব বামফ্রন্ট বিযাং বিদ্রোহীদেব জন্য পেনসন প্রথা চালু কবেন। তখনকাব বাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা কবে বামফ্রন্টকে সমর্থন কবাব সিদ্ধান্ত তসলাম ফাব (নিজেব সমাজেব অর্থনৈতিক লাভেব জন্য) সিদ্ধান্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচাযক। তসলাম ফা আব ইহজগতে নেই। বিযাং সম্প্রদাযেব জন্য তসলাম ফাব অবদান স্মবণীয হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরায় নাট্য আন্দোলন ঃ আদি যুগের রূপরেখা

অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য

"চারণ কবি গেয়ে যাচ্ছে —
বাজাও শঙ্খ উড়াও পতাকা
গভীর ঝঙ্কারে তোলহে তান
জিনিয়া সমরে আসিছেন শ্রীধর
ত্রিপুরা গৌরব, ত্রিপুর মান।
ত্রিপুরা দীপ্ত অসির ঝলকে
কেঁপে গেছে বিশ্ব আঁখির পলকে
কেঁপে গেছে সপ্ত সাগর নীর
সভয়ে স্তম্ভিত মগ-পাঠান।
যাহারা আহবে ত্যজিছে প্রাণ
তাদের তরে করো অশ্রু দান
তারাই প্রকৃত ত্রিপুর ক্ষত্রিয়
স্বাধীন দেশের বীর সন্তান।—

মঞ্চের উপর অশ্বপৃষ্ঠে এলেন রাজ-মহিষী—যুদ্ধে আহবান করলেন ত্রিপুরাবাসী যুবকদের— মগ পাঠানোর বিরুদ্ধে আত্মদান করতে। গর্বে বুক ভরে উঠছে শ্রোতার —দেশপ্রেমের অগ্নি উদ্দীপনী বাণী—এই ছিল সেদিনকার মঞ্চাভিনয়। অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন সেদিনকার পশু ডাক্তার শরৎ ঘোষ এবং অবিনাশ বানার্জি। আরও অনেক। শুধু অভিনয়হ নয়—নাটক রচনাও হতো। ত্রিপুর গৌরবও তেমনি একটি—।" কথা কয়টি অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিলিপি থেকে তুলে ধরলাম।

ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্থানীয় নাট্যকার রচনা করেছেন পঞ্চাঙ্কের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক 'ত্রিপুর গৌরব।' ত্রিপুরার প্রথম থিয়েটার পার্টি "উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ" তাদের বিরাট ও মনোহর মঞ্চে মহা-আড়ম্বরে রূপায়ণ করলেন 'ত্রিপুর গৌরব' নাটক। সাড়া পড়ে গেলো সারা ত্রিপুরার নাট্যামোদী রসিক-মহলে। দাবী উঠলো চারদিকে —নাটক চাই, আরও নাটক। এমনি উৎসাহ ও উদ্দীপনা জেগে উঠলো পুরাতন ত্রিপুরার নতুন রাজধানী নূতন হাবেলীতে। আগরতলার পুরনো নাম নতুন হাবেলী —পুরাতন ত্রিপুরার নবীন কলেবর।

নূতন হাবেলীর নবীন রাজা প্রতিভাবান বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেই রাজধানীতে শুরু করলেন সংস্কৃতি চর্চ্চার মহান উদ্যোগ আয়োজন। গড়ে উঠলো প্রাসাদকেন্দ্রিক এক বিচিত্র সঙ্গীত তীর্থ, সাহিত্য-তীর্থ। দূর দূরান্ত হতে ছুটে এলেন জ্ঞানী-গুণী বিদগ্ধজনেরা। এলেন গায়ক চূড়ামণি যদু ভট্ট, তানসেনের উত্তরপুরুষ বীণ-বিশারদ কাশিম আলী খাঁ, কাশ্মিরী নাট্যাচার্য্য কুলন্দর বক্স, সুরশিঙ্গা ও এস্রাজ যাদুকর হায়দার খাঁ। এলেন পাখোয়োজী পঞ্চানন মিত্র এবং আরও অনেক সঙ্গীত বিশারদ। কবি-কুঞ্জে যোগ দিলেন ভাবুক রাজকবি মদনমোহন মিত্র, বহরমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। কবি সাহিত্যিক সঙ্গীতবিশারদে ভরে উঠলো ত্রিপুরার নন্দন কানন। এই সংস্কৃতি যজ্ঞের প্রধান হোতা মহারাজ বীরচন্দ্র , কিন্তু এই সংস্কৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের রূপদাতা হলেন তাঁরই উত্তর পুরুষেরা। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাজ রাধাকিশোর পৃষ্ঠপোষকতা করলেন প্রধান সাহিত্য চর্চ্চার এবং তার উত্তরকালে তারই প্রতিভাবান পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর সাধনা করলেন সঙ্গীত চিত্রশিল্প অভিনয়-কলার। এভাবেই পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছিল পরিপূর্ণতার দিকে। এই সংস্কৃতি-প্রবাহ থেকেই জন্ম হল নাট্যমঞ্চের যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। ত্রিপুরার প্রথম নাট্য সংস্থা 'উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ' তারই ফলশ্রুতি।

বিংশ শতকের সূচনাকাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার থিয়েটারী রঙ্গমঞ্চে উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের একাধিপত্য ছিল। বস্তুতঃ এই নাট্য সমাজই ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাট্য সংস্থা এবং আঞ্চলিক নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তৎকালে বাংলার রাজধানীর বিচিত্র নাট্য আন্দোলনের ধারা ঢাকার মঞ্চপরিক্রমা করে ধীরগতিতে ত্রিপুরার অরণ্যে এসে প্রেরণা যুগিয়েছিল একথা সত্য। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট — এই তিনটি সমৃদ্ধ শহরে তখন সবেমাত্র প্রগতিশীল বাংলা নাট্য চর্চ্চার পর্ব্ব শুরু হয়েছে। এগুলি ত্রিপুরার নতুন রাজধানীর প্রতিবেশী শহর। বিশেষতঃ নিকট প্রতিবেশী কুমিল্লার সঙ্গে আগরতলার রাজকীয় তথা সাধারণ সাংস্কৃতির ভাব বিনিময়ের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নাট্য চর্চ্চার বিষয়ে কোনরূপ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। এ বিষয়ে ঢাকার সঙ্গেই কিছুটা সংযুক্তি ছিল ত্রিপুরার। এই সংযুক্তির মূলে ছিলেন মুখ্যতঃ ব্রজেন্দ্র মুখার্জি — উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের অন্যতম প্রধান পুরোহিত নাট্যকর্মাবিশারদ ব্রজেন্দ্র মুখার্জ্জি। কলকাতা আর ঢাকা— বাংলাদেশের এই দুই সারস্বত পীঠস্থানের ভাবাদর্শই প্রধানতঃ অনুসরণ করতো ত্রিপুরার নাট্য সমাজ, কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিলীন করে নয়। প্রতিযোগিতামূলকই হোক আর সৌজন্যমূলকই হোক— ত্রিপুরার নাট্য সমাজ তৎকালে বাইরের বিশিষ্ট নাটকের দলকে ত্রিপুরায় আহবান করতেন। আগরতলার মঞ্চে এসে অভিনয় করেছেন বিখ্যাত ষ্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার। ঢাকা থেকেও এসেছে বিশিষ্ট থিয়েটার পার্টি, অপেরা পার্টি। ষ্টার থিয়েটার ত্রিপুরার নিজস্ব নাট্যাভিনয় দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছেন। তারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন স্বীকার করেছেন - দেখবার আগে ভাবতেও পারেন নি অনুন্নত, অজ্ঞাত— ভারতের এক প্রত্যন্তে লুক্কায়িত ক্ষুদ্রতম দেশীয় রাজ্যের ততোধিক ক্ষুদ্র রাজধানীর শিল্পীরা এতো সুন্দর অভিনয় করতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন মহল থেকে সপ্রশংস শুভেচ্ছার বরমাল্য লাভ করে গৌরবান্বিত ও উৎসাহিত হয়েছে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের প্রথম হোতা উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ।

এই নাট্য সমাজের দীর্ঘ বিশ বৎসরের সারস্বত সাধনা ও অবদানের মূল্য ইতিহাসের বিচারে নগণ্য নয়। প্রতিভাবান রাজা, গুণবান, রাজ পরিজন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি পরায়ণ ও শিল্পী প্রজাসাধারণ সম্মিলিত হয়ে গঠন করেছিলেন এই নাট্য সমাজ। যদিও এটি ছিল সৌখীন নাট্য সংস্থা তবু একমাত্র অবসর বিনোদনের আড্ডারূপেই এটির উদ্ভব হয় নি , সত্যিকারের সারস্বত যজ্ঞের বীজমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে, কলাকৃষ্টির বিভূতি ছড়িয়ে দেবার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করবার লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ সমাজ গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তারা তাদের এই মহৎ প্রতিশ্রুতি সগৌরবে নানা আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সমাজের শিল্পী অভিনেতা নেতারা স্থানীয় নাট্যচর্চ্চার সীমিত প্রাঙ্গণে অভিনব সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাদের উত্তর সাধকের জয়যাত্রার পাথেয় স্বরূপ। এ সমাজের অবদানের ঋণ সেকালের উত্ত সাধকেরা অস্বীকার করতে পারেন নি। অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগের ক্রান্তিকাল অর্থাৎ যুদ্ধ পূর্ব্বকাল পর্যন্ত এ সমাজের প্রভাব ও আদর্শ পরবর্ত্তীদের নাট্য কর্মে প্রবাহিত ছিল প্রবলভাবে।

উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের অন্তিম অধ্যায়ে, এ সমাজের উদ্বুদ্ধ হয়ে একাধিক নাট্য সংস্থা জন্ম নিয়েছে ধীরগতিতে। বিশেষতঃ ত্রিপুরার তৎকালীন দ্বিতীয় বৃহত্তম নাট্য সংস্থা রণবীর কর্ত্তার থিয়েটার পার্টি উদ্ভব হয় এ সময়েই। বস্তুতঃপক্ষে সেদিনই হয়েছিল উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের জীবন সন্ধ্যা।

সমকালে ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরেও গড়ে উঠেছিল নাট্যমঞ্চ— উন্নত ধরণের থিয়েটারী মঞ্চ। ত্রিপুরার মহিলাদের নাট্যচর্চ্চার সূত্রপাত হয় এ মঞ্চ থেকেই। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। রাজবাড়ীর অন্দর মহল অতিশয় পর্দানশিন , কুলরীতির বিধি-নিষেধে অতিশয় সংরক্ষণশীল। পুরুষের প্রবেশাধিকার কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। তবু এ মহলে জমে উঠলো যুগবাঞ্ছিত সংস্কৃতি চর্চ্চার উত্তাল তরঙ্গ। মূলতঃ প্রেরণা এসেছিল বীরচন্দ্রের সঙ্গীত-তীর্থ থেকে, বিবিধ কৃষ্ণলীলার অনুপ্রেরণায়। উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের প্রত্যক্ষ প্রেরণাও কম ছিল না। এই সংস্থার প্রবর্ত্তক ছিলেন মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর আর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষণায় ছিলেন তদীয় গুণবতী সহধর্মিনী মহারাণী প্রভাবতী দেবী। এভাবেই গড়ে উঠে ত্রিপুরার মহিলা নাট্য সংস্থা। যদিও এটি সাধারণ রঙ্গালয়রূপে নয়, একান্তভাবে ঘরোয়া সংস্থারূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবু বাইরের বিশিষ্ট পরিবারের নাট্যমোদী মহিলাগণ নির্দ্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করতেন। রাজ পরিবারের এবং বাঙ্গালা সমাজের দু'একজন পুরুষ কর্মী এবং শিল্পী অংশগ্রহণ করতেন এই সংস্থায়। মঞ্চশিল্পীরূপে উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের অন্যতম দিকপাল ব্রজেন্দ্র মুখার্জি এই সংস্থার দৃশ্যপট অঙ্কন এবং মঞ্চরচনার মুখ্য দায়িত্ব নিতেন। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কুমার ব্রজবিহারী দেববর্ম্মণ ওরফে লেবু কর্ত্তা নিতেন সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব এবং বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্য শিল্পী কুমুদ সিংহ ঠাকুর শেখাতেন নৃত্য। আবহসঙ্গীত ও কনসার্টের কাজে রাজ পরিবারের কুমার বাহাদুরগণই মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতেন। বাইরের মহিলা কর্মীদের মধ্যে লেডী ডাক্তার মিসেস কাজী চিফ মিডওয়াইফ মিসেস মাইকেল এবং এলোকেশী আচার্য্য দায়িত্ব নিতেন রিহার্শ্বেলের এবং মেক-আপ ও ধারাভাষ্যের। এই সংস্থার অনুষ্ঠিত অভিনয়ে শহরের সংস্কৃতিপরায়ণ পরিবারের মহিলা দর্শকগণ নিমন্ত্রিত হতেন। পুরুষ দর্শকের প্রবেশাধিকার থাকতো সীমাবদ্ধ।

অন্দরের এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় 'বসন্ত উৎসব নৃত্যনাট্য। এই নাটকীয় রচনা করেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের স্বনামখ্যাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের আগ্রহে এবং প্রত্যক্ষ উদ্যোগেই এই নাটকীয় মহাসমারোহে রূপায়িত হয়। এতদুপলক্ষে, রাজবাড়ীর বিশেষ আমন্ত্রণে স্বর্ণকুমারী দেবীরও সংস্কৃতিপরায়ণা কন্যা সরলা দেবী আগরতলায় এসেছিলেন নাটক দেখতে। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। 'বসন্ত উৎসব' অভিনয়ে, রাজ-অন্তঃপুরের নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্নে সরলা দেবীকে

প্রধান অতিথিব আসনে ববণ কবে ত্রিপুব-বাজপবিবাব আতিথেযতাব পবাকাষ্ঠাব সমুচিত পবিচযই দিযেছিলেন।

'বসন্ত উৎসব এব সঙ্গীত পবিচালনা কবেন মহাবাজ বীবেন্দ্র কিশোব স্বযং এ নাটকেব পব দ্বিতীয সার্থক অভিনয হল 'দোললীলা' নাটক। এই নাটকটি বচনা কবেছিলেন বীবেন্দ্রকিশোব নিজেই। এই সংস্থায ধর্মমূলক গীতিনাট্য, নৃত্যনাটাই অভিনীত হত বেশি। কালেভদ্রে দু'একটি ঐতিহাসিক নাটকেব রূপাযণও হত।

এ সময়ে আগবতলাব খোশবাগ এলাকায আব একটি নাট্যসংস্থাব কর্ম্মতৎপবতাব কথা জানা যায। এটিব উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাজভ্রাতা মহাবাজকুমাব সুবেন্দ্র দেববর্ম্মণ ওবফে সুবেন কর্ত্তা। তাঁব বিবাট বাংলো বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাট্যমঞ্চ শহবেব সঙ্গীত বিলাসী ঠাকুব পবিবাবেব শিল্পীদেব এবং মণিপুবী শিল্পীদেব সমন্বযে এই দল গঠিত হযেছিল। এটি প্রথমে গড়ে উঠে নৃত্যনাট্যেব দল হিসাবেই। পবে সাধাবণ নাট্যচর্চ্চাব তাগিদে বাঙ্গালী অভিনেতা ও শিল্পীদেব নিযে দলটিকে আবও পুষ্ট কবে সাধাবণ নাট্যচর্চাব তাগিদে বাঙ্গালী অভিনেতা ও শিল্পীদেব নিযে দলটিকে আবও পুষ্ট কবে সাধাবণ নাট্যসংস্থায পবিণত কবা হয। সম্ভবতঃ এটিই ত্রিপুবাব তৃতীয নাট্যসংস্থা।

সুবেন্দ্র কর্ত্তাব এই নাটকেব দলটি বণবীব কর্ত্তাব বিখ্যাত থিযেটাব পার্টিব সমসাময়িক। মাঝে মাঝে এই দুই দলেব মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলতো অঘোষিত ভাবে। কিন্তু বণবীব কর্ত্তাব থিযেটাব পার্টিব সঙ্গে এ দল শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পাবে নি। এই দল মাত্র ৫/৬ বৎসব সগৌববে নাট্যচর্চ্চা কবে অবলুপ্ত হযে যায। প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চ্চা কবে অবলুপ্ত হযে যায। প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চ্চাকে ভগীবথেব মতো সাধাবণেব বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবাহিত এবং প্রসাবিত কববাব মুখ্যকৃতিত্ব যদিও বণবীব কর্ত্তাব থিযেটাব পার্টিব তবু এই আন্দোলনে সুবেন্দ্র কর্ত্তাব থিযেটাব পার্টিব অবদানও কম ছিল না। এ দলেব প্রভাবে অনুপ্রাণিত হযে সে সমযে আগবতলায আবও কযেকটি সৌখিন নাটকেব দলেব উদ্ভব হযেছিলো, যদি দু'চাব বছবেব বেশি কোন দলই টিঁকে থাকতে পাবে নি। এগুলিকে নাটকেব মৌসুমী দল বলা যায।

সুবেন্দ্র কর্ত্তাব দলেব অবলুপ্তিব পব বণবীব কর্ত্তাব দলই ত্রিপুবাব শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থারূপে স্বীয মহিমা বিস্তাব কবে। মহাবাজ বীবেন্দ্র কিশোব সে সমযে নাট্যচর্চ্চাব নন্দন কানন হতে সাময়িকভাবে বিদায নিযে শাসনকার্যে এবং বাজ্যেব উন্নযনমূলক গঠনকার্য্যে মনোযোগ দিযেছেন। উজ্জযন্ত নাট্যসমাজও তখনকালেব নির্দেশে প্রাসাদ প্রাঙ্গনেব চৌহদ্দী থেকে চলে এসে সাধাবণেব অঙ্গনে আশ্রয নিযেছে। কিন্তু ঠাঁই বদলেব ধাক্কায এ সমাজেব প্রাণপুরুষও যেন অকালবার্দ্ধক্যে উপনীত হযে তাব বিপুল ঐতিহ্যময কর্মতৎপবতা ও উদ্দীপনা এক নিমেষে হাবিযে ফেলে। এভাবে ধুঁকতে ধুঁকতেই কযেক বছব বণবীব কর্ত্তাব থিযেটাব পার্টিব সঙ্গে অঘোষিত প্রতিযোগিতা কবে শেষ পর্যন্ত কালেব গর্ভে বিলীন হযে যায। তখন ১৯২০ সাল। ত্রিপুবাব দ্বিতীয বৃহত্তম নাট্যসংস্থারূপে বণবীব কর্ত্তাব থিযেটাব পার্টিব স্বর্ণযুগেব সূচনা হয তখন থেকেই। বস্তুতঃপক্ষে ১৯২০ সালেই শেষ হয ত্রিপুবাব নাট্য আন্দোলনেব আদিযুগ। তাবপব শুরু হয মধ্যযুগ—১৯২১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। তাবপব দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব ৪/৫ বছব নাট্য আন্দোলনেব বিবতিকাল।

'রবি পত্রিকা' ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্ররচনা ও পাঠান্তর

রমাপ্রসাদ দত্ত

'রবি' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন এবং ত্রিপুরার একমাত্র 'রবি' পত্রিকা যাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার রচনা প্রকাশ করতে দিয়েছেন। 'রবি' পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসাবে ছয় বৎসর কাল প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'রবি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কবিগুরুর গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ব্যতীত অধিকাংশ সংখ্যায় 'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনায় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা থাকত। কেবল মাত্র এর ব্যতিক্রম দেখি 'রবি'র ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ভাবের ঝুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের দু'টি গান স্থান পেয়েছে।

'ভাবের ঝুলিতে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানও কবিতা পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইয়ে স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ যাঁবৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় 'ভাবের ঝুলি'র নামোল্লেখ কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে একমাত্র ত্রিপুরার 'রবি' পত্রিকায় 'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনার একটা মূল্য আছে।

'রবি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং তাঁর প্রকাশিত বইয়ের রচনার সঙ্গে পাঠান্তর রয়েছে। আবার কোন কোন কবিতা উভয়স্থানে হুবহু ভাবেই রয়ে গেছে। ছয় বৎসরের পরিধিতে 'রবি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনা ও অন্যত্র রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে যে পাঠান্তর সে বিষয় নিয়েই এ রচনা।

'রবি' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা প্রকাশিতহয়নি। রবির প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) ১৪৪ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গান প্রকাশিত হয়। গানের প্রথম লাইন হল 'ঐ মরণের সাগর পারে'। এ গানটি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বরবিতান দ্বিতীয় খণ্ডে এ গানের স্বরলিপি আছে। এ গানটি রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ' (১৯২৫ খৃঃ) বইয়ের অর্ন্তভুক্ত। রবির এ সংখ্যায় ১৫৮ পৃষ্ঠায় 'ভাবের ঝুলি' নামীয় সংকলনে রবীন্দ্রনাথের 'বেঠিক পথের পথিক' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। (এই কবিতাটি অ-কারন্ত সমস্ত শব্দকে হসন্ত রূপে গণ্য

করতে হবে) পরবর্তীকালে এ কবিতাটি রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্মশতবর্ষসংকলন এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪২ পৃষ্ঠায় 'পূরবী' কাব্যে মুদ্রিত হয়।

'রবি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ ১৯২৪ খৃঃ) ২৭৩ পৃষ্ঠায় 'ভাবের ঝুলিতে' আমরা রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর গান হিসাবে সাতটি গান প্রকাশিত হতে দেখি। এখানে উল্লেখ থাকে যে ঐ বৎসরের প্রবাসী পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায়ও এই সাতটি গান প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন রক্তকবরী নাটকটির বই হিসেবে প্রথম মুদ্রণ হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ সন)। কিন্তু এখানে দেখা যায় ১৩৩১ বাংলা সনের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় এবং ঐ সনের পৌষ মাসে রবি পত্রিকাতে রক্তকরবী নাটকের সাতটি গান প্রকাশিত হয়— এ কথা পূর্বে বলেছি। মূল বই মুদ্রিত হবার দেড় বৎসর পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশ হবার কারণ হিসাবে প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন—'নূতন নাটক যক্ষপুরী' পরে যার নাম দেন রক্তকরবী'। কবি নাটক লিখিলেন বলে কিন্তু ছাপাইবার জন্য আদৌ তরান্বিত নহেন। অনেক কাঁটা ছাটার পর প্রায় দেড় বৎসর পরে সেটি প্রকাশ করিলেন ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে।"

এবার আসি 'রবি' পত্রিকায় মুদ্রিত 'রক্তকরবী' নাটকের সাতটি গানের কথায়। প্রথম গানটি হল—' পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয়" যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সঃ) চতুর্থ খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে । পাঠান্তরে দেখা যায় ঃ

১। রবি পত্রিকা ঃ—
আলোয় খুসী উঠল জেগে'
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং)
আলোয় হাসি উঠল জেগে

দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। গানটি হল 'মোর স্বপন পুরীর কে তুই নেয়ে।'

পাঠান্তর—

১। রবি পত্রিকা ঃ—
'তোর সুদুর ঘাটে চলাবে বেয়ে'
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (জ শ সং)
"তোর সুদূর ঘাটে চলরে বেয়ে"

তৃতীয় গানটি- 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে' রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পাঠান্তর —

রবি পত্রিকা ঃ—

'তোব প্রাণের বসত শুকিয়ে গেল'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'তোব প্রাণের রসতো শুকিয়ে গেল।'

চতুর্থ গানটি— 'তোমায় গান শুনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ'। রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। গানটির তৃতীয় লাইনে পাঠান্তর দেখা যায় ঃ—

১। রবি পত্রিকা ঃ—
'বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাকো।'
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাক।'

পঞ্চম গানটি ' ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুঃখের পারাবারে'। রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। পাঠান্তর ঃ-- তৃতীয় লাইনে

১। রবি পত্রিকা ঃ—
'আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে''
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
''আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে''

রবি পত্রিকায়-উপরোক্ত পঞ্চম গানটি চার লাইনে সমাপ্ত। শেষ লাইন হলো ঃ- 'তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে।' কিন্তু রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) আরো চার লাইন অধিক আছে। সে চার লাইন নিম্নে দেয়া গেল।

'পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে
আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে
সেই পথ হারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।

রবি পত্রিকার ষষ্ঠ গানটি 'ভালোবাসি ভালোবাসি' পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এ গানটির মধ্যে পাঠান্তর নেই।

সপ্তম গানিট 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল' এগানটি পরে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পাঠান্তর সপ্তম লাইনে।

রবি পত্রিকা ঃ—

''রাতের সুখের আধার খানি খুলিবে ইঙ্গিতে।''
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'রাতের মুখের আধার খানি খুলবে ইঙ্গিতে।'

'রবি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (চৈত্র, ১৩১১ বাং) 'ভাবের ঝুলিতে' রবীন্দ্রনাথের 'সাধন কিসের আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে' গানটি প্রকাশ হয়েছিল। এ গানটি শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২০৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়। উপরোক্ত রবির সংখ্যায় 'ভাবের ঝুলির, দ্বিতীয় গানটি 'আনমনা গো আনমনা' ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৮ই মাঘ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এ গানটির 'শাপমোচন' (১৯৩১ খৃঃ) নৃত্য নাট্যের অর্ন্তভূক্ত এবং ৩নং স্বরবিতানে স্বরলিপি সহ মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংখ্যার গানগুলিতে কোন পাঠান্তর নেই। 'ভাবের ঝুলির' সঙ্গে রবীন্দ্র রচনাবলীতে।

'রবি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'ভাবের ঝুলির' অর্ন্তগত 'আকন্দ' কবিতায় পাঠান্তর দেখা যায় ঃ—

১। রবি পত্রিকা ঃ—
''শিখে নিলে অনন্তের ভাষা'
২। রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং)
''শিখে নিলে আনন্দের ভাষা'

রবি পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ''ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার' গানটিতে পাঠান্তর দেখা যায়।

১। রবি পত্রিকা ঃ- ২য় লাইনে
'রইলে আড়ালে'
২। রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং)
'আজি রইলে আড়ালে'
৩। 'রবি' পত্রিকা ঃ- ৯ম লাইনে
একি মনে রাখা একি ভালবাসা'
৪। রবীন্দ্র রচনাবলীতে একি ভালবাসা'
'একি মনে রাখা একি ভুলে যাওয়া'
৫। রবি পত্রিকা, ১০ম লাইন
'একি স্রোতে ভাসা' একি কূলে আসা?
৬। রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং)
'একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া'

রবি পত্রিকাব ঐ সংখ্যায় 'তারা' কবিতাটি যার প্রথম লাইন 'আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই' স্থান পায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আণ্ডেস জাহাজে নভেম্বর মাসে বসে লেখেন, রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পাঠান্তর হল—

রবি পত্রিকা ঃ—
'বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল বিমল ঘন রাতে'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'বিচ্ছেদেরি লাগলো বাদল মিলন ঘন রাতে'

'রবি' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'প্রভাতী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) দ্বিতীয় খণ্ডের ৭০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এ কবিতার পাঠান্তর হল ঃ-

রবি পত্রিকা ঃ-
'আছে অঞ্চলি পাতি'
রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ-
'আছে অঞ্জলি পাতি'

রবি পত্রিকা ঃ—

'দিকে দিকে আজি পাওনি কি সে বারতা'
রবি পত্রিকা ঃ-
'শিশির শিহরা পল্লব ঝলমল
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুল দল'
রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ-
'শিশির শিহরা পল্লব ঝলমল
বেণু শাখাগুলি খনে খনে টলমল
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল'

'রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথের গান-মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা' মুদ্রিত হয়, যাহা রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৬৫৯ পৃষ্ঠায় পরবর্তী কালেপ্রকাশিত হয়। এখানে কোনো পাঠান্তর নেই।

'রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন/১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলিতে' রবীন্দ্রনাথের মোট নয়টি গান আছে। যে গানগুলি ১৩৩৩ বাংলা সনের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে উঠেছিল। প্রথম গানটি 'শেষ বেলাকার শেষের গানে' পরবর্তী কালে গীতবিতানে ১৬৭ নং গান হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয় এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় গানটি হল 'পাতার ভেলা ভাসাই নীরে' পরবর্তী কালে রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হয়। পাঠান্তর ঃ-

'মেলা আমার চলার খেলা
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ সঃ সং)
'খেলা আমার চলার খেলা'

তৃতীয় গানট হল 'তপস্বিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেলা আসে।' এ গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

চতুর্থ গান হল 'বিরস দিন বিরল কাজ প্রবল বিদ্রোহে' রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) ৪র্থ খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পঞ্চম গান 'বিনা সাজে-সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে' রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় আছে। এ গানটির পাঠান্তর হল

রবি পত্রিকা ঃ—
'হারাব দোঁহারে দোঁহে'
রবীন্দ্র রচনাবলী
' দোহারে হারাব দোহে'

ষষ্ঠ গানটি হল-'আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে'-পরবর্তী সময়ে-রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৫০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। সপ্তম গান—'আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সে কি' এ গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায়, গীত বিতানের পূজা খণ্ডের ৩৪০ নম্বর গান হিসাবে প্রকাশিত । এতে পাঠান্তর দেখা যায়—

'রবি' পত্রিকা ঃ—

'আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সে কি?
অন্ধকাবে হঠাৎ তারে দেখি
পাগল হাওয়া ঝড়ে আগল খুলে পড়ে
কাব সে নয়ন পরে নয়ন যায় যে ঠেকি
যখন আসে পরম লগন তখন গগন মাঝে
তাহার বাঁশী বাজে।
তখন আমার গানে তাহারি সুর আনে
আমন্ত্রণের বাণী যার হৃদয়ে লেখি।
রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) আছে ঃ—
'আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা আপন সেকি ?
অন্ধকারে হঠাৎ তাবে দেখি
যবে দুর্দম ঝড়ে। আগল খুলে পড়ে
কার সে নয়ন পবে নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পবম লগন তখন গগন মাঝে
তাহার ভেরী বাজে,
বিদ্যুৎ উল্লাসে বেদনারই দূত আসে
আমন্ত্রণের বাণী যার হৃদয়ে লেখি।'

এরপব এ সংখ্যার অষ্টম গানটি হল ঃ— 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে'। রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডেব ২৯৫ পৃষ্ঠায় গীতবিতানে ' প্রেম' শীর্ষক খণ্ডে ২৭৮ নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানের পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়ালো মুখের প্রান্ত পারে।
গোধূলি আলোক একা এসেছিল ভুলে
পথ হারা ফুল অন্ধরাতের কুলে
অরুণ আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে
কী যে তাব রূপ দেখা হল না তো চোখে
জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে
আধারের যারা পথিক গোপনে চলে,
পরিচয় হীন সেই তাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিবহের ধারে ধারে
করুণ মাধুরী খানি কহিতে জানেনা বাণী
কে এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।'

রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং)

'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকাবে
গন্ধ ছড়ালো মুখের প্রান্ত পাবে
একা এসেছিল ভুলে অন্ধরাতের কুলে
আলোর বন্দনা করিবারে
কোন দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে।
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে
জানিনা কী নামে স্মরণ করিব ওকে
আঁধারে যাহারা চলে সেই তাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে
করুণ মাধুরী খানি কহিতে জানেনা বাণী
কে এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।'

'ভাবের ঝুলি'র এ সংখ্যার নবম গানটি হল 'এ পথে আমি যে গেছি বার বার।' রবীন্দ্র রচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় গীত বিতানের ' প্রেম' শীর্ষক খণ্ডেব ২৭৬ নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানে কোন পাঠান্তর নেই।

'রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যার 'ভাবের ঝুলি'র প্রথম গানটি 'সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী।' এ গানটি রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায়, গীত বিতানের 'প্রেম' শীর্ষক খণ্ডের ১৬৬নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানটিব পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা—
'কুন্দের ফুল সীমান্তে।'
রবীন্দ্ররচনাবলীঃ— (জঃ শঃ সং)
'কুন্দের দুল সীমন্তে।'

এ সংখ্যার দ্বিতীয় গানটি 'ভালো লাগার শেষ যে না পাই' পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র বচনাবলীব (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় গীত বিতানের 'পূজা' শীর্ষক খণ্ডের ৬০৪ নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়। পাঠান্তর রবি পত্রিকা ঃ—

'ভালো লাগার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ।'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহব হল শেষ।'
রবি পত্রিকা ঃ—
'অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল দেহ ভবে।'
রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।'

এ সংখ্যার তৃতীয় গানটি 'চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে রঙের খেলা খানি'— পরবর্তীকালে গীতবিতানের 'বিচিত্র' শীর্ষক খণ্ডের ১০৬ নং গান হিসাবে প্রকাশিত । এ গানের পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলা খানি
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহো, বাঁধিতে চাহো যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা তারে
সে তো কেবলি গান কেবলি বাণী
দিবস রাতি দেব সভার মাঝে
যে সুধা করে পান
পরশ তার মেলেনা যে,
নাহি যে পরিমান।'
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে
মাধুরী মাখা হাসিতে আঁখি কোণে
সে সুধারস পিয়ো আপন মনে
নিয়ো তাহারে জানি।'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের মেলাখানি
চেয়োনা চেয়োনা তারে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বরে
বাজিল যাহা প্রাণের বাণী তারে
সে তো কেবলই গান কেবলই বাণী
পরশ তার নাহিরে মেলে, নাহিরে পরিমাণ
দেবসভায় যে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে
মাধুরী মাখা হাসিতে আঁখি কোণে
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে
মুক্তরূপে নিয়ে তাহারে জানি।'

এরপর এ সংখ্যার চতুর্থ গানটি হল —'আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে', এ গানটির পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে'
রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং)
'গানে গানে তব বন্ধন যাক্ টুটে'

রবি পত্রিকা ঃ—

'জীবন তোমার সুধার ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে।'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সঃ)
'জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে',

এ সংখ্যার পঞ্চম গানটি হল—'আপনি আমার কোন খানে বেড়াই যে সে সন্ধানে।' এ গানটির পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'আপনি আমার কোন খানে বেড়াই যে সে সন্ধানে'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সঃ)
'আপনি আমার কোনখানে বেড়াই তারি সন্ধানে'
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সঃ)
'আপনি আমার কোনখানে বেড়াই তারি সন্ধানে'

পূর্বেই বলেছি 'রবি' পত্রিকা ছয় বৎসর কাল প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই 'রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় 'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথের লেখা উঠেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের 'রবি' পত্রিকা কোন সংখ্যাতেই 'ভাবের ঝুলি শীর্ষক রচনা নেই।

'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনা ব্যতীত ও রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা গান 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে গুলি দেয়া গেল।

রবি পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা সঙ্গীত সমাজে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সম্বর্দ্ধনা গীতি লিখেছেন তা প্রকাশিত হয়। এই গানটি রবীন্দ্ররচনাবলীর (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ৬০৬ পৃষ্ঠায় 'নাট্য গীতি' শীর্ষক খণ্ডের ৪২ সংখ্যক গান হিসাবে প্রকাশিত। এ গানটি সম্পর্কে দেখা যায় রবি পত্রিকা ও রবীন্দ্ররচনাবলীতে পংক্তি সন্নিবেশে পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন —

রবি পত্রিকা ঃ—

'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয় মালা
ত্রিপুরা পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপাচারে
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা
ক্ষীণ জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী
দীন জন দুখ হরণ নিপুণ তব পানি
গুণ অরুণ কিরণ তব সব ভুবন আলা।।
রবীন্দ্ররচনাবলী ঃ— (জঃ শঃ সং)
'রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা

ত্রিপুর পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা
ক্ষীণ জন ভয় তারণ অভয় তব বাণী
দীন জন দুখ হরণ নিপুণ তব পানি
তরুণ তব মুখ চন্দ্র করুণ বস ঢালা
গুণি রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলো

'রবি' পত্রিকাব উপরোক্ত সংখাতেই রবীন্দ্রনাথের গান, বসন্তের দূতী তুমি ফাল্গুনের কুসুম উৎসবে' যাহা পরবর্তী কালে রবীন্দ্ররচনাবলীব (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৯৫ সংখ্যক গান হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ গানে পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'বসন্তের দূতী তুমি, ফাল্গুনের কুসুম উৎসবে
আনন্দের সুধাপত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে?
মঞ্জুল নিকুঞ্জ তলে
সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
আকুল কুন্তল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।
চঞ্চল মঞ্জীর খাতে মুখর কল্লোল গুঞ্জরণ
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে দেবে অরণ্যের নিভৃত স্বপন।
নয়ন পল্লবে হাসি
হিল্লোলি উঠিবে ভাসি'
ধেয়ানে দেখিতে পাবে দিকে দিকে হৃদয় বল্লভে
রবীন্দ্র রচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে
মঞ্জুল নিকুঞ্জ তলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে
চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জন কল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয় হিন্দোল
নয়ন পল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি
মিলন মল্লিকা মাল্য পরাইবে পরাণ বল্লভে।

'রবি' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'পূজা' যার প্রথম লাইন 'নমি নমি চরণে' রবীন্দ্র রচনাবলীতে (জঃ শঃ সং) চতুর্থ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় গীতাবিতানের পূজা শীর্ষক খণ্ডে ৫০৩ নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানেও কোনো পাঠান্তর নেই।

'রবি' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'লগ্ন' নামে গানটি প্রকাশিত হয়। গানের প্রথম লাইন—'প্রতীক্ষা মোর আকাশ পানে তাকিয়ে আছে।' এ গানটি পরবর্তীকালে রবীন্দ্র

রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় গীতবিতানের অন্তর্গত 'বিচিত্র' শীর্ষক খণ্ডের ১৭ নং গান হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এ গানের পাঠান্তর হল ঃ—

রবি পত্রিকা ঃ—

'প্রতীক্ষা মোর আকাশ পানে তাকিয়ে আছে
লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার প্রসাদ জ্যোতিঃ শিখা,
দাও এঁকে দাও বিজয় টীকা এই যে যাচে।
দীপ্ত প্রাণের পরশ আশে, সীমন্তিনী
আলোক ঋণে কারা আমায় নিত্য ঋণী
তোমার ঊষায় আমার রাতে
সেই আলোর তা'র রাখী গাথে,
সেই আলোকের আভায় আমার চিত্ত নাচে।'
রবীন্দ্ররচনাবলী (জঃ শঃ সং)
'আমার অন্ধ প্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে,
যে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।।
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন ওগো শিখা
বিজয়টীকা দাওতো এঁকে এই যে যাচে।।
হায়-কাহার পথে বাহির হলে বিরহিনী।
তোমার আলোক ঋণে করো তুমি আমার ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে
এমন ভাগ্য হায় গো আমার হারায় পাছে।

পরিশেষে এ কথাটা বলা প্রয়োজন যে 'ভাবের ঝুলি' সম্পর্কে রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনায় কেহই আজ পর্য্যন্ত উল্লেক করেনি। এর কারণ হিসেবে আমাদের মনে হয় 'রবি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা আলাদাভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছায়—রবির সম্পাদকদ্বয় (নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত) 'ভাবের ঝুলির' নামকরণ করেছিলেন। এবং এও লক্ষ্য করা গেছে 'ভাবের ঝুলি'র অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখাই 'প্রবাসী' বা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উঠেছে। সুতরাং ত্রিপুরার পত্রিকায় 'ভাবের ঝুলির' মূল্য বর্হিত্রিপুরার লেখকদের কাছে হয়ত ততটা প্রকাশমান ছিল না। কিংবা 'রবি' পত্রিকার প্রচার বর্হিত্রিপুরায় ততটা ছিল না। এখানে আরো উল্লেখ থাকে যে, পূর্বে বলা হয়েছিল 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনা রবীন্দ্ররচনাবলীতে নাই, কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, অনেক রচনাই আমূল পরিবর্তিত বা কিছু কিছু পাঠান্তর হয়ে রবীন্দ্ররচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র— দত্ত, শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা-ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী সমিতি।

৩। রবীন্দ্র জীবনী—-প্রভাত কুমার মুখোঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।

৪। দেশীয় রাজ্য— কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মণ

৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—১৫ খণ্ড রবীন্দ্র জন্মশত বর্ষ সংস্করণ

৬। রবি পত্রিকা ১ম বৎসর/১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

৭। 'ভাস্কর'—২য় ৩য় সংখ্যা।

সামাজিক মূল্যায়নের নিরিখে নারী ও ত্রিপুরা

অপরাজিতা রায়

জীবনের আর এক অংশীদারের সঙ্গে একই সমভূমিতে দাঁড়াবার জায়গা মেয়েরা পায়নি বহুকাল ধরে। কোন্ সেই বিস্মৃত অধ্যায়ে সমাজের বিস্তৃত অংশ থেকে মাতৃতন্ত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল, মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল পিছলেন সারিতে। সারা বিশ্বজুড়েই এই বিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেল, হয়ত কোথাও দ্রুত লয়ে, কোথাও আবার কিছু স্তিমিত ধারায়। কোথাও হয়ত সে অসূর্যম্পস্যা হয়ে, মুক্ত আলো হাওয়ার জন্মগত অধিকার খুইয়েও রেহাই পায়নি, সমাজপ্রদত্ত অপমানের শিরোপা ''নরকের দ্বার'' মেনে নিতে হয়েছে মাথা নীচু করে। কোথাও আবার বোরখায় বস্তাবন্দী হয়ে সহ্য করতে হয়েছে দিন যাপনের দুঃসহ গ্লানি। কী ভাবে যে সেই আদিম যুগের মাতৃতন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পেয়ে গেল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে নারীকে পুরুষের অন্যতম ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করল, সে এক দীর্ঘ অবগুণ্ঠিত ইতিহাস।

বিশ্বের সামাজিক ভূগোল একটি পৃথুল রেখার বিভক্ত চিরকাল। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর পর্বে যখন মানুষের মধ্যে কোনও সচেতন ভাগাভাগি ছিল না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই পুরুষ ভেঙ্গে আনতো শক্ত গাছের ডাল, শিকার করে আনতো পশুমাংস, নারী গুহায় থাকতো সন্তান কোলে নিয়ে। সন্তানের প্রয়োজনে সন্তানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল আশ্রয় যোগাড় করার তাগিদ। এই তাগিদই তাকে গৃহমুখী কবেছে আবহমান কাল থেকে। নীড় বাঁধতে হয়েছে স্থায়ীভাবে সন্তান পালনের দায়িত্বে, মাতৃত্বের আনন্দে বাইরের জগতের সমস্যা সে ভুলে থেকেছে।

পরবর্তী সময়ে তার এই অন্তর্মুখী মনোভাব ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল শরীরের জন্যে অনেক বড় বঞ্চনা ও অসম্মান তাকে বহন করতে হয়েছে। বহির্বিমুখতাকে মানবিক অযোগ্যতা বলে প্রচার করা হয়েছে। দৈহিক শক্তির মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে সভ্য-সমাজের মনুষ্যত্ব। অমৃতস্য পুত্রার জন্মদাত্রী ও পালয়িত্রীকে মেনে নিতে হয়েছে মহৎ মানুষেব সাধন পথে অন্তরায় হওয়ার অপবাদ। পার্থিব লোভের উৎস বিষয় সম্পদ এবং কাঞ্চণের মতই নারী ত্যাজ্য বলে বিহিত হয়েছে একদা।

সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরায় মেয়েদের অবস্থা যে এর চেয়ে অন্যরকম কিছু ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। বরং বলা যায়, সেখানে সাধারণ মানুষের বিকাশের দরজা জানালাগুলো আরও শক্ত করে অর্গলবদ্ধ ছিল।

বিবর্ণ আলোকে সেই সমাজে মেয়েদেব দিকটায় অন্ধকাব আবও এক পোঁচ বেশি হওযারই কথা। বাজন্য শাসিত ত্রিপুবায় মানব সভ্যতাব যেটুকু অবদান পৌঁছুতো, তা সংগৃহীত হত বাজা এবং বাজানু গৃহীত একটি বিশেষ সম্প্রদাযেব দ্বাবা। বাজধানী আগবতলা কিংবা পুবাণ হাবেলী কিংবা তাবও আগেব বাঙামাটিব দিকেও যদি ফিবে তাকাই মানুষেব সঙ্গে মানুষেব বিবাট পার্থক্য চোখে পডবেই। কিন্তু এই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীব মধ্যেও নাবীব আসন পুরুষেব পাশাপাশি ছিল না। কোনও প্রতিবাদ ছিল না, মৃদুতম আপত্তি তোলাব কথাও কেউ ভাবত না। শুধুমাত্র "বাণী" এই আখ্যা লাভেব সুযোগটুকুই বহু নাবীকে তাব সমস্ত আত্মসম্মানবোধ মানসিক স্বস্তি শান্তি বিসর্জন দিতে প্ররোচিত কবত। ববীন্দ্রনাথকে যিনি প্রথম বাজকীয় সম্মানে ভূষিত কবেছিলেন হ'ব মাধ্যমে ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে ত্রিপুবাব প্রথম যোগাযোগ সংস্কৃতিব পুবোধা এবং প্রগতিশীল সেই মহাবাজ বীবচন্দ্রে কনিষ্ঠতমা পত্নী ছিলেন তাঁব পৌত্রীব বযসী। কিন্তু এটুকুই শেষ কথা নয, ভাবতেব তদানিন্তন অন্যান্য দেশীয় বাজ্যগুলিব মত ত্রিপুবাব বাজ অন্তঃপুবেও বক্ষিতাব অভাব ছিল না। বাজাদেব এইসব উপপত্নীদেব বলা হত "কাচ্চাবাণী"। "ঈশ্বরেব প্রতিনিধি বাজাব স্পর্শধন্য হওযা ছাড়া এদেব সামাজিক মর্যাদাব আব কোনও ভিত্তি ছিল না। দেহসর্বস্ব এই মহিলাদেব আইনগত অধিকাব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায নি সেদিন।

তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীব মহিলাদেবও লেখাপড়াব সার্বিক অধিকাব বা বেওযাজ ছিল না। ছেলেবা যেখানে বাজ্যেব বাইবে গিয়ে শাসক শ্রেণী পবিচালিত বিশেষ অভিজাত বিদ্যালযে পডাশুনাব সুযোগ পেত, বাজকুলেব মহিলাদেবও তা থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। পাঁচিল ঘেবা আবেষ্টনীব মধ্যে যতটুকু সম্ভব লেখাপড়াব সুযোগ অবশ্য কাবো কাবো হযেছে। এই স্বল্প পবিসবেই তাঁবা প্রমাণ কবে দিযেছেন —প্রতিভা, সৃজনশক্তি ও মননশীলতায তাঁবা কত গভীব সম্ভাবনাময ছিলেন। বীবচন্দ্রেব কন্যা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী তাব এক উজ্জ্বল উদাহবণ। অনঙ্গমোহিনী তিনটি কাব্যগ্রন্থ বচনা কবেন, কণিকা (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) শোক গাঁথা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) প্রীতি (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সমযেব হিসেবে ধবলে তিনটি গ্রন্থই বিশ শতকেব গোড়ায প্রকাশিত। তবু অনঙ্গমোহিনী উনিশ শতকেব কবিই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে। বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকে যে নতুন চেতনাব ছোঁযা লেগেছিল, অনঙ্গমোহিনীব মধ্যে তা উপস্থিত হবাব সুযোগ পায নি। তাঁব কবিতা ব্যক্তিগত আবেগ সুখদুঃখ এবং ধর্মীয চেতনাকে কেন্দ্র কবে। এব চেয়ে বেশি দূব এগিযে যাওযা তাঁব পক্ষে সম্ভব হযনি। যদিও তাঁব অনুভূতি সমগ্রভাবে ত্রিপুবাব মাটি জল হাওযা, ত্রিপুবাব জনজীবনকে ছুঁতে পাবেনি তবু একটি মহৎ সম্ভাবনাব ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। ত্রিপুবাব নিস্তবঙ্গ নাবী জীবনে এটাব মূল্য যথেষ্ট।

পাশেব বাজ্যে তখন অন্ততঃ উঁচুতলাব নাবীজীবনে কিছু আলোক সম্পাত ঘটেছে। স্বর্ণকুমাবী দেবী তখন প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক, "ভাবতী" পত্রিকা সম্পাদনা কবে চলেছেন যোগ্যতাব সঙ্গে।

প্রিযংবদা দেবী এবং কামিনী বায কবি প্রসিদ্ধি লাভ কবা ছাডাও শিক্ষাব্রতী ও সমাজকর্মীরূপে সমাজেব কেন্দ্র এসে দাঁডিযেছেন সবলাদেবী চৌধুবাণী আবও এগিযেছেন পাঞ্জাবেব "হিন্দুস্থান" পত্রিকাব সম্পাদনা কবছেন, প্রতিষ্ঠা কবেছেন "ভাবতী স্ত্রী মহামণ্ডল" উত্তব ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চল ঘুবে জাতীয জাগবণেব প্রেবণা দিচ্ছেন সবোজিনী নাইডু ইযোবোপ গেছেন ইংবাজীতে কবিতা লিখছেন। কুমাবী তরু দত্ত এব অনেক আগেই ইযোবোপ গেছেন ফবাসী ভাষায কবিতা লিখেছেন। এক কথায বলা চলে মুক্তিব একটু হওযা বইবাব সঙ্গে সঙ্গে মেযেবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতাব প্রমাণ দিযেছে।

ত্রিপুবাব নাবী সমাজ তখন এসব থেকে দূবে। যাদেব বাস একটু ওপবেব দিকে তাবা খিলানঘেবা অট্টালিকায চিকেব আডালে বসে ববীন্দ্রনাথেব কবিতা শুনেছে। এব বাইবে সংখ্যায যাবা বেশী বাঁশেব বেড়ায তৈবী ঘবে বসে তাবা শিক্ষা সাহিত্য চেতনা এসবেব স্বপ্ন দেখাব কথা ভাবতেও পাবেনি।

বিশাল ভারতের এক প্রান্তে পড়ে থাকা ছায়াঘেরা এই রাজ্যের স্বল্পালোক জানলার পাশে বসে অনঙ্গমোহিনী কিন্তু স্বকীয়তার পরিচয়ও রেখে গেছেন। তাঁর "প্রীতি" কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় দেখি

"ক্ষিপ্ত পিয়াস জীবনে যাহার
বধে সে বিরহে আপনার,
অধীর বিলাপ, বাসনা দীপনে
জেগে ওঠে ঘোর যাতনায় ।"

অন্যত্র—
"কণ্ঠে তোমার কিসের পিপাসা
অজানা দূরের প্রবাসী
বক্ষে তোমার বহ গো কি আশা
কি ধন চয়নে প্রয়াসী"

এসব কবিতায় অনঙ্গমোহিনীর ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত। রবীন্দ্র প্রভাব সত্ত্বেও এইসব পংক্তিতে অনঙ্গমোহিনী নিজে প্রবলভাবে উপস্থিত। ত্রিপুরার ক্ষীণস্বর নারীদের পক্ষে নিজের আশা ও ইচ্ছার তীব্র প্রকাশ, দূরের দিকবলয়ে দৃষ্টিক্ষেপ এটা লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত। একথা তিনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ত্রিপুরার বন্দী নারী জীবনেও স্মরণীয় সৃষ্টি ঘটতে পারত। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার নারী সমাজের শিল্পীসত্তার আর এক উজ্জ্বল উদাহরণ রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী। যে সৃষ্টি ও পরিকল্পনার মূলে এই মহিলার সৃজনধর্মী প্রতিভার দান অনেকখানি।

ত্রিপুরার আদিবাসী মহিলাদের শিল্পীচেতনার স্বাক্ষর রয়েছে তাদের বয়ন শিল্পে। এই বয়ন শিল্প একান্তভাবে মেয়েদেরই শিল্প। হাতে তৈরী তাঁত বোনার এই কুটীব শিল্প পুরুষ দখল কবতে পারে নি আজও। বোনার মধ্যে ত্রিপুরার মেয়েরা বচনা করে বিভিন্ন নক্সা, নানা ধরণেব ডিজাইন। এসব ডিজাইন তাবা সংগ্রহ করে তাদের আশেপাশের প্রকৃতি থেকে। মাছির ডানা, ফুলের পাপড়ি প্রজাপতিব পাখা, মাছের আঁশ এসব থেকে নক্সা নিয়ে নিজের মৌলিকতা মিলিয়ে তারা রচনা করে অপরূপ শিল্প যাদু। রিয়া নামক বক্ষবন্ধনীতে এই নক্সার বৈচিত্র্য বেশী দেখা যায়। কাপড় রং করার জন্যে তারা ব্যবহার করে নিজস্ব পদ্ধতি ও উপকরণ। পাতার রস, গাছের ছাল ইত্যাদি দিয়ে উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং করার কারিগরী তাদের আয়ত্বে। এত নিপুণতা নিয়েও কিন্তু ত্রিপুরার সাধারণ নারী সমাজ মূল্য পায় নি খুব বেশি। পুরুষের পাশাপাশি স্থান তারা দখল কবতে পাবে নি। সামাজিক পটভূমিতে সীমাবদ্ধ আঙ্গিনাতেই তাদেব থাকতে হয়েছে। সন্তান ধারণ, পালন পুরুষের আনন্দ বর্দ্ধন ও পুরুষ নির্দেশিত কতগুলি বিশেষ কার্যসূচী অনুসরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা তাদের সামনে খোলা ছিল না।

গ্রামের সভা বা জমায়েতগুলোতে মেয়েরা যোগ দিতে পারে অবশ্য, তবে তা কেবল শ্রোতা হিসেবে। সক্রিয় অংশীদার হিসাবে নয়। কোনও প্রস্তাব তারা আনতে পারে না, কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদ জানাতে পারে না কোন মন্তব্য করারও তাদের অধিকার নেই। তাদের মন্তব্য বা মতামতের কোনও মূল্যই এইসব জমায়েত দেওয়া হয় নি।

গ্রামের পূজা বা অন্য উৎসবে, কোনও ভোজের অনুষ্ঠানে পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়েদের রাখা হয় না। তারা নিমন্ত্রিতদের এবং উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে রান্নাবান্না করে, তারাই মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রাখে।

সর্বত্রই তাদের শ্রমিকের ভূমিকা, যে শ্রমের ফল ভোগ করে পুরুষ। কখনও অবশ্য দেখা যায়, কোনও বৃদ্ধা মহিলা বৃদ্ধ পুরুষদের সঙ্গে এসব অনুষ্ঠানে একত্র খাওয়া-দাওয়া ও গল্প করে অনেক তসময় কাটিয়ে দিচ্ছে সে শুধু কিছু উপভোগ্য কথাবার্তা বলার বিনিময়ে কিছুক্ষণ একত্র বসার অধিকার মাত্র আর কিছু নয়। মতামত দেবার অধিকার তাদেরও থাকে না।

ত্রিপুরী পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে পৌরহিত্য করে, তাকে বলা হয় "ওচাই"। বলা বাহুল্য যে একমাত্র পুরুষেরাই এ পদ অলঙ্কৃত করতে পারে। কোনও নারীর পক্ষে এ কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোও আগাগোড়া সব পুরুষরাই সম্পন্ন করে। কোন ও নারীর পক্ষে এ কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোও আগাগোড়া সব পুরুষেরাই সম্পন্ন করে কেবল দু একটা ক্ষেত্রে যেন "বান্ধাক মাতাই" বা "চাকলাক মাতাই ছাড়া অন্য কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতেও মেয়েরা পারে না। ত্রিপুরীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব যথেষ্ট। কালী, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ মহাদেব এসব দেবতা তারা পূজা করে তবে পূজা পদ্ধতি তাদের নিজস্ব। কিন্তু তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত যেসব দেবতা যেমন গড়িয়া, লামপ্রা ওয়াথাপ এরা সকলেই কিন্তু পুরুষ। নারীদেবতা এদের নেই বললেই চলে। একজন আধজন যা আছেন মধ্যে নাকসু মাতাই এর নাম করা যেতে পারে।

বর্তমানে শহরে অবশ্য হিন্দু প্রভাবে আদিবাসী সমাজে লক্ষ্মী পূজার প্রচলন বেড়েছে এবং সে পূজাটা মেয়েরাই করে। কিন্তু সেখানেও লক্ষণীয় যে, শারদীয়া পূর্ণিমার প্রধান যে লক্ষ্মীপূজা , সেটা পুরুষ পুরোহিত দিয়েই করানো হয়, মেয়েরা সেখানে অপাংক্তেয় ।

আদিবাসী সমাজে পরিবারের কর্তা পুরুষই হয়। সে যদি অথর্ব বৃদ্ধা কিম্বা শয্যাশায়ী ও হয়ে থাকে, তবু কোনও মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়, তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। পরিবারের পুরুষ অভিভাবকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মেয়েদের পক্ষে রীতি নয়। তারা নতমস্তকে পুরুষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই অভ্যস্ত। এমনকি যদি তাদের প্রতি কোনও রুঢ় আচরণও করা হয় অযথা তিরস্কার ইত্যাদি সেটাও তারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। আদিবাসী গ্রাম পাহাড়ের সমাজে স্বামী যদি কখনও স্ত্রীকে মারধোরও করে সেটাও আপত্তিকর বলে ধরা হয় না আবহমানকাল চলে আসা একটা প্রথা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। এসবই হল আদিবাসী সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের স্পষ্ট উদাহরণ। (এ সম্পর্কে Directorate of Research, Departement of Welfare for Scheduled Tibes and Scheduled Castes কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীদেবপ্রিয় দেববর্মণের লিখিত গ্রন্থ "Treatise on Traditional Social Institutions of the Tripuri Communities" দ্রষ্টব্য।) তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যাতে মেয়েদের একটা ক্ষেত্রে অন্তত মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বেশি দেখানো হত। যদিও তা জীবদ্দশায় নয় মৃত্যুর পর। অন্তিম সংস্কারের সময় মেয়েদের চিতায় কয়েক সত্র কাঠ বেশি দেওয়া হত পুরুষের থেকে। তাদের সারা জীবনে শ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতার স্বীকৃতি রূপে। অবশ্য এই জ্বলন্ত তাজমহলের ধোঁয়ার সারা জীবনের অসাম্য অবশ্যই মুছে যেত না। এখন এ প্রথা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ ও নারীর শবদেহ এখন প্রায় সর্বত্রই প্রয়োজনানুযায়ী কাঠেই সৎকার করা হয়। মেয়েদের জন্যে বিশেষ আয়োজন করা হয় না। তবে উপরিউক্ত প্রাচীন প্রথাটির উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, তার মধ্যে Mr R H S Hutchinson- এর রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে মহিলাদের অংশ খুবই কম। রাজমালার পাতার পর পাতা ওল্টালে রাণী রাজকুমারীদের রাজনৈতিক ভূমিকা খুব কমই চোখে পড়ে। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা ছায়াবৃতা। একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় মহারাণী জাহ্নবী দেবীর স্বামী কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর পর যিনি কয়েক বছর রাজ

পরিচালনায় ছিলেন। রাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর যুদ্ধ যাত্রার কাহিনীও উপকথায় পল্লবিত, তবে ঐতিহাসিক ভিত্তি বিতর্কহীন নয়। অবশ্য দেখা গেছে ত্রিপুরার মুদ্রায় রাজাদেব সঙ্গে রাণীদেব নামও ক্ষোদিত থাকত। এটা অবশ্য একটা দুর্লভ উদাহরণ। কারণ প্রাচীন ভারতের অন্যত্র রাজার সঙ্গে রাণীর নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করবায় রীতি প্রচলিত ছিল না। জাহাঙ্গীর ব্যতিক্রম করেছিলেন নূরজাহান সম্পর্কে। তবে ত্রিপুরার রাণীরা শুধু এই নামাঙ্কন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। রাজনীতিতে তাঁদের অবদান ইতিহাসে বিধৃত নেই। অন্যদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধী যে সব গণসংগঠন মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানে ও মেয়েরা প্রধান ভূমিকা নেয়নি।

সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে মেয়েদের অবস্থা হয়ত অন্যত্রও এরকমই অল্প বিস্তর। ত্রিপুরা যখন ভারত ইউনিয়নে যোগ দিল, তারপর থেকে মেয়েদের যতটা উন্নতি আশা করা গিয়েছিল, ততটা যে হয়নি, এটা বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। এ রাজ্যের দশটি মহকুমা মিলিয়ে যখন অন্ততঃ ছেলেদের দশটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ছিল, মেয়েদের জন্যে তখন সারা রাজ্যে একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। আজ সেখানে উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ত্রিপুরাতে দুশো হয়েছে প্রায়, সেখানে মেয়েদের উচ্চ এবং উচ্চতর বিদ্যালয় কুড়িটি মাত্র।

অবশ্য কিছু কিছু স্কুলে মেয়েদের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে মেয়েদের দ্রুত শিক্ষার বিস্তৃতির জন্যে আলাদা মেয়েদের স্কুলের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। এটা প্রমাণ হয়ে যায়, সহশিক্ষার স্কুলগুলিতেও ছাত্রী সংখ্যা আর মেয়েদের আলাদা স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যার তুলনা দেখে। অভিভাবকদের স্বাভাবিক ঝোঁকা এখনও মেয়েদের জন্যে আলাদা পাঁচিল অথবা উঁচুবেড়া ঘেরা স্কুলের দিকেই। অবশ্য ত্রিপুরার সেই রাজকীয় শাসন থেকেই মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ছিল। পরবর্তীকালে কলেজ স্তরেও মেয়েদের জন্যে পৃথক একটি "গার্ল স্টাইপেণ্ড" - এর প্রবর্তন মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে কিছুটা। বর্তমান সরকার অবশ্য ছেলেদের শিক্ষাও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করেছেন। কিন্তু এতসব করে ও দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার নারী শিক্ষা পুরুষের চেয়ে অনেকখানি পিছিয়ে। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার শিক্ষিতের হার ছেলেদের যেখানে ৫১.৭০% মেয়েদের সেখানে ৩৯.৯৯%গড় হার ৪২.১২%। দশ বছর আগে পরিসংখ্যান থেকে আমরা পাই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার তখন ছিল ২৯.২০% আর ছেলেদের ৪০.২০% গড় হত ৩০.৯৮% । দশ বছরে তাহলে মেয়েদের শিক্ষা বেশ কিছুটা এগিয়েছে এখানে। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে ফারাকটা তো কমছে না। কেন্দ্রীয় নীতি অনুযায়ী তপশিলী জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে অন্য গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। এমনকি তপশিলী জাতি-উপজাতি ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ একটি কর্মসূচী রয়েছে, তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের স্কুলের পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু সেখানে সামগ্রিকভাবে মেয়েরা গোষ্ঠী সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনগ্রসর, সেখানে মেয়েদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকগুলো দূর করার কথা ভাবা দরকার। আজকের আদিবাসী মেয়েদের পাশাপাশি বাঙালী মেয়েদের সমস্যাও রয়েছে সামাজিক অবিচার যারা কিছু কম ভোগ করেনি।

বিগত নারীবর্ষে (১৯৭৫) Committee on the Status of Women in India যে বিস্তৃত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপিত করেছিলেন তা থেকে মেয়েদের শিক্ষার একটা করুণ চিত্র পাওয়া যায় সর্বভারতীয় পটভূমিতে। ছেলেদের শিক্ষার হার যেখানে ৩৯.৪%, মেয়েদের সেখানে মাত্র ১৮.৭% গড় হার ২৯.৫% মেয়েদের সবচেয়ে উচ্চ হার দেখা গেছে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে ৩৭.৪% সেখানে ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চহার ৬৩% দেখা গেছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যে। এতে বোঝা যায়, মেয়েদের মধ্যে পড়ার ঝোঁক বা সুযোগ সুবিধা অল্প বয়সেই সীমাবদ্ধ। স্ত্রীশিক্ষার হার দেখতে

গিয়ে যে বিশেষ দিকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের শিক্ষার হার। ভারতে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার হার মাত্র ১৩ ২% অথচ সেখানে শহরাঞ্চলে সে হার হচ্ছে ৪২ ৩% অর্থাৎ গ্রাম এবং শহরে তিন গুণেরও বেশি পার্থক্য। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে কেরালায় গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রী শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি, আর রাজস্থানে সবচেয়ে কম বিহার, মধ্যপ্রদেশের এবং উত্তর প্রদেশের অবস্থাও এদিক করুণ। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ৩৫২টি জেলার মধ্যে ৮৩টিতে স্ত্রী শিক্ষার হার ৫% এরও কম। আরও ১১৩টি জেলার ৫% থেকে ১০% এর মধ্যে। উল্লেখিত ১৩টি জেলার মধ্যে ৬৪টি হল উত্তর প্রদেশের রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে। ১০% পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষার হার যে ১১৩টি জেলায় তার মধ্যে ৭৩টি অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ বিহার মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র রাজ্যে।

এই যে স্ত্রী শিক্ষার হার গণনা করা হয়, এর মধ্যেও কিন্তু একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে। কারণ এর মধ্যে শতকরা চল্লিশ জনের শিক্ষার কোনও মান নেই। এরা প্রকৃত পক্ষে অর্দ্ধ স্বাক্ষর, শতকরা আটজন ম্যাট্রিকুলেট আর ১ ৪% হল গ্র্যাজুয়েট। কাজেই দেখা গেল ভারতীয় নারীদের এক বিরাট অংশই নিরক্ষর অথবা অর্দ্ধসাক্ষর। যে সামান্য অংশের মহিলারা উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ পদে আসীন তাদের দিয়ে ভারতীয় নারীর প্রকৃত অবস্থা যাচাই হয় না। শিক্ষার অভাবেই অন্ধ সংস্কার এবং প্রথাগত অবিচার মেয়েদের ওপর পাষাণভার চাপিয়ে রাখে। তাকে সরাতে গেলে শিক্ষাই সবচেয়ে বেশি দরকার। সামাজিক ন্যায় বিচার মেয়েদের নিজের প্রচেষ্টাতেই আদায় করতে হবে চেতনা ব্যক্তিত্ব যোগ্যতা ও বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু তার ভিত্তি স্বরূপ তো সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা।

আদিবাসী, বাঙালী সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীদের অবস্থা সর্বভারতীয় নারীচিত্রের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। স্ত্রী শিক্ষার হার হয়ত ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে উঁচুতে এখানে তবু যদি এর বিস্তৃত সমীক্ষায় আমরা প্রবেশ করি, তাহলে সর্বভারতীয় অবস্থার অনেক ছায়া এখানেও দেখতে পাব। ত্রিপুরার মহিলারা আজ সমাজের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। যেখানেই তারা সুযোগ পেয়েছে, প্রমাণ করেছে পুরুষের চেয়ে তারা কোনও অংশে কম নয়। মহিলা ইঞ্জিনীয়ার, বিচারক, আইনজীবী, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশাসক, সমাজকর্মী সবদিকেই তারা আপন যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। তবু বলতে হয় সেটুকু দিয়ে ত্রিপুরার নারী সমাজের বিচার হয় না। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনামূলক বিচার করলেই দেখা যাবে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ অধিকার করা সত্ত্বেও মেয়েরা কত পিছনে।

[২৯-২-৮৪তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী]

	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
প্রাথমিক স্তর	১,৯৬,৬৫৭	১৫,২,৬১৭
মধ্য স্তর (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)	৫১,৯৩৪	৩৫,২২১
মাধ্যমিক স্তর (নবম দশম শ্রেণী)	২২,০০৭	১৪,৮৩২
উচ্চতর মাধ্যমিক (+ ২ স্তর)	৮৪১৭	৩৯২৫

ত্রিপুরার অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

[১৯৮১ ৮২ সালেব তথ্য অনুযাযী]

সাধাবণ ডিগ্রী কলেজ	৪০৪৫	২০৫৫
ইঞ্জিনীযাবিং কলেজ	৩৯০	১৩
কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশান	২২	
কলেজ অব এডুকেশন		
ফার্মাসিস্ট কোর্স	৯৩	১৬
(৮২ ৮৩ সাল)		
(৮৩-৮৪ সাল)	৬১	২
স্নাতকোত্ত ব্রীজ কোর্স (৮৩-৮৪)	২২	২

বিদ্যালয স্তব, উচ্চশিক্ষাব স্তব সর্বস্তবেই মেযেবা এখনও কত অনগ্রসব ছেলেদেব তুলনায ওপবেব তথ্যগুলো তাবই ছবি তুলে ধবেছে।

প্রাথমিক স্তবে সার্বজনীন শিক্ষা প্রসাবেব নীতি গ্রহণেব পব ত্রিপুবাব স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তিব যে প্রযাস চালানোব বিভিন্ন কর্মসূচী নেওযা হয, সবকাবী সহাযতা ও উৎসাহ দানেব ব্যবস্থা কবা হয তাতে ছাত্রদেব সঙ্গে ছাত্রীবও প্রাথমিক স্কুলে প্রথম অবস্থায আসতে থাকে। কিন্তু যদি আমবা প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদেব অবস্থিতি ও উন্নযনেব সমীক্ষায নামি তাহলে দেখব এখ নিবাশাব্যঞ্জক ছবি। প্রথম শ্রেণীতে যেসব ছেলে-মেযে ভর্তি হয তাদেব অধিকাংশই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায না। পঞ্চম শ্রেণতে পৌঁছবাব পব পড়া ছেড়ে দেওযা ছেলেমেযেব হাব দেখা গেছে প্রায শতকবা ৬৫, এটাকে যদি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ কবা হয, মেযেদেব সংখ্যাটাই বেশি দাঁড়াবে। পড়া ছেড়ে দেওযাব কাবণ খুঁজতে গিযে সাধাবণভাবে দেখা গেছে, দাবিদ্র্যই সবচেযে বড কাবণ। অধিকাংশ ছোটো ছেলে মেযে অর্থোপার্জনে নেমে পবিবাবকে সাহায্য কবতে বাধ্য হয। আনাজ তবকাবী বেচে লাকড়ী সংগ্রহ কবে বিক্রি কবে শিশু শ্রমিকেব কাজ কবে তাবা অন্ন সংস্থান কবে। মেযেদেব বেলায এব ওপব আবও বযেছে মাকে সাংসাবিক কাজে সাহায্য ছোটো ভাই-বোন মানুষ কবা এবং বাল্য বিবাহ। বিযে দিতে পাবলে মা-বাপেব ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তাব বোঝা কমে, কাজেই যত তাডাতাডি পাবা যায ছোটো ছোটো মেযেদেব পডাশুনোব পাট চুকিযে বিযে দিযে দেওযাটা তাবা বাঞ্ছনীয মনে কবে। অবৈতনিক শিক্ষা, সবকাবী সাহায্য সব সেখানে ব্যর্থ হযে যায। অথচ দেশ জানে, বিজ্ঞান জানে, সমাজ সভ্যতা সকলেই জানে মেযেদেব শিক্ষাব ব্যক্তিত্বকে অন্ধ সংস্কাব থেকে মুক্ত কবে মৌলিক ভাবধাবায বলিষ্ঠ কবতে জননী এবং ধাত্রীব শিক্ষিত হওযাব প্রযোজন পিতাব চেযে অনেক বেশি।

তবু সমাজে আশানুরূপ সাডা আজ ও নেই। স্কুল কলেজেব সংখ্যা বাডানোব পবও অনেক সমস্যা থেকে যায। আজও সমাজে সাধাবণভাবে অভিভাবকদেব কাছে মেযেদেব চেযে ছেলেদেব শিক্ষা দেওযাব প্রযোজনীযতা বেশি মেযেদেব শিক্ষা তাদেব স্ব-নির্ভবতা বা ব্যক্তিত্ব বিকাশেব জন্য নয, তাদেব বিযেব যোগ্যতা বাডানোব জন্যে মাত্র। কাজেই সেই লক্ষ্য সামনে বেখে যতটুকু দবকাব ততটুকু শিক্ষাব মাত্রই মেযেদেব জন্য ধার্য থাকে। বব পণ যৌতুক প্রথা আইন কবেও তোলা যাচ্ছে না। মেযেবা নিজেবাই পাবছে না

এর মুখর প্রতিবাদী হতে। কারণ পায়ে তাদের আজও যথেষ্ট জোর নেই। অনেক শঙ্কা ভীরুতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চেয়তা তাদের ঘিরে আছে। ভাগ্য তাদের নিজের হাতে নির্দ্ধারিত হয় না। আদিবাসী সমাজের মতই সব পরিবার ও সমাজের নিয়ন্তা আজ ও পুরুষ। মায়ের চেয়ে বাপের জোর পরিবারে অনেক বেশি। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা যে এর পিছনে কার্যকরী তা সত্যি। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থাকে ; সেসব মেয়ে অর্থোপর্জন করছে, তারাও এ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কেন ? বহুদিন ধরে চলে আসা প্রথার শিকার তারাও হচ্ছে। বাইরের দায়িত্ব নিয়েও ভেতরের শেকল থেকে ছাড়া পাচ্ছে না। সাংসারিক কাজগুলো আজও কেবলমাত্র মেয়েদের করণয় এবং কিছুটা নীচু মানের বলে মনে করা হয়। বাইরের কাজে মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হচ্ছে কিন্তু ভেতরের কাজে ছেলেবা মেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না। ফলে মেয়েদের শরীর ও মনে চাপ পড়ছে অনেক বেশী। হয়ত এর জন্যে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি দরকার। আরও বেশি সংখ্যায় মেয়েদের বাইরে আসতে হবে স্বনির্ভর হতে হবে। এখন হয়ত শতকরা দশজন মেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। বাকী নব্বই শতাংশের পর নির্ভর মানসিকতা সমাজকে প্রভাবিত করছে বেশি। ত্রিপুরার চাকুরী ক্ষেত্রে মেয়েরা বেশি এসেছে শিক্ষকতার বৃত্তিতে। অন্যান্য পেশায় মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। সেই শিক্ষকতার বেলায় নারী পুরুষের আনুপাতিক হার নীচে তুলে ধরছি।

[ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ তে প্রাপ্ত তথ্য]

	শিক্ষকের সংখ্যা	শিক্ষিকার সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৩৯	১৩.৩
মধ্য স্তরের বিদ্যালয	২২৪৪	৭৫৮
উচ্চবিদ্যালয়	১৮৭৬	৬৪০
উচ্চতর (+২) বিদ্যালয়	১৯৯০	৮৭৪
মহা বিদ্যালয়	৫০৭	১০০
	মোট ১০.৭৫৬	৩,৬৪৮

পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্রে মেয়েরা যে কত পিছিয়ে রয়েছে ওপরের তথ্য তার এক আংশিক উদাহরণ মাত্র। জনসংখ্যার অর্দ্ধেক ভাগ অধিকার করে থাকা সত্ত্বেও জীবিকার অংশ তাদের দিকে মাত্র এক তৃতীয়াংশ তাও শুধু একটি বিভাগে, অন্যত্র আরও কম।

সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বেও ত্রিপুরার মহিলাদের সংখ্যাল্পতা আর এক দুর্বলতা সূচিত করে। শাসনতান্ত্রিক পরিণতিতে ত্রিপুরা একের পর এক পেয়েছে ইলেকটোরাল কলেজ আঞ্চলিক পরিষদ পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা। সে তো বত্রিশ বছর হয়ে গেল। বিধানসভার আসন সংখ্যা ত্রিশ থেকে বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ষাট অর্থাৎ দ্বিগুণ। কিন্তু শাসক ও বিরোধী সব দল মিলিয়েও এই দীর্ঘ দিনে মহিলা সদস্য সংখ্যা কখনও তিন

অতিক্রম করে নি। কোনও মহিলাই এপর্যন্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যায়ে আসীন হতে পারেন নি। ত্রিপুরা থেকে সংসদ সদস্যা হওয়ার ঘটনাও মহিলাদের ইতিহাসে ঘটেছে গত রাজ্য সভা নির্বাচনে।

অথচ ভারতীয় সংবিধান কত সমতার কথাই বলেছে। আইনের চোখে সমতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমতা ইত্যাদির ঘোষণা রয়েছে ১৪,১৫,১৬ অনুচ্ছেদগুলিতে। কিন্তু আজ এতগুলো বছরের শম্বুক গতিতে মনে হয় ঘোষণা যতই থাক তা সফল হবে না ; যদি না মেয়েরা নিজেরা কিছু গতি সঞ্চার করে। তাদের অধিকারবোধ আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও চেতনা দিয়ে কিছু শক্তির পরিচয় তাদের দিতেই হবে। আর্থিক স্বাধীনতার পবিসর আদায় করতে হবে। বুদ্ধি হৃদয়বত্তা ও যোগ্যতার সমন্বয়ে প্রমাণ করতে হবে স্বাধীনতা ও মানবিক বিকাশ নারী ও পুরুষ উভয়েরই জন্মগত অধিকার।

ত্রিপুরার দেবায়তন ও দেবমূর্তি

শক্তি হালদার

ঐক্যবদ্ধ মন্দিরময় বাংলাদেশের প্রত্যন্তে অবস্থিত ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিক এবং ইতিহাস সিদ্ধ। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানেই এর নিদর্শন আছে। প্রথমে ত্রিপুরার অন্যতম পীঠস্থান উদয়পুরের কথাই ধরা যাক্। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন উদয়পুরে (উদয়মাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে যার নাম ছিল রাঙামাটি, যাবার রাস্তা ছিল মেলাঘর হয়ে, কাঁকড়াবন দিয়ে গোমতী পেরিয়ে। নগরের প্রবেশ পথেই পড়ত জগন্নাথ দীঘি ও জগন্নাথ মন্দির। শিলেট পাথরে গড়া সে মন্দির আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিগ্রহ ও অপসারিত। আলম্বন হারিয়ে দীঘিও আজ ভ্রষ্টশ্রী। সেই মন্দিরের পাশে আরো কতগুলো ভাঙ্গা মন্দিরের চিহ্ন দেখা যায়। অনুমিত হয় এবং লোকমুখে প্রচলিত, এই জগন্নাথ মন্দিরের পাশেই ছিল মহাদেব ও বিষ্ণু মন্দির। বছর আটেক আগে (৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৯) স্থানীয় দীঘির সৃষ্টিকালে কতিপয় মূর্তির আবিষ্কার সারা উদয়পুরে ও ত্রিপুরায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণু মূর্তিটি ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ১ ফুট চার ইঞ্চি প্রস্থ। কষ্টি পাথরের উপর খোদাই করা এই চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তির পাদদেশে হাত ভাঙ্গা ছিল এবং চক্র শোভিত হস্তটিই শুধু অক্ষত ছিল। মূর্তির পাদদেশে জোড় হস্তে গরুড়ের মূর্তি অঙ্কিত। মূর্তির পিছনের অর্দ্ধ-বৃত্তাকার চালির উপর দশ অবতারের রূপ শোভমান। সম্পূর্ণ মূর্তিটি শিল্প নৈপুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর উরুতে আর একটি মূর্তি 'হর-গৌরী'। হর আসনে বসে আছেন, তার বাম উরুতে গৌরী বসে আছেন। এখানে হর চতুর্ভুজ। এক হাতে পদ্ম আর এক হাতে ত্রিশূল। এক হাতে গৌরীকে বেষ্টন করে আছেন আর এক হাত নিজ বক্ষে স্থাপিত। গৌরীর ডান হাতটি হরের কাঁধের উপরে রাখা। মূর্তির নীচের দিকে এক দিকে বৃষ অন্যদিকে সিংহ। এছাড়া আরো ভাঙ্গা মূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরী।

জগন্নাথ দীঘি পার হয়ে ডান দিকে রাস্তা গিয়ে মিলেছে অমরসাগরে, বিজয় মহাদেব দীঘিতে। এই সার্জন কথিত মহাদেব দীঘির আসল নাম ছিল বিজয় সাগর। দীঘির উত্তরে প্রথমে তিন মুখে তিন মন্দির এবং আর একটি মন্দির উল্টোদিকে। মন্দিরগুলিতে কোন বিগ্রহ নেই। যতদূর জানা যায় মন্দিরগুলি মহারাজা কল্যাণ মাণিক্যের দ্বারা নির্মিত। ত্রিপুরার স্মৃতিতে সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন — প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে দুটি মন্দির ও নাট মন্দিরে যে শিলালিপি আছে তাতে কল্যাণ মাণিক্যের নাম দেখা যায়। আবার শিব মন্দিরের শিলালিপিতে মনে হয় ধন্যমাণিক্য কর্তৃক মন্দিরটি সংস্থাপিত হয়েছিল এবং এর সংস্কার করেছিলেন কল্যাণ মাণিক্য।

মহাদেবের মন্দিরের উত্তরদিকে গোপীনাথ মন্দির। শিলালিপির প্রমাণে জানা যায় মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য ১৫৭২ শকাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরে যদিও গোপীনাথের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু এ যুগের অনেকেই এই মন্দিরটিকে চতুর্দশ দেবতার (উত্তরকালে আগরতলায় স্থানান্তরিত) প্রাচীন মন্দির বলে থাকেন।

গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে যে মন্দিরটি আছে ১৫৯৫ শকাব্দে মহারাজা রামমাণিক্য সেই মন্দিরটি নির্মাণ করে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। এই মন্দিরগুলির পূর্বদিকে প্রাচীর বেষ্টিত দুটি মন্দির আছে। লোকে এই মন্দির দুটিকে 'দুত্যার বাড়ী' (দূতীর বাড়ী?) বলে। এই মন্দিরগুলির আরো পূর্বদিকে একটি মাঠে তিনটি মন্দিব আছে। তারমধ্যে পশ্চিমের মন্দিরটি মহারাণী গুণবতী ১৫৯০ শকাব্দে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। অপর দুটি মন্দির সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বাহান্ন পীঠস্থানের অন্যতম দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির যোড়শ শতাব্দীব প্রথম ভাগে মহারাজা ধন্যমাণিক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কথিত আছে বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা কবার উদ্দেশ্যে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু মহারাজ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কালিকা মূর্তি স্থাপন করেন।

ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরটি ইটের তৈরী। প্রবেশ দ্বার পশ্চিমদিকে। দেবী মূর্তি কষ্টিপাথরের তৈরী চতুর্ভূজা। ৫ ফুটের অধিক উচ্চতা। এই দেব মন্দিরের সামনে নটি মন্দিরের পাশে একটি বৃহৎ ঘন্টা ঝোলান আছে — ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক এই ঘন্টা প্রদত্ত হয়েছিল। মন্দিরের প্রবেশ পথের বামপাশে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

মহাদেব মন্দিরের সামনে থেকে যে রাস্তাটি সোজা দুই ফার্লং পূর্বে গিয়েছে গোমতী নদী পাব হয়ে, পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ সেখানে। এখানে একটি পুরাতন মন্দির আছে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় — কোন বিগ্রহ মন্দিরে নেই। যোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই রাজধানী গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণমাণিক্যের সময় এই উদয়পুর থেকে রাজধানী পরিত্যক্ত হয়।

উদয়পুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে পাহাড়শ্রেণী, বড়মুড়া। পূর্বদিকে অমরপুর। ৯৮৭ ত্রিপুবাব্দে (১৫৭৭ খৃঃ) কুমার রামদাস দেব (ইনি বিজয় মাণিক্যের ভাই অনন্ত মাণিক্যের কাকা) বহু ছলবল এবং কৌশল প্রয়োগ করে ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন এবং নিজ নাম পরিবর্তন করে অমর মাণিক্য নাম ধারণ করেন। তাঁর নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় 'অমরপুর।' বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণেই উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয়। সেই সময় অমরপুর অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। বর্তমানে অমরমাণিক্যের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অমরসাগর আর ফটিকসাগর নামে দুটি দীঘি আছে এখানে। এই দীঘি দুটির চতুর্দিকে টুক্‌রো টুক্‌রো ইট ছড়িয়ে আছে মনে হয় প্রাচীনকালে এখানে একাধিক দেবমন্দির ছিল। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার অন্যতম পুরাতত্ত্ব উৎসাহী শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার লোধ অত্যন্ত পরিশ্রম করে অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অনেক দেবমূর্তিও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীলোধ মহাশয় অমরপুরের অনেক আশ্চর্যজনক সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

ত্রিপুরার উত্তর থেকে দক্ষিণে সুদীর্ঘ পর্বতমালা। এর পশ্চিমদিকে আনুমানিক ৭৫ মাইল দীর্ঘ পাহাড় শ্রেণীটি বড়মুড়া। এই পাহাড়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। একটি মূর্তি মহিষামর্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি। লোকে পর্বতের এই স্থানটিকে দেবতামুড়া বলে। এখানকার ছোট ছোট সারিবদ্ধ দেব মূর্তিগুলি খুবই অস্পষ্ট। নির্মাণের সময় নির্দ্ধারণ করা একেবারেই সম্ভব নয়, তবে পাথরের বয়সের দিক দিয়ে বিচার করলে ৩৪ শত বৎসরের বেশী হওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে দেবতামুড়ার মূর্তি কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

দেবতামুড়া পাহাড় থেকে ১৫ মাইল পূর্বদিকে 'ডম্বরু' বর্তমানের ডম্বুর রাইমা ও সইমা নামে দুটি নদী একসঙ্গে মিলে ঝর্ণার রূপ নিয়ে দুইটি বিরাট পাথরের ফাঁক দিয়ে অনেক উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। নীচের জলধারাকে ডম্বুর কুণ্ড বলা হয়। উপরের পাথরের মুখটি বলা হয় তীর্থমুখ ডম্বুর এবং ত্রিপুরাবাসীর আর একটি বড় তীর্থস্থান। তীর্থমুখে পূজা হয় গঙ্গাপূজা এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে মেলা বসে।

এখানে পূর্ব পাকিস্তানেব অন্তর্গত কুমিল্লা ও আখাউড়াব মাঝখানে কস্‌বা নামে একটি জায়গা আছে, লোকে বলে কিছুকালেব জন্য কৈলাবগড় নামে ত্রিপুবাব সাময়িক বাজধানী এখানে ছিল। এব পূর্বদিকে কমলাসাগব দীঘি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাবাজা ধন্যমাণিক্য এখানে তাব মহিষী কমলাদেবীব নামে একটি সবোবব খনন কবেছিলেন। দীঘিটি 'কমলাসাগব' নামে পবিচিত। এই সবোববেব তীবে দশভূজা ভগবতীব পাথবেব খোদাই একটি মূর্তি আছে। লোকে বলে কল্যাণ মাণিক্য এব প্রতিষ্ঠাতা। মূর্তিব পায়েব নীচে শিবলিঙ্গ খোদাই কবা আছে তবে এই দেবী মূর্তি 'কসবাব কালী' নামে পবিচিত এবং প্রসিদ্ধ।

প্রায় পঞ্চাশ বছব আগে ত্রিপুবাব একজন বাজকর্মচাবী চৌদ্দগ্রাম পবগণাব পূর্বদিকে খণ্ডল পবগণায় একটা পুকুব কাটাব সময় মাটিব তলা থেকে কষ্টি পাথবে খোদাই কবা শিবশক্তিব মূর্তি পেয়েছিলেন। সেই মূর্তি তিনি আগবতলায় নিয়ে আসেন। পববর্তীকালে মহাবাজা বীববিক্রম কিশোবমাণিক্য বাহাদুব এই মূর্তিটিকে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এব দক্ষিণ পূর্বে একটি সুদৃশ্য মন্দিব প্রতিষ্ঠা কবে স্থাপিত কবেন। সেই থেকে এই শিবদুর্গাব মূর্তিটি 'উমা মহেশ্বব' মন্দিব নামে পবিচিত। অপূর্ব কাৰুকার্য খচিত এই মূর্তি শিল্প নৈপুণ্যেব এক অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিবেব বচনাশৈলী ও অপূর্ব। মহাবাজাব নিজেব নির্দেশে 'T' এব আকাব এই মন্দিব নির্মাণ কবে এব ভাবসাম্য বক্ষা কবা হয়েছে। মূল মন্দিব চূড়াটি কাশী বিশ্বনাথেব মন্দিবেব অনুরূপ এবং দুদিকেব মন্দিবেব সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ মাদ্রাজেব মন্দিব শিল্পেব অনুকবণ কবা হয়েছে। মন্দিবেব সামনেব সিড়িব দুই দিকেব স্তম্ভে বৃষ ও সিংহেব দুটি প্রতিমূর্তি আছে।

এই মন্দিবেব অপবদিকে কৃষ্ণসাগবেব পশ্চিম তীবে শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিব অবস্থিত। মহাবাজা বাধাকিশোব মাণিক্য এই মন্দিবেব প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীনত্বেব দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকদেব এই মন্দিবটি একটি বিশেষ আকর্ষণ। শিল্প নিদর্শনে, সূক্ষ্ম কাৰুকার্যেব দিক থেকে ত্রিপুবাব সমস্ত মন্দিবেব মধ্যে এই মন্দিবটি শ্রেষ্ঠত্বেব দাবি বাখে।

জগন্নাথ মন্দিব এবং উমা মহেশ্ববেব মন্দিবেব দক্ষিণে বাজবাড়ীব প্রধান প্রবেশদ্বাবেব দুইদিকে পূর্বে লক্ষ্মীনাবায়ণজীব মন্দিব এবং পশ্চিমে দুর্গাবাড়ী লক্ষ্মীনাবায়ণ বা বাধামাধব মন্দিব। মহাবাজা বৈষ্ণব ধর্মপ্রাণ শ্রীবীবেন্দ্র কিশোব মাণিক্য এব প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিবেব স্থাপিত মূর্তি বাজগুৰু কর্তৃক আনিত হয়েছিল। এই মন্দিব প্রাচীন বাংলাব মন্দিব চাল ঘবেব অনুকবণে নির্মাণ কবা হয়েছিল। অপব মন্দিব দুর্গাবাড়ী মন্দিব বা মণ্ডপ বলা চলে। এখানে স্থাপিত মূর্তি নেই। এই মণ্ডপেব প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবাজা বীবেন্দ্র কিশোব মাণিক্য বাহাদুব। বাজবাড়ী থেকে সোজা সেন্ট্রাল বোড ধবে যে বাস্তা গোলবাজাবেব দিকে এসেছে তাব কাছেই শিববাড়ী। এই মন্দিবে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। বড়মাতা মহাবাণী প্রভাবতী দেবী এব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন এই দশকেই। বর্তমানে শিববাত্রি চতুর্দশীতে এখানে মেলা বসে।

বাজবাড়ীব উত্তবদিকে যে বাস্তা কুঞ্জবনেব দিকে চলে গেছে সেখানে বেনুবন বিহাব, বুদ্ধ মন্দিব অবস্থিত। মহাবাজা বীব বিক্রম কিশোব মাণিক্য বাহাদুব এব প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। ভগবানেব মূর্তিটি শ্বেতপাথবে তৈবী। এই মূর্তিকে কেন্দ্র কবে অনেক বকমেব প্রবাদ প্রচলিত আছে। মূর্তি আকাবে দুই ফুট ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। গেৰুয়া বঙেব এই মন্দিবটিব বচনাশৈলী সাদাসিধা কিন্তু অপূর্ব। শোনা যায় এ মন্দিবেব পবিকল্পনাও মহাবাজাব নিজেব।

১৯৪৬ ইং সনে ১৩৫৭ ত্রিপুবাব্দে এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দিব নির্মাণেব পিছনে মহাবাজাব যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা মন্দিবেব বর্তমান অধ্যক্ষ ভিক্ষু আর্য মিত্রেব কথায় — মহাবাজব নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি যখন ১৯৪৬ ইং সনেব প্রথম দিকে তাব নবনির্মিত বেনুবন বিহাবেব ভাব গ্রহণ কবতে আসি তখন বাজ প্রাসাদেব অভ্যন্তবেব এক কক্ষে সাক্ষাৎকাবেব সময় মহামান্য মহাবাজ বলেন — "দেখুন স্বামীজি, আমি জন্মগতভাবে বৌদ্ধ না হলেও ভগবান বুদ্ধেব অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব, পবম পবিত্র জীবননীতি এবং মানব কল্যাণেব পুণ্যবাণীব জন্য আমি তাব প্রতি অগাধ বিশ্বাসী ও

শ্রদ্ধাশীল রয়েছি। বস্তুত জীবনক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধের কল্যাণ বাণীর উপযোগিতা অসীম বলেই আমি মনে করি। আমার পার্বত্য প্রজারা বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। নানা বাধা নিষেধের হিন্দুধর্ম তাদের গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং আমার ইচ্ছা আপনি ভগবান বুদ্ধের পরম কল্যাণ, উদার উন্মুক্ত ধর্মবাণী প্রচার করে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পথ থেকে রক্ষা করুন "

আগরতলা বেনুবন বিহার প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বুদ্ধ মন্দির ছিল। তারমধ্যে ধর্মনগর বিভাগে পেচারতলের বুদ্ধ মূর্তিটি প্রায় ৫ ফুট দীর্ঘ। কাঞ্চনপুর, কৈলাশহর বিভাগে মনুঘাট ও ছামনু, কমলপুরে কুলাই হাওর, খোয়াইয়ে চাকমাঘাট, বিলোনীয়া বিভাগে ইলেবাবা ও কলসী এবং সাব্রুমে বংকুল রূপাছড়িতে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ।

আগরতলা থেকে যে রাস্তা সোজা পূর্বদিকে চলে গেছে আসামে, নাম তার আসাম -আগরতলা রোড। এই রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে হাওড়া নদীর তীরে, আগরতলা থেকে ৫ মাইল দূরে পুরাতন হাবেলী, মানে মূল আগরতলা। এখানে রাজধানী ছিল নতুন শহর পত্তন হবার আগে। চতুর্দশ দেবতার মন্দির রয়েছে সেখানেই, নতুন হাবেলীতে এই দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি কারণ জনরব মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলে নতুন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু বিগ্রহ স্বপ্নাদেশে জানিয়ে দিয়েছেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাদের যেন না আনা হয়। উদয়পুর থেকে এই মূর্তি আনা হয়েছিল প্রথমে, আগেই এর উল্লেখ করেছি।

এখানে পুরানো রাজপ্রাসাদের পিছনে একটা বড় পুকুরের পাড়ে মন্দির। পুকুরের পুব পাড়ে মস্ত একফালি জায়গা জুড়ে চতুর্দশ দেবতার মন্দির। চতুর্দশ দেবতার বিশেষত্ব হল 'মুণ্ড মূর্তি, বিগ্রহ শুধুমাত্র মস্তক। হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী,সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিধি, পৃথিবী, হিমালয়, সমুদ্র, কাম, অগ্নি ও গঙ্গা। কয়েকটি সোনালী ও কয়েকটি রূপালী রঙের অষ্ট ধাতুতে তৈরী। প্রত্যেকের মস্তকে বাঁকা চাঁদের প্রতীক আছে। যদিও দেব ও দেবীর সমন্বয়ে চতুর্দশ দেবতা তবুও মাতৃতান্ত্রিক স্বাভাবাপন্ন এদেশীয় লোকে 'মা চৌদ্দ দেবতা' বলে থাকেন।

চতুর্দশ দেবতার মধ্যে একমাত্র 'হর' বিগ্রহের সারা বছর পূজা হয় এবং অন্যান্য বিগ্রহ মূল পূজার সাতদিন ছাড়া সারা বছর লোহার সিন্দুকে ঘুমিয়ে থাকেন। মন্দিরের পাশে বেলগাছের গোড়ায় বুড়া দেবতা প্রতিষ্ঠিত। এই দেবতার গড়ন কতকগুলো সরলরেখা সংযোজিত, অনেকটা বিমূর্ত্ত। বুড়া দেবতা চৌদ্দ দেবতার জাগ্রত প্রহরী। পূজাচারে বুড়া দেবতা ব্রহ্মারই রূপান্তর। চতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরার রাজবংশের কুল দেবতা। মূল পূজাকে বলা হয় খার্চি পূজা। একমাত্র এই খার্চি পূজার দিনেই চৌদ্দটী মূর্তির একসঙ্গে পূজা হয়। পূজা সাতদিন ধরে চলে এবং এটি প্রকাশ্য পূজা — এই পূজার চৌদ্দদিন পর প্রথম শনিবার কিংবা মঙ্গলবার (দশমী তিথি বাদে) শুরু হয় অপ্রকাশ্য 'কেরপূজা'। পুরাতন হাবেলীর মূল মন্দিরে এবং নতুন শহর আগরতলায় দুই দফে মোট আটচল্লিশ ঘন্টা ব্যাপী কের পূজা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই নিয়ম চলে আসছে। ত্রিপুরার উত্তরাংশে কৈলাশহর। এখানে পার্বত্য তীর্থ ঊনকোটি অবস্থিত কৈলাসেশ্বর ভবানীপতি অসংখ্যাবার স্থানে স্থানে খোদাই ও অঙ্কনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই তীর্থের নাম ঊনকোটী।

ত্রিপুরাব্দ প্রবর্তনকারী রাজা যুঝাফার পঞ্চদশ পুরুষ 'কুমার' নামে খ্যাত শিবভক্ত রাজা এখানে এসে শিবোপাসনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। ঊনকোটী পাহাড়টি একশ হাত উঁচু। উপরে উঠার জন্য জীর্ণ পাথর সিঁড়ি আছে। এখানে একটা ঝর্ণা নীচের তিনটি কুণ্ড পড়েছে, পরে আরও নীচে একটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। পর্বতের গায়ে যে মূর্তিগুলি তার শিল্প নিদর্শন বেশী কিছু নেই তবে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। পাহাড় কেটে ত্রিনয়ন -বিশিষ্ট

একটি বৃহৎ মূর্তি আছে। মূর্তিটির খোলা ঠোঁটে দাঁতের সুস্পষ্ট আভাষ। বিরাট মাথা, বিরাট কান দুটিতে সাপের মত অলঙ্কারের সজ্জা। এখান থেকে হাত চৌদ্দ দূরে আর একটি 'মুণ্ড' আছে। উনকোটিশ্বর 'কালভৈরব' নামে এটি প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক আচারের কতকগুলি নরমুণ্ড এখানে খোদাই আছে। এরই একটু অল্প দূরে আর একটি খোদাই মুণ্ড আছে লোকে এটিকে 'বিষ্ণু মূর্তি' বলে।

উনকোটি পাহাড়ের নীচের দিকে করোগেটেড টিন শেডের ভিতর একটি ত্রিমুখ পাথরের মূর্তি আছে। লোকে এঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলে। আর একটি দেহের ঊর্ধ্ব ভাগবিশিষ্ট মূর্তি এখানে আছে। এই মূর্তিগুলির শিল্প কুশলতা অপূর্ব। এই অপূর্ব মূর্তিগুলির মত আর একটি চতুর্মুখ মূর্তি একটু দূরে বাঁশ জঙ্গলের কাছে মাটির ভিতরে প্রোথিত অবস্থায় আছে। মনে হয় মূর্তিগুলি অন্য কোথা থেকে আনা হয়েছিল। পাহাড়ের উপরে আজানুপ্রোথিত একটি পঞ্চমুখ ও অষ্টভূজ ধনুর্ধারী মূর্তি রাবণের মূর্তি বলে খ্যাত। এই মূর্তির পাশে একটু উঁচুতে কয়েকটি বড় পাথরের তৈরী দাঁড়ান অবস্থায় দ্বিভুজ মূর্তি আছে, লোকে তাকে মন্দোদরীর মূর্তি বলে। এখানে একটি গাছের নীচে গণেশ মূর্তি এবং আরও কতকগুলি পাথরের মূর্তি ও যুগল পদচিহ্ন আছে।

অজস্র খোদাই মূর্তিতে ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম উনকোটী তীর্থ দেবময় ত্রিপুরার গর্ব। যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার রাজা ও রাজমহিষীগণকে ভগবানের দেবময় ত্রিপুরার গর্ব। যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার রাজা ও রাজমহিষীগণকে ভগবানের প্রতি আত্ম-নিবেদনের যে আকাঙ্ক্ষা আকুল করেছিল আজো ভক্ত হৃদয় আকুলতা নিয়ে ঘুরছে ত্রিপুরার তীর্থ থেকে তীর্থে। উদাসীনতা আমাদের স্বভাব ধর্মে। ত্রিপুরার মঠ-মন্দিরগুলোর ওপর গবেষণাধর্মী কাজ খুব অল্পই হয়েছে। ত্রিপুরার সরকার, পণ্ডিত ও তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এখনো এ বিষয়ে উদাসীন।

সমরেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যলোক ঃ জেবুন্নিসা

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী

ত্রিপুরার অন্যতম মনস্বী স্রষ্টা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণের 'জেবুন্নিসা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯খৃ) কলকাতা থেকে এস. সি. আঢ্য কোম্পানীর (১০ হলধর বর্ধন, লেন) জে. চক্রবর্তী দ্বারা এবং ওয়েলিংটন প্রেস (৬/৭ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) থেকে ছেপে। সঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা ছিল লেখকের বন্ধুবর তথা জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের। গ্রন্থটির প্রথম পর্ব সুচনায় বিবৃত হয়েছে গ্রন্থটির উৎস উপকরণ সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক তথ্য। আগ্রা প্রবাসকালে (স্মরণীয়, লেখককৃত আগ্রার চিঠি গ্রন্থ) লেখক একটি (জেবুন্নিসার) জীবনীগ্রন্থ ক্রয় কবেন (সে জীবনী গ্রন্থের ভাষা বা লেখকের নাম কোথাও উল্লেখিত নেই) এছাড়া আবেকটি উর্দুতে লেখা গ্রন্থ লেখকের কাছে আগে থেকেই ছিল (সে গ্রন্থেও রূপম্ পত্রিকার একটি প্রবন্ধের (সৈয়দ মহম্মদ রচিত) সাহায্য নেয়া হয়েছে, কাহিনী শেষাংশ রচনায়। তৎসহ লতীফ-এ- লাহোর নামক আরেকটি গ্রন্থের প্রসঙ্গও লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। জেবুন্নিসার অপর একটি কাব্যগ্রন্থে বৈরাজের প্রসঙ্গও তাতেই নাকি লিপিবদ্ধ ছিল।

।।২।।

গ্রন্থ ভূমিকায় লেখকের 'বন্ধুবর' অবনীন্দ্রনাথেব লেখায় সমরেন্দ্রচন্দ্রের পাশী, উর্দু, হিন্দু, এবং অন্যান্য ভাষার জ্ঞানের ও পরিণত রসবোধের কথা বিশেষ করে সঙ্গীতশাস্ত্রে ও চিত্রশিল্পে লেখকের সরকারের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। শিল্পীর ভাষার জানি - অধিকারী লেখক — বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম বংশের রাজপুত্র - ভারতের একজন মোগল সম্রাটকন্যার কথা যোগ্যতার সঙ্গেই লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকায় আরো যে দুয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা হল এক মোগল হারেম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল ধারণা বিদূরিত হয় এই গ্রন্থ মাধ্যমে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস হারেমে শুধু বিলাস বাসনের ব্যবস্থাই বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য সুপ্রচুর বিদ্যাবর্ত্তা সুগভীর রসবোধ ও সুবিস্তৃত কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া হারেম নিবদ্ধ জেবুন্নিসার পক্ষে যে বড় কবি হওয়া সম্ভব ছিল না —এতথ্য এ গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয়। দুই, ভূমিকা লেখকের আবেদন ছিল উত্তরকালের লেখকদের প্রতি — সমরেন্দ্র চন্দ্রের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষায় জেবুন্নিসার সামগ্রিক পরিচয় ও তাঁর কবি বিলির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করবেন। বর্তমান গ্রন্থে সমরেন্দ্রচন্দ্র শুধুমাত্র জীবনী রচনার প্রয়োজনে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কবিতারই সংগ্রহ, ব্যাখ্যা সহ, উপস্থাপিত করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবীকালের প্রতি

অবনীন্দ্রনাথের আকাঙ্খাটি উচ্চারিত সে আকাঙ্খা বিষয় কোনো যোগ্য উত্তরসাধকের দ্বারা এখনো তা পূর্ণ হয়েছে বলে আমরা জানি না।

।।৩।।

গ্রন্থটি দশ পরিচ্ছেদে এবং ৮৪ পৃষ্ঠায় রচিত। গ্রন্থটির পরিচ্ছেদ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সার প্রথমে নিয়ে পরবর্তীঅংশে বিদুষী জেবুন্নিসার কবিতা সমূহের মূল, সমরেন্দ্রচন্দ্র কর্তৃক শব্দ পরম্পরাগত গদ্যানুবাদে এবং নিবন্ধকের কাব্যানুবাদের প্রয়াস লিপিবদ্ধ হল।

প্রথম পরিচ্ছেদ —জেবুন্নিসার জন্ম ১৬৩৬ খৃঃ (হিজরী, ১০৪৮ ১০ই শাওয়্যান) মাতা-শাহ্ নওয়াজ খাঁর দুহিতা, দেলরস্ বানু বেগম, পিতা আওরঙ্গজীব, ধাত্রীস্তন্যপান, শিক্ষিতা, ধর্মচারিণী ধাত্রীদ্বারা প্রতিপালিতা, কোরাণ পাঠে অভ্যস্তা ধাত্রীর সঙ্গে থেকে কোরাণ পাঠে আগ্রহ, শিক্ষিকা (স্ত্রী - হাফেজ) মরিয়মের নিয়োগ এবং অল্প বয়সেই কোরাণ কণ্ঠস্থ, বালিকা বয়সেই 'হাফিজ' এই উপলক্ষ্যে উৎসব দান খয়রাতি ও শিক্ষিকা পুরস্কৃত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ —ইরান থেকে আগত শিক্ষক কবি মোল্লা আসুফ মাজন্দ্রানীর নিয়োগ, একুশ বছর পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাস, সে যুগের মহিলাদের মধ্যে অগ্রহুণ্য বিদুষী, আরবী, ফার্সী- ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য পাঠ ও চর্চা রচনা আরবী ও ফার্সীতেই, কবিতা রচনায় আগ্রহ মোল্লা আস্রফের উদাহরণেই রচনা সমূহের মধ্যে উল্লেখ অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থ জেবুনমনশাত ও কাব্যগ্রন্থ দেওয়ানই মুখফি হারেমে পাঠাগার স্থাপন বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে কবি লড়াইতে অংশগ্রহণ পর্দার আড়াল থেকে বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে কবি লড়াইতে অংশগ্রহণ পর্দার আড়াল থেকেই এবং প্রণয়ী আকিল খাঁর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - জেবুন্নিসা কর্তৃক বিখ্যাত কবিদের কবিতার পাদপূরণ নিজের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে কবিতা রচনা ঔরংজীবের হারেমের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে জেবুনের কাব্যবিকাশ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য।

চর্তুথ পরিচ্ছেদ — ঔরংজীবের কাছে জেবুনের শাস্ত্র ও কাব্যচর্চার স্বীকৃতি হাফিজের কাব্যপাঠে ঔরংজীবের সম্মতিলাভ, জেবুনের ভুয়ো দর্শন বিভিন্ন সময়ে গৃহকলহ নিরসনে জেবুনের ভূমিকায় এমনকি রাজ্যপরিচালনায় ও ঔরংজীবের পরামর্শ দাতারূপে জেবুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ — ভ্রাতা আকবর পিতৃদ্রোহী হলে জেবুনের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে সংযোগ প্রকাশ হলে পড়লে জেবুনের নর্বাসন সলীমগড়ে, সেখানে কাব্যরচনার অবসর লাভ, এক বছর কারাদণ্ডের পর জেবুনের মুক্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ — জেবুন - আকিল খাঁ প্রণয় সঞ্চার, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ঔরংজীব লাহোর গেলে, উভয়ের ঘনিষ্ঠতা, জেবুনকে লাহোর রেখে গেলেন উভয়ের ঘনিষ্ঠতা জেবুনকে লাহোরকে রেখে গেলেন ঔরংজীব, উভয়ের প্রণয় গভীর তর, মজুরবেশী আকিলের উদ্যানে এসে দেখা ও পত্র ও কবিতা বিনিময়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ খবর দিল্লীতেও পৌছল, ঔরংজীবের ক্রোধ, আকিলের লাহোর ত্যাগ, কিন্তু জেবুনের জন্যে কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট হল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ — জেবুনের পীড়াপীড়িতে আওরঙজীব অবশেষে সম্মত জেবুন—আকিল বিবাহ প্রস্তাবে, কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে, স্বয়ংবরের জন্য প্রস্তাব জেবুনের ঔরংজীবও কিন্তু আকিলের প্রতিযোগীরা আকিলকে জানায়, এ ছলমাত্র, ফাঁদ পেতে আকিল এলে তাকে বধ করা হবে —ভয়ে আকিলের পলায়ন এবং পরিণামে বিবাহ প্রস্তাব নাকচ, জেবুনের স্বেচ্ছা চিরকুমারী থাকার ত্যাগব্রত।

অষ্টম পবিচ্ছেদ — ইবাণেব বাজপুত্ত ফাককেব এবাব জেবুনেব পাণিপ্রার্থী হয়ে দিল্লী আগমন জেবুনেব অনিচ্ছা পিতাব পীড়াপীড়িতে বাজি তবে একটি শর্তে বিয়েব আগে বাজপুত্রেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব চাই, বাজপুত্র প্রাসাদে ভোজসভায় আমন্ত্রিত কথোপকথনে ফাকখেব অশালীনতা (কথাব শ্লেষে বাজকুমাবীব চুম্বন প্রার্থনা) জেবুন্নিসা এই অশিষ্টতাব জন্য বাজপুত্রেব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেন।

নবম পবিচ্ছেদ — প্রণয়েব শোচনীয় পবিণাম আকিল ছদ্মবেশে দিল্লী এলে হাবেমে যাতাযাত শুরু কবেন, শেষ পর্যন্ত ধবা পড়েন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, জেবুনেব কোনো শাস্তি হল না, কাবণ প্রণয়ে কোন ক্লেদ ছিল না।

দশম পবিচ্ছেদ — কাহিনীব তপবিসমাপ্তি, আজীবন বিদ্যা ব্রতী জেবুনেব লাহোবেই জীবনাবাসন, আকিলেব সমাধিব পাশেই জেবুনেব সমাধি, সমাধিতে শোকলিপি -লতীফ এ লাহোবে লিপিবদ্ধ ১০৮০ হিজবী, অর্থাৎ মাত্র ৩২ বৎসব বযসে লোকান্তব।

।।৪।।

সমবেন্দ্রচন্দ্র প্রথাসিদ্ধ কবিতা বচনায যদিও কখনো (দ্রঃ বাহাদুব শাহ, ত্রিপুবা স্মৃতি) হাত দেননি, তবু তাঁব গদ্যানুবাদে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তিব অভাব নেই। বর্তমান নিবন্ধে আমবা সংকলিত জেবুন্নিসাব প্রকীর্ণ পদ, সমবেন্দ্রেব গদ্যানুবদেব সঙ্গে আমাদেব কবা কাব্যানুবাদ একাদিক্রমে উপস্থাপিত হচ্ছে।

দখতব-এ-শাহম্ ও লেকিন রুবফকব আউব দাহম জেব ও জিনত্ বস হমীনম নাম-এ মন জেবুন্নিসা।

—বাদশাহেব কন্যা আমি, কিনতু গবীবেব রূপ ধবিযাছি বেশভূষা আমাব এই এ রূপেব যে আমি আমাব নাম জেবুন্নিসা অর্থাৎ স্ত্রীভূষণ।

—বাজনন্দিনী আমি গবীবেব রূপ নিয়েছি

এইতো আমাব বেশভূষা সব এইতো পবেছি এ জেবুন্নিসা নাবীব ভূষন নামতো ধবেছি।

২। নাসীব আলী বনাম আলী বুবদহ্ পানাহ্ ওবনা ও জুলফকাব এ আলী সবফ্বা দামত।

——নাসীব আলী তোমাব নাম আলী তাই আশ্রয পাইযাছ নতুবা আলী জুলফিকাব তববাবিতে তোমাব মস্তক ছেদন কবিতাম।

নাসিব আলী —আলী বলেই বক্ষা পেলে তুমি নযত এই —জুলফিকাবে শিব গড়াতে ভূমি।

৩। হেজাব-এ-নৌ অরুসা দবদব সৌবে নমে মানদ অগব মানদ সবে মানদ শব-এ দিগব নমে মানদ।

—পতিব পক্ষে নব বধূগণেব লজ্জা বহে না, যদি থাকে এক বাত্রি বহে দ্বিতীয বাত্র বহে না।

—পতিব বুকে নববধূব লজ্জা বহে না, একটি বাত বা দুটি বাত বেশি সহে না।

৪। চহায চিজ গম -এ-দিল বুবদ রুদাম চহাব শবাব ও সবজী ও আব-এ বোর্যা। ও রু ও-নিগব।

—চাবিটি দ্রব্য মনেব ব্যথা দুব কবে সে চাবিটি কি সুবা, শ্যামল মাঠ, ঝবণা ও সুন্দব মুখ।

—চাব জিনিসে জানিগো জানি মনেব ব্যথা ঠিক সাবায সুবা সুধায মধুব মুখে হবিৎ মাঠ আব ঝর্ণায।

৫। চহায চিজ গম-এ-দিল বুবদ কদাম চহাব নমাজ ও বোজা তসবিহ ও তোবা ইস্তগফাব

—চাবিটি দ্রব্য মনেব দুখ দুব কবে সে চাবিটি কি। ঈশ্বব উপাসনা, উপবাস জপমালা ও পাপ ক্ষালনেব জন্য তওবা।

—চাব জিনিষে মনেব ব্যথা দুব যে কবে। বলতে পাব তা ? উপাসনায জপমালায উপবাসন অনুশোচনা।

৬। নে নে গলত্ অস্ত কি আফতাব-এ-দশহব বব নেজা বব আমোদ ও কিযামত পব পাস্ত

—না না ভুল হয়েছে যেন মৃত ব্যক্তিগণের পুনরুত্থান দিনের রবি শূলের উপর উদয় হইয়া প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছে।

—ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে নানা প্রেতের ছায়া জেগে যে ওঠে কে আর করে মানা। প্রলয় দিনে শূলের পরে রবির দেখি হানা।

৭। দর্দা কিজ্ কয়েদ সিতম্ আজাগ নাগশতম এক লহ্জা জেগনহায়ে জহাঁ শব্দ নাগযতম্।

গরচে পাবঞ্জির মথ্ফি জদ্ তাহে দিওয়ার-ই গম শুক্‌র আল্লা কজ জফা-এ হামগুণা আসূদা অম দিল্ এ মন আমির মুখফি বারলাই হিজর তাকে কি রজ্জ্ হাওয়াই ওয়ালত গুণাগহিগর নদারম মথফী উমেদ রেহাই তার রোঁজ হস্ত নেস্ত।

খাক্ -এ গুর্বত হরকে বদির মহদ্ দামনিগর শুদএ তা মরা জঞ্জির দরপায়ে দিল দিওয়ানা শুদ্ তা মরা জঞ্জির দরপায়ে দিল দিওয়ানা শুদ্

দোস্ত শুদ্ দুশমন্ মরা হর আশনা বেগানা শুদ্।।

হায় ব্যথা উৎপীড়নের কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছিনা। এক মুহুর্তের জন্যও আমি ভবযন্ত্রনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। যদিও পায়ে বেড়ি আছে ও দুঃখরূপ প্রাচীরের অন্তরালে রয়েছি। ধন্য ভগবান, সকলের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া আরামেই আছি। বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আমার মন কতদিন পর্যন্ত বন্দী থাকিবে ? কেবল মিলনের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোনো পাপ মনে রাখি না। দারিদ্রের ধূরা যাহাকে শৈশব হইতে স্পর্শ করিযাছে, তাহার মহাপ্রস্থানের পূর্বে মুক্তির আশা নাই। যখন হইতে পায়ে বেড়ি পরিযাছি সেইদিন হইতেই মন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে—যাহারা আমার প্রিয় বন্ধু ছিল তাহারও শত্রু হইয়াছে এবং প্রিয়জনও আমার অপরিচিত লইয়া রহিয়াছে।

হায় ব্যথাপীড়নের কারাবাস থেকে মুক্তি পাবনা লেশ হায় এক লহমাও ভব যাতনার দুঃখ হবে না শেষ হায় যদিও রয়েছে পায়েতে শেকল দুখের দেয়ালে ভিন্ন তবু ধন্য আল্লা রেখেছ আমারে পীড়নের থেকে ছিন্ন হায় জানিনা কদিন রব যে বন্দী বিচ্ছেদ তাপ মোড়া হায় মিলনের সাধ ছাড়া কোন পাপ নাহিযে হৃদয় জোড়া আর দারিদ্র্যধূলা শৈশব থেকে লেগেছে যাহার গায় হায় মহাপ্রলয়ের আঁচ থেকে আর মুক্তি কি কভু পায় হায় যখন থেকে সে পদযুগে বেড়ী তখন থেকেই মত্ত হায় প্রলয়ের আগে পরাণে যাহার বৃথা আশা সব সত্য হায় যারা ছিল আগে প্রিয় সকলের দেখিয়ে শত্রু সাজ হায় যারা ছিল সব প্রিয়জন আগে অপরিচিত যে আজ।

৮ গর বাদ গুই রর সর-এ জুলফম্ নারসী

—বায়ুরূপে আসিলেও আমার কেশাগ্র পর্যন্ত পৌছাইতে পারিবেনা।

—বায়ু রূপ ধার আসো ঘোর পারবে না ছুঁতে কেশাগ্র মোর।

৯ আ মতবখ্ -এ-মা দর তলব।

—তোরা রান্নাঘরের মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া নাও।

—চেয়ে নে তোর যা কিছু লাগে রান্নাঘরে মায়ের আগে।

১০ বুল বুল অজ গুল বগুজর গিদ চমন বীনদ মরা বুত পরস্তী কে কুনিদ গর ব্রহমন বীনদ মরা দর সুখন পিনিহা শুদম্ চৌবু-এ গুলদর বর্গ-এ-গুল হর কি দীদন মেল দারদ দর শুখন বীনদ মরা।

—আমাকে বাগানে দেখিলে বুলবুল ফুল ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ যদি আমাকে দেখে তবে সে কেন আর মূর্তি পূজা করিবে ? ফুলের সুবাস যেমন পাপড়ির ভিতর লুকাইয়া থাকে তেমনি আমার কবিতার ভিতর আমি লুকাইয়া আছি যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে আমার কবিতার ভিতর আমাকে দেখিতে পাইবে।

—দেখলে আমাকে পুষ্পকাননে ফুল ছাড়ে বুলবুল দেখলে আমাকে বামুন করেকি মূর্তি পূজার ভুল পাপড়ি ভিতরে ফুলের সুবাস কবিতা গভীরে আমি চায় যদি দেখা দেখতে পাবে সে কবিতা গভীরে আমি চায়

যদি দেখা দেখতে পারে সে কবিতা গভীরে নামি।

১১. শুনি দম তর্ক, খেদমত কর্দ আকিল খাঁ বনাদানী
—শুনিলাম নির্বুদ্ধিতায় আকিল খাঁ (রাজসেবা) ছাড়িয়াছে।
আক্কেলহীন শুনিয়ে আকিল খাঁ
ছেড়েছে রাজ সেবা।

১২. আহ্ জেবুন্নিসা বহুকুম কজ্জা
নাগ হাঁ অজ্জ নিগাহ্ মুখফী শুদ।
সম্বা -এ-সুফ বচাহ্ মুখফী শুদ।
সাল তারিখ আজ খিরদ জুস্তম
গুফ্ত হাতিফ্ কি শাহ্ মুখতী শুদ।
—আহা জেবুন্নিসা বিধাতার আদেশে
দৃষ্টি হইতে অকস্মাৎ লুকাইয়াছেন।
বিদ্যাবুদ্ধি রূপ লাবণ্যের ধারাস্বরূপ তিনি
য়ু সুফর ন্যায় কুপের ভিতর লুকাইয়াছেন।
মৃত্যুর বৎসরের কথা বিবেককে প্রশ্ন করিলাম
অদৃশ্য হইতে বলিলেন চন্দ্র লুক্কায়িত হইলেন।
— হা জেবুন্নিসা বিধাতার শাপে জনতা লোচন ত্যজি
বিদ্যাবুদ্ধি রূপলাবণ্য ধারাস্বরূপ আজি
য়ু সুফের মতো কুয়োর ভিতরে লুকানো রয়েছে আজি
মৃত্যুর সাল জিজ্ঞাসিলাম বিবেককে ডেকে আমি
অদৃশ্য থেকে বলিল কে জানে চাঁদ লুকোলেন বুঝি।

১৩. দম বাস এ মিশা কল্লা ।
——— একবার মুহুর্তের জন্য (খণ্ডিত) মুণ্ডের মত থাক
——একবার শুধু মুহুর্তের লাগি
ছিন্নমুণ্ড প্রায় রহ জানি ।

১৪. বর মজার -এ-মা বানে চেরগ-ও নে গুলে
নে পর-এ পরওয়ালে ও নে -এ-বুলবুলে।
— জন্মভূম ত্যাগী আমাদের সমাধির উপর একটি ফুল ও নাই, প্রদীপ ও নাই
একটি পতঙ্গের পক্ষ পর্যন্ত নাও বুলবুল পাখির শব্দও নাই।
— জন্মভূমি ছিন্ন আমি করবে নেই একটি বাতি একটি ফুল পতঙ্গটি পক্ষহীনা শব্দহীন বুলবুল।।

গভীর মমতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে রচিত এ গ্রন্থে গ্রন্থকার সমরেন্দ্রচন্দ্র দাবি করেছেন জেবুন্নিসা ভারতের মধ্যযুগের এক বড় কবি, যতদিন তাঁর দেওয়ান-ই মুখফি' বেচে থাকবে ততদিন কাল থেকে কালান্তরে তা রসিক পাঠকের সম্ভ্রম ও আগ্রহ আকর্ষণ করে যাবে।

ত্রিপুরায় আলোকচিত্র চর্চার সেকাল ও একাল

রবীন সেনগুপ্ত

বিশ্বে ফটোগ্রাফী উদ্ভাবনের প্রাককথা ঃ - ফটোগ্রাফীর আভিধানিক বুৎপত্তিগত পরিভাষা গ্রীক শব্দ Photo এবং light বাক্যদ্বয়ের মিশ্রণে গঠিত। Photo শব্দটির অর্থ আলো বা light এবং Graphin শব্দটির অর্থ আঁকা । এই দুটো বাক্যের একত্রীকরণের তাৎপর্যগত অর্থ "আলো দিয়ে ছবি আঁকা" এবং পরবর্তী সময়ে Photographin বা Photography নামে সেই উনবিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে এই শিল্পকলা আবিষ্কৃত হবার পর সমগ্র বিশ্বে সেই একই নামে পরিচয় বহন করে আসছে ।

সৃষ্টির শুরুতে সূর্য বা কোন আলো কোন জিনিসের উপর পড়লে তার একটা ছায়া বা shadow পড়বে এবং এটাই স্বাভাবিক । এই প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবির অন্তহীন সৌন্দর্যকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার চেষ্টা চিত্রশিল্পীগণ যেমন করে গেছেন আবার উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন । ১৮০৯ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের "ওয়েজউড", ১৮৩৬ খ্রীঃ উইলিয়াম হেনরী ফক্স ট্যালবট, ১৮৩৯ খ্রীঃ ফরাসী চিত্রকর ও বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে দাগর ও নীপসে ভ্রাতৃদ্বয় ফটোগ্রাফী সচিত্রকরণে সাফল্য প্রাপ্ত হন । ১৮০৯ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের "ওয়েজউড" (Wegedee) কাগজে ও মসৃণ চামড়ার উপর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ প্রলেপ দিয়ে এর উপর দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে ছবি ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন । এরপর ১৮৩৬ খ্রীঃ ফরাসী মঁসিয়ে নীপসে ও দাগর বৈজ্ঞানিক হার্সেল Negative তৈরী করে এর থেকে কাগজের উপর ছবি ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । ১৮৩৯ খ্রীঃ ফরাসী মঁসিয়ে নীপসে ও দাগর বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে কপোর পাত্রের ওপর আয়োডিন বাষ্প লাগিয়ে তার উপর কোন বস্তুর ছায়াকে প্রতিফলিত করে একে স্থায়ীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । সে সময় ঐ পদ্ধতিকে বলা হতো হোলিও গ্রাফী ও দাগরোটাইপ ।

১৮৫৬ খ্রীঃ ইংরেজ ভাস্কর কাচের প্লেটের উপর কলোটিন সিলভার ব্রোমাইড তরল পদার্থের আবরক লেপন করে ক্যামেরার পুরু লেন্সের মাধ্যমে সরাসরি বিষয়বস্তু এর প্রতিচ্ছবি উক্ত কলোটিন মাখানো কাচের প্লেটের উপর সরাসরি প্রতিফলিত করে ছবি তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । একে বলা হতো Wet plate।

১৮৭১ খ্রীঃ জার্মানীর ম্যাডক্স কলোডিনের পরিবর্তে জিলোটিন ব্রোমাইড (Geleyine Bromide) আরক মাখিয়ে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এমন পদ্ধতির (Dry plate পদ্ধতি) আবিষ্কার করেন ।

উপরিউক্ত এইসব আলোচনা ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোকপাত করা হলো । ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের আলোচনা করতে গেলে সে এক বিশাল অধ্যায় । ঊনবিংশ শতাব্দির ফটোগ্রাফীর প্রাক কথার সঙ্গে ক্যামেরা অবশ্যই অঙ্গাঙ্গীভাব যুক্ত । কারণ শুধুমাত্র HalyoGraphy, Dagarotype Photograna পদ্ধতির সঙ্গে কি পদ্ধতিতে ছবি তোলা হতো বা ছবি তোলার গ্রহণকারী মাধ্যম কি তদ্‌ব্যাপারে কিছুটা আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে তাই এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে ।

প্রথমদিকে Pinhole Camera দিয়ে ঐসব আবিষ্কৃত পদ্ধতি কাগজের উপর আরক (Geletine) ও কাচের প্লেটের উপর দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি ফেলে ছবি তোলা শুরু হয়েছিল ।এরপর আবিষ্কৃত হল Roll film। জার্মানীর চশমা বিক্রেতা (Zena ক্যামেরার) (১৮১৬ - ১৮৮৯) ও Carleir লেন্স তৈরীর কারখানা খুললেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ইষ্টার্ণ কোডাক, (১৮৫৪ - ১৯৩২) এবং জার্মানী ZEISS IKON যুগপৎভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নধরণের Camera Wet Field Camera, Box Camera, Folding Camera, Reflex Camera (Twin lens), 35 mm Camera, SLR Camera তৈরী করে বাজারজাত করতে থাকেন । এরপর Gavert Illford কোম্পানীও Camera, Plate Film, Prints Paper তৈরী শুরু করেন । উপরিউক্ত ঐ সমস্ত আলোচনা ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে প্রারম্ভিক একটা কিঞ্চিত ধারণা পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলে ধরা হলো, এই কারণে ফটোগ্রাফী সৃষ্টির প্রথম যুগ ১৮০৯ থেকে ১৮৫৬ খ্রীঃ ত্রিপুরায় কিভাবে এর প্রভাব পড়েছিল তাব সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই আলোচনা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র ।

ত্রিপুরার ফটোগ্রাফী চর্চার আদি কথা : - ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ওপরে ১৮০৯ খ্রীঃ থেকে ১৮৩০ খ্রীঃ যখন সমগ্র ইউরোপে ফটোগ্রাফীব চূড়ান্ত রূপ দেবাব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং কয়েক বছর পর তথা ১৮৫৪ খ্রীঃ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার রাজধানী পুরাতন আগরতলায় তৎকালীন মহারাজ কুমার বীরচন্দ্র মাণিক্য এই আধুনিক শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর উপর গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন । এটা ভারতবর্ষে তো বটেই সমগ্র পৃথিবীতে সেই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি ও আলোচনা শুরু হয়েছিল । ত্রিপুরায় "আলোকচিত্র চর্চার" সেইকালের আদিযুগ যা আমাদের ভাবিত ও গর্বিত করে। ত্রিপুরায় এই আলোকচিত্রের শ্রষ্টার সম্বন্ধে আংশিক হলেও আলোচনার দাবি রাখেন নতুবা ইতিহাস অধরাই থেকে যাবে । যেটাকে ত্রিপুরার আলোকচিত্র চর্চার আদিযুগও বলা যায় ।

আলোক চিত্রগ্রহণের মূল তত্ত্ব:- সৃষ্টির অন্তহীন অপর সৌন্দর্যকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার চেষ্টা একদিকে যেমন চিত্রকর, ভাস্কর তাঁদের বিরামহীন নান্দনিক শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী করে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি ১৮০৯ খ্রীঃ থেকে প্রকৃতির পার্থিব কি অপার্থিব সর্ব শক্তিমান সেইসব সৃষ্টির প্রতিচ্ছবিকে চালিয়ে যেতে থাকেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ঈশানচন্দ্র কনিষ্ঠ বীরচন্দ্রকে এই শিল্পকলা চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য নিজ অমাত্য পণ্ডিত শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রাধারমন ঘোষ, শ্রীহরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখদের প্রভূতভাবে সাহায্য করতে নির্দেশ দেন । বীরচন্দ্রের বাংলা, আরবী, সংস্কৃত ও মণিপুরী ভাষাব উপর

যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল । ইংবাজী বুঝতে পাবলেও লেখনে ও বলনে তেমন পাবদর্শী ছিলেন না । তাঁদেব অমাত্য ও সচিবদেব দিয়ে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী থেকে তৎকালীন ইংবাজী ভাষায় বচিত আলোকচিত্র চর্চা সম্বন্ধীয় বই আনিয়ে অনুবাদ কবে ক্যামেবা, প্লেট, ফটো প্রিন্টিং পেপাব আনিয়ে ও নিজে তৈবী কবে এব অনুশীলন ও চর্চা শুরু কবেন ।

১৮৬২ খ্রীঃ মহাবাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নতুন হাবেলী তথা বর্তমান বাজধানী আগবতলায় একটি দ্বিতল সুদৃশ্য বাজপ্রাসাদ নির্মাণ কবেছিলেন । কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও যুববাজ বীবচন্দ্রেব অনুবোধে এই প্রাসাদেব পূর্বকোণে একটি নাতিদীর্ঘ স্টুডিও তৈবী কবিয়ে দিয়েছিলেন । বাজ অমাত্য ও কর্মচাবীগণ এটাব নামকবণ কবেছিলেন "মানাঘব" । বীবচন্দ্রেব খুবই উঁচুমানেব চিত্রকব ছিলেন । এই মানাঘব তথা "স্টুডিও" তে বসে এমন সব ছবি ও ফটো সৃষ্টি কবেছিলেন, সে সম্পর্কে পবে কিছুটা হলেও আলোচনা কবা হবে ।

মহাবাজ বীবচন্দ্রেব বাজত্বকাল ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ খ্রীঃ স্থিব চিত্রেব (Still Photo) মাধ্যমে স্থায়ীভাবে রূপ দিতে আলোকচিত্রীগণ সচেষ্ট হয়ে পড়েন । চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য বা স্থিবচিত্রেব মধ্যে তাকে একটা স্তব্ধতা, আব এই স্তব্ধতাব ভিতব দিয়ে গড়ে ওঠা গতিশীলতা । দর্শক বা সমাজ এইসব চিত্রকলাব মাঝে তৎকালীন বা সমকালীন প্রেক্ষাপটেব সাক্ষী গুলোকে ভাবনুসঙ্গেব অনুভূতি দিয়ে নিজ নিজ জীবন চৈতন্যেব উপলব্ধিতে বাঙময় কবে তোলেন । ত্রিপুবাব যুববাজ ও পববর্তী সময়ে মহাবাজ বীবচন্দ্র ছিলেন তেমনি একজন, যিনি একাধাবে চিত্রকব, আলোকচিত্রেব উদ্ভাবক, সঙ্গীতজ্ঞ, কাব্য ও সংস্কৃতিব সার্থক শ্রষ্ঠা ও রূপকাব।

সেকালেব ইতিহাস :- ১৭৬০ খ্রীঃ (১১৭০ ত্রিপুবাব্দ / ১১৬৭ বঙ্গাব্দ) মহাবাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কর্তৃক উদযপুব হতে পুবাতন আগবতলায় স্থানান্তবিত কবাব পব উক্ত স্থানে এক সুদৃশ্য বাজপ্রাসাদ নির্মাণ কবেছিলেন। অল্পবিস্তব যাব ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে । তাঁবই বংশধব বীবচন্দ্র ১৮৫৪ খ্রীঃ উক্ত প্রাসাদেব পূর্বকোণে "আলোকচিত্র চর্চা" শুরু কবেছিলেন । যখন সমগ্র বিশ্বে আলোকচিত্র শিল্পেব আধুনিকীকবণেব সমীক্ষা চলছে, ঠিক ঐ সময়ে ভাবতেব পূর্বকোণে এক প্রত্যন্ত অঞ্চল "স্বাধীন ত্রিপুবা বাজ্যেব" এক মহাবাজকুমাব এই আলোকচিত্র চর্চাব আধুনিকতাব প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন । ইউবোপেব সমকালীন আলোকচিত্র চর্চাব সঙ্গে সাযুজ্য বেখে উনিও পবীক্ষা-নিবীক্ষা পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ছিল । যদিও আক্ষবিক অর্থে ১৮৭০ - ১৮৯৬ খ্রীঃ । ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত বাজসিংহাসনেব দাবি নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবাজকুমাব নবদ্বীপ চন্দ্রেব (কুমাব শচীন দেববর্মণেব পিতা) মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়াব পব ব্রিটিশ সবকাব কর্তৃক খেলাত বা খিলাত ও বোবকাবী (সম্মান ও অধিকাব) প্রাপ্ত হয়ে ১২০টি স্বর্ণমুদ্রা নজবানা দিয়ে বাজ্য শাসনেব "স্বাধীন" অধিকাব প্রাপ্ত হন । সেই সময় বৃটিশ ভাবতেব এক অবসাব প্রাপ্ত ইংবেজ সিভিলিয়ান মিঃ ম্যাকেঞ্জীকে চাকলা বোশনাবাদেব জমিদাবীব ম্যানেজাব নিযুক্ত কবেন । তিনি ফটোগ্রাফীব বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন । তাঁব মাধ্যমে ও একান্ত প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ড থেকে ফটোগ্রাফীব প্রচুব বইপত্তব ও "কেমিক্যালস্" আনতেন । ওদিকে জনৈক ফবাসী নাগবিক মঁশিয়ে এপোলোস্বিযাস মহাবাজ বীবচন্দ্রেব অন্যতম বাজকর্মচাবী পদে বৃত্ত ছিলেন। তাঁব সাহায্যেও ফবাসী দেশ থেকে ফটোগ্রাফীব বই পুস্তক এনে চর্চা কবতেন মহাবাজ আলোকচিত্র গ্রহণেব "মনুষ্যাকৃতি" ক্যামেবা, প্লেট, প্রিন্টিং পেপাব নিজে হস্তে তৈবী কবে বিস্ময় সৃষ্টি কবেছিলেন । এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য কবতেন ডার্ককম সহকাবী কষীচন্দ্র দেব, নাজীব সাহেব দীনবন্ধু দেববর্মা, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ । ওদিকে বৃটিশ সিভিলিযান মিঃ ম্যাকমিলান বৃটিশ ইণ্ডিয়া থেকে অবসবপ্রাপ্ত হয়ে "স্বাধীন ত্রিপুবাব" অত্যুৎসাহী মহাবাজ বীবচন্দ্রে বাজকার্যে সহায়তা কবাব জন্য ত্রিপুবায় চাকুবী নিয়ে চলে এসেছেন । উনিও মহাবাজকে তৎকালীন যুগেব "দাগোবা টাইপ", "প্লেটিনা টাইপ" "ফটোগ্রাভিযা" এবং "প্ইবা ডেভেলপাব" পদ্ধতিতেও ছবি

তোলার পরিস্ফুটন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন । মহারাজ বীরচন্দ্র ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে নিজ কনিষ্ঠা মহিয়সী শ্রীমতী মনমোহিনী দেবীও অন্যান্য রাজকুমারী নিজ পুত্র যুবরাজ রাধাকিশোর এবং প্রথম মহারাণী ভানুমতীদেবীর গর্ভজাত পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ (বড় ঠাকুর), কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণ প্রভৃতিকে ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ও শিক্ষাদান করে গিয়েছিলেন । মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর "মানাঘরে" (একমাত্র মহারাজ ব্যতিত অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ) ওখানে বসে "বিবসনা" রমনীদের "ন্যূড" ছবি চিত্রাঙ্কন করতেন । তৎকালীন যুগে সমগ্র পৃথিবীর "ন্যূডস্টাডি" (নগ্ন ছবি) শিল্প চর্চার একটা নান্দনিক মানসিকতা গড়ে উঠেছিল । কারো কারো নিকটে এই শিল্পকলা অশ্লীলতাপূর্ণ বলে বিবেচিত হত, কিন্তু শিল্প ও সৌন্দর্যের অপার বিষ্ময়ের অধিকারী বলে গণ্যও হতো । ইউরোপীয় সৃজনশীল প্রখ্যাত শিল্পীদের অংকিত বা ফটোগ্রাফ - এর সত্যতা প্রমাণ করে।

মহারাজ বীরচন্দ্র কর্তৃক গৃহীত তৎকালীন যুগের চৌদ্দ দেবতার বাড়ী যাবার পায়ে হাঁটা পথে চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি, সরোবরে শত শত প্রস্ফুটিত পদ্ম, শাপলা ফুলের নৈসর্গিক দৃশ্যকে মহারাজ বীরচন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীঃ "কলোটাইপ প্লেটে" আলোকচিত্রের মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন । এছাড়া তৎকালীন যুগে পি ও জি (খুবই পাতলা) পেপারে যা আজ নেগেটিভ থেকে ১৩৩ বছর পূর্বে গৃহীত ও মুদ্রিত হয় তার একটি কপি প্রবন্ধকারে দুর্লভ সংগ্রহে এখনও সংরক্ষিত আছে ।

১৮৮৪ খ্রীঃ থেকে নতুন হাবেলীর রাজপ্রাদে ১৮৬২ খ্রীঃ মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক নির্মিত পূর্বেকার রাজপ্রাসাদ) প্রতিবছর "ক্যামেরা ক্লাব অফ ত্রিপুরা" কর্তৃক ফটো প্রদর্শিত হতো । এতে মহারাণী মনমোহিনী দেবী, রাজকুমারী, রাজকুমারগণ অংশগ্রহণ করতেন । এদের মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনমোহিনী দেবী একজন সুদক্ষ মহিলা আলোকচিত্রী ছিলেন । ১৮৯১ খ্রীঃ তাঁর গৃহীত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তোলা ছবি "ক্যালকাটা ফটোগ্রাফীক ইন্টারন্যাশন্যাল" এক্জিবিশানে প্রদর্শিত হয়েছিল । মহারাজ বীরচন্দ্রের ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে তাঁরই অমাত্য তৎকালীন ভারতের অন্যতম পণ্ডিতপ্রবব শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত "প্রদীপ" মুখপত্রে বিশদ আলোচনা করেছিলেন ।

১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে মহারাজ বীরচন্দ্রের তাঁর ফটোগ্রাফীর নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চর্চ্চার সম্মানস্বরূপ তৎকালীন "ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার" আজীবন সদস্য করেন এবং আমৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিলেন । ১৮৯২ খ্রীঃ মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কার্শিয়াং ভ্রমণের সময় কবির যে প্রতিকৃতি (Portrait) তুলেছিলেন সেটা "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়ে মহারাজ বীরচন্দ্রের আলোকচিত্র শিল্পকলার এক অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে ।

১৮৯২ - ৯৩ খ্রীঃ "ত্রিপুরা সরকারী ষ্টেট প্রেসে" কলোটাইপ ও ফটোগ্র্যাভি" পদ্ধতিতে রঙ্গীন (এক রঙ্গা) ছবি ছাপাবার যন্ত্র এনেছিলেন এবং মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের দুখানা ছবি মুদ্রিতও হয়েছিল । "কলোটাইপ" ও "ফটোগ্যাভি" পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরায় রাজবংশের ইতিহাস রাজরত্নাকর ১ম খণ্ড সংস্কৃত দেবনাগরী লিপিতে পুস্তকের রঙ্গীন ফটো ও পরিকল্পনা তার দ্বারা গৃহীত । মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এক্সরে পদ্ধতিতে রঞ্জন রশ্মি প্রতিফলিত করে এক অভিনব পদ্ধতিতে ছবি তোলার যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সেই কামনা অসম্পূর্ণ রেখে দেয় । আমেরিকা হতে প্রকাশিত Practical Photography তাঁর ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় ।

সেকালের পরবর্তী অধ্যায় ঃ- মহারাজ বীরচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, যুবরাজ রাধাকিশোর, বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা আলোকচিত্র গ্রহণে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মান বজায় রেখে গেছেন । এদের মধ্যে মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজে ফটো তোলার

ক্যামেরা, প্লেট পরিস্ফুটনের বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যালস নিজে তৈরী করতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরই ডার্করুম অ্যাসিষ্টেন্ট মণিপুরী "কেচুই সিং" প্রভূতভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। সমরেন্দ্রচন্দ্র মাতাপিতার সান্নিধ্যে মাত্র ছয় বৎসর থেকে ফটোগ্রাফী চর্চা শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর অত্যুৎসাহী সৃজন প্রতিভার দ্বারা তৎকালীন যুগের "ছবি" তোলারও পরিস্ফুটনের বিবিধ কলাকৌশল (technics) সুচারুরূপে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছিলেন। অল্প আলোতে সেই যুগে ছবি তোলায় বেশ একটা সমস্যা দেখা দিত। এর জন্য Wet plate এর পরিবর্তে Dry plate ছবি তুলে Zelotne High Speed পদ্ধতিতে পরিস্ফুটন করে দিতেন। ফটো প্লেটে ছবি গ্রহণ করে ছাপাবার জন্য Aluban পেপাব ব্যবহার করে ত্রিপুরার মত গরম আবহাওয়ায় এর যথার্থ সুফল প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী সময়ে ঐ Platinotype পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিলেন। "কার্বণ" ও "প্লাটিনোটাইপে" উভয় পদ্ধতিতে ছবি ছাপা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Pictorial Photography এক প্রবন্ধে যে তথ্য সহকারে লিপিবদ্ধ করে গেছে। তাঁর সম্বন্ধে বৃটেনের Photography Society ও Photography Society of India প্রসেডিং-এ ৭ই জানুয়ারী, ১৮৯২ খ্রীঃ রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। সমরেন্দ্রচন্দ্রের শত শত গৃহীত ফটোগ্রাফগুলি একটা বিশেষ নৈসর্গিক স্তব্ধতাকে অনুসরণ করত। ১৮৯১ খ্রীঃ কলকাতাব তাঁর "সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের" সেই অবিস্মরণীয় সাদা-কালো ছবিটি লণ্ডনের "বৃটিশ অ্যামেচার ফটোগ্রাফার্স সোসাইটি" আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি তৎকালীন সমগ্র ভারবর্ষের ফটোগ্রাফী জগতে একটা সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য কয়েক বছর আগে (১৯৯৯ খ্রীঃ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় "কলকাতার কড়চা' নিবন্ধে অতীতের স্মৃতিতে সমরেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর গৃহীত ছবি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছে। বহু পুরস্কার বিজয়ী ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির সেকালের প্রখ্যাত সৃজনী আলোকচিত্র শিল্পী সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সম্বন্ধে "আনন্দ পাবলিশার্স" কর্তৃক প্রকাশিত সিদ্ধার্থ ঘোষ রচিত পুস্তকে (১৯৯৮) বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরার পক্ষে এটা অত্যন্ত গর্বের।

ত্রিপুরা আলোকচিত্র চর্চার জগতে অনন্ত প্রতিভা কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা। মহারাজ বীরচন্দ্র ও সমবয়সী মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঠাকুর মহিমচন্দ্র উচ্চশিক্ষাকল্পে কলকাতায় গমন করেন এবং তাঁরই সহপাঠি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সখ্যের সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ছিল অবাধ যাতায়াত তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর জীবন চৈতন্য বোধ। সে সময় কলকাতার প্রখ্যাত আলোকচিত্র গ্রহণকারী ও আলোকচিত্র গ্রহণের ক্যামেরা, ফিল্ম, পেপার এবং অন্যতম আধুনিক ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম বিক্রেতা মেসার্স বার্ণ অ্যান্ড শেফার্ড' এর সঙ্গে মহিমচন্দ্রের নিবিড় সখ্য গড়ে উঠেছিল। ওদিকে মহিমচন্দ্র মহারাজ বীরচন্দ্র ও সমবয়সী সমরেন্দ্র চন্দ্রের কাছে থেকে পুরাতন আগরতলা রাজপ্রাসাদে ও নতুন হাবেলীতে নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের উভয়স্থানে "ফটো স্টুডিও" তথা "ছবিঘরে" গভীর আলোকচিত্র চর্চার সুযোগ তাঁকে অতি উচ্চমানের আলোকচিত্র শিল্পীতে পরিণত করেছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের অমাত্য শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধারমন ঘোষ এবং মিঃ ম্যাকেঞ্জি, মিঃ ম্যাকমিলান, মঁশিয়ে এপোলেনিয়াম এঁদের কাছ থেকেও তৎকালীন সময়ে ফটোগ্রাফী চর্চার বিবিধ কলাকৌশল আয়ত্ত্ব করেছিলেন।

আগরতলায় মহারাজ বীরচন্দ্র নিজ হাতে তৈরী ফটোগ্রাফীর "দাগরো টাইপ" ও "কলোটাইপ" পদ্ধতিতে গৃহীত ছবি ও প্লেট দিয়ে কলকাতার বন্ধু-বান্ধব এবং তৎকালীন যুগের কলকাতার প্রখ্যাত স্টুডিও ডি রতন, বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ড এঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ইতিমধ্যে Karl Zeiss, Kodak, Ilford Agfa, Gevart প্রভৃতি বিভিন্ন কোম্পানীর ফোল্ডিং ক্যামেরা বাজারে এসে গেছে। মহিমচন্দ্র ঐ সমস্ত

ক্যামেবা সংগ্রহ করে মহাবাজ বীবচন্দ্রকে এনে দিয়ে এদেব প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতেন । সে যুগে বেশীবভাগ আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান বা আলোকচিত্র গ্রহণকাবীগণ FIELD CAMERA তথা তিনটি পর্যায়েব উপব বেলো সিস্টেমেব লম্বা ক্যামেবা বসিয়ে কালো কাপড়ে ঢেকে পিছনে ঘসা কাচেব উপব (Ground Plan) "বিষয়েব ছবি" সামনেব লেন্সেব মাধ্যমে প্রতিফলিত করে, ফোকাস মিলিয়ে এবপব "ডার্ক লাইট" ফ্রেমেব ভিতব কাচেব নির্মিত প্লেট ঢুকিয়ে ১,২,৩, সেকেণ্ড সময় নিয়ে ছবি গ্রহণ কবতেন । বলা বাহুল্য প্রবন্ধকাব প্রথম জীবনেও (১৯৪৬ খ্রীঃ) পিতাব প্রফুল্ল সেনগুপ্তেব তত্ত্বাবধানে ঐ পদ্ধতিতে ছবি গ্রহণের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে পববর্তী সময়ে অনেক ছবি তুলেছেন ।

তৎকালীন যুগে ত্রিপুবাব ফটোগ্রাফী চর্চা সম্বন্ধে সুলেখক কর্ণেল ঠাকুব মহিমচন্দ্র দেববর্মণ দেশীয় বাজ্য, ভাণ্ডাব, প্রবাসী, প্রদীপ - বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন । তাঁব গৃহীত বহু ছবি ১৯৩০ খ্রীঃ অপূর্বচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ইংবাজীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত Progressive Tripura- তে ছাপা হয়েছে । ববীন্দ্রনাথ ও মহাবাজ বাধাকিশোবেব যৌবন বয়সেব একসঙ্গে বসা অবস্থায় সেই দুর্লভ ছবি ব্যতিত আবো বহু ছবি এবং ১৯০৯ খ্রীঃ মনিপুব মহাবাজ চূড়াচাঁদ সিংহেব আগবতলা ভ্রমণেব ছবি তাঁবই গৃহীত । কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সম্পাদিত বাজমালাব বহু ছবি তাঁব তোলা ।

ঊনবিংশ শতাব্দিব গোড়াব দিকে তৎকালীন সময়ে মহাবাজকুমাব মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ, মহাবাজকুমাব নবেন্দ্রকিশোব দেববর্মণ, মহাবাজ কুমাব ব্রজেন্দ্রকিশোব ও বণবীবকিশোব ভ্রাতৃদ্বয়, মহাবাজ বীবেন্দ্রকিশোব, মহাবাজকুমাব নবোত্তম কিশোবেব গৃহীত বহু ছবি দিয়ে একদা বাজপ্রাসাদেব হলঘবে নিয়মিত ছবি প্রদর্শিত হতো ।

ত্রিপুবাব আলোকচিত্র চর্চাব আদিকাল তথা ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এই শতবর্ষেব আলোক প্রদীপে বহু প্রখ্যাত বাজা, মহাবাজা, কর্তা এবং বাঙালী আলোক চিত্রশিল্পীগণ তাঁদেব সৃজনী শিল্প প্রতিভাব স্বাক্ষব তৎকালীন যুগে গৃহীত ঐ সমস্ত Still Photo তথা স্থিবচিত্র'ব মাধ্যমে বেখে গেছেন । বাজন্য যুগ থেকে বংশ পবম্পবায় যে সমস্ত বাঙালী ত্রিপুবায় বসবাস কবতেন এঁদেব মধ্যে বমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৯৬ থেকে ১৯৫০ খ্রীঃ ফটোগ্রাফী শিল্পকলা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি বেখে গেছেন । ঠাকুব পবিবাবেব নবেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ (নকু ঠাকুব) শৈলেশ চন্দ্র দেববর্মণ , নবেনচন্দ্র দেববর্মণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ফটোগ্রাফী শিল্পকে পেশারূপও নিয়েছিলেন । নকু ঠাকুবেব (নবেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ) কর্তৃক গৃহীত ১৯২৬ খ্রীঃ ববীন্দ্রনাথেব সপ্তমবাব আগবতলাব আগমণেব সময বর্তমান বাজভবনেব তথা তৎকালীন সময়েব "পুষ্পবন্ত বা কুঞ্জবন" প্রাসাদেব গোল বাবান্দায় ববীন্দ্রনাথেব সেই ছবি এবং উমাকান্ত একাডেমী হলঘবেব সামনেব গোলাকাব স্থানে "কিশোব সাহিত্য সমাজ কর্তৃক কবিকে সম্বর্ধনাব ছবি দু'টি (ববীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুবা শতবর্ষ স্মাবক গ্রন্থে মুদ্রিত) অতীতেব স্মৃতিকে আজো ধবে বেখেছে । তেমনি অতীতেব ত্রিপুবাব অবলুপ্ত জ্যাকসন গেইট, কাবমাইকেল ব্রীজ, কবণোশেন্ প্যাণ্ডেল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, লালমহল, বাজন্য যুগেব বাজপথ, হাতীব মিছিল, এমনি শত শত দুর্লভ আলেখ্য সেকালেব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিব ধাবক ও বাহক হয়ে আছে।

ত্রিপুরাব আলোক চিত্র চর্চার একাল - ঊনবিংশ শতাব্দিব মধ্য যুগ থেকে বিংশ শতাব্দিব মধ্য যুগ পর্যন্ত সময়টাকে আমবা ত্রিপুবাব ফটোগ্রাফী শিল্প চর্চাব "সেকাল" বলে গণ্য কবতে পাবি অর্থাৎ ভাবতেব স্বাধীনতা প্রাপ্তিব পূর্বেব যুগ । ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগেব পব অগণিত শবনার্থী ত্রিপুবায় এসে আশ্রয় গ্রহণ কবা সত্ত্বেও সেকালেব আলোক চিত্রশিল্পীগণই ত্রিপুবাব প্রতিনিধিত্বেব দাবিব স্বাক্ষব বেখে গেছেন । ১৯৪০

খ্রীঃ থেকে ফটোগ্রাফী চর্চার মধ্যে একটা বিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। যাকে আমরা "New think" রূপেও বলতে পারি। তৎকালীন যুগে প্রথম পেশাদার আলোক চিত্রশিল্পী ও বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত একই আলোকচিত্রের উপর একই ব্যক্তি হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছেন, তবলায় সঙ্গত করছেন ও শ্রোতারূপে শুনছেন এই রূপ ছবি তুলে বেশ একটা কৌতূহল সৃষ্টি করেছিলেন। একে বলা হতো "ট্রিকস ফটোগ্রাফী"। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ও পরে ১৯৪৫ / ৪৬ খ্রীঃ বিনয় গাঙ্গুলী আধুনিক পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আলো ও যন্ত্রপাতি দিয়ে "ইলেকট্রো স্টুডিও" নাম দিয়ে সর্ব প্রথম ফটো স্টুডিও স্থাপন করেছিলেন। স্থানটি ছিল বর্তমান সেন্ট্রাল রোডের "পার্শ্বনাথ বস্ত্র ব্যবসায়ীর" দোকানের বাঁ দিকে।

বিংশ শতাব্দির ত্রিপুরা তথা আগরতলায় আলোকচিত্র চর্চার একালকে চারটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১৯০০ ১৯৩০ খ্রীঃ, ১৯৩০ - ১৯৫০, ১৯৫০ - ১৯৭০, ১৯৭০ - ২০০০ খ্রীঃ। ১৯০০ ১৯৫০ পর্যন্ত পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকে ত্রিপুরায় আলোকচিত্র চর্চার আধুনিকীকরণের যুগ বলা যেতে পারে। সে সময় আগরতলার সর্বপ্রাচীন প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৯২৪) সরোজ স্টুডিও তথা পূর্ববর্তী সময়ের "সেন অ্যাণ্ড সেন" (১৯১০) একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহ্য বহণ করে গেছে তারই পথিকৃৎ হয়ে ১৯৪৫ খ্রীঃ বিনয় গাঙ্গুলীর "ইলেকট্রো স্টুডিও", প্রবীর দেবের "স্টুডিও রূপবাণী", অশ্বিনীকুমার সাহার "স্টুডিও কল্পলোক", সুবোধ মজুদারের "ছায়ালোক", হরিদাস (দাসু) বসাকের "উজ্জ্বলা স্টুডিও", ত্রিপুরার প্রথম যাদবপুর প্রিন্টিং অ্যাণ্ড টেকনোলজির থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কনু বোসের (চিররঞ্জন) "বোস অ্যাণ্ড কোং" পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত আবদুল খালকের "স্টুডিও চিত্ররেখা" শ্যামল দাসের "পার্ট স্টুডিও" প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত স্টুডিওগুলি বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা In door এ "সুটিং" করতেন এবং Out door -এ বিশেষ করে যেখানে আলোর অভাব সেইসব ক্ষেত্রে Flash Bulb দ্বারা "সংবাদ চিত্র" অথবা পারিবারিক ছবি তুলতেন।

ছয়ের দশক থেকে আলোক চিত্রকে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্ত, প্রবীর দেব ও কনু বসু। ত্রিপুরার বাইরে এরা বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। স্টুডিও কল্পলোকে ১৯৫৭ খ্রীঃ থেকে প্রায় প্রতি বৎসর শিল্প সুষমামণ্ডিত আলোকচিত্রের মাধ্যমে এর শিল্প সৌন্দর্যকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। ১৯৫৯ খ্রীঃ প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্তর "Dead still alive" বিখ্যাত ও "Door of a trap" ছবি দু'খানি ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনাতে প্রদর্শিত হয়ে ত্রিপুরার সম্মান বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৬১ খ্রীঃ তিনি ত্রিপুরা থেকে সবপ্রথম রয়েল ফটোগ্রাফী সোসাইটি, ব্রিটেন" - এর সদস্য পদ লাভ করেন। এছাড়া "ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফীর" (১৯৫৯) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রূপে পরিগণিত ছিলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ তাঁর সৃষ্ট ছবিগুলি ত্রিপুরার বাইরে শারদীয় যুগান্তর, দেশ, মার্গ পাবলিকেশন Times of India প্রভৃতিতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্ত, চিত্ত সেন, দিলীপ দেববায়, সুজিত দেববায়ের গৃহীত সংবাদচিত্র সমূহ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আজও দলিল রূপে স্বীকৃত হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দির ৬০ ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে চিত্ত সেনের "স্টুডিও সেনগুপ্ত" দিলীপ দেববায়ের "স্টুডিও ক্লিক" সুনীল দাসের "স্টুডিও ফ্ল্যাক্স" এবং "সাহা স্টুডিও", "কল্পনা" পেশাদারী আলোকচিত্র আপন পারদর্শিতা আজও রেখে যাচ্ছে। '৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের - আগরতলায় ও মফঃস্বলে বেশ কিছু অ্যামেচার ফটোগ্রাফার পেশাদার ফটোগ্রাফীতে চলে আসেন। এদের মধ্যে "স্টুডিও অপর্ণা" (অধুনা লুপ্ত), "মিতালী", "বণিক স্টুডিও", "সিনেট", "রাজলক্ষ্মী", "আশা", "বিপাশা", "বৈশাখী", "ফুজিকা", "মনসা", "লিবার্টি", "মায়া", "উত্তম", "স্টুডিও সেন", "বিয়া", "অপ্সরা", "প্রভা", "ভৌমিক",

"কিন্নারা", "ডলফিন", "ঝলক" এমনি আগরতলা ও মফঃস্বলের অনেক পেশাদারী ফটোগ্রাফী স্টুডিও।

১৯৬৪ সনের পূর্বে মফঃস্বলের ধর্মনগরের নিকুঞ্জবিহারী নাথ, কৈলাশহরের বলরাম আচার্য, কুমারঘাটের লোকেশ দাস, তেলিয়ামুড়ার সুনীল চক্রবর্তী, মাখন দেব, খোয়াই-এর সুনীল বিশ্বাস, উদয়পুরের কুসুম রায়, শিবশঙ্কর দে, সমীর রায়, সোনামুড়ায় মতিলাল রায়, সাব্রুমের প্রিয়তোষ নন্দী প্রভৃতি আলোকচিত্র গ্রহণে নিজ-নিজ শহরে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে '৭১ সনের পর ত্রিপুরার সর্বত্র আলোকচিত্রকে পেশাদারী রুজি - রোজগারের প্রেক্ষাপটে এর যে "শৈল্পিক নান্দনিক দিক" সেটা প্রায় হারিয়ে গেছে।

আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর পূর্বে ১৯৬৪ খ্রীঃ মহারাজকুমার নরোত্তমকিশোর দেববর্মাকে প্রবীর দেবকে সভাপতি, রবীন সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক সুবোধ মজুমদার ও রুনু বোসকে যুগ্ম সম্পাদক এবং অশ্বিনী কুমার সাহাকে কোষাধ্যক্ষ করে "Photographer's Associations of Tripura, Regd NO. 56" নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার আলোকচিত্র শিল্প চর্চার উন্নতি সাধন ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

চিত্র সাংবাদিকতা - ত্রিপুরার তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহ তাদের প্রেসের প্রিন্টিং অসুবিধা সত্ত্বেও "সংবাদ চিত্র সমূহ" কলকাতা থেকে ব্লক করে এনে তাঁদের সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। সেদিন পেশাদার আলোকচিত্র শিল্পীগণই "PRESS PHOTOGRAPHY" -র দায়বদ্ধতা বহণ করতেন। ১৯৫৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত এই প্রবন্ধকারের গৃহীত ও প্রেরিত ফ্রি -ল্যান্সার চিত্র সাংবাদিকের চিত্র সমূহ আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ব্লিৎস, অমৃত বাজার, দেশ - বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে তৎকালীন সময়ের সংবাদসমূহকে বস্তুত সত্যনিষ্ঠ রূপে প্রত্যয়িত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিশেষ করে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশে এবং বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে প্রামাণিক চিত্রসমূহ যথাযথভাবে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে "চিত্র সাংবাদিকতার" উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। সেই ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের সঙ্গে রুনু বসু, সুজিত দেবরায়, চিত্ত সেন, দিলীপ দেবরায়ের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। বর্তমানে ত্রিপুরায় কর্মরত চিত্র সাংবাদিকগণ "Press Photographer's Association" তৈরী করেছেন ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও সাদা-কালো আলোকচিত্র গ্রহণের পাশাপাশি রঙ্গীন আলোকচিত্র গ্রহণের প্রচেষ্টা শুরু হয় বিগত শতাব্দির ৬০ দশক থেকে। এই ব্যাপারে প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্ত ও প্রয়াত প্রবীর দেব অগ্রগণ্য। প্রবন্ধকারের ১৯৬২ সনে রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণের রঙ্গীন ছবিগুলো সেই সাক্ষ্য আজও বহন করছে।

বিগত বিংশ শতাব্দির ৯০ দশকেও এর কিছু বৎসর পর্যন্ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগরতলায় রঙ্গিন ছবি প্রিন্টিং ও প্রসেসিং (ম্যানুয়েল) পদ্ধতি চালু করেন "স্টুডিও সেনকোর" চিত্ত সেন ও পরবর্তী সময়ে বোস অ্যাণ্ড কোং ও আরো কয়েকজন বর্তমানে আগরতলায় অটোমেটিক কালার প্রসেসার ও প্রিন্টাররূপে বেশ কয়েকটি কালার ল্যাব তৈরী হয়েছে। ত্রিপুরার সংবাদ চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিজম অ্যাণ্ড মাস কম্যুনিকেশন" বেশ একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। চিত্র সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণে এর কোর্স ডিরেক্টার ও ফেকাল্টি মেম্বার নিযুক্ত হন প্রবন্ধকার রবীন সেনগুপ্ত। এছাড়া "অর্কনীড়" নামক একটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এন জি ও) ফটোগ্রাফী প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর শিক্ষকতায় আছেন "ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার" বর্তমান সম্পাদক ও স্টুডিও ক্লিক - এর শ্রী দিলীপ দেবরায়।

পর্যালোচনা - ত্রিপুরার সেকাল ও একালের ফটোগ্রাফী চর্চার উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবশ্যই কিছুটা বিতর্ক আছে। ১৮৫৬ ইং থেকে ১৯৫৬ ইং এই শতবর্ষে ছিল ফটোগ্রাফীর দৃষ্টিনন্দনকারী সাদা-কালো ও রঙ্গীন ছবির

বিভিন্ন পর্যায়ের স্বর্ণযুগ । যেমন Pictorial, Human Portrait, Tricks photography, Hard colour Bromaid, Lantern Slides, Toning Bath (Sepia, green, brown etc). Reversal Colour Photo Slides, experimental Photo ইত্যাদি বিশেষ করে Plete ও Film এর Speed প্রিন্টিং পেপারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রেড ও পর্যায় যেমন, Glassy, Lustre, Mat, Semi Mat, Gasslight, silter এমনি আরো অনেক । ছবির দৃশ্যগত চরিত্র Neagative density বুঝে এদের বিভিন্ন পেপারে মুদ্রিত করে এক শৈল্পিক রূপ দেওয়া হতো । তেমনি সাদা - কালো 'Light & shade' এর প্রয়োগকে অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে প্রয়োগ করে এর প্রাধান্য দেওয়া হতো ।

তেমনি সেকালের আলোকচিত্র গ্রহণকারীদের বিভিন্ন ক্যামেরাগুলিও ছিল তৎকালীন যুগের আবিষ্কৃত ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে নির্মিত । দৃশ্যের উপর প্রতিফলিত আলো বিচ্ছুরণের মাপ অনুমান করে নিজ অভিজ্ঞতায় এক্সপোজার নিতে হতো । এর সঙ্গে প্লেট ও ফিল্ম-এর স্পিড কথা অবশ্যই চিন্তায় থাকতো । বিংশ শতাব্দির ৩-এর দশকের আগেও পরে Exposer Meter এ আলোর গতি মাপ নিরূপণ করে দৃশ্যের ছবি গ্রহণ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় । এরও অনেক অনেক পূর্বে Pictorial Photo তুলতে হলে আকাশকে আলাদা, নদী, সমুদ্রকে আলাদা এবং প্রকৃতির গাছপালা পৃথক পৃথকভাবে ছবি গ্রহণ করে একত্রে সুপার ইম্পোজ করে প্রিন্ট করা হতো । এর কারণ ছিল ফিল্ম বা প্লেট Slow speed থাকার জন্য ।

প্রবন্ধকার ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে কবির একটি ৩০" x ৪০" সাদা-কালো প্রতিকৃতি প্রথম এনলার্জ করেন এবং শতবর্ষের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় । এরপর আরও বৃহদাকার এনলার্জমেন্ট যথা ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত স্থানীয় উন্নয়ন প্রদর্শনী, কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ত্রিপুরার বাইরে উন্নয়ন প্রদর্শনী, দিল্লীর বাণিজ্যমেলার এবং এর পরেও প্রবন্ধকারের সেন অ্যাণ্ড সেন স্টুডিও, স্টুডিও সেনকো ও প্রচার দপ্তরের আলোকচিত্রীগণ নিজস্ব শিল্প ও সৌন্দর্যের সাক্ষর রেখে গেছেন । প্রবন্ধকার কর্তৃক প্রস্তুত ১২" x ৪" দীর্ঘ রঙ্গীন ও সাদা কালো এমন বহু ছবি দিল্লী, কলকাতা, গৌহাটি বাণিজ্যমেলায় প্রদর্শিত হয়ে ত্রিপুরার আলোকচিত্র শিল্পীদের গুণগত কলাকৌশলকে সারা ভারতে ত্রিপুরার স্থান উঁচু করে দিয়েছিল । যা বিংশ শতাব্দির ৯০ দশকের আলোকচিত্রীগণের চিন্তা ও বোধ শক্তির বাইরে ।

অ্যামেচার তথা সৌখিন আলেকচিত্রীর সংখ্যা সেকালের থেকে একালে সংখ্যায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা সম্ভবপর হয়েছে সহজলভ্য ফিক্সড Lens এর Auto 35mm ক্যামেরার দৌলতে । মুখ্যতঃ এরা রঙ্গীন ছবিই বেশী (৯৯ শতাংশ) তুলে থাকেন । কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন ও ছবির উৎকর্ষতার মান খুবই নিম্নমানের । 'ডফটোগ্রাফী" একটা বিজ্ঞানভিত্তিক নেশা ও পেশা । এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ বই পুস্তক পড়াশোনার খুবহ প্রয়োজন আছে । যা স্থানীয় একালের পেশাদার ও সোখিন ফটোগ্রাফারদের মধ্যে প্রায় নেহ বলতে হয় ।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির যুগে বেশীভাগ ক্যামেরা "ম্যানুয়েল" পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল, তাই আলোকচিত্রীগণকে Film - এর Speed মাথায় রেখে নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী Shutter speed, Diaphragm কে সেইভাবে adjust করে exposure নেওয়া হতো একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । সেসব ক্ষেত্রে Camera চালিত হতো তাঁদের অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে । বর্তমান যুগে Automatic ও Digital System এ প্রস্তুত Camera পরিচালিত করছে আলোকচিত্রীদের । সেক্ষেত্রে exposure ও shutter speed, Diphragm এর তারতম্য ঘটিয়ে নিজস্ব-শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে তাঁরা পরাঙ্মুখ। একথায় তাঁরা camera ক্রীতদাস । নিজস্ব কোন প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ । তেমনি সাদা-কালো ছবি

করতে যে সমস্ত Processing chemicals এর দরকার সেটা তাঁরা সহজলভ্য 'রেডিমেড' তৈরী কিনে ব্যবহার করেছেন। সেখানে পৃথক পৃথক কোন ক্যামিকেলসের কি গুণগত মান, কোনটা কম বেশী হলে ছবির tone -এ কি ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে "অজ্ঞতা" থাকায় সেকালের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলোকচিত্রদের দক্ষতার তুলনার বিচারে এঁরা পিছিয়ে যাচ্ছে।

রঙ্গীন ছবি গ্রহণের ক্ষেত্রে রঙ্গীন ছবিতে যে Negative তৈরী হবে সেখানে প্রধান (Prime) তিনটি Colour থেকে ছয়টি রং এর সৃষ্টি হবে। Yellow, Red, Megenta, Blue, Cyan, Green এই রং ছবি প্রিন্টে প্রতিফলিত হবে। তাই রঙ্গীন ছবি তুলতে গেলে বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে একালের কিছু পেশাদারী আলোকচিত্রীগণ যথেষ্ঠ সতর্কতার সঙ্গে ছবি তুলছেন, এটা বড়ই গৌরবের। Reversal (Positive) কিন্তু কিছু থেকে Separation Negative তৈরী করে বিভিন্ন রং-এর পরিশুদ্ধতা বজায় রেখে Colour Paper- এর উপর প্রিন্ট হবে এখানে সে ব্যবস্থা নেই। এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় পর্যায়ে আগরতলার Clour Lab গুলোকে অগ্রণী হতে হবে। এমনকি Colour Negative Process এ যথেষ্ঠ ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। Colour Paper এ প্রিন্ট এর উপর Colour Balance ও tone সঠিকভাবে বজায় থাকছে না। কলকাতা বা ভারতের অন্য কোথায় থাকে Colour ছবি প্রিন্ট করলে এর সঙ্গে এখানকার Lab গুলির তৈরী প্রিন্টগুলির গুনমানগত অনেক নিম্ন ও অনুন্নত। সেদিকে নজর রেখে একালের স্টুডিওগুলোকে সচেতন হতে হবে।

পরিশেষে আলোকচিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ফটো সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে। ফটো সাংবাদিক বা প্রেস ফটোগ্রাফারদের পেশাগত আচরণবিধি ১৯৭৬ সনের ৮ই জানুয়ারী, ভারতের রাজ্যসভায় যেটা গৃহীত হয়েছে তাকে সম্যকভাবে মর্যাদা দিয়ে স্থানীয় চিত্র সাংবাদিক তথা প্রেস ফটোগ্রাফারদের (তা "ষ্টাফ ফটোগ্রাফার হউন কিংবা ফ্রীলান্সার হউন) এই মানতেই হবে। এক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের চেয়ে একজন ফটো সাংবাদিকের দায়িত্ব, বিপদ, জীবনের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। একজন সাংবাদিক ঘরে বসে এর মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করে নিবন্ধ বা সংবাদ তৈরী করতে পারেন। কিন্তু ফটো সাংবাদিককে নিজে ক্যামেরা দিয়ে "অকুস্থলে" গিয়ে ছবি সংগ্রহ করতে হয়। প্রবন্ধকারের দীর্ঘ ৫০ বছরের "ফ্রিলান্স চিত্র সাংবাদিকতার" অভিজ্ঞতায় এই প্রজ্ঞা লাভ হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে উত্তাল রনাঙ্গনের সেদিনের গৃহীত প্রামণিক দলিল রূপী ছবিগুলি এই সাক্ষ্য বহণ করছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা

সরোজ চন্দ

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভাবতে ত্রিপুবা ছিল বাজন্য শাসিত একটি দেশীয বাজ্য। ভাবত স্বাধীনতা লাভ কবাব পব ১৯৪৯ সালেব ১৫ই অক্টোবব ত্রিপুবাব ভাবতভুক্তি চূড়ান্ত হয এবং বাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজতন্ত্রেবও অবসান ঘটে সেদিন থেকে।

অতীতে ত্রিপুবা ছিল বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীব বাসভূমি এবং বাজ পবিবাবও ছিল উপজাতি বংশোদ্ভূত। কিন্তু একশ' বছবেবও আগে থেকে ত্রিপুবাব জনসংখ্যাগত ভাবসাম্য লক্ষ্যণীযভাবে পবিবর্তন ঘটতে থাকে। ত্রিপুবাব সীমান্ত সংলগ্ন পূর্ববঙ্গেব বিভিন্ন জেলা থেকে বাঙালীবা এ বাজ্যে এসে বসতি স্থাপন কবতে শুরু কবায় এখানে একটি মিশ্র জনবসতি গড়ে উঠে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগেব পব তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুল সংখ্যায বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদেব আগমনেব ফলে ত্রিপুবায উপজাতি জনসংখ্যাব হাব হ্রাস পেযে নেমে এসেছে ৩০ শতাংশে।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভাবতে বাজতন্ত্রী ত্রিপুবা আপেক্ষিক অর্থে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ কবত। এ বাজ্যেব আভ্যন্তবীণ বিষযে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ কবতেন না। তবে অভ্যন্তবীণ ক্ষেত্রে বাজাবা যে 'স্বাধীনতা' ভোগ কবতেন তা ছিল সীমাবদ্ধ আকাবেব স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয এ ধবনেব কোন ঘটনা যাতে না ঘটতে পাবে সেজন্য ব্রিটিশ শাসকেবা পলিটিক্যাল এজেন্টেব মাবফতে বাজ্যেব ঘটনাবলীব উপব সতর্ক দৃষ্টি বাখতেন। বিশেষভাবে তাদেব দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ ভাবতে স্বাধীনতাব যে জোযাব সৃষ্টি হচ্ছিল তাব ঢেউ যাতে বাজন্য শাসিত ত্রিপুবা তথা দেশীয বাজ্যগুলিতে এসে না লাগে। অন্যদিকে এ বাজ্যেব প্রজাসাধাবণেব মধ্যে যেহেতু ব্রিটিশ শাসনেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না সেহেতু স্থানীয জনগণেব মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী মনোভাবেব তীব্রতাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ববং 'স্বাধীন' বাজ্যেব অধিবাসী হিসাবে (বাজতন্ত্রী ত্রিপুবাকে এক সময়ে 'স্বাধীন ত্রিপুবা' নামে অভিহিত কবা হতো) এই বাজ্যেব বাসিন্দাদেব মধ্যে খানিকটা আত্মগৌববেব মনোভাব ছিল। ভাবাদর্শেব দিক থেকেও প্রজাবা ছিল বাজতন্ত্রেব প্রতি মোহাবিষ্ট। বাজাকে তাবা নবরূপী নাবাযণ রূপেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি কবত। এ ক্ষেত্রে উপজাতি এবং অনুপজাতি প্রজাদেব মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

সাধাবণভাবে বাজ্যেব এই অবাজনৈতিক পবিবেশ সত্ত্বেও উনিশ'শ বিশেব দশকেব শেষ দিকে থেকে খানিকটা পবিবর্তন লক্ষানীয হযে উঠে। সংখ্যায কম হলেও ছাত্র-যুবকদেব একটি অংশ বিপ্লবী কার্যকলাপের

প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর উচ্চতর শিক্ষার কোন সুযোগ সেই সময়ে এ রাজ্যে ছিল না। এখানকার যেসব ছেলে স্কুল জীবন শেষ করার পর কলেজীয় শিক্ষা পেতে চাইত তাদের বেশীর ভাগই যেত পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত)। আর কুমিল্লা ছিল সেই সময়ে বিপ্লবীদের (বিশেষভাবে অনুশীলন সমিতির) একটি শক্তিশালী ঘাটি, যে বিপ্লবীরা ছিলেন সশস্ত্র পন্থায় দেশকে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদের সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরার ছেলেদেরও কেউ কেউ বিপ্লবী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবী মতাদর্শের বীজ বহন করে নিয়ে আসে ত্রিপুরাতেও । এভাবেই আগরতলায় ১৯২৭ সালে প্রথমে ছাত্র সঙ্ঘ এবং পরের বছর ১৯২৮ সালে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল। যদিও শরীর গঠন (ব্যায়াম চর্চা) এবং সেবামূলক কাজকর্মকে কেন্দ্র করেই সঙ্ঘ দু'টি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ বয়সীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করা।

ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে 'স্মৃতির আলোয়' বইয়ে ছাত্র সঙ্ঘ ও ভ্রাতৃ সঙ্ঘ কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দিয়ে যা লিখেছেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। এ থেকে তখনকার সময়ে এ রাজ্যে ছাত্রদের একাংশের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেনঃ 'উমাকান্ত (একাডেমি) থেকে যেসব ছাত্র কুমিল্লাতে পড়তে যেত তাদের মধ্যে অনেকেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসে। নারায়ণ ব্যানার্জি ও নীলু গাঙ্গুলী ছিলেন সেরকম ছাত্র এবং তাদের মাধ্যমেই আগরতলার সাথে কুমিল্লার যোগাযোগ ঘটে এবং সেটা ছিল আমাদের (বিপ্লবী) কার্যকলাপের প্রথম যুগ। এই পর্যায়ে বীরেনের (বীরেন দত্তের) বিপ্লবী কাজের সূচনা Lilly Blossom দিয়ে এবং বিস্তার অগ্রগতি পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে। দেখা যায় গুপ্ত সমিতির মধ্যে ধীরে ধীরে অনেকেই এসে বীরেনের সাথী হন এবং গুপ্ত সমিতির কাজকর্মে অগ্রগতি লাভ করে ও প্রসার ঘটে Lilly Blossom থেকে ছাত্র সঙ্ঘে। ছাত্র সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল নীলু গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। কিছুদিন চলার পর ছাত্র সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায় এবং জন্ম নেয় ভ্রাতৃ সঙ্ঘ, পুরাতন কর্ণেল বাড়ীতে মুখ্যত শচীন্দ্রলাল সিংহ ও উমেশলাল সিংহের উদ্যোগে। ভ্রাতৃ সঙ্ঘ হয়ে উঠে একটি জীবন্ত সঙ্ঘ। আগরতলার অনেক ছাত্র পূর্বপাড়া, মধ্য পাড়া থেকে দলে দলে এসে এখানে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা ও শরীর চর্চা করত। এখানেই আসে সুখময় সেনগুপ্ত (পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী), আশু মুখার্জী, তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত এবং আরো অনেকে। ১৯২৮ সন নাগাদ ভ্রাতৃ সঙ্ঘ তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় আগরতলার সমাজ জীবনে। ব্যায়াম চর্চার প্রসার ঘটে আগরতলায় এবং এর মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের ধ্যানধারণা মূর্ত হয়ে উঠে। ছাত্রদের কাজের মাধ্যমে এ সময়ে যোগাযোগ ঘটে কুমিল্লা ও বরিশালের ব্যায়ামগারের সাথেও। ব্যায়ামের সুষ্ঠু প্রদর্শনী আকৃষ্ট করে যুবকদের। শচীনবাবু নিজেও ব্যায়াম চর্চায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শরীর চর্চার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী এ সময় আগরতলা শহরে সংঘটিত হয়। এবং এই প্রদর্শনী ভাল সংখ্যক যুবকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে সাহায্য করে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় এ সমস্ত অনুষ্ঠান সবই ছিল দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবার কাজে সহায়ক। ঐ সময় দেখা যায় সেবামূলক কাজে ছাত্র ও যুবকদের আগ্রহ। শচীনবাবুর নেতৃত্বে সেবামূলক কাজে আমরা তখনকার ছাত্রদল বেশ সংগঠিত হয়েছিলাম। এবং এভাবে ছাত্র যুবকরা সমাজসেবার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যবহারিক কাজকর্মে উদ্যোগ গ্রহণ ছিল সে সময় একটি বলিষ্ঠ প্রক্রিয়া। স্বভাবতই দেখা যায় সামাজিক অন্যায় আচরণের প্রতিবাদী শক্তি আগরতলায় ছাত্র-যুবকবৃন্দ আর তাদের নেতৃত্বে বীরেন (দত্ত), শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, কালীকুমার দে প্রমুখ।

শ্রী সেনগুপ্ত স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ঐ সময়কার আরও একজন বিপ্লবীর কথা উল্লেখ করেছেন যার

কাছ থেকে শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ ও বীরেন দত্ত 'দেশাত্মবোধের দীক্ষা নিয়েছিলেন'। এই বিপ্লবী হলেন রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর কথা উল্লেখ করে শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন, "এই সময় এই রাজ্যে (১৯২৫ - ২৬) উমাকান্ত স্কুলের সন্নিকটে (বর্তমানে যেখানে সমাজ শিক্ষা বিভাগ অফিস অবস্থিত) ছিল একটি সংস্কৃত টোল। আর সেই টোলে অধ্যয়ন করতেন রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি যে বিপ্লবী সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন এ খবর আমরা পরবর্তী সময়ে জানতে পারি। বিপ্লবী আন্দোলনের এই যুগ শুরু হয় তার এই টোলে অধ্যয়ন থেকে।

"রমেনদা যে এখানে কিভাবে এলেন তা আমার জানা নেই। কারও কাছ থেকে জানবার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু এটুকু জানি যে সেদিন যারা গুপ্ত সমিতিতে এসেছিলেন— শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, বীরেন দত্ত প্রমুখ তারা সকলেই রমেনদার কাছ থেকে দেশাত্মবোধের দীক্ষা নিয়েছিলেন।"

ভ্রাতৃ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রলাল সিংহ ও উমেশলাল সিংহের মধ্যে(উভয়ে নিকট আত্মীয়) উমেশলাল অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ (যিনি ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও ত্রিপুরার প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী) ৯৩ বছর বয়েসে ২০০০ সালের ৮ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীর রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ভ্রাতৃ সঙ্ঘের অন্যতম সদস্য (এবং পরিবর্তিত ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও মন্ত্রী) তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত অতীতের ঘটনাবলীর উল্লেখ করে লিখেছেন, "১৯২৭ - ২৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথমে ছাত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়। কিছুদিন পর শচীন্দ্রলাল সিংহ ও প্রয়াত উমেশলাল সিংহের নেতৃত্বে পুরাতন কর্ণেল বাড়ীকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ গঠিত হয়। এই সময়ে দুই সঙ্ঘের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়। প্রত্যেকেই তখন লাঠি খেলা ছুরি খেলা ইত্যাদি শরীর চর্চার প্রতিযোগিতা শুরু করে দুই দল পৃথকভাবে আগরতলায় এসব নিয়ে একাধিক প্রদর্শনী খেলারও আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে যোগদানকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা অঞ্চলের প্রতিযোগীরাও ছিলেন। প্রদর্শনীগুলিতে শচীন্দ্রলাল সিংহের বুকের উপর দিয়ে ফোর্ড গাড়ি (বর্তমান ট্যাক্সির মত) চালানো হয়। এই খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হই এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের বনমালীপুর শাখায় ১৯২৯ সালে আমি এই খেলা শেখার জন্য যোগদান করি। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসঙ্ঘ ছিল অনুশীলন দল (বিপ্লবী) এবং ভ্রাতৃ সঙ্ঘ যুগান্তরের অন্তর্ভূক্ত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব।" (দৈনিক সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ২০০০)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তখনকার সময়ে বঙ্গদেশে যে দুটি বিপ্লবী সংগঠন খুবই শক্তিশালী ছিল তার একটি হলো অনুশীলন সমিতি, অপরটি যুগান্তর। বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত ত্রিপুরার যুবকেরা দুই সংগঠনেই বিভক্ত ছিল —কেউ অনুশীলনে আর কেউ যুগান্তরে। এ রাজ্যের বিপ্লবীরা ছাড়াও ব্রিটিশ ভারতে সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত বিপ্লবীদের কেউ কেউ ত্রিপুরাকে 'নিরাপদ' আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিতেন। আইনগত ও ভৌগলিক উভয় দিক থেকেই ত্রিপুরা ছিল তাদের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ। ইচ্ছে করলেই ব্রিটিশ ভারতের পুলিশ এ রাজ্যে ঢুকে কোন রাজনৈতিক কর্মীর পিছু নিতে অথবা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারত না। তবে এরাজ্যে অবস্থানকালে এই সব বিপ্লবীরা সব সময়েই সতর্ক থাকতেন যাতে রাজতন্ত্রের সাথে তাদের কোনরূপ সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়। একই কথা বলা চলে ত্রিপুরার যেসব বিপ্লবী অনুশীলন অথবা যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের সম্পর্কেও। তাঁরাও চাইতেন না এমন কিছু করতে যা রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য করে তুলে। তারাও রাজন্য শাসিত ত্রিপুরাকে পশ্চাৎ ভূমি হিসাবে ব্যবহার করে ব্রিটিশ ভারতে তাদের সশস্ত্র কার্যকলাপকে প্রসারিত করার কৌশল নিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ ই এপ্রিল 'মাষ্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহীরা সরকারী অস্ত্রগার দখল করে নিয়েছিল। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা।

জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অতুলনীয় বীরত্বের নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। চট্টগ্রামের এই যুব বিদ্রোহীদের সঙ্গেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের কিছুটা যোগাযোগ ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অনন্তলাল সিংহের সঙ্গে উমেশলাল ও শচীন্দ্রলালের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এই দু'জনের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার মহারাজার অস্ত্রাগার থেকে কিছু অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে অনন্তলাল আগরতলা এসেছিলেন এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে।

এ সম্পর্কে তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, "শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে তদানিন্তন রাজবাড়ীর (ত্রিপুরা) অস্ত্রাগার থেকে একটি রাইফেল ও দুই বা তিনটি পিস্তল চুরি করে অনন্ত সিংহের মাধ্যমে (তাঁদের আত্মীয়) চট্টগ্রামে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের জন্য পাচার করা হয়। ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর একটি রাইফেল ইংরেজরা ত্রিপুরার রাজ সরকারের বলে সনাক্ত করে।"

১৯৮৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'উৎসধ্বনী' নামীয় সাময়িকীতে 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ' শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক রমাপ্রসাদ দত্তও এ সম্পর্কে লিখেছেন, "তারপর মহারাজার ভান্ডার হতে রাইফেল ও রিভলবার চুরি গেল। এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের মারফৎ চট্টগ্রাম আন্দোলনের সহায়তা স্বরূপ কিছু রসদও এখান থেকে পাঠানো হয়।"

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দেশের যুবশক্তিকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। তার কিছুটা প্রভাব এসে পড়েছিল রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায়ও। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৩২ সালে আগরতলায় স্থানীয় ধনী ব্যক্তি ও ঔষধ ব্যবসায়ী অমর ভট্টাচার্যের দোকানে রাজনৈতিক ডাকাতি। অমর ভট্টাচার্যের ছেলে অসিত ভট্টাচার্যের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি (অসিত) নিজেই যে সিন্দুকে টাকাপয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার রক্ষিত ছিল সেই সিন্দুকের চাবি 'ডাকাত' দলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই রাজনৈতিক ডাকাতি যাঁরা সংঘটিত করেছিলেন তাঁদের কেউ স্থানীয় লোক ছিলেন না। তাছাড়া, এই দুঃসাহসিক অভিযান সংঘটিত করার আগে তাঁরা স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগও করেননি। ফলে যাঁরা এই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কার্যোদ্ধার করে তাঁরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হননি। সকলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। ধৃত ব্যক্তিরা হলেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ দত্ত ও পবিত্র কুমার পাল। বিচারে এই তিন জনের প্রত্যেকেরই সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

এই রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনার অল্প কিছুকাল পরে সোনামুড়ার মহকুমা শাসক ঠাকুর ললিত মোহন দেববর্মার বাড়ী থেকে তাঁর পিস্তলটি খোয়া যায়। আসলে মহকুমা শাসকের কন্যা অমিয়া নিজেই তার বাবার পিস্তলটি সরিয়ে এনে তাদের বাড়ীরই কর্মচারী কান্তি দেববর্মাকে দিয়ে সেটি বিপ্লবী কর্মী অনন্ত দে'র কাছে পৌঁছে দেন। অনন্ত দে সেই পিস্তল সহ কুমিল্লায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। পিস্তল চুরির মামলায় অনন্ত দে ছাড়া প্রভাত রায় ও কান্তি দেববর্মারও সাজা হয়েছিল। প্রভাত রায় (দেববর্মা) অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং মহকুমা শাসকের কন্যাকে দিয়ে তাঁর পিতার পিস্তলটি তিনিই সরাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ব্রিটিশ সরকারও রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে আক্রমণের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। হাজার হাজার যুবক সেই সময়ে নিরাপত্তা আইনে আটক হন। অস্ত্র আইনে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের দীর্ঘ কারাদন্ড হয়। এই সব দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু কিছু বিপ্লবীকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের বন্দী জীবনকে অসহনীয় করে তোলার জন্য।

দীর্ঘ কারাবাসের পর এই সব বিপ্লবীরা যখন বাইরের জগতে ফিরে আসেন তখন তাদের চিন্তার

জগতে বড রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাঁদের সকলেই সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন যে ব্যক্তি সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণ হবে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হবে জনগণকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করে তাদের মুক্তি আন্দোলনে সম্মিলিত করা। সন্ত্রাসবাদ পরিহার করা সম্পর্কে মতৈক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতাদর্শ বেছে নেবার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ জেলখানা থেকেই মার্কসবাদের দীক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসেন, আবার কেউ কেউ বেছে নেন গান্ধীবাদী মত ও পথ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ত্রিপুরার যাঁরা বিপ্লবী যুগান্তর গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কংগ্রেস রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে অনুশীলন সমিতির অনুসারীরা নিজেদের কমিউনিস্ট সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজনীতির এই দু'টি ধারা (কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট) তখন থেকে স্পষ্টতর রূপ নিতে শুরু করে।

ত্রিপুরায় কংগ্রেস রাজনীতির গোড়াপত্তনে যাঁরা তখনকার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, হরিগঙ্গা বসাক, সুখময় সেনগুপ্ত, ক্ষিরোদ সেন, নীলরতন মুখার্জি, নিরোদ ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখার্জি প্রভৃতি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্বসূরীদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন বীরেন দত্ত, অনন্তলাল দে, নলিনী সেনগুপ্ত, বঙ্কিম চক্রবর্তী ও জিতেন দত্ত। এঁদের মধ্যে নলিনী সেনগুপ্ত ও বঙ্কিম চক্রবর্তীর বন্দীজীবন কেটেছিল আন্দামান সেলুলার জেলে। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন ১৯৪৫ সালে। তারপর থেকে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে সুসংহত করতে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৩৮ সালে গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে উমেশলাল সিংহ ও হরিগঙ্গা বসাক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন তখন ব্রিটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের কোন শাখা সংগঠন গড়ার অনুমতি দেওয়া হত না। দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য অখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনী (All India States peoples Conference) নাম দিয়ে কংগ্রেস আদর্শে পরিচালিত অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি ও শেখ আবদুল্লা ছিলেন সহসভাপতি। রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এই সংগঠন দেশীয় রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করত। গণপরিষদ অখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনীর অনুমোদিত শাখা সংগঠন হিসাবেই ত্রিপুরায় তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে। এদের প্রধান দাবি ছিল ত্রিপুরায় রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া, স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিও তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রায় একই সময়ে (১৯৩৮সালে) ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি নাম দিয়ে আরও একটি রাজনৈতিক সংগঠন এ রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করে। গণপরিষদের মত এটি কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক উদারনীতিবাদী ব্যক্তি এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রভাত রায়। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না এবং রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ছিল না। তিনি ছিলেন রাজ দরবারের পন্ডিত। অন্যদিকে প্রভাত রায় বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং অস্ত্র আইনে তাঁর কারাদন্ড হয়েছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গণপরিষদের মত জনমঙ্গল সমিতিরও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা

করা। কমিউনিস্টদের নিজস্ব শক্তি তখন পর্যন্ত বিশেষ দানা বাঁধে নি। তাছাড়া, ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করায় কমিউনিস্টদেব প্রকাশ্যে কাজ করাব মত সুযোগও ছিল না। (কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মতভাবে কাজ করার মত সুযোগও ছিল না। (কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মতভাবে কাজ করার সুযোগ পায় আট বছর বাদে ১৯৪২ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার পর।) তাই তাঁরা জনমঙ্গল সমিতিকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাবার সিদ্ধান্ত নেন। বীরেন দত্ত (যাকে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গণ্য করা হয়) জনমঙ্গল সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য ও প্রচুর সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'প্রজার কথা' নামে একটি রাজনৈতিক বুলেটিন খুব অনিয়মিতভাবে হলেও তখন প্রকাশিত হত। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক প্রচারপত্র প্রকাশের সম্ভবত সেটাই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে আগরতলা শহরের রামনগর এলাকা থেকে কৃষক উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ সরকারের সঙ্গে গণপরিষদের সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয়। রামনগর এলাকাটি সে সময়ে ছিল নেহাতই গন্ডগ্রাম। বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালি মুসলমান, যাদের অধিকাংশই ছিলেন পেশাগতভাবে কৃষক। শহর উন্নয়নের নাম করে তৎকালীন রাজ সরকার ঐসব মুসলমান কৃষকদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলে প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিতে গণপরিষদ আন্দোলন সংগঠিত করে। অতঃপর রাজার আদেশে শচীন্দ্রলাল সিংহ সহ গনপরিষদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্মী রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হন।

গণপরিষদ জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হবার পর যখন ত্রিপুরায় প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় তখন তার কিছুটা প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপরও। তবে এখন আর আগের মত চরম গোপনীয়তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাবার জন্য নয়, প্রস্তুতি শুরু হয় প্রকাশ্যে ব্যাপকভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। ১৯৩৬ সালে জাতীয় স্তরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারশন গঠিত হবার পর ছাত্রদের উপর তার প্রভাব লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে। সব কিছুর উর্দ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যই যেহেতু ছিল মূল বিষয়, কাজেই তখনকাব ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার উপরই জোর দিত সবচেয়ে বেশি।

এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আগরতলা উমাকান্ত একাডেমির ছাত্র বিজয় মুখার্জি ও ফটিক সেন এবং মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পূর্ণিমা মুখার্জি ও সরস্বতী বসাকের স্কুল থেকে বহিষ্কার। তাঁদের অপরাধ ছিল তাঁরা ১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসে' ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ শে জানুয়ারী দিনটিকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালন করা হতো। ঐ বিশেষ দিনটিতে ভারতের গ্রাম-শহরে সর্বত্র জনগণ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে সমস্বরে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করতেন।

রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান দাবির মুখে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর ১৯৩৯ সালের ১৬ই এপ্রিল শাসন সংস্কারের একঘোষণাপত্র প্রচার করেন। কিন্তু প্রস্তাবিত এই শাসন সংস্কার রাজ্যের রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল গণপরিষদ ও জনমঙ্গল সমিতি কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার গঠন করার কোন কথা এতে ছিল না। তবে ঘোষণা অনুযায়ী রাজ সরকার শাসন সংস্কারের জন্য কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়।

এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতি যত জটিল হতে থাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপর আক্রমণও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সভা-শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা একে একে

বিনা বিচারে আটক হতে থাকেন। তখন পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজনৈতিক দলগুলির গণভিত্তি ততটা শক্তিশালী ছিল না। তার উপর যুদ্ধ পরিস্থিতির কল্যাণে গণতন্ত্রে উপর উপর্যপরি আক্রমণ শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট থেকে 'ভারতছাড়' আন্দোলনের যে ঢেউ সারা দেশে আছড়ে পড়েছিল ত্রিপুরায় তার তেমন কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ত্রিপুরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হলো রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ এই বিদ্রোহের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কারণে স্থানীয় নেতৃত্বের পরিচালনায়। এই বিদ্রোহের সামনে যেহেতু কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশ ছিল না সেহেতু এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তদানিন্তন রাজশক্তি যে চণ্ডনীতির আশ্রয় নিয়েছিল এবং বিদ্রোহের নেতা রতনমণিকে মহারাজের আদেশে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তা চিরদিন রাজকীয় নিষ্ঠুরতার এক ঘৃণ্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর সারা বিশ্বে ও সেই সঙ্গে ভারতেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল তার সাথে তাল রেখে জনজাগরণের সূত্রপাত হচ্ছিল দেশের এক কোণে অবস্থিত সামন্তশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতেও। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টা ছিল ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিসমূহের পরাজয় ও মিত্রপক্ষ বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের চমকপ্রদ সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিসরে শক্তির ভারসাম্যে বড় রকমের পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের সীমান্ত প্রসারিত হয়েছিল পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব সফল হওয়ার পর সমাজতন্ত্র একটি বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পরাধীন দেশগুলিতে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল জোয়ার। ভারতে তখন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য এদেশের মানুষ তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই ও করাচিতে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ, রসিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্র জনতার সঙ্ঘর্ষ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক কৃষক জনগণের জঙ্গী সংগ্রাম স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দিন শেষ হয়ে আসছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার প্রভাব এসে পড়তে শুরু করেছিল রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার উপরেও। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এবং রাজবন্দীরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার ফলে অনতিকালের মধ্যেই প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। বলা চলে এটা ছিল ত্রিপুরায় রাজনৈতিক নবজাগরণের সূত্রপাত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সারা দেশের তুলনায় ত্রিপুরাতে বন্দীমুক্তি বিলম্বিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাধ্য হয়েছিলেন বন্দীমুক্তির বিষয়ে ত্রিপুরার মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখতে। ১৯৪৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ —

"আমি জ্ঞাত হয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ ও ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের অনেক সদস্য বিনা বিচারে দীর্ঘকাল ধরে কারাগারে আছেন। স্পষ্টতই যুদ্ধের শুরুতে তাঁদের বহুসংখ্যক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ

হয়েছিলেন। তারা বাংলা সরকারের না ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দী, আমি জানি না। আরও সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যে এই বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাঁদেব কয়েকজন মারাত্মক অসুখে ভুগছেন। আমি আর ও জানতে পেরেছি যে ১৯৪০ এর শুরু থেকেই সমস্ত সভা ও মিছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোন প্রকারের নাগরিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার তথ্যগুলি যদি ভুল হয় আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যদি সেগুলি ভুল না হয়, আমি বিশ্বাস করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজ্য প্রশাসনের এই কলঙ্ক অপনোদন করবেন।" (বীরেন দত্ত রচিত "আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা" থেকে।)

পণ্ডিত নেহরুর এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ সালে ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে সেই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। আর সভা মিছিল প্রভৃতির উপর থেকে নিষাধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৪৬ এর জানুয়ারীতে।

আগের আলোচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে ত্রিপুরায় স্বনামে কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল না; কংগ্রেস আদর্শে যারা বিশ্বাসী তারা ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের নামে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী। কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবার পর গণপরিষদ অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংগঠনটির অবলুপ্তি ঘটে।

বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা বয়ে কিভাবে ত্রিপুরায় প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট গ্রুপটি গঠিত হয়েছিল সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করার পর ব্রিটিশ ভারতের মত ত্রিপুরাতেও কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য কাজকর্মের সুযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। (কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল ১৯৪২ সালে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হওয়ার পর অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট রাজবন্দীরাও যখন জেল থেকে মুক্তি পান তাবপর ত্রিপুরাতেও কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সাল থেকে প্রকাশ্যে অফিস খুলে দলীয় কাজকর্ম শুরু করে।

প্রায় একই সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লকও এ রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে। সর্বভারতীয় এই দলগুলি ছাড়াও এই সময়ে জন্ম নেয় রাজ্যভিত্তিক দল ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল। বামপন্থী মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দলটি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ত্রিপুরার রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট সংগঠন বলতে যা বুঝায় প্রজামণ্ডল সেই অর্থে কোন ফন্ট সংগঠন ছিল না। তবে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের খুবই গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হত।

জনসংখ্যার দিক থেকে তৎকালীন ত্রিপুরায় উপজাতিদের পরেই ছিল বাঙালি মুসলমানদের স্থান। কিন্তু কোন সময়েই এখানে মুসলিম লীগের কোন শাখা সংগঠন গঠিত হয়নি। তবে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভিত্তি করে ত্রিপুরায় আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের নেতা ছিলেন আবদুল বারিক (ওরফে গেদু মিঞা), যিনি ছিলেন আগরতলার একজন ধনী কন্ট্রাক্টর। অবশ্য এই সংগঠনের পাল্টা হিসাবে জাতীয়বাদী ভাবধারার উপর মুসলিম প্রজা মজলিশ নাম দিয়ে অপর একটি মুসলিম রাজনৈতিক দলও সৃষ্টি হয়েছিল এ রাজ্যে। তবে শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়াই ছিল প্রবল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক নবজাগরণের পাশাপাশি শিক্ষিত উপজাতি ছাত্র যুবদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। আত্মবিকাশের প্রয়োজনে উপজাতি সমাজকে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার আবশ্যকতা তারা তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করে। এই অনুভূতি থেকেই ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ২৭ শে ডিসেম্বর উপজাতি ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের এক সম্মেলনে ত্রিপুরা জনশিক্ষা

সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করার লক্ষ্য সামনে রেখে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই জনশিক্ষা সমিতি যাত্রা শুরু করে। কিন্তু এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এ ধরনের একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবেই যে পরবর্তীকালে রাজনীতির গতিপথ অনেকাংশে নির্দ্ধারিত হয়েছিল এ কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

উপজাতি প্রধান এলাকাসমূহে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী নিয়ে জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা যখন কাজে নেমে পড়েন উপজাতি জনগণের মধ্যে তাতে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। শিক্ষা আন্দোলন এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে উপজাতি এলাকায় একের পর আর এক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। জানা যায়, তিন শতাধিক বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন ও অর্থসাহায্যও লাভ করেছিল। এটা একটা বড় রকমের সাফল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতিগতভাবে যা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো জনশিক্ষা সমিতি উপজাতি জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টি করেছিল সেটাই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গণভিত্তি রচনা করে। জনশিক্ষা আন্দোলনে যারা ছিলেন শিক্ষাকর্মী পরবর্তী সময়ে তাঁরাই কমিউনিস্ট কর্মীতে রূপান্তরিত হন। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেসব নেতা উপজাতিদের মধ্যে-ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানিত নেতা হিসেবে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে লন্ডনকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ২০ শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট এটলি হাউস অব কমন্সে প্রদত্ত ঘোষণায় বলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগের মাউন্টব্যাটেনর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছিল আরও কিছুকাল পরে (জুন মাসে), কিন্তু এটা কারোরই বোঝার বাকি ছিল না যে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে ভারতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে।

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর এই সময়ে যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তা খুব স্পষ্ট নয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে আগরতলায় সম্প্রদায়ভিত্তিক তিনটি আলাদা আলাদা সম্মেলন তিনি আহ্বান করেছিলেন উপজাতি সম্মেলন, বাঙালী মুসলমান সম্মেলন ও বাঙালী হিন্দু সম্মেলন। সম্প্রদায়ভিত্তিক এ ধরণের তিনটি পৃথক সম্মেলন ডেকে মহারাজা রাজ্যে যাতে কোন ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেই কৌশলই নিতে চেয়েছিলেন বলে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ধারণা। ১৯৪৭ সালের ২২ও ২৩শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত উপজাতি সম্মেলনে 'ত্রিপুর সঙ্ঘ' নাম দিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শুধুমাত্র 'জি হুজুরদের' দিয়ে কমিটি গঠনের চেষ্টা হলে সম্মেলনে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রজা মণ্ডলের তিন নেতা বংশীঠাকুর, সুধন্বা দেববর্মা ও হেমন্ত দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য পরদিনই রাজার আদেশে তাঁরা জেল থেকে মুক্তি পান ও সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন শেষ হবার মাত্র দু'মাসের মধ্যেই (১৭ই মে) মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের মৃত্যু হয়। মহারাজার অনুপস্থিতিতে ত্রিপুর সঙ্ঘও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ত্রিপুর সঙ্ঘ গঠনের পেছনে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও তাঁর অকাল মৃত্যুতে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে নি।

মহারাজা বীরবিক্রমের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সময়ে রাজ্যে এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সৃষ্টি হয়েছিল। যুবরাজ কিরীটবিক্রম তখন নাবালক। সেজন্য তার পক্ষে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে একটি রিজেন্সী কাউন্সিল যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রয়াত মহারাজের বিধবা পত্নী মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী। রিজেন্সী কাউন্সিল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার পর নয়াদিল্লীর পরামর্শে চিফ্ মিনিস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন বহিরাগত এক আই. সি এস অফিসার এস. ভি. মুখার্জি।

ইতিমধ্যে ভাইসরয় লর্ড্ মাউন্টব্যাটেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ সরকার চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দেন যে ভারতকে দু'টো পৃথক রাষ্ট্রে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতে যোগ দেবে না পাকিস্তানে অথবা পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয় সেই সব রাজ্যের নৃপতিদের উপর। এই ঘোষণার পর ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে সে নিয়ে কিছুটা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট রিজেন্সী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন। তারপর সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে ১৫ই আগষ্ট প্রথম স্বাধীনতা দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অংশ হয়ে যাওয়ার পরেও বলপূর্বক তাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই সময়ে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়কদের একজন ছিলেন মহারাজকুমার দুর্জয়কিশোর দেববর্মণ, যিনি ছিলেন রাজ পরিবারের একজন সদস্য এবং রিজেন্সী আমলে নিযুক্ত রাজ্যের একজন মন্ত্রীও। আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়ার নেতা আবদুল বারীক ওরফে গেদু মিঞা ছিলেন ষড়যন্ত্রের অপর নায়ক। রাজ্যের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢুকিয়ে দিয়ে ত্রিপুরাকে দখল করে নেবার জন্য সীমান্তের ওপারে মুসলিম লীগ নেতা তফজ্জল আলীর নেতৃত্বে জোর প্রস্তুতি চলছিল বলেও তখন খবর প্রচারিত হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন বিপজ্জনক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁকে একটি জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরাকে দখল করে নেবার কোনরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর তারবার্তাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"I have received information from more than one source that the Muslim league National Guards in East Bengal are carrying on propaganda pamphlets inciting Muslims to conquer Tripura are in circulation in Eastern pakistan and preparations are being made to invade Tripura. Tripura acceded to the Indian Dominion before 15th August. Any activites in Pakistan teritory intended to support the forcible annexation of Tripura into Eastern pakistan are one clearly a hostile act against the dominion of India. I request that you will discourage such activities and see that no act of aggression is committed on Tripura."

অভিযোগ উঠেছিল যে ত্রিপুরার তৎকালীন চিফমিনিস্টার এস ভি মুখার্জিও এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে মুখার্জির অপসারণ দাবি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে চিফ মিনিস্টার এস. ভি. মুখার্জি ১৯৪৭ সালের ২৭ শে নভেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। একইভাবে দুর্জয়কিশোরকে ইস্তাফা দিতে হয় এবং সাময়িক কালের জন্য তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

এস ভি মুখার্জি অপসারিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার অপর এক আই সি এস অফিসার এ বি চ্যাটার্জিকে ত্রিপুরার দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। এই দেওয়ানী ব্যবস্থা চালু ছিল ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ভারতের সাথে ত্রিপুরার সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি বা মার্জার (Marger) যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন পর্যন্ত

আর এই দেওয়ানী শাসনের আমলেই গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে সৃষ্টি হয়েছিল উপজাতি জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে যখন সারা দেশ জুড়ে কমিউনিস্টদের উপর চলছিল প্রচণ্ড দমন পীড়ন। ত্রিপুরাও এই কমিউনিস্ট —বিরোধী অভিযান থেকে বাদ পড়ে নি, যদিও ত্রিপুরায় সেই সময়ে কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শক্তি বা প্রভাব ছিল না আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হয়েছিল। সংগঠনের সভাপতি তথা মূল নেতা ছিলেন দশরথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। তাই গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে সেটি উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপক গণভিত্তিযুক্ত একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়

১৯৪৮ সালের ৯ই অক্টোবর গোলাঘাটিতে পুলিশের গুলিচালনায় ৬ জন উপজাতিসহ মোট ৭ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হওয়ার পর গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ধাপে ধাপে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নেয়। অন্যদিকে সরকারও তার পীড়নযন্ত্রকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ সামরিক আইন জারী করে সমগ্র খোয়াই বিভাগের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয় সামরিক প্রশাসনের হাতে। সদর (বিশালগড় তখন সদর বিভাগের মধ্যেই ছিল) ও খোয়াই বিভাগ থেকে দলে দলে উপাজাতিদের গ্রেপ্তার করে এনে জেলখানা ভর্তি করা হয়। শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার অভাবে বহু মানুষ জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ত্রিপুরায় এ ধরণের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আর কখ এর আগে কার কখনও হয় নি। দশরথ দেব ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার আরও বেশি ক্ষিপ্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। ১৩৫৯ ত্রিপুরাব্দের (১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের) ৪ই চৈত্র সেনাবাহিনী খোয়াই বিভাগের পদ্মবিল গ্রামের ওপর আক্রমণ চালায়। গ্রামের মহিলাগণ দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী মহিলাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রী শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

পদ্মবিলের নারীহত্যার পর প্রতিরোধ সংগ্রাম অধিকতর তীব্রতা লাভ করে। এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে দুই বছর ধরে (১৯৪৯-৫১)। প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে সদর ও খোয়াই বিভাগের বিস্তীর্ণ উপজাতি এলাকায় রাজ্য সরকার তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল এক সমান্তরাল প্রশাসন। আর এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম যখন চলছিল তার মধ্যেই গণমুক্তি পরিষদের সমগ্র নেতৃত্ব ও সক্রিয় কর্মীগণ এক সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্টপার্টি ত্রিপুরায় একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ থেকে ব্যাপক গণভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগষ্ট সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ভারতভুক্তি চূড়ান্ত রূপ পেতে সময় লেগেছিল আরও দু'বছর ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর রিজেন্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী চূড়ান্ত অন্তর্ভূক্তির দলিল Agreement of Marger স্বাক্ষর করেছিলেন। উল্লেখ্য যে ১৯৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারী রিজেন্সী কাউন্সিল ভেঙ্গে দিয়ে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে এককভাবে রিজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত অন্তর্ভূক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেই বছর (১৯৪৯) ১৫ই অক্টোবর থেকে ত্রিপুরার শাসনভার পুরোপুরিভাবে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চিফ কমিশনার এ রাজ্যের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পর ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে। আর সেই সঙ্গে শুরু হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য জনগণের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়।

ত্রিপুরার পুতুল নাচ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

কার্তিক লাহিড়ী

পুতুল নাচ এখন ক্রমশ বিবল হয়ে যাচ্ছে , কোন কোন মেলায বা প্রদর্শনীতে হঠাৎ কখনো পুতুল নাচেব দু'একটি দল আসে, সে সময দর্শকদেবও কিছু ভীড হয, অথচ তা যেন অনেকটা বিলাসী বা সৌখিন গোছেব ব্যাপাব, এবং অনেকটা স্মৃতি কাতবতাব দীর্ঘশ্বাসেব মত ক্ষণিক সুখেবও বটে। যাদুঘবেব সামগ্রী যেমন বহু সময আচমকা আমাদেব অতীতেব কথা মনে কবিয়ে দেয, পুতুল নাচও তেমন মনে কবায যে এক সময আমাদেব দেশে পুতুল নাচেব বহুল প্রচলন ছিল আব সাধাবণ মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা পুতুল নাচেব অতি অনুবাগী দর্শক ছিলেন।

ভাবতে পুতুল তৈবী যে অর্বাচীন ব্যাপাব নয তাব প্রমাণ মেলে বেলেচিস্থান, মহেঞ্জোদাডো প্রভৃতি অঞ্চলেব প্রাপ্ত অসংখ্য মাটিব তৈবী পুতুলে, সেই ধাবা মোটামুটিভাবে এখনও বহমান আছে বিশেষ কবে পল্লী অঞ্চলে, আব কাঁদামাটি থেকে আঙুলে টিপে পুতুল তৈবীব বেওযাজ সেই কথা আমাদেব মনে কবায। প্রধানত জীবিকাব জন্যই পুতুল তৈবী হতো সন্দেহ নেই, তবে পুতুল তৈবী যত পুবনো ব্যাপাব পুতুল নাচ তত পুবনো কিনা তা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল, তবে পুতুল নাচও যে অর্বাচীন ব্যাপাব নয তা নিঃসকোচে বলা চলে। ডক্টব সুকুমাব সেন মনে কবেন "সংস্কৃত নাটকেব উৎপত্তি পুতুলবাজি থেকে পুরোপুবি না হোক তা যে পুতুল নাচ অবলম্বনে (নট নাট্য নাটক, পৃঃ ৯৮) পুষ্টিলাভ কবেছিল তাব প্রমাণ তিনি কালিদাসেব নাটক থেকে যথেষ্ট পেযেছেন এবং পতঞ্জলি-ব প্রচলন ছিল তা তিনি 'নট নাট্যনাটক' গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিযেছেন। আব বাংলাদেশে পুতুল নাচ যে বেশ প্রাচীন ব্যাপাব এবং "পাঞ্চালী" গানেব সঙ্গে পুতুল বাজিব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা অনেকেব জানা। ডক্টব সুকুমাব সেনেব মতে "দেব মাহাত্ম্যময গীতি দীর্ঘ হইলে গেয বস্তুব পাত্রপাত্রীব "পঞ্চালিকা" অর্থাৎ পুতুল কপ (pappet) দেখানো হইত। অর্থাৎ পুতুল নাচেব সঙ্গে চলিত নাট গান। পুতুলেব অভাবে, ছোট আসব হইলে, পট দেখাইযা গান চলিত। এই "পাঞ্চালী" বীতি পবিপুষ্ট হইযা একটি বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ কবিবাব পবে "পুতুল বাজি" অংশটুকু বাদ পডিযা যায। আব যেখানে পুতুল-বাজি বহিযা যায সেখানে গানেব অংশ ক্ষীণ হইযা আসে"। (বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ সং, পৃঃ ১৯)। পুতুল নাচ কোনো সখেব ব্যাপাব ছিল না, তা গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতাব একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বাঙালীব ধর্মময

জীবনে কিংবা অবসর বিনোদনে পুতুল নাচের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এবং ইংরেজ আগমনের আগে পর্যন্ত গ্রামীণ জীবন যাত্রায় তার সংস্কৃতিতে পুতুল নাচ হেলাফেলার বস্তু ছিল না।

ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত যে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও গ্রামকে কেন্দ্র করে যে লৌকিক সংস্কৃতি বেগবান ছিল সে ধারা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে যে আধা শহুরে আধা গ্রাম্য সমাজ তৈরী হলো, তাতে স্বাভাবিক ভাবে গ্রামের অনেক জিনিষ আমাদের কাছে হেয়, তুচ্ছ বলেগণ্য হতে থাকে। বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রীক সভ্যতার পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন সভ্যতারই স্বাস্থ্যকর জীবনী শক্তি ছিল না, উপরন্তু ইংরেজদের প্রবর্তিত ব্যবস্থায় যে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে গ্রাম ও শহর পরস্পর কাছে আসার বদলে ক্রমে সরে যায়। গ্রাম ক্রমে উপেক্ষিত হতে থাকলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলেই সে আঘাত পড়ে তা সকলের জানা, কারণ ভারতের প্রাণ পল্লী সমাজ। গ্রাম ও নগরের ঘনিষ্ঠ ও প্রাণবান যোগাযোগে এ ফাঁড়া কাটানো চলতো, কিন্তু তার কোনও চেষ্টা না শাসক না নিজেদের কোনও প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতি ক্রমে সচল প্রবাহটি হারিয়ে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে প্রাণ হারায়।

বলা বাহুল্য পুতুল নাচের কপাল তেমন প্রশস্ত ছিল না, কোনও জাঁদরেল পৃষ্ঠপোষক পেলে না হয় আর কিছুদিন পুতুল নাচের জেল্লা থাকত, কিন্তু হাফ-আখড়াই বা কবি গানের মত পুতুল নাচের কোনও নামী দামী পৃষ্ঠপোষক জোটে নি, ফলে আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পুতুল নাচ অবহেলা বা উদাসীনতার আবর্তে তলিয়ে যেতে থাকে, ইদানীং অবশ্য পুতুল নাচ কিছু বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগিয়েছে, তবে উপেক্ষার তুলনায় তার পরিমাণ যে খুবই সামান্য তা বলা বাহুল্য।

অবশ্য ত্রিপুরার মেলায় কিংবা বার্ষিক প্রদর্শনীতে এখনও দু'একটি পুতুল নাচের দল দেখা যায়, সেই পুতুল নাচ দেখার জন্য সাধারণ লোকই বেশী ভীড় করেন, এবং এই সব দলের আয়োজন সামান্য হলেও পুতুল নাচ যে এখনও বেঁচে আছে তা ভেবে আনন্দ হয় নিশ্চয়। মেলায় বা প্রদর্শনীতে যে দু'একটি দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু কিছু সংবাদ ও তথ্য জানা গেছে, সংক্ষিপ্ত হলেও সেই বিবরণ থেকে পুতুল নাচের দল সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

এইসব দলে প্রায় আটজন লোক থাকেন, কোনও কোনটিতে দু'একজন কম বেশি। দলের ম্যানেজার সাধারণতঃ টিকিট বিক্রির কাউন্টারে বসেন। সম্মিলিতভাবে গান করে চারজন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাদযন্ত্র হিসেবে হারমনিয়াম, ঢোলক, করতাল বাঁশি-ই ব্যবহৃত হয়। সচরাচর যিনি হারমোনিয়াম বাজান তিনি মূল গায়ক, সঙ্গে দোহারও থাকেন। পুতুল নাচান একজন, এবং তার সহকারী থাকেন একজন। এইসব শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ পালা আরম্ভ হবার আগে গেটে দাঁড়ান টিকিট সংগ্রহের জন্য, কেউ বা মাইকে পুতুল নাচ দেখতে আসার আহবান জানান।

সাধারণত আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত পুতুল নাচ নানা জায়গায় দেখানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেমন উদয়পুর, সাব্রুম, বাইখোরা, শিলাছবি, কোলসি, লাওগাঙ, আগরতলা, বিশালগড়, চড়িলাম, লালসিংমুরা, বক্সনগর, কৈলাশহর পুতুল নাচের দল ঘুরে বেড়ায়। আসামের শিলচর অঞ্চলে ত্রিপুরার দল নাচ দেখাতে মাঝে মধ্যে গিয়ে থাকে।

এক একটা পুতুল নাচের দলে প্রায় চারজন লোক স্থায়ীভাবে থাকেন, বাকি-কজন বাইরের, কিন্তু যারা স্থায়ী লোক তাঁরাও অন্য কাজ করেন, আর সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুতুল নাচের দলে কাজ করেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে পুতুল নাচ দেখিয়ে যা আর আয় হয় তা যথেষ্ট তো নয়ই, বরং অনেক সময় খরচ পোষানো

মুস্কিল হয়ে পড়ে। অনেকেই অবশ্য বলেছেন তাঁরা পুতুল নাচ দেখিয়ে আনন্দ পান, তবে বেশির ভাগ কর্মীর মত যে অন্য কোন অর্থ উপার্জনের উপায় থাকলে তাঁরা এই পথে আসতেন না। মেলায় বা গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে আগে খরচ পড়তো একশ (১০০) টাকার উপরে, বর্তমানে তা আরও বেড়ে গেছে, ফলে দলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোন সময়ই তেমন হয় না, যাতে কর্মীরা অখণ্ড মনযোগ দিয়ে এই কর্মে লিপ্ত থাকেন।

ত্রিপুরায় পুতুলনাচ দেখানোর জন্য যে পুতুল সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই পুতুল তৈরী হয় কাগজ দিয়ে। মাটির দেহের উপর আঠা লাগিয়ে তার উপর কাগজ এঁটে দেওয়া হয়, কাগজ শুকিয়ে গেলে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে সেই কাগজটাকে কেটে কেটে তুলে নেওয়া হয়, তারপর ফের আঠা দিয়ে কাগজের টুকরোগুলো জোড়া লাগে কাগজের উপর তুলি দিয়ে নাক চোখ ইত্যাদি আঁকা হয়। হাত তৈরীর জন্য গাছের ছাল লাগে, যে কোন গাছের ছাল। এরপর রঙ লাগানো হয়, তারপর কাপড় পরানো। রাজা, রাণী, মন্ত্রী ইত্যাদি নানা রকমের পুতুলের জন্য নানা ধরণের পোষাক লাগে, এসব পোষাক তৈরী করতে বিশেষ দক্ষতার দরকার আছে এবং তৈরী করতে সময় লাগে। সচরাচর যাঁরা দলের স্থায়ী সদস্য তাঁরা পুতুল তৈরী থেকে শুরু করে পোষাক পরানো মঞ্চ খাটানো ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী। অনেক সময় বাওতোলা (জমিতে হয়) দিয়েও পুতুল তৈরী হয় কিন্তু সে পুতুল তুলনায় কিছুটা ভারী বলে ঠিক মত কাজ করা যায় না ফলে কাগজের পুতুলই বিশেষ ব্যবহার করা হয়। পুতুল তৈরী হলে সেগুলো কালো সূতো দিয়ে বাঁধা হয়।

পুতুল নাচিয়ের মুখে থাকে একটা বাঁশের চটা, সেই চটা দিয়ে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র শব্দ বের হয়, প্রধান নাচিয়ের এক পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে এবং দুহাতে পুতুলের সুতো। এক একটা পুতুলের নানা সুতো এক একটা বাঁশের চটায় লাগানো থাকে। পুতুল নাচিয়ে সে পুতুল নাচাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও নাচতে হয়।

সচরাচর কয়েকটি পালা একটি প্রদর্শনীতে দেখানো হয় —হরিশচন্দ্র, বেহুলা, নৌকাবিলাস, সাবিত্রী সত্যবান লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতা হরণ ইত্যাদি পালাগুলি বেশ জনপ্রিয়। পালা দেখানোর আগে ছোট ছোট কাটিং দেখানো হয় কাটিং-এ ও গান করা হয়। সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনী নিয়েও পালা রচিত হয়। এক একটি প্রদর্শনী চলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অবশ্য সে রকম বায়না পেলে ছোট ছোট অনেকগুলো পালা দেখানোর বদলে একটা পুরো পালা-বিশদ করে দেখানো হয়।

পালাগুলি দেখানোর আগে জোর মহলা (রিহার্সেল) চলে প্রায় ১৫/২০ দিন ধরে। মহলার সময় সাধারণভাবে সন্ধ্যাবেলা, কারণ নিজ নিজ কাজ সেরে খানিকটা সময় তখনই তারা পায়, প্রায়ই দলের ম্যানেজারই পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন। দলে কয়েকটি অলিখিত নিয়মও আছে। যেমন দলের সদস্যরা বৃহস্পতিবারে মাছ মাংস খান না, ঐদিন হরিসভা বসে, এবং বাতাসা লুট দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার আগে অনেকগুলি দল ছিল, তার মধ্যে ছ'টি দল অনেকদিন টিকে ছিল। আগরতলায় অনতিদূরে আরালিয়াতেই একসময় চারটি সক্রিয় দল ছিল, কিন্তু কালক্রমে দলগুলি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে উঠে যায়। এই সব দলের মধ্যে শিবদুর্গা, ত্রিপুরেশ্বরী, শিবশক্তি পুতুল নাচের দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্রামগঞ্জেও একটি নাচের কোম্পানী ছিল, পেঁচারথলে একটা দল আছে, তাঁরা কাঠের পুতুল নাচিয়ে থাকেন। এই দলগুলিকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে পেশাদারী পর্যায়ে ফেলা যায় না, আবার এগুলি সখেরও দল নয়। সম্পূর্ণ পেশাদারী নয় এই জন্য দলের লোকেরা শুধু পুতুল নাচ দেখানোর আয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন না, আবার তাঁরা শুধু সখের জন্য পুতুল নাচ দেখান না, আয় হবার বাসনা নিয়েই তাঁরা নাচের দলে কাজ করে থাকেন।

প্রধানতঃ ভাবত বিভাগেব পব ত্রিপুবাব সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আগত উদ্বাস্তুবাই পুতুল নাচেব দল তৈবী কবেছেন, তাঁবা সেখানে (বর্তমান বাংলাদেশ) যেভাবে পুতুল নাচ দেখাতেন এখানে এসে সেই ধাবা মোটামুটি বজায় বাখাব চেষ্টা কবেন, তবে গানেব সুব বা পালাব ঘটনা বিন্যাসে সিনেমাব প্রভাব এড়ানো সম্ভব হযনি, হযত সাধাবণ দর্শকদেব মনোবঞ্জনেব জন্য অনেক সময কিছু কিছু চটুল হাল্কা কথাবার্তা বা গান জুড়ে দিতে হয। ত্রিপুবাব আদিবাসী সমাজে (যতদূব খবব পেযেছি) পুতুল নাচ দেখানোব কোনও দল তৈবী হয নি, তাব কাবণ সম্পর্কে চট কবে কিছু বলা মুস্কিল। পৃথিবীব নানা জাযগায পুতুল নাচেব জনপ্রিযতা আবাব বাড়ছে এবং পুতুল নাচেব উপব নানা গবেষণাও শুরু হয়েছে এমনকি জীবিকা হিসেবে পুতুল নাচ গ্রহণ কবাব জন্য পুতুল তৈবী কবা থেকে আবম্ভ কবে মঞ্চ সাজানো পালা বচনা প্রভৃতি বিষযে নানা সহজ পাঠ্য সহজবোধ্য বই ইংবেজীতে বচিত হয়েছে। এছাড়া সিনেমা টেলিভিশন ইত্যাদিব মাধ্যমে পুতুল নাচেব জনপ্রিযতা বিদেশে বেড়ে চলেছে। ত্রিপুবাব পুতুল নাচেব দলগুলি এখন নানা সঙ্কটেব সম্মুখীন, দলগুলিব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কবে তাদেব অসুবিধাও সমস্যা বিষযে অভিহিত হওযা আমাদেব বিশেষ দবকাব, কাবণ এই দলগুলি উঠে গেলে আমবা একটি মূল্যবান জিনিষ হাবাবো নিঃসন্দেহে।

আগরতলার নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি

শিশু সেনগুপ্ত

গতিময় এ জীবন। কোথাও থামবার মত এতটুকু সময় নেই। নেই কোন অবসর। উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাধারার মত জীবনের শুরু। তারপর শিশুকাল ও কৈশোরের কলতান, যৌবনের উচ্ছ্বল, দুর্দ্দম গতি, প্রৌঢ়ত্বে স্মৃতিচারণ ও পরে বার্দ্ধক্যের স্থবিরতায় জীবনের পরিসমাপ্তি।

চঞ্চল যৌবনে যা সম্ভব হয়নি আজকে ঠিক মুহূর্তে প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পেছনে ফেলা আসা আবছা দিন গুলোর দিকে চোখ মেলে তাকানোর মত সময় আমার হাতে এসেছে। মন বলছে "আর কেন ?" সঞ্চয়ের অনেক বোঝাইতো বয়ে বেড়িয়েছ - এবার নিজেকে শূন্য করে সবাইর সামনে সেগুলো ছড়িয়ে দাওনা। উন্মুক্ত করে দাও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার। সবাইকে সামনে নিয়ে এস, তাদেরকে -যারা একদিন নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সবাইর মনোরঞ্জন করে গেছেন। সেদিনকার দিনে কোন আত্মপ্রচার তাঁরা চাননি। কেবলমাত্র মানুষকে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছেন। আগরতলার নাট্যচর্চার ঝলমলে ইমারৎ আজকে গড়ে উঠেছে, বিগত দিনের সেইসব হারিয়ে যাওয়া অভিনেতারাই কিন্তু এর কাঠামো রচনা করতে গিয়ে অনেক ঘাম ঝড়িয়েছেন।

১৯৪৫ ইং থেকে আজ পর্য্যন্ত আগরতলার নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচর্চার আমি নীরব সাক্ষী। নাট্যচর্চার এই পরিবর্ত্তন খুব কাছ থেকে দেখবার মত সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। তখনকার দিনের নামী অনামী অনেক অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার মত সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাদের স্মৃতি আজকেও আমার মনকে নাড়া দেয়, যাদের স্নেহ ও ভালবাসায় তিল তিল করে আমার অভিনয় জীবন পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যাদের সঠিক পথ নির্দেশ ও সহযোগিতা আমার নাট্য জীবনে প্রেরণা জাগিয়েছে তাদেরকে আমি ভুলতে পারিনা। পারিনা বলেই যারা আজকে আগরতলার নাট্যচর্চার সেই সব পথিকৃৎদের উপেক্ষা করে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করতেই আমার এই প্রচেষ্টা। আমার এই প্রতিবেদন আত্মপ্রচার নয়, কাউকে ছোট করার মত মানসিকতাও আমার নেই। শুধুমাত্র বিবেকের তাড়নায়, বিস্মৃতির আবরণ সড়িয়ে সত্য ঘটনার সঠিক তথ্য জনমানসে পৌঁছে দেওয়াটা আমি নৈতিক কর্ত্তব্য হিসাবেই মনে করি। তা না হলে আগরতলার প্রাচীন নাট্যশিল্পীদের শুধুমাত্র অসম্মান করা হবেনা নতুন জমানার অভিনেতাদের

কাছে তাঁরা চিরদিন অপরিচিত থেকে যাবেন । নাট্যামোদীদের কাছে দায়বদ্ধতা আমি অস্বীকার করতে পারিনা। ছোট বয়সের অনেকটা সময়, আগরতলার কাছে আখাউড়াতে আমার জীবন কেটেছে । আমার বাবা ও স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টার হিসেবে একটানা আঠার বছর কাজ করেছেন। আমার বাবা ও বড় ভাইরা সেদিন সৌখিন অভিনেতা হিসেবে আখাউড়া নাট্যামোদীদের মনোরঞ্জন করেছেন । এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার । ভারতবর্ষে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরী করেন স্বর্গত সত্য সেন । সম্পর্কে ইনি আমার জ্যাঠতুত দাদা।

আমাদের কোয়ার্টারের পশ্চিম দিকে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত সেই ছোট বয়সে আমার সঙ্গী সাথীরা যখন অবসর সময়ে খেলাধূলায় মেতে থাকত, আমি কিন্তু চলে যেতাম অনেক অনেক দূরে, যেখানে খোলা আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ তার মাঝখানে । প্রকৃতিকে দর্শক রেখে উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করতাম রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতা গুচ্ছ । রেলওয়ে কলোনী স্কুলে পড়াশুনার সাথে সাথে স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী নজরুল জয়ন্তী, বার্ষিকী পুরস্কার বিতরণী উৎসবে আবৃত্তি ও একাংক নাটকে অভিনয় করেছি । ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় কবি হুমায়ুন কবির আখাউড়া এসেছিলেন । তার সম্বর্ধনা সভায় তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি । সেই স্মৃতি আজও আমার মনকে নাড়া দেয় । যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ঐ সময় স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকে যেমন শ্রীপার্থ গুপ্ত (বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত) শ্রীমতী বেবী গুপ্তা, বেদাচার চক্রবর্তী (বর্তমানে নাগীছড়া প্রাক্তন সৈনিক কলোনীতে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। আজকে আগরতলার স্থায়ী বাসিন্দা । বেদাচারের বাবা স্বর্গীয় গিরীজা চক্রবর্তী। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক তবুও তার কথা স্মরণ না করে পারছিনা । কারণ ছোট বয়সে আমাকে নাটক করতে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। গিরীজা বাবু পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) সুখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী । শান্তিনিকেতনে গানবাজনা শিখেছেন, গিরিজাবাবু আগরতলা মহারাণী তুলসীবতী স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন ।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে অভিনীত ছোট নাটক (স্ত্রী বর্জিত) যেমন কেদাররায়, কর্ণার্জুন, শিশুরবি, সৈনিক প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছি । আমাদের স্কুলে কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিলনা । স্কুলের লাগোয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনষ্টিউট হলে সে সময় আখাউড়ার সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ত । বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষে আমার বাবা বড়ভাইরা স্থানীয় উৎসাহী সৌখিন অভিনেতাদের নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে সাজাহান, বঙ্গেবর্গী, দেবলাদেবী, সিঁথির সিঁদুর, সতী সাবিত্রী, মাটির ঘর, পি. ডাবলু ডি, মহারাজা হরিশচন্দ্র, বেজায় বগড়, টিপু সুলতান প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন । বড়দের এই সব নাটকে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে । বাবা ও বড়ভাইদের উৎসাহ আমার মঞ্চভীতি দূর করেছে । অভিনয়ে সাবলীলতা যুগিয়েছে । ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে অভিনয় করার জন্য শিল্পীদের পোষাক পরিচ্ছদ আনা হত ঢাকার রমেশ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী থেকে। এখন ভাবতে হাসি পায় যে এই সমস্ত চোখ ধাঁধানো ঝলমলে পোষাক, আঁকা সিন, উইহংস, রঙ্গবেরংগের স্কাইএ মোড়া মঞ্চ আমার শিশু মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলত । পোষাক পড়ে মেক্‌আপ নিয়ে কখন মঞ্চে উঠব, অভিনয় করব সেই অদম্য আগ্রহ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত ।

১৯৪৩ সন । মন্বন্তর । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্ব্বনাশা কালোছায়া । অন্ধকারে ঢাকা মসীলিপ্ত সেই ভয়ংকর দিনগুলি । অবিভক্ত বাংলার সমস্তটা জুড়ে অভিনীত হচ্ছে এক মর্মন্তুদ নাটক, যার কুশীলব বাংলার প্রতিটি মেয়ে পুরুষ শিশু । "একটু ভাত দে মা" "একটু ফ্যান দে মা" । প্রেতের মত চেহারার সেই মানুষগুলোর ক্ষুধার্ত ম্লান মুখগুলো স্মরণ করে আজকেও আমি শিউরে উঠি।

আখাউড়ার কাছে সিংগারবিলে ইংরেজরা তৈরী করেছে বিমানঘাঁটি । এর মাঝে জাপানীরা একদিন বোমা ফেলে গেছে । চারদিকে একটা অশান্ত থমথমে ভাব । সব মানুষ আতংকে দিন গুণছে । এই বাতাবরণে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় । এই সময় আগরতলা ও কুমিল্লা থেকে দুটো নাট্যগোষ্ঠী আখাউড়া আসে । যতদূর মনে পড়ে আগরতলার দলটি (পরে জেনেছি ত্রিপুর শিল্পায়তন) অভিনয় করেছিল দুটো নাটক, - পতিব্রতা ও তটিনীর বিচার । কুমিল্লা দলটির অভিনীত হয়েছিল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে । নাটকে উভয় দলই যে মঞ্চসজ্জা রচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের । টানা আঁকা দৃশ্যপটের পরিবর্তে ব্যবহার করেন কাঠের ফ্রেমে সাটা কাটা সিন । সেগুলো মঞ্চে সাজিয়ে তৈরী করা হয় ঘরবাড়ী, দালানের কোঠা, বাগান, আসামীর কাঠগড়া, বিচারের মঞ্চ । অভিনয়ে আগরতলার দলটির অভিনয় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে । অভিনেতাদের অনেকেরই নাম মনে নেই । তবে ˚ত্রিপুরেশ মজুমদার, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, ˚ইন্দুবিকাশ চৌধুরীর নাম সবাইর মুখে মুখে ঘুরেছে ।

১৯৪৫ সন । জীবনের প্রথম অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত । বাবা, রেলওয়ে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে সপরিবারে আগরতলা চলে আসেন । আমাদের বাড়ী তৈরী হ'ল মোটর ষ্টাণ্ডের কাছে বনমালীপুরে । উমাকান্ত একাডেমীতে ক্লাশ এইটে ভর্ত্তি হলাম । প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী । তার অসুস্থতার কারণে সহকারী প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় সতীশ চক্রবর্তী মশাই প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাতেন । বাংলার শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় নিশিকান্ত বিশ্বাস ।

বনমালীপুরে আমার বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সাথে পরিচয় হয় । সবার সাথে অন্তরঙ্গতা হয়ে যায় । এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদে নাট্যগোষ্ঠী তৈরী হল । পাড়ায় বিভিন্ন সময়ে বেশ কটি নাটক মঞ্চস্থ করা হোল । নাটকগুলি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত । পরে তিনি কলকাতা চলে যান । বইগুলোর নাম যতটা মনে পড়ে, বেতন নিবারক বিছানা, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া, চলার পথে ইত্যাদি । এই নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল বনমালীপুরে শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মুখার্জী (মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের শিক্ষক) মশাইর বাড়ীর সামনের খোলা জমিটির উপর কাঠের চোকি দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে । মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল ধুতি, শাড়ী দিয়ে এবং আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে । বনমালীপুরের প্রভাতী লাইব্রেরীটি ছিল বর্ত্তমান আগরতলার পূর্ব থানার কাছে স্বর্গীয় প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য মশাইর বাড়ীর সামনের ঘরটিতে । এছাড়া দুএকটা নাটক হয়েছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত তৈলচিত্র শিল্পী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (শ্যামাচরণ পেইন্টার) মশাইর বাড়ীর সামনে ।

আমরা, সিরাজের স্বপ্ন, না টক না মিষ্টি, এই ধরণের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করি বনমালীপুরে ˚দ্বিজেন দত্ত মশাইর যে খালি জমি ছিল সেইখানে । এখানেই পরবর্তী সময়ে হরিগঙ্গা বসাক স্কুল গড়ে উঠেছে । নাটকে যে সমস্ত রাজকীয় পোষাক ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশীর ভাগ যেমন আচকান, পাগড়ি, তলোয়ার, যোধপুরী পায়জামা আমরা যোগাড় করেছি রাজ কর্মচারীদের বাড়ী থেকে । মহারাজের রাজসভায়, রাজকর্মচারীদের ঐ সমস্ত পোষাক পরে যেতে হত । নাটকে অভিনয় করার সময় আমাদের সাজিয়ে দিতেন ˚ শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, স্নেহাংশু চৌধুরী (তখনকার দিনের সঙ্গীত শিক্ষক, বাড়ী বনমালীপুর থানা রোড) মধ্যপাড়ার ফটোগ্রাফার ˚ প্রফুল্ল সেনগুপ্ত (সেন এণ্ড সেনের মালিক, রবি সেনগুপ্তের বাবা) । আগরতলাতে যারা নাটক অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অনেকের বাড়ীই আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ বনমালীপুরে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ˚ত্রিপুরেশ মজুমদার, ˚ জ্যোর্তিময় মজুমদার (কালা), ˚ পীযুষ মজুমদার (ধলা), ধূর্জটি দাশগুপ্ত, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সুখময় সেনগুপ্ত (ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী), দিগেন্দ্র ব্যানার্জী, ˚ জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ˚ বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ˚ অনিল দাশগুপ্ত, ˚ অজিত দাসগুপ্ত, ˚ স্মরজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ । জ্যোতিপ্রসাদ ও বঙ্কুপ্রসাদ সম্পর্কে আমার বড়ভাই । অভিনেত্রীদের মধ্যে যূথিকা মজুমদার, কণিকা চক্রবর্তী ।

উমাকান্ত একাডেমীতে প্রতিবছর বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুলের ছাত্ররা নাটক করতেন। মঞ্চ তৈরী হত স্কুলের হল ঘরে যেখানে লাইব্রেরী কাম রিডিং রুম করা হয়েছে। এই হল ঘরে আগরতলার অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনেক নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান করেছেন।

উমাকান্ত একাডেমীর শত বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যে স্মরণিকা বের করা হয়েছে তাতে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য মশাই তার "একাডেমীর ছাত্র নাট্যচর্চার আদিপর্ব" প্রবন্ধের শেষ দিকে লিখেছেন যে "ইন্দু বিকাশ বাবুর অনুপস্থিতিতে এবং যুদ্ধকালীন অশান্ত সামাজিক পরিবেশ উমাকান্ত একাডেমীর নাট্যচর্চার প্রবাহে সাময়িক বিরতি ঘটে। তারপর যুদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর একাডেমীর নাট্যচর্চায় নতুন যুগের সূচনা হল।" তাঁর এই বক্তব্য আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিনা। কারণ ১৯৪৩ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে উমাকান্তের ছাত্ররা শিক্ষক স্বর্গীয় নিশিকান্ত বিশ্বাস মশাই এর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ডাকঘর" নাটকটি অভিনয় করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দর্শকদের অনুরোধে তিন দিন ধরে এই নাটকটি অভিনীত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে এই নাটকটিই উমাকান্ত স্কুলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকটির অমল চরিত্রে অভিনয় করেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা (ইনি ত্রিপুরা বন বিভাগে উচ্চপদে চাকুরী করে কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্র চিত্রনে ছিলেন রবীন দেব, পরিমল ভট্টাচার্য্য, পরেশ দে, বিমল চৌধুরী, দেবরাজ হালদার, মনোরঞ্জন ধর, নিত্যরঞ্জন দাস, ফটিক দত্ত ও আরও অনেকে। এটা খুবই সত্য কথা যে তখন আমি আগরতলা আসিনি কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় নিশিবাবুর কাছে এ তথ্য জানতে পেরেছি।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে তখনকার মহারাজার শিক্ষামন্ত্রী কর্ণেল ডি. এ. ডব্লু ব্রাউন সাহেব উমাকান্ত একাডেমী স্কুলে "এডুকেশন উইক" নামাকরণ করে এক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মহকুমা শহরের হাই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগীতার মূল অংগ ছিল খেলাধূলা ইত্যাদি। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ছিল নাটক অভিনয় ও আবৃত্তি। যতদূর মনে আছে, এই উৎসবে উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্ররা নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের "শতবর্ষ আগে" নাটকটি উপস্থাপনা করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন কৃতি অভিনেতা ও খ্যাতনামা পরিচালক ত্রিপুরেশ মজুমদার। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এ নাটকে ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ছিল "লুনা" চরিত্রে শ্রী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (এখন আকাশ বাণী আগরতলা কেন্দ্রে কর্মরত) অভিনয়। হুসনীবাঈর চরিত্রে অভিনয় করেন সলিল ঘোষ (ইনি ত্রিপুরার তৎকালীন, চীফ মেডিক্যাল অফিসারের ছেলে) এম. বি. বি. কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করার পর ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার হন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদে চাকুরী নেন) সলিলের সুন্দর চেহারা ও অভিনয় অনেক অভিনেত্রীকেও হার মানায়। পুরুষ চরিত্রে ছিলেন জ্যোতির্ময় মজুমদার (কালা) পীযূষ মজুমদার (ধলা) বিমল চৌধুরী, রতিরঞ্জন দেবনাথ, বিমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রমথ পোদ্দার, মনোরঞ্জন ধর, দেবরাজ হালদার, পরেশ দে, অমলেন্দু রায়বর্দ্ধন ও আরও অনেকে। দলগত অভিনয়ে নাটকটি উচ্চমানে পৌছেছিল ও দর্শকদের উচ্চপ্রশংসা পেয়েছিল। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিনয় করেছিলেন "সরমা" নাটকটি। যতদূর মনে আছে, নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা সুধাংশু মোহন দত্ত। অভিনয়াংশে ছিলেন মনিকা গৌতম, বাণা চক্রবর্তী, মীরা বিশ্বাস, মায়া রায়, অলি গুপ্তা এবং আরও অনেকে। নেপথ্য সংগীতে অংশ নেন মহারাজকুমার বিপিন বিহারী দেববর্মা, প্রয়াত মহারাজকুমার বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা, ঠাকুর নীলু দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা। আলোক সম্পাতে ছিলেন পরেশ নাথ চাটার্জী। বোধজং স্কুলের ছাত্ররা অভিনয় করেন অয়সকান্ত বক্সীর ভোলামাষ্টার।

উমাকান্ত স্কুলের বর্ত্তমান জিমনাসিয়াম হলের একটু পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল। তার সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে সেখানেই প্রতিযোগিতার নাটকগুলি অভিনীত হয়। এই নাটক প্রতিযোগিতায় আমি অবশ্য কোন অংশে নেইনি।

ক্লাশ এইটের বার্ষিক পরীক্ষার পর-আমাদের বাংলার শিক্ষক ' নিশিবাবু স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে মহেন্দ্রগুপ্তের "টিপু সুলতান" নাটকটি অভিনয় করান। আগরতলা স্কুল জীবনের নাটকে স্ত্রী চরিত্রে আমার প্রথম মঞ্চাভিনয়। টিপু সুলতান নাটকে রুনী বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি কুড়াই। নাটকে নাম ভূমিকায় ছিলেন শ্রীবিমল চৌধুরী। ইনি বহুদিন হয় আগরতলা ছেড়েছেন বিদেশ দূতাবাসে চাকরী করতেন। মনে হয় এতদিনে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রমথ পোদ্দার অভিনয় করেছিলেন মশিয়ে লালী চরিত্রে। সুপুরুষ,সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বাড়ীটা ছিল খোসবাগানের মাঠের দক্ষিণে দিকে। এখন যেটা বিশ্বকর্ম্মা গ্লাস এজেন্সীর মালিকরা কিনে নিয়েছেন। অন্যান্য যারা অভিনয় করেছিলেন, তারা ছিলেন অশোক দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, পরেশ দে, মনোরঞ্জন ধর, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। নাটকে জ্যোতিষির ভূমিকায় অভিনয় করেন মুসুদা (আমিনুল ইস্‌লাম, বর্ত্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক) মুসুদার উদাত্ত গলায় সুরেলা কণ্ঠের গাওয়া সেই গান - "হে ভৈরব রুদ্র ডমরু তব কৈ," 'চঞ্চল, ওরে চল, মুসাফির থামিস্ নে আগে চল"। গানগুলি আজও এতদিন পর আমাকে এক বিস্মৃত জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের টিপু সুলতান নাট্যাভিনয় আগরতলা নাট্যামোদীদের মন কেড়ে নিয়েছিল। নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল ' নিশিবাবুর হাড়ভাংগা পরিশ্রম ও কঠিন সাধনা। আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার উৎসাহ ও স্নেহশাসনে আমার পরবর্ত্তীকালের অভিনয় জীবন এক প্রচণ্ড গতিবেগ পেয়েছিল। নাট্যজীবনের স্মৃতি রোমন্থনে ওঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। পরবর্ত্তীকালে স্কুল জীবনে আরও বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছি। অবশ্য সবগুলি নাটকেই আমার ভূমিকা ছিল স্ত্রী চরিত্রে। নাটকগুলি হচ্ছে শতবর্ষ আগে, মীরকাশেম, কালিন্দী, মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ ইত্যাদি।

১৯৪৭ ইংরেজী সনের শেষের দিকে তখনকার ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মেজর হৃষিকেশ দেববর্মা মশাই পুলিশী কর্ম্মচারীদের দিয়ে অভিনয় করান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক "অনুপমার প্রেম"। এক্ষণে যেখানে আই. জি. পির. অফিস সেখানে ছিল পুরানো পুলিশ রিজার্ভ। এই পুরানো পুলিশ রিজার্ভ অফিস প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। অভিনযাংশে ছিলেন প্রয়াত অমূল্য কেশব সেন শর্ম্মা, ' বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনীন্দ্র তরফদার, কমল দাশগুপ্ত (ছবি দাশগুপ্ত), অমৃত কর, ননী চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অনেকে। ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাবের এটাই হচ্ছে প্রথম পূর্ণাংগ নাটক অভিনয়।

১৯৪৮ সন। আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র। প্রমথ পোদ্দারের কথা আগেই বলেছি। তিনি তখন কলেজের ছাত্র। নাট্য চর্চায় উৎসাহী তরুণকে নিয়ে একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সভ্যদের মধ্যে ছিল, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, অনিল দে, রঞ্জিৎ দাস, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, পরেশ দে, আমিনুল ইস্‌লাম, সলিল ঘোষ, মানিক সেন প্রমুখ অনেকে। প্রমথদার পরিচালনায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল প্রাঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয় মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক টিপু সুলতান। এ নাটকে আমি অভিনয় করিনি। স্মারক হিসেবে এই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা ছিল উন্নতমানের। প্রতিটি অভিনেতা দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। তখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতে যোগ দেয়নি। ১৯৪৮ সন। রায় সাহেব সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, ত্রিপুরা মহারাজের অন্যতম উপদেষ্টা। তার ছেলেরা, জ্যোতিষ দত্ত, অমর দত্ত, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত আমার সাথে স্কুলে অনেক নাটকে অংশ নিয়েছেন। সিনেমা জগতে ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র "তথাপি"। প্রযোজনায় ছিল ছবি ও বানী লিমিটেড্। অমরবাবু ছবি ও বানী লিমিটেডের অন্যতম কর্ণধার। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন

স্কুলটিও তখন ছিল ছন বাঁশ দিয়ে তৈরী কাঁচা ঘর। মাটির ভিটি। পূর্বে পশ্চিমে লম্বা বিরাট ঘর। প্রতি বছরই এই স্কুল ঘরটি আগুনে পুড়ে গেছে।

জ্যোতিষবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বৈকুণ্ঠের উইল" উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। তিনি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে বৈকুণ্ঠের উইল নাটকটি অভিনয় করিয়ে সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল ঘরটি পাকা করতে সাহায্য করবেন। সে সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত হীরেন্দ্র নাথ নন্দী। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এ প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেন। "ত্রিপুর শিল্পায়তন" ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী নাট্যগোষ্ঠীর তখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোতিষবাবু একদল উদীয়মান নাট্যপ্রেমী তরুণকে একত্রিত করে নিজের বাড়ীতেই এই নাটকের মহড়া দেন। নাটক মঞ্চ করতে যে খরচ হয় তার পুরোটাই তিনি নিজের পকেট থেকে দেন। তার সুযোগ্য পরিচালনায় দুদিন ধরে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ও দর্শকদের অকুণ্ঠ-প্রশংসা কুড়ায়। এ নাটকে আমার কোন অংশ ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জেনেছিলাম যে প্রায় সাতশ টাকার মত দর্শনীমূল্য সংগৃহীত হয়েছিল ও পুরো টাকাটাই স্কুল কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনকার দিনে এই সাতশ টাকার মূল্য কম ছিল না। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, সরোজ চন্দ (পরবর্ত্তী জীবনে রাজনৈতিক কর্মী), বনজিৎ দাস, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, সলিল ঘোষ, রবীন দে, অনিল দে (ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন কর্মী) প্রমুখ আরও অনেকে। শিশু চরিত্রে ছিল, চিদানন্দ গোস্বামী ও রেনুধর গোস্বামী।

পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে ষাট দশকের মাঝামাঝি আগরতলায় নাট্যচর্চার প্রবাহ খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে অনেক নতুন নতুন নাট্য গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। নাটক অভিনয়ের ধারা পাল্টে গেছে। আঙ্গিকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, একঝাঁক তরুণ উদীয়মান অভিনেতার আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

১৯৫০ সনে প্রমথ পোদ্দারের উদ্যোগে "সবুজ সংঘ' নামে একটি নতুন নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম নেয়। আমি এই নাট্য সংস্থার সদস্য হই। ˚ সুধাংশু মোহন দত্তের পরিচালনায় আমরা ঐতিহাসিক নাটক "দেবলা দেবী অভিনয় করি। নাটকটি অভিনীত হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের স্কুল ঘরে। এই নাটকে যারা অভিনেতার তালিকায় ছিলেন তারা হলেন, প্রমথ পোদ্দার, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, বঙ্কিম দাস, প্রাণতোষ দত্ত, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, রতিরঞ্জন দেবনাথ, মানিক মিএগ্রা (বর্ত্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক) স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন, সুবীর দাস, পরিমল দত্ত, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, রেনুধর গোস্বামী ও আরও অনেকে। আমি অভিনয় করি দেবদাসের ভূমিকায়।

প্রমথদা ছিলেন সবুজ সংঘ নাট্যসংস্থার প্রাণপুরুষ। নাটক অভিনয় করতে যে টাকা খরচ হ'ত তার সিংহভাগই আসত তার কাছ থেকে। দেবলাদেবী নাটক অভিনয়ের পর তিনি আগরতলা থেকে চলে যান। তাই ইচ্ছা বা আকাংখা থাকলেও "সবুজ সংঘকে' আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। প্রধান কারন ছিল অর্থাভাব।

একটা কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। করোনেশন গেটের পেছন দিকে ঘোড়ার খুড়ের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে দালানটি আছে তার নাম "প্যাণ্ডেল"। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ও পরে মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের যুবরাজ হিসেবে এখানেই অভিষেক হয়। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই প্যাণ্ডেল হল। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারত ভুক্তির চুক্তিও এখানেই হয়েছিল। ১৯৪৮ সনের গোড়ার দিকে "ত্রিপুর শিল্পায়তন" এই প্যাণ্ডেলে ডি এল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক "সাজাহান" অভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা ও এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ˚ ত্রিপুরেশ মজুমদার। দারা, সুজা, মুরাদ ও

ঔরঙ্গজীবের চরিত্র চিত্রন করেন যথাক্রমে মেজর হৃষিকেশ দেববর্মা (ভিক্ষু ঠাকুর) অনিল সেন (ত্রিপুরার প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার) রাণা ডাহলজং (মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা বোধজং এর বড় ছেলে) ও * সুধাংশু মোহন দত্ত মশাই। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে ছিলেন ধূর্জটি দাশগুপ্ত, লক্ষবীর জং, * অনিল দাশগুপ্ত, * অজিত দাশগুপ্ত প্রমুখ। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, * কিরন দেববর্মা, * অনিল দাস ও শিশু সিপারের ভূমিকায় ছিল মায়া রায়। এই নাটকে যে সব পোষাক ব্যবহার করা হয় সে সমস্ত আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। অভিনেতাদের সার্বজনীন অভিনয়ে নাটকটি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে যারা পোষাক নিয়ে এসেছিল তারাও নাটকটির অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিল। তৈরী করা মঞ্চটি থেকে যায়। কিছুদিন পর আমরা এখানে যে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করি সেগুলি হল "স্বর্গ হতে বড়" ও "রাজপথ"।

স্বর্গ হতে বড় নাটকে অমরেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রী সরোজ চন্দ। অপূর্ব বাচন ভঙ্গীতে উনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। শ্রী চন্দ পরবর্তী জীবনে আর নাটক করেন কি। রাজনীতিই এখন ওর পেশা। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন * জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, * গোপাল গুপ্ত, পরেশ দে, রুনু বোস, সুনীল ঘোষ প্রভৃতি। আমার ভূমিকা কি ছিল এখন সেটা মনে করতে পারছিনা।

আগরতলার কৃষ্ণনগর ব্যানার্জী পাড়ায় * ব্রজগোপাল ব্যানার্জী মশাইর বাড়ীতে প্রতি বছর পূজোর সময় ঘরোয়া পরিবেশে বেশ কিছু নাটক হয়েছে। * যদুগোপাল ব্যানার্জীর মেয়ে রুবী ব্যানার্জী ছিল এর উদ্যোক্তা। সিনেমা ও মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী বাড়ীর আত্মীয়রা। তিনিও মাঝে মাঝে এই সব নাটকে অংশ নিয়েছেন। ব্যানার্জী বাড়ীর মেয়ে রেখা ব্যানার্জী ও ইরা ব্যানার্জী (গাঙ্গুলী) সত্তর ও আশীর দশকে অভিনয় জগতে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রবীণ শিল্পী কানু ব্যানার্জীও এই বাড়ীর ছেলে।

ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের অন্যতম উপদেষ্টা ঠাকুর * জীতেন্দ্র দেববর্মা। কৃষ্ণনগরের এ্যাড্ভাইজার চৌমুহনীর নামাকরণ ওরই পদমর্য্যাদার স্বাক্ষর বহন করে। প্রয়াত দেববর্মা, আগরতলার বেতার কেন্দ্রের অফসার শ্রীমৃণাল দেববর্মার ঠাকুরদা। মৃণাল দেববর্মার পিসী * সলিলা দেববর্মা সংগীত ও কৃষ্টি জগতের তখনকার দিনে একটি পরিচিতি নাম। জীতেন বাবুর বাড়ীতে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও সলিলা দেবীর উৎসাহে নৃত্যনাট্য, নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে।

১৯৫১ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। নাট্যজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করে পা রাখলাম তৃতীয় অধ্যায়ে। পরিচয় হল প্রয়াত ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মার সাথে। (পরলোকগতা অভিনেত্রী কল্পনা দেববর্মার বাবা বাড়ী কৃষ্ণনগরে) আমার অভিনয় জীবনে আগরতলার অনেক নাম করা পরিচালক ও অভিনেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমার এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না যদি প্রয়াত দেববর্মার সাথে আমার পরিচয় না হত। ওর সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। প্রথম জীবনে সৈনিক পরবর্ত্তী কালে গবেষক, সাহিত্যেকার নাট্যকার, কবি ও সংগীত শিল্পী। প্রখর ব্যক্তিত্বময়, এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। ওর সংগে পরিচয় না হলে আমি ত্রিপুরা মহারাজাদের নাটক সম্পর্কে উৎসাহ ও পৃষ্টপোষতার কোন খোঁজ পেতাম না। ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের শেষের দিকে (আমার আগরতলা আসার আগ পর্য্যন্ত) আগরতলার নাট্যচর্চার অনেক ইতিহাস আমি ওর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

ত্রিপুরার মহারাজ স্বর্গীয় বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পার্সোনাল ষ্টাফে (দেহরক্ষী বাহিনীতে) উচ্চপদে চাকরী করতেন ক্যাপটেন দেববর্ম্মা ও সব সময় মহারাজের পাশে পাশে থাকতেন। ত্রিপুরার মহারাজ নাট্যকার অভিনেতা ও সংগীত শিল্পীদের শুধুমাত্র উৎসাহই দিতেন না, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যও করেছেন।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এক নাটকাগোষ্ঠি তৈরী করেন । নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের সময় মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন ও অভিনয়ের ভুল ভ্রান্তি শুধরে দিতেন । গুণী শিল্পীদের তিনি কেমন ভালবাসতেন এ সম্পর্কে স্বর্গীয় দেববর্মা একটা সুন্দর গল্প বলেছিলেন । প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় অমূল্য কেশব সেনশর্মা, * ত্রিপুরেশ মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই । কলকাতা কলেজে বি. এ. পড়ার সময় অমূল্য বাবু আগরতলা বেড়াতে আসেন । * ত্রিপুরেশ বাবু তখন যুবক । নাটক পাগল । অমূল্যবাবু নাটক করেন একথা * ত্রিপুরেশ বাবু জানতেন । * ত্রিপুরেশ বাবুর উৎসাহে ও পরিশ্রমে "মীরাবাঈ" নাটকটি অভিনীত হয় । অমূল্যবাবু এ নাটকে রাণা কুম্ভের অভিনয় করেন । তখনকার দিনে দুর্গাবাড়ী মণ্ডপের হয় পূর্বদিকে নয়ত পশ্চিমদিকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটক অভিনয় হত । অন্যান্য দর্শকের সাথে একাসনে বসে মহারাজ নাটকটি দেখেন । নাটকটি খুবই উঁচু মানের হয়েছিল - বিশেষ করে অমূল্যবাবুর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব্ব । মহারাজা ডেকে অমূল্যবাবুর খোঁজ খবর নেন ও আগরতলা থাকতে অনুরোধ করেন । কলেজ খোলার পর সেনশর্মাবাবু কলকাতা যাওয়ার উদ্যোগ নেন । কানাঘুষায় এ খবরটা মহারাজার কানে উঠে । তিনি পুলিশের লোকদের বলে দেন অমূল্যবাবুর উপর নজর রাখতে যাতে তিনি (অমূল্যবাবু) আগরতলা ছেড়ে যেতে না পারেন । মহারাজার ভয়ে পরবর্ত্তী জীবনে অমূল্যবাবু স্থায়ীভাবে আগরতলা থেকে যান ও রাজ সরকারে চাকুরী নেন ।

* ত্রিপুরেশ বাবু খুব বড় মাপের অভিনেতা ও সংগঠক । তার মৃত আত্মার প্রতি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি যে তিনি নিজে যে ধাঁচে অভিনয় করতেন, অভিনয়ের সেই ধারা জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন । অর্থাৎ অভিনেতার নিজস্ব বিশিষ্টতার কোন মূল্য তিনি দিতেন না । পরবর্ত্তীকালে দু একবার এ ব্যাপারে আমার সঙ্গেও তার মত বিরোধ ঘটেছে । অমূল্যবাবু কলকাতা মঞ্চে অভিনয় দেখেছেন । তখন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ব্যানার্জির যুগ । অমূল্যবাবু তাদের অভিনয় বাচনভঙ্গীর অনুরাগী ছিলেন ও অভিনয়ে ত্রিপুরেশবাবুর মতামতের প্রাধান্য দেন নি । ফলে পারসোনালেটি ক্ল্যাস অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সংঘাত । পতিব্রতা নাটক অভিনয়ের পর সম্পর্কের ফাটল আরও দীর্ঘায়িত হল । স্থানীয় অভিনেতা হিসাবে ত্রিপুরেশবাবু জয়ী হলেন । অমূল্যবাবুকে দল থেকে বের করে দেওয়া হল । অধিকাংশ অভিনেতারা ত্রিপুরেশ বাবুর দলে রইলেন । এই সময় নিঃসঙ্গ অমূল্যবাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা বোধজং এর বড় ছেলে রাণা ডাহলজং ।

ত্রিপুরেশ বাবু তার নাট্যগোষ্ঠীর নামাকরণ করলেন "ত্রিপুর শিল্পায়তন"। রাণা ডাহলজং এর পৃষ্ঠপোষকতায় অমূল্যবাবু সম্পূর্ণ আনকোরা শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুললেন "মাতৃ মন্দির" নাট্যসংস্থা । মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থাব প্রথম নাট্যভিনয় মন্মথ রায়ের "কারাগার" । ব্রিটিশ ভারতে এই নাটকের অভিনয় তখন নিষিদ্ধ ছিল । নাটকের মূল চরিত্র কংসের ভূমিকায় ছিলেন অমূল্য বাবু নিজে । অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন * মনি দেববর্মা (বীরচন্দ্র দেববর্মার ভাই) * রমেশ দেববর্মা, কালু মিঞা, মাতাব মিঞা, * বলাই সেনগুপ্ত (অমূল্য বাবুর ভাই), রূপেন চক্রবর্তী, * নরেশ চক্রবর্তী, * নারায়ণ রায় প্রমুখ অনেকে । শিশু অভিনেতা বিশ্বজিৎ সেনশর্মা কীর্ত্তিমানের প্রথম অভিনয় করেন এই নাটকে । নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল দুর্গাবাড়ী নাট্যমন্দিরের পূর্বদিকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে । কিছুদিন পর ত্রিপুরেশ বাবুর গোষ্ঠী অভিনয় করেন অপরেশ চন্দ্রের "কর্ণার্জুন" । শকুনিও কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে * ত্রিপুরেশ বাবুও * স্মরজিৎ চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুরের বাসিন্দা ও পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা শাসক হিসাবে কাজ করেন)। মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থা পরবর্তী সময়ে দস্যু ও পোষ্যপুত্র নামে আরও দুটি নাটক অভিনয় করেন । সেগুলোও দুর্গাবাড়ীর অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয়। এই মঞ্চটি তৈরী হয়েছিল নাট মন্দিরের পশ্চিমদিকে । * সুধাংশু মোহন দত্ত পড়াশুনা শেষ করে আগরতলা আসেন ও মাতৃমন্দির নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন । সুধাংশুবাবুর উপস্থিতি মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থাকে শক্তিশালী

করে তোলে। অভিনীত নাটক দুটির অভিনয় লিপিতে ছিলেন ˙ অমূল্য কেশব সেনশর্মা, ˙ সুধাংশু মোহন দত্ত, নারায়ণ রায়, কালু মিঞা, মাতাব মিঞা, রূপেন চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। শিশু শিল্পী হিসেবে ছিলেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর "দস্যু" নাটকটিতে অভিনেতাদের অভিনয় চাতুর্য্য দেখে অভিভূত হন। পাশাপাশি ত্রিপুরেশ বাবু গোষ্ঠী অভিনয় করেন অনুরূপা দেবীর "মা"। অভিনয়াংশে ছিলেন ত্রিপুরেশ বাবু, ˙ স্মরজিত চক্রবর্তী, ˙ মন্মথ পোদ্দার (প্রমথ পোদ্দারের বাবা) মেঘেন্দ্র মুখার্জি, কানু বানার্জি, অতুল চক্রবর্তী, স্বর্গীয় শান্তি রায়। স্বর্গীয় নীলরতন গাংগুলি প্রমুখ আরও অনেকে।

"পোষ্যপুত্র" নাটক অভিনয়ের পর মাতৃমন্দির সম্ভবত: আরও দু'একটা নাটক করেছিল। সেগুলোর নাম ক্যাপটেন দেববর্মার মনে ছিল না। এরপর অমূল্য কেশব সেনশর্মা চাকরীর সুবাদে কৈলাসহর চলে যান ও নাট্যসংস্থাটি সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে মুছে যায়। ˙ সুধাংশুবাবুও স্থায়ীভাবে ত্রিপুর শিল্পায়তনে যোগ দেন।

১৯৫২ সনে স্কুলের পড়া শেষ করে ত্রিপুরা সরকারে পূর্ত্ত বিভাগে চাকুরী নেওয়ার পর সাময়িকভাবে আমার নাট্যজীবনের পট পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে বিচ্ছিন্নতা নয়। এই সময়টা আমার কেটেছে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার নাট্যঅভিনয়ে স্মারক হিসেবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই "ত্রিপুর শিল্পায়তনের" ডাকে তাদের নাটকে স্মারক হিসেবে আমার ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ সনে, আগরতলা পূর্ত্ত বিনোদন সংস্থা মঞ্চস্থ করে কথা সাহিত্যিক ˙ তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের নাটক "আরোগ্য নিকেতন"। পরিচালক শ্রীতপেশ বোস। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল নেতাজী চৌমুহনীতে মন্ত্রীবাড়ীর সামনের খোলা জায়গায়। আজকে সেই মাঠেই গড়ে উঠেছে পূর্তবিভাগেব বিভিন্ন অফিস। এ নাটকে আমিও অংশ নিই। অভিনয়াংশে অন্যান্যরা হলেন সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য, ˙ অজিত দাশগুপ্ত, সুধীন দে প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন মৃণাল ভৌমিক বেনুধর গোস্বামী, সুবীর দাস। মন্ত্রীবাড়ীব এই অস্থায়ী মঞ্চে পরে আরও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয় যেমন পি. ডব্লিও. ডি. চিকিৎসা সংকট, কেরানীর জীবন, মানসী, পূজার বোনাস ইত্যাদি।

সমসাময়িক কালে ধলেশ্বর শ্রীনিত্যরঞ্জন দাশগুপ্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় স্বর্গীয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক "দ্বীপান্তর"। এই নাটকে নিত্যবাবু অভিনয় করেন। তার সঙ্গে আর কে কে ছিলেন ঠিক মনে করতে পারছিনা।

ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে ঐ বছর বর্ত্তমান শিশুউদ্যানে শিল্পউন্নয়নে প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। সরকার থেকেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে দেওয়া হয়। আগরতলার কয়েকটি নাট্যসংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আমাদের অভিনীত নাটক দুটির নাম পি. ডাব্লু. ডি. ও উল্কা। ত্রিপুর শিল্পায়তন উপস্থাপনা করে সানিভিল্লা। পি. ডাব্লুও. ডি. নাটকে আমার চরিত্র ছিল মিঃ সেনের। সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অভিনয় ধারার এই চরিত্র চিত্রন করে দর্শকদের সাধুবাদ পাই। এই অভিনয় নিয়ে ত্রিপুর শিল্পায়তনের পরিচালক ও অভিনেতা ত্রিপুরেশ বাবুর মত বিরোধ হয়।

১৯৫৪ সনের মাঝামাঝি উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানএর আয়োজন করা হয়। নাটক ও যাত্রাভিনয় ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। অভিনীত হয় "সরমা" ও বঙ্গেবর্গী" যাত্রাপালা ও "রীতিমত নাটক"। যাত্রাপালা ও নাটকে চরিত্র বন্টন নিয়ে ˙ ত্রিপুরেশ বাবুর সাথে আমার পুরাণো মতবিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অন্যান্য অভিনেতারা আমাকে বঙ্গেবর্গীতে সিরাজের ভূমিকার অভিনয় করার পক্ষে মত দেন কিন্তু ত্রিপুরেশ বাবু এর তীব্র বিরোধিতা করেন। আমি নাটক অভিনয় থেকে সড়ে আসতে চাই। শেষ অব্দি শ্রীহৃষিকেশ দেববর্ম্মা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল দাশগুপ্ত ও শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মশাইর হস্তক্ষেপে এই মতবিরোধের নিস্পত্তি হয়।

শেষ অব্দি বঙ্গেবর্গীতে আমিই সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করি । এটাই আমার জীবনে প্রথম যাত্রাভিনয়। এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ত্রিপুরেশ বাবুর সাথে মতান্তরের জন্য উমাকান্তের প্রাক্তণ ছাত্র বিশ্বজিৎ সেনশর্মাও এই অনুষ্ঠানে নাটক বা যাত্রা অভিনয়ে কোন অংশ নেন নি । যাত্রার প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছিল "শিরিশ কুসুম" গাছটির একটু পশ্চিম দিকে ও নাটক অভিনয় হয়েছিল এই প্যাণ্ডেলের আরও একটু পশ্চিম দিকে যেখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল তার সামনে । যাত্রাপালায় যারা আমার সাথে অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয় সুধাংশু দত্ত, স্বর্গীয় নীলরতন গাঙ্গুলী, স্বর্গীয় পার্ব্বতী ভট্টাচার্য্য, দিগেন্দ্র ব্যানার্জী, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, সুধীর দাস, রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ । যাত্রাপালার ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জাকর আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে । যাত্রাগান দেখতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় ।

থিয়েটার "রীতিমত নাটকে" বাড়ীওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় করি । অন্য যারা অংশ নেন তারা হলেন স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয় স্মরজিৎ চক্রবর্তী, স্বর্গীয় সুধীর দত্ত (উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক) ধূর্জটি দাশগুপ্ত, শান্তি সরকার, স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ মুখার্জী এবং আরও অনেকে । স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী মুখার্জী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দাস প্রমুখ । কলকাতা মঞ্চ ও সিনেমা জগতের নাম করা হাস্যকৌতুক অভিনেতা স্বর্গীয় শ্যাম লাহা এই নাটক অভিনয় দেখবার অন্যতম দর্শক ছিলেন ।

"ত্রিপুর শিল্পায়তন" এর পর আরও দু একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন 'চিত্রকথা' সিনেমা হলে (কোন স্থায়ী মঞ্চ না থাকায় নাটকের কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে সিনেমা হল ভাড়া করতেন) যত দূর মনে হয় শিল্পায়তন যে যে নাটক অভিনয় করেন সেগুলো হচ্ছে, মাটির ঘর, কেদার রায়, উমাকান্ত একাডেমী হলে অভিনীত হয় "সীতা"। নাটকগুলি ˚ ত্রিপুরেশ বাবু নিজেই পরিচালনা করেন । অভিনয়ে ছিলেন ˚ ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয় অনিল সেন, হৃষিকেশ দেববর্মা, রাণা ডাহলজং, স্বর্গীয় সুধাংশু দত্ত, স্বর্গীয় অলি দাশগুপ্ত, স্বর্গীয় হরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা, কানু বন্দোপাধ্যায়, অমলেন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে ।

ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলটি ছিল বর্ত্তমান রূপসী সিনেমা হলের সামান্য একটু উত্তর দিকে । বোধ হয় আর্থিক অনটনের জন্যই এই হলটি বন্ধ হয়ে যায় । এই হলে একটা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল । এই মঞ্চে ˚ ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তনের শিল্পীরা অভিনয় করেন "চন্দ্রগুপ্ত ও বাংলার মেয়ে" নাটক । যারা অভিনেতা গোষ্ঠিতে ছিলেন তারা হলেন ˚ শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত (উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক) শ্রী কে. পি. দত্ত (তখনকার পাবলিসিটি অফিসার) । অনিল কুমার সেন, হৃষিকেশ দেববর্মা, ধূর্জটী দাশগুপ্ত, কানু বন্দোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, রাণা ডাহলজং, সুধীর দাস, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, রনজিৎ ভট্টাচার্য্য, বেণুধর গোস্বামী, ˚ গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায় । এই নাটকে আমার কি ভূমিকা ছিল তা মনে নেই।

নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আগরতলার মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না । বনমালীপুরের হরিগঙ্গা বসাক স্কুলের সাহায্যার্থে পাড়ার মেয়েরা ত্রিপুরেশবাবুর পরিচালনায় অনুরূপা দেবীর "মা" নাটকটি অভিনয় করেন ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলের অস্থায়ী মঞ্চে । নাটকটি প্রযোজনা করেন বনমালীপুর মহিলা সমিতি । অভিনয়াংশে ছিলেন মুকুল সেনগুপ্তা (সেনশর্মা), উমা দাশগুপ্তা (চৌধুরী), বানী দাস, যুথিকা মজুমদার, দুলী দাশগুপ্তা, মিউ ব্যানার্জী প্রমুখ । প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয় গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মুকুল সেনগুপ্তার মা চরিত্র চিত্রন হয়েছিল অনবদ্য ।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তীর (প্রাক্তন মন্ত্রী) উদ্যোগে ও কয়েকজন উৎসাহী মেয়ে একটি নাট্য সংগঠন গড়ে তোলে । এই গোষ্ঠী অভিনয় করেন "শ্যামলী" নাটকটির । পরিচালক ˚ ত্রিপুরেশ মজুমদার । ত্রিপুর ছায়াবানী হলের অস্থায়ী মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয় । এই নাটক দেখার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী মূল্য

নেওয়া হয়েছিল ও সংগৃহীত পুরো টাকাটাই বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় । স্কুলটি তখন ছিল বেসরকারী । নাটকে যারা অভিনয় করেন তারা হলেন নাম ভূমিকায় টুকু চক্রবর্ত্তী (বাসনা চক্রবর্ত্তীর বোন) ও অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী মুকুল চক্রবর্ত্তী, সতী দাশগুপ্তা, আরও অনেকে । স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ বাবু পরিচালনা ছাড়াও দাদুর ভূমিকায় অভিনয় করেন । এই নাটকে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ অভিনেতা ।

ত্রিপুর শিল্পায়তন পরবর্ত্তী সময়ে আগরতলার বিভিন্ন অস্থায়ী মঞ্চে পর্য্যায়ক্রমে যে নাটকগুলি অভিনয় করেন সেগুলোর তালিকায় রয়েছে সাজাহান, সরমা, সীতা, প্রফুল্ল, মাটির ঘর, সংগ্রাম ও শান্তি, পরিচয় ইত্যাদি । অভিনেতা হিসাবে যাদের নাম আগে উল্লেখ করেছি তারাই ছিলেন ।

আগেই বলেছি যে পুলিশ রিক্রিয়েসন ক্লাবের প্রথম নাটক অনুপমার প্রেম । পরবর্ত্তী সময় এই সংস্থা অভিনয় করেন কেদার রায় উদয়ন সিনেমা হলে । (বর্ত্তমানে রূপছায়া সিনেমা হল) পরিচালনায় ছিলেন পুলিশ সুপার জি. পি. ঘোষ । মাটির ঘরও ছিল কারাগার এই ক্লাবের পরবর্ত্তী প্রযোজনা । নাটক দুটির পরিচালনায় ছিলেন পুলিশ সুপার শ্রীহৃষিকেশ দেববর্মা ও পি. এন. চ্যাটার্জি (ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনীয়ার) এর কিছুদিন পরে জেলা শাসকের কর্মচারীরা শ্রীনরেশ সাহা ও প্রেমানন্দ নাথের পরিচালনায় যে নাটক অভিনয় করেন তার নাম "মহারাজ নন্দকুমার" । নাটকটি মঞ্চস্থ হয় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বেংকোয়েট হলে । অভিনেতাদের নাম স্মরণ আসছে না ।

১৯৫৫ সন । আগরতলার নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটা নবযুগের সূচনা । প্রতিষ্ঠিত হল "লোক শিল্পী সংসদ নাট্যসংস্থা" । নাটক নির্বাচন, অভিনয় ও আঙ্গিকের ঘটল বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন । নাট্য আন্দোলনে লোকশিল্পী সংসদ এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল । লোকশিল্পী সংসদের আত্মপ্রকাশের আগ পর্য্যন্ত আগরতলার সহরে, নাটকের স্ত্রী চরিত্র পুরুষ অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হত । কিন্তু এই সংস্থা মেয়েদের দিয়েই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করান । সে সময় অবশ্য সমাজ জীবনে অভিনেত্রীর অভাব ছিল তাই ত্রিপুর শিল্পায়তনে ও অন্যান্য সংস্থাগুলিতে বাধ্য হয়েই স্ত্রী ভূমিকা পুরুষ দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছে । নাট্য আন্দোলনে এটা হল একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । লোকশিল্পী সংসদের প্রথম অভিনীত নাটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" মঞ্চস্থ হল উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের হলঘরে । লোকশিল্পী সংসদই প্রথম দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী মূল্য নিয়ে নাটক দেখার সুযোগ দেন । নাটকে অভিনয় করেছিলেন শক্তি হালদার, তপেশ রায়, কেশব ভট্টাচার্য্য, দেবেন্দ্র ভৌমিক, লীলা দেব (বর্ত্তমানে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বোধজং গার্লস স্কুল) ইত্যাদি । এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলে, যার কথা আগেই বলেছি । সেদিনকার দিনে অভিনেতাদের অভিনয়ের ধারা, বিশেষ করে মেয়েদের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়, দেখতে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়েছিল । দর্শকরা লোকশিল্পী সংসদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছিল ।

লোকশিল্পী সংসদের কর্মকর্ত্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বাংলার অধ্যাপক) ও মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্য (প্রথমে উমাকান্ত একাডেমীর শিক্ষক ও পরে ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তরে উপ-অধিকর্ত্তা) ।

লোকশিল্পী সংসদের অনুপ্রেরণায় ত্রিপুর শিল্পায়তন ও এতদিন পরে সমস্ত বাধা দূরে ফেলে দিয়ে মেয়েদেরকেঅভিনয়ের পাদ প্রদীপে নিয়ে আসে । অভিনীত হয় তাদের করা পুরাণো দুটি নাটক বাংলার মেয়ে ও চন্দ্রগুপ্ত । পুরুষদের চরিত্রে অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, হৃষিকেশ দেববর্মা, শীতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অনিল সেন, রমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অমলেন্দু বর্দ্ধনরায়, সুবীর দাস, কালীদাস বাড়রী, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য্য, শ্যামল চোধুরী, স্বদেশ পাল, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ । স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন শ্রীমতী রাণী কর

(সেন), ছন্দ' দে, বেলা রায় ও আরও অনেকে। অভিনয়ে মেয়েরা পুরুষ অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যান।

সমসাময়িক কালে শিল্পায়ন নাট্যসংস্থা জন্ম নিল। এই নাট্যসংস্থার প্রধান সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন শ্রী শিবদাস বন্দোপাধ্যায়। নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে বজায় রেখে তারা একের পর এক নাটক অভিনয় করেছেন। তাদেব উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনয়ের মধ্যে ছিল, কেরানীর জীবন, দুঃখীর ইমান, শেষ কোথায়, মহেশ ও ছেঁড়া তার। পরিচালক ও বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ে শিববাবু নিজে। কেরানীর জীবনে ত্রিপুরেশ বাবু ও যুথিকা মজুমদার শিববাবুর সঙ্গে একসাথে অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন, সান্টু দে, বেলা রায় ও শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ অন্যান্য নাটকগুলিতে কে কে অভিনয় করেছিলেন মনে নেই। তবে শিবদাস বাবু ও কনিকা দেবনাথ মুখ্য চরিত্রে ছিলেন। শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ, অভিনয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর অভিনয় ছিল সাবলীল প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক। ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শিল্পায়ন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অভিনয় করে। পরিচালক ছিলেন শিবদাস বাবু। অভিনয়ে কে কে ছিলেন মনে নেই। এই নাট্যসংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর পর আস্তে আস্তে কমে যায়।

যে নাট্যসংস্থা এতদিন ধরে অভিনয় জগতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসেছে সেই "ত্রিপুর শিল্পায়তন" তখন পিছিয়ে পড়েছে। এর কারণ কি আমার জানা ছিলনা। হয়ত বা শিল্পীরা বয়সের ভারে ক্লান্ত অথবা আর্থিক অনটনই এর প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু ত্রিপুরেশ বাবু তার মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত এই সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

নাট্যচর্চায় লোকশিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশক্তি হালদার, পেশায় শিল্পী। সৌখিন অভিনেতা ও কুশলী সংগঠক। ইতিমধ্যে "রক্ত করবী"তে তার অভিনয় দেখেছি। শক্তিবাবুর সাথে যেচে আলাপ করলাম। আমি অভিনয় জগতে আছি শুনি উনি ওব নাট্যসংস্থায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। সানন্দে সাড়া দিয়ে এই সংস্থার সভ্য হলাম। তখন ওরা নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর ধৃতরাষ্ট্র নাটকের মহড়া দিচ্ছিল। যেহেতু নাটকে চরিত্র বিলি শেষ হয়ে গেছিল আমি বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছিলাম। এই নাটকে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, স্নিগ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, অঞ্জলি দাশগুপ্তা, মৃণাল ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী প্রমুখ। ধৃতরাষ্ট্র নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে আমাকে দেওয়া হল স্বরূপের ভূমিকা কারণ এই চরিত্রের নিয়মিত অভিনেতা শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্তী অসুস্থ ছিলেন। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল আলোছায়া (বর্ত্তমান রূপছায়া সিনেমা হল) সিনেমা হলে সকাল ৯টায়। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। জীবনে এই প্রথম মেয়েদের সংগে নাটক অভিনয়। অভিনয়ে সফলতার নজীর রাখি, সংস্থার সভ্য সভ্যা ও দর্শকদের প্রশংসা আদায় করি।

এরপর লোকশিল্পী সংসদের দ্বিতীয় নাট্য উপহার হল ধনঞ্জয় বৈরাগীর মঞ্চ সফল নাটক রূপোলী চাঁদ। নাটকটি অভিনীত হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে। পরিচালনায় ছিলেন সুধাংশু মোহন দত্ত। অভিনয়ে আমি ছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলে নীলরতন গাঙ্গুলী, খগেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক রুদ্রবীণা পত্রিকা) ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল চ্যাটার্জী, রণজিৎ ভৌমিক, সনৎ গোস্বামী, শক্তি হালদার, আশু রায়, মৃণাল ভৌমিক, সুধীন দে, সুশীল চৌধুরী প্রমুখ। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন সতী দাশগুপ্তা, বিভা রায় ও বীণা রায়। অভিনয়ের তারিখ ১৬/১৭ অক্টোবর, ১৯৫৭ ইং।

১৯৫৮ সন। এই সময় ভারত সরকারের ফিল্ড প'বলিসিটির একটি শাখা আগরতলায় আসে ও আমাদের লোকশিল্পী সংসদকে ওদের অন্তর্ভুক্ত করে "আমাদের গ্রাম" ও "মংগু" নামে দুটো নাটক অভিনয় করতে অনুরোধ করে। আমবা, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ, সোনামুড়া, মেলাঘরে

ও আগরতলায় এই নাটক দুটো মঞ্চস্থ করি। আমি ছাড়া আর যারা এই নাটকে অভিনয় করেন তারা হলেন, নরেশ সাহা, দেবেন্দ্র ভৌমিক, ডাঃ নয়ন মজুমদার, মনং গোস্বামী, শ্রীমতী আভা রানী পাল, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মীনা সাহা, মৃণাল চৌধুরী।

ত্রিপুরা পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের প্রযোজনায় আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করলাম জটাগঙ্গার বাঁধ ও মানভঞ্জন নামে দুটো নাটক। অভিনয়াংশে আমি ছাড়া অন্যান্যরা হলেন তপেশ রায়, সুশীল চৌধুরী, অজিত ভট্টাচার্য্য, শক্তি হালদার, গিরীন্দ্র ভৌমিক, মীনা চক্রবর্তী, ছবি দত্ত, ইরা দত্ত ও আরও অনেকে

১৯৫৯ সনের ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী আমাদের নাট্যসংস্থা নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে অভিনয় করলো কিরণ মৈত্রের নাটক বারো ঘন্টা। শক্তি হালদার নাটকটির পরিচালক। তিনি অভিনয় করেন রাজেশ্বর চরিত্রে। আমি অভিনয় করি অমিয়র ভূমিকায়। আর যারা ছিলেন তারা হলেন, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সুধীন দে, বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, শান্তি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, ডাঃ নয়ন মজুমদার, রণজিৎ ভৌমিক, তন্দ্রা মজুমদার, শুভ্রা মজুমদার, যূথিকা গুপ্তা, বিজয়া সাহা, রাণা রায়, সনজিৎ সেনশর্ম্মা, রাজু, অজিত ভট্টাচার্য, হরেন্দ্র হালদার, সুশীল চৌধুরী ও গিরীন্দ্র ভৌমিক।

পরের নাটক লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার অভিনীত হয় ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সনে। স্থান নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবন। নাটকটির পরিচালক শক্তি হালদার। অভিনয়াংশে আমি ছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলেন শক্তি হালদার, জিগ্নির সেনশর্মা, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, অজিত ভট্টাচার্য্য, সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, রীনা দে, তন্দ্রা মজুমদার, স্বপ্না হালদার, মিতালী চক্রবর্তী, কল্পনা গুপ্তা, শুভ্রা মজুমদার, বিজয় রায়, রণজিৎ ভৌমিক, সাধন কর্মকার, সুবীর দাস, অভিজিৎ, যূথিকা গুপ্তা, মীনা চক্রবর্তী, রেনুকা সিংহ রায়, অলকা গুপ্তা ও পূর্ণিমা বমণ।

লোকশিল্পী সংসদের সহ সভাপতি ও সাহিত্যিক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য বহু পরিশ্রম করে ও অনেক নথিপত্র ঘেঁটে রচনা করেন "রাণী জয়াবতী" নাটকটি। শক্তি হালদার নাটকটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে। নাম ভূমিকায় ও রাণী কমলাবতীর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে চিনু বর্ম্মন ও মানসী রায়। আমি ছাড়া পুরুষ চরিত্রে ছিলেন, শক্তি হালদার, তপেশ রায়, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, রূপেন মজুমদার, রণজিৎ ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী, সুশীল চৌধুরী, সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ ব্যানার্জি, সুধীর দাস, নিখিল ভট্টাচার্য্য ও আরও অনেকে। "রাণী জয়াবতী" নাটকটির অভিনয়ের আগে কিছু সভ্য এই নাটকটির বিরোধীতা করেন। সাময়িকভাবে মিটমাট হলেও এক শ্রেণীর সভ্যদের মনে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে।

১৯৬০ইং সনে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব প্রাক্কালে আমাদের সংস্থা, উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে রক্তকরবী নাটক মঞ্চস্থ করে, শক্তিবাবুর পরিচালনায়। আমার ভূমিকা ছিল সর্দ্দারের। শক্তিবাবু অভিনয় করেন রাজার ভূমিকায়। অন্য যারা অভিনয়াংশে ছিলেন তারা হলেন তপেশ রায়, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, অজিত ভট্টাচার্য্য, সুশীল চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক ও অন্য আরও অনেকে। নন্দিনীর অভিনয় করেন স্নিগ্ধা হালদার ও কিশোরের ভূমিকায় ছিল প্রয়াত প্রণব ব্যানার্জি।

১৯৬০ সালের ১৩ই ও ১৪ই জুলাই আসর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হিসাবে বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে বিসর্জন নাটকখানা অভিনয় করে। এই নাটকের অভিনয়ে যাঁরা সেদিন ছিলেন তারা হলেন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ফনী চক্রবর্তী, দিলীপ সরকার, জ্যোতির্ময় খাসনবীশ, আশু রায়, তুলসী দত্ত, অঞ্জলী দাশগুপ্তা, সুমিত্রা দত্ত। রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীবিমল গুপ্ত।

১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ৯ই ও ১০ই জুলাই উপাবে লিখিত নাট্য সংস্থাটি 'বিসর্জন নাটকটি ২য় বার অভিনয় করেন প্রগতি বিদ্যাভবনের জ্ঞানমন্দির ক্যাম্পাস হলে। এই নাটকে সেদিনকার অভিনেতা ও অভিনেতৃরা ছিলেন বিমল গুপ্ত, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মণিশংকর ভৌমিক, জ্যোতির্ময় খাসনবীশ, ফনী চক্রবর্তী, দিলীপ সরকার, নীলরতন গাংগুলী, রমা সেন ও সতী দত্ত। পরিচালনায় ছিলেন ˚ সুধাংশু মোহন দত্ত।

১৯৬১ সনের ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখ বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টি ভবনে "রসচক্রের" প্রযোজনায় বিসর্জন নাটক অভিনয় হয় ˚ রবীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায়। অভিনয়ে অংশ নেন মৃণাল চক্রবর্তী, উমাচরণ চক্রবর্তী, ভানু রক্ষিত, সমীর দাস, নরেন্দ্র দারিং পার্থী চক্রবর্তী, ভুবন চক্রবর্তী, রেখা চক্রবর্তী, অমলা চক্রবর্তী ও মীনাক্ষী মজুমদার ও আরও অনেকে।

অনেকদিন চুপ করে থাকার পর ত্রিপুর শিল্পায়তন ১৯৬১ সনের ৯ই জুন উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে বিসর্জন নাটকটি সফলভাবে অভিনয় করেন। এতে বিভিন্ন চরিত্রে যারা রূপ দেন তাঁরা হলেন শ্রী পি এন. চ্যাটার্জী, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, মেঘেন্দ্র মুখার্জি, স্বদেশ পাল, সবিতা সিংহ রায়, প্রতিমা চৌধুরী, ইরা ব্যানার্জী। নাটকটির পরিচালনায় ও রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন ˚ ত্রিপুরেশ মজুমদার।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই মে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে বিসর্জন নাটকের ইংরেজী রূপ "স্যাক্রিফাইস" অভিনীত হয় রবীন্দ্র হলে। অভিনয়াংশে ছিলেন লীলা রমন (ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্য সচিব শ্রী রমনের স্ত্রী), বামাপদ মুখোপাধ্যায়, নীরা চ্যাটার্জী, মৃণাল মজুমদার। এটাই ছিল আগরতলার নাট্য ইতিহাসে প্রথম ইংরেজী ভাষায় নাট্যাভিনয়।

ঐ সনের ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর আমরা লোকশিল্পী সংসদের সদস্যরা উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে অভিনয় করি কাঞ্চনরঙ্গ নাটকটি। শক্তিবাবু এর পরিচালক। অভিনয়ে আমি ছাড়া অন্যান্যরা হলেন শক্তি হালদার, ভূপেন চক্রবর্তী, মুকুল ভট্টাচার্য্য, মহুয়া ভট্টাচার্য্য, লীলা দেব, তপেশ রায়, অর্পণা রায় চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক, সন্তোষ ব্যানার্জি, ডাঃ নয়ন মজুমদার প্রমুখ অনেকে।

এরপরের ইতিহাস দুঃখজনক। আগেই বলেছি রানী জয়াবতী নাটকটির অভিনয়ের আগ থেকেই বেশ কিছু সভ্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ প্রকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু সভ্য আমাদের গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যান ও অন্য সংস্থায় যোগ দেন। প্রকট হয়ে ওঠে আর্থিক সংকট। আমি, শক্তিবাবু ও ডাঃ নয়ন মজুমদার বহু চেষ্টা করে আমাদের প্রিয় নাট্যদলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। যে মহান ব্রত ও স্বপ্ন নিয়ে লোকশিল্পী সংসদ জন্ম নিয়েছিল, এগিয়ে চলেছিল নানা বিপত্তির মধ্যে তার যাত্রাপথ শেষ হল এক অশুভ মুহূর্তে।

কিছুদিন বেশ অস্বস্তির মাঝে কাটাই। চীন ভারত আক্রমণ করেছে। রাষ্ট্রীয় আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক এমনি সময় ত্রিপুরা পাবলিসিটি বিভাগ আগরতলার বিভিন্ন দলের অভিনেতাদের নিয়ে একটি ইউনিট তৈরী করেন। অভিনেতা হিসাবে আমিও ডাক পাই। এই ইউনিট অভিনয় করেন দেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করে "সৈনিক" নাটক। নাটকটির পরিচালক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী পি. এন. চ্যাটার্জী। আমার সাথে এ নাটকে আর যারা অভিনয় করেন তারা হলেন পি. এন. চ্যাটার্জী, তপেশ রায়, রণজিৎ ভৌমিক, শক্তি হালদার, শ্রীমতী রাণী কর, শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচার্য্য, ছবি দেববর্মা ও আরও অনেকে।

পরের অভিনয় "ডাউন ট্রেন" নাটকে। আগরতলায় ক্যানসার হাসপাতাল তৈরী করার জন্য ভীষণ চেষ্টা চলছে। এই নাটকটি অভিনয় করে - যে দর্শনীমূল্য পাওয়া গেছিল তার পুরোটাই আমরা "ক্যানসার হসপিটাল তৈরী কমিটির" সভাপতি ডাঃ গোবিন্দ চক্রবর্তীর হাতে তুলে দিই। নাটকে অভিনয়াংশে আমি ছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলেন শ্রী পি. এন. চ্যাটার্জী, ˚ অজিত দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে। নাটকটির পরিচালক ছিলেন শ্রী চ্যাটার্জী।

১৯৬৪ ইং সনের ৪ঠা ও ৫ই জুলাই নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে অভিনীত হ'ল শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক মেঘে ঢাকা তারা । অভিনয়াংশে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, কমল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্র ভৌমিক, সন্তোষ গাঙ্গুলী, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মিন্টু দাস, রণজিৎ ভৌমিক, অমরেন্দ্র রক্ষিত, সুপ্রকাশ বড়ুয়া, বিজিতা গাঙ্গুলী, অমিতা চক্রবর্তী, দেবল মজুমদার । নাটকটি পরিচালনা করেন বিজিতা গাঙ্গুলী । (বর্ত্তমানে বিজয়কুমার গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা)

বোধ হয় ১৯৬৫ সনের গোড়ার দিকে প্রয়াত হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মাকে (হরিকর্ত্তা) সভাপতি ও দশজনকে কার্য্যকরী কমিটির সদস্য করে "কৃষ্টি গোষ্ঠী" নামে একটি নাট্যসংস্থা গড়ে তুলি । নাট্য গোষ্ঠীর প্রথম নাটক "সর্পিল" । এই নাটকে আমার সাথে অভিনয় করেন শ্রী তপেশ রায়, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ ভৌমিক, * জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, রাণী কর প্রমুখ আরও অনেকে ।

শ্রী নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরা বনবিভাগের দপ্তর প্রধান হিসেবে অনেক দিন কাজ করে গেছেন । দক্ষ প্রশাসক ও কড়া অফিসার হিসেবে তার সুনাম ত্রিপুরায় আজও ছড়িয়ে আছে । ১৯৬৭ সনে তিনি ত্রিপুরা কৃষি বিভাগের অধিকর্ত্তা হিসাবেও অতিরিক্ত দায়িত্বভার নেন । শ্রী ভট্টাচার্য্য বনবিভাগ ও কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের দিয়ে একটি বিনোদন সংস্থা গড়ে তোলেন । এই নাট্যসংস্থা ১৯৬৭ ইং সনের ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ করেন শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক "শেষাগ্নি" । নাটকটি পরিচালনা করেন কৃষি বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস । অভিনয়াংশে ছিলেন শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, দিলীপ চক্রবর্তী, বীরেন চক্রবর্তী, বিমল চক্রবর্তী, সতীশ শর্ম্মা, পিনেন্দ্রনাথ রায়, বিজু চক্রবর্তী, মিসেস পাল চৌধুরী, অপরাজিতা দেববর্মা, নিরুপমা মজুমদার ও আরও অনেকে । তিনদিন ধরে নাটকটি অভিনীত হয় । দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরার তখনকার চীফ কমিশনার শ্রীউমানাথ শর্ম্মা । দলগত অভিনয়ে নাটকটি সফলতা লাভ করে । অভিনয়ে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রাখেন বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা ও মিসেস বিশ্বাস ।

১৯৬৭ ইং সনের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেন ত্রিপুরাতে আসেন । ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তাঁকে সংবর্ধনা দেন । সূচীতে ছিল নাটক অভিনয় । ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় "কৃষ্টি গোষ্ঠী" অভিনয় করে মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক "টিপু সুলতান" । তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হ'লে নাটকটি অভিনীত হয় । অভিনেতা ও অভিনেত্রী গোষ্ঠীতে আমি ছাড়া অন্যরা হলেন * বঙ্কু প্রসাদ সেনগুপ্ত, * জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, ডাঃ এইচ. এস, রায় চৌধুরী, ভূপেন চক্রবর্তী, সমরেশ চক্রবর্তী (বর্ত্তমানে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের এ্যাসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর), * কল্পনা দেববর্মা, দেবু দেববর্মা ও অন্যান্য আরও অনেকে ।

আমার আলোচনাকাল ত্রিশ দশক থেকে ১৯৬৭ইং অব্দি । এরপর থেকে শুরু হয় রাজ্যভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতা । তার ইতিহাস সবারই জানা । অবশ্য ১৯৬৭ সন থেকে মাঝে মাঝে অনেক নাট্যগোষ্ঠী নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক বাদ দিয়ে অভিনীত হয়েছে রূপক ধর্মী নাটক । কিন্তু ঐ সব নাটক প্রকৃত অর্থে সব শ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি না । নাটকে কোন গল্প না থাকলে, খুশী মনে সে নাটক দর্শকরা গ্রহণ করতে পারে না । তাই আজকের দিনে আবার সেই গল্প প্রধান নাটক ফিরে আসছে । সেই সব নাটক অভিনীত হচ্ছে থিয়েটার ও যাত্রাগানে ।

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারায় বিশেষ করে পাঁচ ও ছয় দশকে বহু নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল । এ সব নাট্যসংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নাট্যশিল্পী সংসদ, শিল্পশ্রী, শিল্পী সংগঠনী, পঞ্চ প্রদীপ, শিল্পী সংসদ, আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন, শিল্পী সমাজ, কালচারেল ইউনিট, শিল্প সন্ধানী, কলাকার গোষ্ঠী, কল্লোল গোষ্ঠী, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ, প্রচার বিভাগ, শিল্প বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, আমরা সবাই, মুকুল সংঘ, রসচক্র, উত্তরায়ন

শিল্পী সমাজ, বনমালীপুর ইয়ুথ এসোসিয়েশন, অগ্রগতি সংসদ, শিল্পী বাসর, রবীন্দ্র পরিষদ, রূপারোপ । এছাড়া ছিল স্কুল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা । এর মধ্যে অনেক সংস্থারই অস্তিত্ব নেই । তবে এই সংস্থাগুলি নতুন নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী, উপহার দিয়েছে । আগরতলার নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । শুধুমাত্র অভিনয়ই নাটকের সফলতা আনে না । নাটককে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করতে হলে দরকার অভিনেত্রীদের, উপযুক্ত রূপসজ্জা ও আলোকসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা, আবহ সংগীত ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যন্ত্র ও সঙ্গীতের সৃষ্ঠ প্রয়োগ । যে কলাকুশলীরা এ সমস্তের দায়িত্বে থাকেন তারা নেপথ্যেই থেকে যান । আমার এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী নাম উল্লেখ করে এসেছি । ঐ সব কলাকুশলীরা, যারা নিঃস্বার্থভাবে নাট্যচর্চায় উপাচার যুগিয়ে গেছেন তাদের নাম উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে । তাই উপস্থাপনা দীর্ঘায়িত হলেও তাদেরকে আমি জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই ।

রূপসজ্জাকর ঃ

* স্নেহাংশু চৌধুরী, * প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, শ্রী রবি ভট্টাচার্য্য, শ্রীমিন্টু রায় (ঝরিয়া), * পীযূষকান্তি মজুমদার, শ্রীহরেন্দ্র হালদার, শ্রীরূপেন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্য নন্দী, শ্রীশক্তি হালদার, শ্রীরণজিৎ ভৌমিক, শ্রীচিন্ময় রায় ও * শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পী ঃ

* কুমার বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা, * কুমার বিপিন বিহারী দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা, নীলু দেববর্মা, রাণা ডাইলজং, ক্যাপটেন * নগেন্দ্র দেববর্মা, ববি নাগ, নিমাই দেববর্মা ।

আলোক সজ্জা ঃ

* পরেশ চ্যাটার্জী, নীরোদ দাস, হরিপদ দাস, নরেশ পোদ্দার ।

মঞ্চসজ্জা ঃ

* প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, পরবর্ত্তী যুগে, বিশু চক্রবর্ত্তী, নরেশ পোদ্দার, শক্তি হালদার, রণজিৎ ভৌমিক, অমরেশ দত্ত, রূপেন চক্রবর্ত্তী ।

ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে আজ অব্দি অনেক দিন চলে গেছে । দেশভাগ হয়েছে । ওপার বাংলা থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনেক পরিবার এসেছে । এখানকার প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও লোকের মানসিকতা সাংস্কৃতিক জীবনের ঘটেছে পরিবর্ত্তন । হাওড়া নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । আগরতলার কাঁচা রাস্তা রূপান্তরিত হয়েছে পাকা রাস্তায় । ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়ে ঘরের জায়গায় মাথা উচু করে গজিয়ে উঠেছে সারি সারি ইমারৎ । আগরতলার বুকে তৈরী হয়েছে রবীন্দ্র ভবন ও টাউন হলের মত আধুনিক প্রেক্ষাঘর । সব কটি স্কুল কলেজে রয়েছে সাংস্কৃতিক ভবন । আগরতলায় আমার নাট্যজীবনের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায়ে এই সমস্ত সাংস্কৃতিক ভবনের স্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করার সোভাগ্য হয়েছে । কিন্তু পেছনে ফেলা আসা প্রথমদিককার সেহ দিনগুলির কথা চিন্তা করতে গিয়ে মনে হয় কি প্রতিকূলতার সামনে দাড়িয়ে আমরা একদল নাটক পাগল ছেলে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করেছি । অভিনেতা ও কলাকুশলীদের প্রায় সবাই স্কুল কলেজের ছাত্র । নিজেদের কোন আর্থিক সংগতি ছিল না । কারুর কাছে চাঁদা চাইতে ভয় করত । দর্শনামীল্য দিয়ে তখনকার দিনে কোন দর্শক নাটক অভিনয় দেখা বিলাসিতা মনে করত । তাই কোন নাটক অভিনয় করতে যে খরচ হত তার পুরো টাকাটার ব্যবস্থা করতে হয়েছে নিজেদের দেয়া চাঁদা দিয়ে ।

কোন কোন সময় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে বাঁশের মাচার ওপর, আবার কোন ক্ষেত্রে স্কুলগুলি থেকে চৌকি ও বেঞ্চ যোগাড় করে আমরা নিজেরাই নাটক করার জায়গায় নিয়ে গেছি । এগুলো দিয়েই মঞ্চ তৈরী হয়েছে । মঞ্চের ওপরটা ঢাকা হত সামিয়ানা বা ত্রিপল টানিয়ে দুপাশের বেড়া দেওয়া হ'ত ধারি দিয়ে । মঞ্চের সামনের দিকটার নীচের অংশ মুড়ে দেওয়া হত ধারির ওপর একরংগা কাপড় ছলিয়ে । মঞ্চের একেবারে পেছন দিকে ঝুলানো থাকত একটা কালোপর্দা । তারপর সামনের দিকে কয়েক সারি আঁকা সিন যাতে থাকত বিভিন্ন দৃশ্যপট । এই সমস্ত সিন ও স্থানীয় শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন । মঞ্চের একেবারে সামনের দিকে দুটো পর্দা দুটো তারের সাথে শনের দড়ি দিয়ে টানানো থাকত । পর্দা দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করা হত পুলি দিয়ে । এছাড়া ছিল কয়েক জোড়া উইংসে ও প্রত্যেক সিনের সামনের দিকে টানানো নানা রং এর কাপড়ের স্কাই । মঞ্চাধ্যক্ষের নির্দেশে নাটকের বিভিন্ন পরিবেশ দেখানোর জন্য উন্মোচন করা হত ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য পট । এক দৃশ্য শেষ হওয়ার পর অন্য দৃশ্য শুরু করতে অনেক সময় লাগতো । কিন্তু এতে দর্শকরা বিরক্তি প্রকাশ করেন নি । কারণ এই বিরতিতে চলত একটানা যন্ত্রসংগীত । নাটক মঞ্চস্থ করার বেশ কিছু দিন আগ থেকেই মঞ্চ তৈরী করার কাজ আরম্ভ করতে হত । বেষ কিছু উৎসাহী কর্মী ও আমরা অভিনেতারাই অমানুষিক পরিশ্রম করে রাতদিন খেটে নাটক উপস্থাপনা ত্রুটি মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছি । বিজলী বাতির অভাব ছিল তাই আলোক সজ্জা করতে হয়েছে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে ।

পূর্বসূরীদের নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখে আগরতলার নাট্যপ্রবাহকে থামতে দিইনি বরং এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি । হয়ত আমাদের এই প্রচেষ্টা যুগান্তকারী নয় কিন্তু যুগপোযোগী ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি ।

ঠিক এই মুহূর্তে আগরতলায় নাট্যচর্চায় কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করেছি । ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার কাম্য নয় । আমি আশা করব নাট্যপ্রেমী তরুণগোষ্ঠী নতুন ধরণের যুগোপযোগী নাটক অভিনয় করে আগরতলা বাসী সবাইর মনে নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলবেন, সামাজিক জীবনে আনবেন দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ।

নাট্যচর্চার জীবনে যারা আমাকে ঘিরে ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই । স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতে অনেকের নামও হয়ত উল্লেখ করা হয়নি । তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও জীবিতদের প্রণাম জানিয়ে এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করলাম । উল্লেখিত সন তারিখের কোন গোলমাল থাকলেও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ।

অবহেলিত উনকোটি

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

"পূর্ব্ব ভারতে বোধহয় বারাণসীর কোটি - তীর্থের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও উনকোটি পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত যত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখ লিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন।"

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের ধর্মকর্ম্ম অধ্যায়ে উনকোটির এই উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মাত্রও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও ইঙ্গিতবহ। উনকোটিকে তিনি পাল-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য। শৈব-তীর্থ রূপেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শব ও ভিন্ন পরিবার দেবতা ছাড়া আরও নানা দেবদেবীর মূর্তি বা মুণ্ড উৎকীর্ণ দেখা যায়। তাছাড়া শিব, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির আকার বা মুণ্ডের গঠন কম বৈচিত্রপূর্ণ নয়। সিংহ মুখী দেবীমূর্তি বা দণ্ডায়মান একাধিক দন্ত ও হস্ত বিশিষ্ট বিরাটাকার গণেশমূর্তি বা দণ্ডায়মান দ্বিভুজ শিবমূর্তি উনকোটির মূর্তিশিল্প সংগ্রহের অনন্যতা প্রমাণ করে। এছাড়া কয়েকটি মূর্তির সঠিক পরিচয় আজও নির্ণীত হয়নি। একাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন হয়ত শুধু শৈবতীর্থ বলেই উনকোটির পরিচয় শেষ, না করে এই অঞ্চলের একটা পূর্ণ ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের পীঠস্থান রূপে উনকোটির মর্যাদা স্বীকৃত হবে। সেই চেষ্টা অবশ্য বেশ কিছুকাল ধরেই চলেছে কিন্তু আশানুরূপ কাজ যে হয়নি তার একটা বড় কারণ মূর্তি বিশেষজ্ঞগণ এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন। অথচ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বহু মূর্তি এমনই ভগ্ন দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা স্থানচ্যুত হয়েছে যে গুলির বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান নির্ণয় ও আয়ুধ-অলঙ্কারের বিবরণ সংগ্রহ ও দুসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অচিরে একদল মূর্তি বিশেষজ্ঞ যদি লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মেতিহাস উদ্ধারে ব্রতী না হন তাহলে শেষ পর্যন্ত যে কিছু জনশ্রুতি, কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ ও কিছু অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্তের আড়ালেই পূর্ব-ভারতের বেশ শতাব্দী কয়েক বহিত-ধর্ম্মেতিহাসের এই পীঠস্থানের প্রকৃত রহস্য ঢাকা থাকবে তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি প্রকাশিত "আবৃত-ইতিহাস উনকোটি" নামে একটি স্বল্প পরিসর বই থেকে। লেখকের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনুসন্ধিৎসা সুপরিস্ফুট। মূর্তিগুলির ধ্যানরূপ লেখন বিবৃত করেছেন তার মধ্যে অনেকগুলিকেই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, একটি বিশেষ ধর্মমতের সমর্থন খুঁজতে গিয়ে লেখক ঐতিহাসিক সুলভ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে পারেন

নি। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে নানা ধর্ম্মনৈতিক বিবরণের উল্লেখ করলেও প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিবরণীর কোনও উল্লেখ তিনি করেননি। অথচ মূর্তির ধ্যানরূপ উদ্ঘাটনে এই বিবরণীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন ধরা যাক, ত্রিমুখ লিঙ্গ প্রসঙ্গ। লেখক এই মুখলিঙ্গটিকে সোজাসুজি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের 'ত্রিমূর্তি' বলে ব্যাখা করেছেন এবং তদনুসারেই ঊনকোটিতে 'ত্রিমূর্তি' স্থাপনের সঙ্গত কারণ হিসাবে নাথ ধর্মমতের দেহ-চক্র সাধনার উল্লেখ করেছেন এবং তন্ত্রক্ষেত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ধ্যানের অত্যাবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

ঊনকোটি সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণীতে এই মূর্তিটি 'ত্রিমুখ লিঙ্গ' বলে অভিহিত। ত্রিমুখ লিঙ্গের ধ্যানরূপের যে প্রামাণিক বিবরণ আছে, বলা প্রয়োজন সে, তার সঙ্গে এই লিঙ্গ মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যামান। ত্রিমুখলিঙ্গ শিবের মহেশ মূর্তিরই ভিন্নতর রূপকল্পনা। এই লিঙ্গের তিনটি শির জটামুকুট শোভিত। বিষ্ণুর শিরোভূষণ জটামুকুট। তাছাড়া সাহিত্য বা ভাস্কর্য— কোথাও ব্রহ্মা একমুখ নন, চতুর্মুখ। কাজেই তিনি মুখের একটি মহেশ্বরের হলেও অন্য দুটি কোনক্রমেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর হতে পারে না। লিঙ্গের বাঁ দিকের মূর্তির দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্ঠুর। কুঞ্চিত গোঁফ ও দাড়ি মুখটিকে ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। মূর্তির কর্ণভূষণ সাপ এবং জটাজালেও সাপ ও নরকপাল দুর্নিরীক্ষ নয়। এই মূর্তি নিঃসন্দেহে শিবের অঘোর মূর্তি। মাঝের মুখটি প্রশান্ত ও মহিমাব্যঞ্জক। কর্ণাভরণও সম্ভবত মকরা কুণ্ডল—রত্নকুণ্ডলও হতে পারে। এমুখ শিবের সদ্যোজাত মূতি। তৃতীয় মুখ বাঁ দিকের মুখের মত ভয়াল না হলেও সৌমা নয়, ব্যাদিত। প্রতিটি মূর্তিতেই তৃতীয় নয়ন সুপরিস্ফুট। সুতরাং লিঙ্গরূপটি পাশুপত ধ্যানকল্পনাজাত বলেও মনে হয়। এই ধ্যানকল্পনার সাদৃশ্যে শিবের আর একটি মুণ্ডের উল্লেখ করা যায়—যার শিরোভূষণ হিসাবে দুটি শৃঙ্গসদৃশ্য পিণ্ড লেখকেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই রূপকল্পনা আগমান্ত শিবধর্ম পোষিত। শিবের লিঙ্গরূপ পূজা গুপ্ত পর্বেই পূর্ণতা পায় এবং পাল-চন্দ্র কম্বোজ পর্বেও সমধিক প্রচলিত ছিল।

শিবের অন্যান্য রূপকল্পনার মধ্যে উনকোটিতে উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর প্রভৃতি সৌমা মূতি যেমন আছে, তেমনই আছে বটুক ভৈরব বা অঘোররূপ সদৃশ্য ভয়াল মূর্তি। এই রুদ্র বা অঘোর রূপ কল্পনাও পাল সেন যুগের ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিকট হাস্যব্যাদিত জটামুকুটধারী শিবমুণ্ড, শক্তি মুণ্ড ইত্যাদি আগমান্ত তান্ত্রিক শৈবধর্ম্মের ধ্যানমূর্তির কথা স্মরণ করায়। ঊনকোটির বিচিত্র মূর্তি সংগ্রহের অনেকগুলির রূপকল্পনা দৃশ্যতও হিন্দুধর্মাশ্রয়ী বলে মনে হয় না। এগুলি খুব সম্ভবত বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মাশ্রিত। কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর ধ্যান ও পরিচয় প্রস্তর মূর্তির সঙ্গে গ্রন্থাশ্রিত ধ্যানের সাদৃশ্য থেকেই মেলে। "এ ক্ষেত্রে মূর্তির ধ্যানের সহিত প্রস্তর বা ধাতু মূর্তির এতটুকুও তফাত থাকা উচিত নহে। যদি থাকে তাহা হইলে দেবতার পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে।" "আবৃত-ইতিহাস-ঊনকোটি'-র লেখক 'নৈরাত্মা (?) 'মহাবদ্ধ', 'পঞ্চানন, "বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী' রূপে আখ্যাত কয়েকটি মূর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে এই ঝুঁকি নিয়েছেন বলে মনে হয়। পর্বতগাত্রে অঙ্কিত একটি নারীমূর্তির সঙ্গে অক্ষোভ্যকুলের দেবী নৈরাত্মার সাদৃশ্য নেহাতই কাষ্ট-কল্পনা। ধ্যানরূপ অনুসারে নিরাত্মা ভীষণ-দর্শনা, শবোপরি অর্ধপর্যাঙ্কসনে নৃত্য পরায়ণা। তাঁর দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে হৃদপ্রদেশে রক্তপূর্ণ নরকপাল থাকে আর একটি খট্টাঙ্গ (খাটের পায়াসদৃশ মুদ্গর) থাকে। এই মূর্তির সঙ্গে ঊনকোটির পূর্বোল্লিখিত মূর্তির সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে লেখক বলেছেন—"আলোচ্য মূর্তিতে একটি মুখ, দুইটি হাত। ইনি ভীষণদর্শনা, কেশ-রাজি ঊর্ধে উড্ডীয়মান। গলায় মালা (মুণ্ড অথবা রুদ্রাক্ষ), ক্রোধোদ্ভাসিত ব্যাদিত-দংষ্ট্রা ভীতিপ্রদ। তবে পদতলে শব-এর অস্তিত্বহীন, পরিবর্তে খট্টাঙ্গের (খাট -Bed-stead) উপরে অর্ধপর্যাঙ্কাসনে (বীরাসনে) নৃত্যরতা। দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ধারণ না করে, দক্ষিণ কটিদেশে ন্যস্ত, বাম হস্তের নিকটে নর-কপাল (নরমুণ্ড) বর্তমান।...... যদিও বাম স্কন্ধ খট্টাঙ্গ শূন্য কিন্তু এই মূর্তির নিম্নে একটি সুবৃহৎ খট্টাঙ্গ বা মুদ্গর পড়ে থাকতে দেখা যায়।" বৌদ্ধ মূর্তির ধ্যান রূপ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়। নৈরাত্মার বর্ণনার সঙ্গে এই মূর্তির সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। মূর্তিটি খট্টাঙ্গের (খট্টাঙ্গের লেখক 'খাট' অর্থ

করেছেন!) উপর নৃত্যরতা বলে মনে হয় না। বরং রথ শ্রেণীর কোন শকটের উপর অধিষ্ঠিতা বলেই অনুমান হয়। শকটের গোলাকার একটি চাকাও সুস্পষ্ট, অন্যাংশ ভাঙ্গা, তাই শকটের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। মূর্তির চেহারাও ভীতিপ্রদ বলে মনে হয় না। বরং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ কটি দেশে ন্যস্ত হওয়ার ফলে মূর্তির তেজোদীপ্ত সৌন্দর্যই সুপরিস্ফুট।

লেখক কর্তৃক উল্লেখিত 'বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী' মূর্তিটিও শাস্ত্রোক্ত ধ্যানসম্মত নয়। মঞ্জুশ্রীর জটামুকুটে অক্ষোভ্য মূর্তি থাকে। ঊনকোটির মূর্তিতে অনুরূপ কোন মূর্তি নেই।

ঊনকোটির মূর্তিগুলির সঠিক রূপনির্ণয় যে এখনো হয়নি সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু আদিতে এই শৈবক্ষেত্রে বজ্রযানী দেবদেবীর নানা মূর্তি বিদ্যমান থাকা যে আদৌ অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব সে কথাই বলা দরকার। পাল-পর্বে যখন পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে বজ্রযান আশ্রিত দেবদেবীর প্রাচুর্য তখন বজ্রযোগিনীর অন্যতম আদি পীঠস্থান 'সিরিহট্ট' বা আধুনিক শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্তী ঊনকোটিতেও যে বজ্রযানী দেবদেবীর ধ্যানরূপ ভাস্কর্যে রূপায়িত হবে তাদে আর বৈচিত্র্য কি! বজ্রযান মতে শূন্যই বজ্র। এই বজ্রেরই প্রতীক কি ঊনকোটির একাধিক শিবলিঙ্গের মস্তকোধৃত গোলাগার প্রস্তরপিণ্ডে রূপায়িত? নিকটবর্তী ধর্মনগরে প্রাপ্ত হেরুক ও অন্যান্য বজ্রযানী মূর্তি এই যানের প্রাধান্য যেমন সূচিত করে তেমনই প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা ধর্মের প্রকৃত প্রতীক পাদুকা-চিহ্নও ঊনকোটিতে আছে। আদিবাসী কোমের বিভিন্ন মুণ্ডাকৃতি দেবদেবীর রূপকল্পনা ঊনকোটির ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মুণ্ডের গঠনে আদিবাসীদের মুখা বয়বের বৈশিষ্ট্যগুলিও সুপরিস্ফুট। আবার কৌলধর্মসঞ্জাত যে নাথ ধর্মের প্রভাব পালপর্বেই অনুভূত হয় পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায়, সেই নাথধর্মী দেবদেবীর মূর্তিকল্পনার নজীরও হয়ত ঊনকোটিতে দুর্লভ নয়। কিন্তু এই মূর্তিকল্পনা অবিমিশ্র নামধর্মী কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়।

ধর্মনগরের নামকরণ সূত্রে লেখক বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নের অন্যতম 'ধর্মের' উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রচ্ছন্ন বুদ্ধরূপে ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে পূর্বপ্রচলিত ধারণা আজকাল পরিত্যক্ত। ধর্মঠাকুরকে আদিবাসী কোমের দেবতা হিসাবেই অধুনা গণ্য করা হয়, সুতরাং ধর্মনগরের নামকরণে বৌদ্ধ প্রভাব দুর্লক্ষ্য। ঊনকোটির নামকরণ প্রসঙ্গে লেখকের 'শূন্যকূট' থিয়োরীও ভাষাতাত্ত্বির বিশ্লেষণের ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না।

শূন্য শব্দটি, 'হুনকূট', 'উনকূট' হলেও আপত্তি থাকে না কিন্তু 'কূট' কি করে তৎসম শব্দ 'কোটী'তে রূপান্তরিত হয় না বুঝা দুষ্কর। তাই বলতে হয় যে, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও সহজ-সাধনের প্রসার লক্ষ্য করে ঊনকোটীর আদি নাম 'শূন্যকূট' কষ্ট কল্পনা মাত্র।

ঊনকোটির অবহেলিত গুরুত্ব এবং মূর্তিগুলির যথার্থ ধ্যানরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন মূর্তিগুলির অবিরাম ক্ষয়-ক্ষতির কথা বিবেচনা করে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এবং মূর্তিবিদ্যাবিদগণ এই জাতীয় কৃত্য যত শীঘ্র সম্পন্ন করবেন ততই মঙ্গল।

'আ মরি ককবরক ভাষা' এবং তৎপ্রাসঙ্গিক

রমেন্দ্র বর্মণ

নানান দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা? — আবল্য

পরিচিত রামনিধি গুপ্তের আশুবোধ্য এই কবিতাংশে কি নিছকই প্রাদেশিকতা আর যুক্তিহীন মাতৃভাষা সংরাগ বাহুল্য? রামনিধির কবিতাটি কি সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করে না? অপ্রবাক্রান্ত এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে সংক্রামক নয় কি ইত্যাকার আবেগ? স্বদেশী ভাষা নিশ্চয়ই আমাদের অস্তিত্বের শোসর এব কোন পরিবর্তে নেই — মাটি জল আলো আবহাওয়া বা অন্যকোন প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেই জীবনের অপরিহার্য উপাদান। মাতৃভাষার কাঠামোতে বিধৃত রয়েছে আমাদের জীবনের আশা আকাঙ্খানুগ অনুভূতি স্বপ্ন কল্পনা বা সুখ সমৃদ্ধি কল্যাণ। ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানের হরিহর আলিঙ্গন মাতৃভাষার প্রাঙ্গণে প্রদৃশ্যমান। মাতৃভাষার বহতা স্রোতস্বিনী কিংবা দেশজ ফল্গুর সঙ্গে পরিচয় ব্যতীত আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিছকই লোক দেখানো কিংবা সত্তা পরিচয়হীন অদ্ভুত কিম্ভুত। আমাদের আবেগ অনুভূতি কল্পনাবোধ বিশ্বাস প্রেরণা সংগ্রাম জীবনদর্শন। মূল্যবোধ ইত্যাদিকে চিরায়ুষ্মান রূপ দিতে গেলে মাতৃভাষাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু মাতৃভাষা সম্পর্কে এই 'ফাল্গুনী বৈশাখী শ্রাবণী' যখন আমরা রচনা করি সে সময় আমরা অবশ্য 'আ মরি বাংলা ভাষা'র কথা মনে রেখেই করি ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারীতে যখন আমরা মাতৃভাষার ঋণ পরিশোধের শপথ নিই সে সময় কি আমরা নিজবাসভূমে যারা পরবাসী হয়ে রয়েছে—যারা আমাদের গানের ভাষা, প্রাণের ভাষা, আশার ভাষা, মধুর বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে গিয়ে উপহাস, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অবমাননার শিকার হচ্ছে তাদের কথা কি ভাবি? বাংলা ভাষার প্রতি তদ্‌গত প্রেমে উচ্ছলিত হবার সময় কশ্চিৎ কখনো কি আমরা ত্রিপুরার ১৮৪ জন সামন্ত নৃপতির বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার শিকড় সন্ধান করেছি? মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের ২-৯-১৮ ত্রিং এ লিখিত নিম্নোক্ত পত্রটি যখন পড়ি ঃ

'এখান রাজভাষা বাঙ্গলা। বাঙ্গলাতেই সরকারী লিখাপড়া হওয়া সঙ্গত। ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্য্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার হইতেছে। ইহা আমি জানতে পারিয়াছি। যাহাতে এইরূপ কার্য্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে। অবশ্য যে কার্য্যে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অনিবার্য্য তথায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হইবে। যেমন Political Dept. এরূপ স্থান ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।' কিংবা রাজমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দে অফিস ও আদালত সমূহের বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করেন তা লক্ষ্য করলে দেখি :———

'সারকুলার নং ৩ : এ রাজ্যের অফিস ও আদালত সমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্বাধিক রাজকার্য্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুন্ন রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনোদ্দেশ্য প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে 'নিস্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন' শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রত্নল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহাদিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

'কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্য্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবার দরুন অথবা উক্ত ভাষায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরী ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদসহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে'।[২]

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরার নৃপতিদের কিংবদন্তী তুল্য বাংলা ভাষা পৃষ্ঠপোষকতা কী অহেতুকী অকৈতব? ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতিরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় মন প্রাণ-সমর্পণ করেছিলেন। শাসন শোষণের জাঁতাকলটাকে কায়েমী রাখার স্বার্থেই, বলা বাহুল্য বাংলা ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ব্রাহ্মণীকরণ চলে।

অবশ্য ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের ভাষা ককবরক অনাদরে উপেক্ষায় রাজদরবার থেকে দূরে নিক্ষেপিত হলেও পাহাড়ের কন্দরে উপজাতি জনগণের মুখে মুখে ব্যবহৃত হয়ে জীবনযাত্রার প্রবাহকে সচল রেখেছে, কারণ লেনিন বলেছেন, ''মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মুখ্য উপায় ভাষা। আধুনিক ধনতন্ত্রের সমানুপাতে প্রকৃতই মুক্ত ও ব্যাপক বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের জন্য, বিভিন্ন শ্রেণীতে জনসংখ্যার স্বাধীন ও ব্যাপক বিন্যাসের জন্য এবং পরিশেষে বাজার ও ছোট বড় প্রতিটি মালিকের মধ্যে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঐক্য ও ভাষার অপ্রতিহত বিকাশই হল সবচেয়ে জরুরী শর্তের অন্যতম।'[৩] ভাষাতাত্বিক ব্লুমফিল্ডও লক্ষ্য করেছেন ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষের সমাজ জীবন গড়ে ওঠে। "All the so-called higher activities of man our specifically human activities – spring from close adjustment among individuals which we call society and this adjustment, in turn is based upon language, the speech community, therefore is the most important kind of social group"[৪] মানুষের পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসা কর্মধারার বিস্তার ককবরক ভাষার সাহায্যে অনাদিকাল থেকেই বহমান। জীবন সংগ্রামে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত হয়ে উপজাতি জনগণ পারস্পরিক আদান প্রদানের ভেতর

দিয়ে শ্রমে স্বেদে যে সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিলেন তা রাজকীয় স্বীকৃতি ছাড়াই ককবরক ভাষার মাধ্যমে দৃঢ় ও সংগঠিত হয়ে ওঠে।

ফলে ভাষার প্রশ্নটিকে অন্যান্য প্রশ্নের মতোই, ত্রিপুরার সামন্ত রাজারা নিজেদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর (Class outlook) দ্বারাই বিচার বিবেচনা করেছিলেন, এ সিদ্ধান্ত প্রায় অবধারিত। বাংলা ভাষাব জন্যে দান খয়রাত উপাধি বিতরণ ও শুধু শোষণের কলটাকে কিঞ্চিৎ মসৃণ করা আর বদান্য নৃপতির তকমা আঁটাব কুশলী প্রয়াস। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় ত্রিপুরার নৃপতিদের বাংলা ভাষায় রাজকার্য পরিচালনার এই দৃষ্টান্তকেপরবর্তী আমলে অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসী শাসনকালে পদদলিত করে ইংরেজীকে শাসন বিচার কার্যের ভাষারূপে বরণ করে নেওয়া হয়। ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থায়ী কংগ্রেসেব শাসনকালে ককবরক ভাষার কথা একবারও বিবেচনা করা হয়নি। এমনকি এই ভাষাভাষীদের শিশু সন্তানদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অথচ ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫০ (এ)-তে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবাধ করার কথা স্পষ্টতই বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে সেন্ট্রাল এডভাইসারী বোর্ড অব এডুকেশন সিদ্ধান্ত নেন "That the medium of instruction in the junior basic stage must be the mother tongue was different from the regional or state language, arrangement must be made for the instruction in the mother tongue by appointing at least one tracher to teach all the classes, provided that there are atleast 40 such pupils in a school. The regional or state language, where it is different from the mother tongue, should be introduced not earlier than class III not later then the end of the junoir basic stage. In order to facilitate the switch over to the regional languages as medium of instruction in the secondary stage, children should be given the option of answering questions in the mother tongue for the first two years after the junior basic stage." [২]

১৯৪৯ এরপর গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কাবেরী, গোমতী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল সমুদ্রে বয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু উপজাতিদের ভাষা ও শিক্ষার সমস্যা প্রায় একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গণ্য করার কোন কারণ নেই — শাসক শ্রেণীব শ্রেণীচরিত্র এবং দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন একটি ভাষা বর্জন/ সমর্থনের প্রশ্নটি ওঠে। প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ও ইংরাজীকে যথাক্রমে রাজকার্য এবং সরকারী কার্যের (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও) রাজ্যভাষার বা State language হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু সরকারী ভাষা গণমাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কার্যকরী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস শাসনকালে তা নেওয়া হয়নি। বলা বাহুল্য এ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

ত্রিপুরার নৃপতিবা এবং কংগ্রেস সরকার উভয়ে ভাষাকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার কবেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতিদের ইংরেজীর পরিবর্তে একটি দেশীয় আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে (এক্ষেত্রে বাংলা) রাজ্যভাষার মর্যাদাদান একটি তাৎপর্যবহ ঘটনা তা আমাদের বারংবার স্বীকার করতে হবে। ভারতের অনড় জগদ্দল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসন একদা সর্বতোভাবে নিজেদের স্বার্থেই, সামাজিক বিপ্লব সাধনে অগ্রসর হয়েছিল।' ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে কার্লমার্ক্স ইতিহাসের অমোঘ গতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তিনি স্পষ্টতই বলেছেন ব্রিটিশরা 'Unconscious tool of history in bring that revolution' আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা বাংলাকে রাজকার্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ভেতরে আমরা দেখি ত্রিপুরার নৃপতিরাও নিজেদের অজান্তে ইতিহাসের

অচেতন যন্ত্ররূপে কাজ করেছেন। সাসনকার্যের ভাষা হিসাবে দেশী ভাষার ব্যবহারোপযোগিতা বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস সে যুগের পক্ষে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা সঞ্চারকারী সূত্র হিসাবে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি বিবেচিত হয়েছে।

অবশ্য সকল জাতির জন্য সমানাধিকার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সকল জাতির শ্রমিকদের ঐক্য একমাত্র মার্ক্সবাদীদের স্বীকৃত আদর্শ। এই বৈজ্ঞানিক আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন সোভিয়েট রাশিয়ার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা সমস্যার সমাধানে পাওয়া যায়। 'ল্যাংগুয়েজ প্রবলেমস্ এণ্ড পলিসিস ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ইউ এস এস আর গ্রন্থে পাই — " All national minorities that is all non Russian speaking groups suffered oppression under the Tsarist regime, and it was partly the hatred of the oppressed nations for Tsarist rule which helped the Bolsheviks to power. To ensure continued support from the various nationalities, the Bolsheviks promised the end of national oppression and guarented cultural autonomy to the minorities. A people's commissa riat for Nationalities was formed under the Soviet people's commisars to implement the policy concerning the nationalities.

To safeguard the cultural interests of the various nationalities and to provide universal education throughout the country, the Soviet Government laid greats stress on the use of native languages in the people's education. The right to education in the native tongue was guaranted both by the Soviet constitutions and by the nationality policy." [২]

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণের মধ্যে আমরা সেই স্বীকৃত আদর্শের বাস্তবায়নের পথে বলিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করি। ভাষার বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে সরকারী আনুকূল্যে নিঃসন্দেহে দরকারী। ককবরক ভাষার উন্নতির জন্যে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ — এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার সময় কতগুলি বিষয় আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমরা জানি যে ককবরকভাষী বা অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাভাষী শিশুদের একটি বিশেষ পারিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ককবরক বা অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাভাষী শিশুরা হয়ত প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার শুরু করল কিন্তু অচিরেই তাকে একটি আঞ্চলিক ভাষা (ত্রিপুরায় সাধারণভাবে বাংলা ভাষা) আয়ত্ত করার জন্যে উঠেপড়ে লাগতে হয় এবং তাকে হতে হয় একটি অসম প্রতিযোগিতার শিকার।

অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে অতি পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে শিক্ষাকে এই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়।"[৩]

এই মুহূর্তে ককবরকভাষী শিশুর শিক্ষাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করার কোন উপায় আমাদের হাতেনেই। তাই উপজাতি ভাষাগোষ্ঠীর শিশুদের অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে কিছু কিছু রক্ষাকবচের খতা আমাদের ভাবতে হবে।

শোনা যায়, বাংলা ভাষার দুর্দিনে 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী লিখিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখকে বাংলা ভাষা চর্চার জন্যে নানাভাবে প্ররোচিত করেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সানুরাগ প্রেরণার ফলেই ইতিহাস

অর্থ-বিজ্ঞানী রমেশচন্দ্রকে আমরা বাংলা ঔপন্যাসিকরূপে পেয়েছি। "বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগ প্রবর্তক প্রতিভাবানদের সাদনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের ইউরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয় স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।"[৮]

ককবরক ভাষার লৌকিক ভাণ্ডার যতোই সমৃদ্ধশালী হোক না কেন ককবরককে আধুনিক গতিশীল জটিল জীবনযাত্রার মাধ্যম করতে হলে বাংলা ইংরেজীর সহায়তা গ্রহণ করতেই হবে। এই সহায়তা গ্রহণের মধ্যে লজ্জার কোন কারণ নেই একথা রবীন্দ্রোক্তিতেই প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ককবরকের মাধ্যমে 'মানবজমিন' আবাদ করার সুযোগ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই ককবরক ভাষীদের পুনরায় কৃষিনির্ভব (জুম চাষ) কৌম জীবন ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই না। তেমনি উপজাতিদের ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ডঃ ডি. পি পট্টনায়কের প্রাজ্ঞবাণী আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি ঃ

"Tribal education is not altogether a different kind of education. It is education to suit the special needs and aspiration of tribal groups who are in different stages of development. When an educationist talks of opposition between 'Science based' and Culture based and 'Curriculam for the tribal. he is victim of snobishness. First of all, science and culture are not exclusive concepts. Secondly, it is wrong to think that as regards the prevalence or otherwise of scientific attitudes, a tribal society is in any great measure different from the non-tribal socities. Thirdly arts, crafts and folk lore are as important components of education as tales of scientific inventions. There is no reason why both cannot be given for both tribals and non-tribals.

Tribals identity is not matter of shame"[৯] [Multilingualism and Mother Tongue Education, Oxford University Press, 1981, P.87.]

যদি আমরা মনে করি বিংশ শতাব্দীতে উপজাতিরা আদিম পাথুরে সভ্যতাব প্রতিনিধিত্ব করছে অতএব তাঁদের যাদুঘরের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বক্ষা করে প্রদর্শন করবো তবে আমরা অমার্জনীয় ভুল করবো। আবার যদি আমরা মনে করি উপজাতিব আচার আচরণ, জীবন-ধাবণা, মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে আধুনিকতার সংস্পর্শ থেকে শত হাত দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে তাও হবে একই ধবনেব ভুল। নানা বাঁক সত্ত্বেও ইতিহাসের গতি সর্বদাই সামনের দিকে — মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতায় ফিরে যাওযা বর্তমানে অসম্ভব। ফলে ককবরকভাষীদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে বাংলা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রেই বাংলা/ইংরেজী শিক্ষিত ককবরকভাষীদের বিশিষ্ট ভূমিকা এবং জরুরী কর্তব্য রয়েছে — যা এককালে ইংরেজী শিক্ষিত বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পালন করেছিলেন।

ককবরকভাষার সবকারী পৃষ্ঠপোষকতাব সঙ্গে বাংলা ইংরেজী শিক্ষিত ককবরকভাষীদেব স্বপ্রেষণার নিঃশর্ত সম্মিলন ঘটুক। আর বহু শতাব্দীর নিজ বাসভূমে পরবাসী টিলা জংলাব মানুষেবা গাঢ় উচ্চারণে বলুক—

'এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আমাদের রৌদ্রে আর
দুঃখের ছায়ায়।'[১০]
[ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯, নিজবাসভূমে ঃ শামসুর রহমান]

প্রসঙ্গ নির্দেশ ঃ

১. শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা; ত্রিপুরা ১৯৭৬, পৃঃ ১২৫।

২. শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, ত্রিপুরা ১৯৭১, পৃঃ ৫৪—৫।

৩. V. I. Lenin Collected Works, Vol. 20. P. 396 থেকে অনূদিত।

৪. L Bloomfield, Language, 1965, P. 42.

৫. Language and Society in India গ্রন্থের B. K. Roy Barman এর প্রবন্ধ Language of Tribal Communities of India প্রবন্ধের পৃঃ ২৫২ থেকে পুনরুদ্ধৃত।

৬. G. J. Kerawalla, P. 58.

৭. 'সাধনা' আষাঢ়, ১৩০০, পৃ্য ১৯৭ দ্রষ্টব্য।

৮. 'রবীন্দ্র রচনাবলী,' ১১শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃঃ ৭১৭।

৯. Multingualism and Mother Tongue Education OUP. 1981, P. 87.

১০. শামসূর রাহমান, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯,' 'নিজবাসভূমে'।

ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্প

মঞ্জরী চৌধুরী

।। ১ ।।

ছোটগল্প সাহিত্য পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হলেও, গল্প বলা এবং গল্প শোনার ইতিহাস বহু পুরনো। সে প্রায় মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি যেমন জন্মের পর কথা বলা শিখতে মাত্র একটি বৎসর ব্যয় করেছিল এবং এরপর তার কথা বলার আর বিরাম ছিল না , ছোটগল্পও তেমনি শেষে আসার খামতিটুকু পূরণ করে দিয়েছে তার সৃষ্টির প্রাচুর্যে, বৈচিত্র আর ব্যপকতায় ।

সমকালীন জীবনের বস্তুভূমির সঙ্গে ছোটগল্পের গভীর আত্মিক যোগ রয়েছে । সাহিত্য মাত্রেই জীবনের গতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা । কিন্তু এর মধ্যেও ছোটগল্পের কাছে জীবনের দাবী সর্বাধিক । ছোটগল্পে শিল্পীর উপলব্ধির বিচরণ ভূমি দৃশ্যমান জগতেরই এক একটি বিশেষ প্রচ্ছদ ।

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় রাজ-আনুকূল্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ইতিহাস আমাদের গর্বের এবং গৌরবের ইতিহাস । বাংলা ভাষা রাজভাষার সম্মান পেয়েছে এই ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরায় । প্রাত্যহিক জীবনচর্চার সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে তার অধিকার । তবুও দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহারাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকে বিশ শতকেরও প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরার সাহিত্য ক্ষেত্রে কাব্য, কবিতা এবং প্রবন্ধ জাতীয় রচনাদির আধিপত্য ছিল । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' এর উৎসাহে এবং উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'রবি' পত্রিকা । এই পত্রিকার হাত ধরেই রাজসভা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য -সংস্কৃতি, রাজধানীর বৃহত্তর মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় । ত্রিপুরার সর্ববিধ সাহিত্য কর্মের ভাণ্ডারী রমাপ্রসাদ দত্ত (পল্টুদা) জানিয়েছেন যে 'রবি' পত্রিকাটি প্রায় ছয় বৎসর কাল ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হলেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার মাত্র একজন লেখকের মাত্র একটি গল্পই তাতে স্থান পেয়েছিল । সেই গল্পকার অজিতবন্ধু দেববর্মা, এবং সেই গল্প - 'দায়মুক্ত' । ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 'রবি' সাহিত্যপত্রের ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই 'দায়মুক্ত' গল্পটিই ত্রিপুরার সাহিত্যজগতে পরিচিত প্রথম গল্প । অজিতবন্ধুর আরেকটি গল্প 'পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে । ১৯৩৪ খৃঃ 'পূবালী' নামে একটি সাময়িক পত্র আত্মপ্রকাশ করে । তাতে গল্প লেখেন সতীশ দেববর্মা 'কেরাণীর অপরাধ' এবং বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য 'মায়াপুরী' ।

প্রায় একই সময়ে 'ত্রিপুরা' নামে আরেকটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির চার বছর আয়ুষ্কালে

এতে গল্প লিখেছিলেন মুরারি ঘোষ, বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বর মিত্র এবং শৈলেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। গল্প লেখক এবং গল্পের নাম জানা গেলেও সেসব গল্প আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। ১৯৮৫ সালে সুখময় ঘোষ এবং বিকচ চৌধুরী যুগ্ম সম্পদনায় প্রকাশিত গল্পসংকলন 'পাঁচ দশকের গল্প' - তে অজিতবন্ধু দেববর্মার 'পরিচয়' এবং রাজেশ্বর মিত্রের 'স্যামসন বক্স' গল্প দুটি স্থান পেয়েছে। অজিতবন্ধু দেববর্মার 'পরিচয়' (১৯৩৩) গল্পের নায় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় প্রায় সময়ই তাব বিবাহিত জীবনের যে গল্প শোনায় তা যেন প্রায় কল্পকাহিনীর মতো। গল্প শুনে শুনে স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগিনী এক নারীর ছবি তাদের মনে আঁকা হয়ে যায়। একদিন সবাই মিলে নায়কের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আদায় করল, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবে। কিন্তু নিমন্ত্রণের দিন সকালেই নায়ক এক চিঠি পাঠিয়ে স্বীকার করে নিল এতদিন সবাইকে সে ঠকিয়েছে। কুৎসিৎ চেহারার জন্য সে বিয়ে করেনি, বানানো কথার জগতে অধরা সুখের সন্ধান করেছে এতদিন। কিছুটা নাটকীয় সমাপ্তি নায়ক অরুণাংশুর জন্য পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্যামসন বক্স' এর কাহিনী ঠিক প্রচলিত ধরনের নয়। মেডিক্যাল কলেজের এক খৃষ্টান ছাত্র স্যামসন ক্রমাগত বারো বছর ধরে চেষ্টা করেও পরীক্ষা পাশ করতে পারে না। কলেজ ছেড়ে চলে যাবার সময় সে হোড়গোড় রাখা বাক্সটি রেখে যায় স্মৃতি হিসেবে।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত 'নবজাগরণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক তরুণ লেখকগোষ্ঠীর জন্ম হয় ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে। হরিদাস চক্রবর্ত্তী, বিমল চৌধুরী, সৈয়দ নুরুল হুদা, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্যপ্রমুখ গল্পকারগণ এই পত্রিকায় গল্প লিখেছেন।

সবই গল্পই ছোটগল্প নয়। এমন কি ছোট আকারের গল্প হলেও তা ছোটগল্প না-ও হতে পারে। সার্থক ছোটগল্প পাঠককে 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' অনুভব করায়। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের হরগৌরী সম্মিলনে গড়ে ওঠা ছোট গল্প তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বভাবে পূর্বগামী সকল প্রকার সাহিত্য শাখার চাইতে স্পষ্টতই আলাদা।

যে-কোনো জন্মের নেপথ্যেই রয়েছে যন্ত্রণার অনিবার্য উপস্থিতি। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের জন্মের প্রেক্ষিত ও সংকট সংশয়, হতাশা-নৈরাশ্য, অবিশ্বাস আর দ্বিধার যন্ত্রণায় দীর্ণ। একটি মানবতা-সচেতন আধুনিক জীবন প্রচ্ছদ এবং শিল্পীর আত্মসংহত জীবনপ্রত্যয়, ছোটগল্পের দুই আবশ্যিক শর্ত। সেই সঙ্গে জরুরী সাময়িকপত্র পত্রিকার দাক্ষিণ্য। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজ্ঞাপন জগতের।

বাংলা ছোটগল্প, রবীন্দ্রনাথের হাতে, যেন চন্ডীদাসের রাধার মতো 'জন্মেই যুবতী'। পদ্মা তীরবর্ত্তী জনপদবাসীর জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি, আর নিজের মনোগহনের রোমান্টিক প্রবণতার ত্রিবেণী সঙ্গমে ছোটগল্পের 'পূর্ণকুম্ভ' সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। কিন্তু একই সময়ে এর সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস সমাজ ব্যক্তির সম্পর্কের সঙ্কিলগ্নটিকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্প প্রকাশের একমাত্র আধার ছিল পত্রপত্রিকা। আবার এই পত্রপত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই প্রবলতম রবীন্দ্র বিরোধীতার জমি তৈরি করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বব্যপ্ত অভিঘাত যে তীব্র আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে, মধ্যবিত্ত মানুষের পায়ের তলায় মাটিহীন অনিশ্চয়তার যে বিপন্নবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, অনুভূতিপ্রবণ নবীন লেখককুলকে তারা রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে জীবনের নতুন বীক্ষায় প্রণোদিত করে। 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' কেন্দ্রিক গল্পকারগণের রচনায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ তাই অনিবার্যভাবেই নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নেয়। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও এতে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে।

কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের এই জয়যাত্রা ত্রিপুরার বাংলাসাহিত্যকে স্পর্শ করতে পারে নি। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট একটি পাহাড়ি রাজ্য-রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার জনজীবনকে সেই অস্থির সময় সমাজ

অস্তিত্বের সমস্যা সংকট কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। স্থানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের দূরত্ব, ভারতবর্ষের বিপুল জনসমষ্টির সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীর মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব গড়ে দিয়েছিল। তাছাড়া বাংলার লেখকদের সেই উচ্চকিত রবীন্দ্র-বিরোধীতার কালে ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল রবীন্দ্র প্রভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মহারাজা বীরচন্দ্র থেকে শুরু করে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পর্যন্ত চারপুরুষব্যাপী শ্রদ্ধা-ভালবাসা ভক্তির এক নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুখ্য দিশারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অতএব রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে যাবার চিন্তা বা চেষ্টা ত্রিপুরার সাহিত্য সমাজে তখন অকল্পনীয় এবং অসম্ভব ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-অধিকৃত ত্রিপুরার সার্বিক অবস্থানের দূরত্ব বহুকাল পর্যন্ত একই রকম অনড় ছিল। তাই দেখা যায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বাধিক ঘটনাবহুল চল্লিশের দশক ও ত্রিপুরার গল্পসাহিত্যকে তার সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরে নিয়ে আসতে পারেনি। ১৯৩৯-এ শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি নিয়ে আসে আছড়ে পড়ে ভারত তথা বাংলাদেশের গায়ের ওপর। বাংলা সাহিত্যে এই যুদ্ধের প্রভাব তাই যেমন ব্যাপক, প্রত্যক্ষ, তেমনি প্রবল, গভীর। দেশজুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী নানা ধরনের গণ আন্দোলন, বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনে যা চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, তাও উত্তাল করে তুলেছিল এই সময়কে। এরপরই আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভয়াল মন্বন্তর-বিদেশী শাসকের মমতাহীন অপরিণামদর্শিতা আর দেশীয় শোষকের নির্লজ্জ লোভের বলি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ মানুষ। ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দু-মুসলমানের সুপ্রাচীন ঐক্যে যে ফাটল ধরিয়েছিল, তার নগ্ন রূপ দেখা গেল ছেচল্লিশের দাঙ্গায়।

অবশেষে এক সময় করায়ত্ত হল স্বাধীনতার সোনার হরিণ, যার মূল্য হিসেবে বিসর্জন দিতে হল মাতৃভূমির পবিত্র অখণ্ডতা। দেশ বিভাজনের দুঃখ, লজ্জা ও জ্বালা, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোটি কোটি মানুষের স্বভূমিতে পরবাসী হয়ে যাওয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের মনে তৈরী করেছিল এক গভীর ও দুরপনেয় ক্ষত। অসহায় বাস্তুহারার দল, সদ্যপাওয়া স্বাধীনতার মাদকতায় ক্ষমতার ভাগবন্টনে রাজনৈতিক দলগুলির সংকট, বেকারত্বের বিশাল চাপ, সবকিছু একাকার হয়ে যে অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, তার প্রভাবে শিল্প সাহিত্যের সকল ধারাতেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বাংলা ছোটগল্প এই দশকে যেমন অজস্র লেখক তৈরী করেছে, তেমনি এনেছে প্রসঙ্গ ও প্রকরণে অভাবনীয় বৈচিত্র্য। গোটা দেশ জুড়ে সময়ের এই টালমাটাল অবস্থা, দেশভাগের আগে পর্যন্ত তদানীন্তন স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। ছোটখাট কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা বাদ দিলে রাজ শাসনে ত্রিপুরাবাসী প্রায় গতিহীন মন্থর জীবনযাত্রায় একরকম সুখেই ছিল। লাঞ্ছনা যন্ত্রণা, প্রতিবাদ প্রতিরোধ, অবিশ্বাস আর দ্বিধায় জঠর থেকে জন্ম নেয় যে ছোটগল্প, নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন ত্রিপুরাবাসীর সাহিত্য জগতে সঙ্গত কারণেই তার দেখা পাওয়া যায় নি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের শর্তরূপে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে ত্রিপুরার শান্ত জনজীবন আর শান্ত রইল না। রাতারাতি পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল পূর্ব-পাকিস্তান-ভারতের রাষ্ট্রসীমার বাইরে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ। এক বিপুল সংখ্যক বাঙালি, পূর্ব বঙ্গে যাদের ছিল সোনার সংসার, তারা এই অচিন্তনীয় বিপর্যয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত আজন্ম পরিচিতি পরিবেশ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এপারে চলে আসতে শুরু করলেন। ছিন্নমূল এই বাস্তুহারাদের একটা বড় অংশ সীমান্ত পার হয়ে পা রাখল ত্রিপুরার মাটিতে। ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার নিজস্ব নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মহাপ্রাণ মহারাজা বীরবিক্রম সেই শরনার্থীর দলকে পরম মমতা ও আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের অপেক্ষাকৃত উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল সমতলে ত্রিপুরা (ব্রিটিশ অধিকৃত চাকলা রোশনাবাদ) থেকেও বিপন্ন বাঙালী প্রজারা দলে দলে এসে আশ্রয় নিল রাজ্যের

অন্যপ্রান্ত পার্বত্য ত্রিপুরায় । ছোট্ট রাজ্যটিতে এই অভূতপূর্ব জনসমাগম অনিবার্যভাবে নিয়ে এল নানা সমস্যা- তাৎপর্যে ও মাত্রায় যা বহুমুখী । স্থানীয় জনগণের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় পরিবর্তনের ঢেউ উঠল । এতসব ঘটনা ও পরিবর্তনের চাপে বদলে যেতে লাগল ত্রিপুরার পরিবেশ ও পরিস্থিতি । সংশয় সংকট আর অস্থিরতার বোধে আক্রান্ত মানুষের এই বিপন্নতা গভীরভাবে স্পর্শ করল চিন্তাশীল বিবেকবান মানুষকে । ত্রিপুরার সৃজনধর্মী সাহিত্যিকদের রচনায় প্রধান উপজীব্য হল এই অস্থির বিপন্ন সময় আর অস্থির বিপন্ন মানুষ । আর এই সূত্রেই ছোটগল্প এতদিনে ত্রিপুরার মাটিতে খুঁজে পেল তার জন্মের উপযুক্ত পরিসর ।

একে একে উঠে আসতে লাগলেন সমাজমনস্ক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গল্পকারগণ। তাঁদের লেখায় ছোটগল্পের পরিচিতি বিষয়সূচীর সঙ্গে যুক্ত হল সেই সময়ের ত্রিপুরার ছোটবড় নানা সমস্যা, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ভুবনে যা অনেকটাই প্রায় অপরিচিত এবং অনুপস্থিত ।

ত্রিপুরায় বাংলা ছোটগল্পের এই যাত্রায় পুরোধা পথিক গল্পকার বিমল চৌধুরী । কবিতা লেখা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন তিনি । কিন্তু অচিরেই নিজস্ব প্রবণতার অনুকূল মাধ্যম খুঁজে পান এবং অর্ধশতকেরও বেশি সময়ের অকৃপণ সৃষ্টিতে ত্রিপুরার গল্প ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলেন । ১৯৪৭- এ লেখা গল্প 'জাগরণ' যথার্থইভাবেই ত্রিপুরার গল্পসাহিত্যে জাগরণ ঘটিয়েছে। 'জাগরণ' গল্পের নায়ক যুবক নগুরাই তিনবছর রাজধানী আগরতলায় ঠাকুর বোর্ডিং এ কাজ করতে গিয়ে দেখেছে "রাজা ও তাঁর আত্মীয়স্বজন কর্মচারী শহরে যারা বাস করে, তারা ওদের মতোই আদিবাসী অথচ এদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার অকৃপণ বন্দোবস্ত" অথচ একই জাতের মানুষ হয়েও ওরা পশুর মতো বন থেকে সুদূর বনে খাদ্যের জন্য ঘুরছে । পাহাড়ে জুম ফসল ভাল না ওঠায় আকাল দুর্ভিক্ষ চলছিল । 'অর্দ্ধহার অনাহার অখাদ্য-কুখাদ্যে মৃত্যুর ঢল নেমে এসেছিল পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে । রাজকোষ থেকে এই দুঃসময়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে এক প্রতিনিধিদল বহু কষ্ট করে রাজধানীতে গিয়েছিল । কিন্তু রাজা তখন পাত্রমিত্রসহ বিদেশে ভ্রমণে রয়েছেন, রাজকর্মচারীরা এদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না, সাহায্য দুরস্থান । এই দুঃসময়ে নগুরাইয়ের ছোটবোন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দাস্তবমি করে মারা যায় । নগুরাই কুড়িমাইল পাহাড়ী চড়াই উৎরাই ভেঙে মুদী ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। কিন্তু 'কপাল ঠুইক্যা খাওয়াইয়া দ্যাক গিয়ে, বলে দেওয়া কয়টা বড়ি নিয়ে সে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরেছিল, তখন বোন কুকুই আর বেঁচে নেই । মা-বাবা-ভাই-এর কান্নায় যোগ না দিয়ে নিষ্ফল আক্রোশ নগুরাই হাতের বড়িগুলো গুঁড়িয়ে ফেলে।

এর দুবছর পর নতুন জুম টিলার খোঁজে একদিন বাবা, ছোটভাই বিশরাই আর নগুরাই তিনজন তিনদিকে বেরিয়ে পড়ে । পছন্দমতো টিলায় খুঁটি পুঁতে রেখে নগুরাই ও তার বাবা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে । বিশরাই-এর ফিরতে দেরী দেখে ভাইকে খুঁজতে নামে সে, আর কিছুদূর গিয়েই দেখতে পায় ভাই-এর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, দাঁতাল শুয়ারের আক্রমণে পেট ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে।

এভাবেই বেঘোরে মরছে অগনিত পাহাড়ী মানুষ । প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই । নগুরাই ক্রমাগত এসব ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, রুণতি ও তার গভীর ভালোবাসা বাবা-মা আর সমাজের অসম্মতিতে পূর্ণতা পেলো না । শেষমেষ একদিন নগুরাই পাহাড় ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয় । তিন বছর ঠাকুর বোর্ডিং-এ কাজ করে সে বুঝতে পারে আদিবাসীদের মধ্যে জাতিগত যে বিভেদ রয়েছে, এর বাইরেও রয়েছে শিক্ষিত শহুরে সম্পন্ন আদিবাসী আর অশিক্ষিত দরিদ্র পাহাড়ি আদিবাসীর দুর্ভেদ্য দেওয়াল । এই বোধ তার যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে তোলে । এমন সময় খবর আসে তার মা মারা গিয়েছেন । কাজ করতে গিয়ে টাক্কলের আঘাতে মায়ের

পা কেটে গিয়েছিল । পরদিন নাকি মায়ের ওপর 'অপদেবতা' ভর করে । ওঝা ওচাই ঝাড় ফুঁক সব ব্যর্থ করে নগুরাইয়ের মা মরে গেল । নগুরাই বুঝতে পারে এই অপদেবতা আসলে প্রাণঘাতী ধনুষ্টঙ্কার রোগ-পাহাড়িদের অজ্ঞানতার সুযোগে যা তার মাকে ছিনিয়ে গিয়েছে । খবর আসে বাবাও অসুস্থ ।

নগুরাই বাড়ি ফিরে আসে । বাবার শরীর শোথে ফুলে গিয়েছে, মড়ার মত পড়ে থাকেন বাঁশের মাচাং-ও । পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার নেই, প্রতিবেশীরা ওঝা নিয়ে আসে । সিঁদুর লেপা কপাল আর রুদ্রাক্ষের গয়না পড়া ওঝা আতপচাল, হলুদ, ডিম ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি আর দুর্বোধ্য মন্ত্রের সশব্দ ও নিঃশব্দ উচ্চারণের পর কিছু সময় নিস্পন্দ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন । তারপর জানালেন 'কোণা দেবতা' কুপিত হয়েছেন । শূকর-হাঁস-মোরগ-মদ ইত্যাদি উপচারে প্রতিদিন দেবতার পূজা দেবার মানত করা হল রোগ আরোগ্যের শর্তে । আর রোগীর হাতে বেঁধে দেওয়া হল একগোছা সাদা সুতো।

নগুরাই একপাশে বসে দেখছিল সবকিছু ।এখন সে জানে এই সবই অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র । সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পাহাড়িদের আত্মপ্রতারণার নামান্তর । নিজেরা না খেয়ে থেকে ওঝার ঝুলিতে পূজার নামে সাধ্যাতিরিক্ত সামগ্রী ভরে দেবার রীতি যে অসহায় দুর্বলের ওপর শক্তিমানের ছড়ি ঘুরানো, একথা বুঝে নগুরাই ক্ষোভে রোষে গুমরাতে থাকে । একসময় দিন শেষ হয়ে আসে রাতের অন্ধকার । মাঝরাতে বাবা কালিগাই অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দে জল খেতে চায় । ওঝার নিষেধ থাকলেও মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে তৃষ্ণার্ত্ত রাখতে পারে না সে । কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল অন্তিম মুহূর্তটি । মরবার আগে কালিগাই ত্রিপুরা তার দীর্ঘদিনের আপত্তি তুলে নিয়ে ছেলেকে বলে সে যেন রুণুতিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে । নগুরাই যেন তার বাবার এই শেষ ইচ্ছার কথা সমাজে জানায় । 'আমারা সব পাহাড়িয়া এক ....' - এটাই কালিগাই-এর অন্তিম উপলব্ধি ।

গভীর রাতে বাবার মৃতদেহের পাশে বসে থাকা নগুরাই সব আপন জন হারিয়ে এই বিশাল বিশ্বে বেঁচে থাকা অর্থহীন ভেবে বেড়ায় গুঁজে রাখা ধারালো টাক্কল হাতে নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় রুণুতিকে সে কথা দিয়েছে, সব সামাজিক বাধা অস্বীকার করে গড়িয়া বাবার আশীর্বাদ নিয়ে তারা ঘর বাঁধবে । মনে পড়ে একটু আগেই বাবার শেষ অনুরোধ আর সর্বশেষ বাক্যটি - 'আমরা সব পাহাড়িয়া এক' । "মৃত পিতার মুখের দিকে তাকায় নগুরাই, তার চিবুক শক্ত হয়ে ওঠে । আমরা সব পাহাড়িয়া এক । মুখ বুজে আর তিলে তিলে ক্ষয় হওয়া নয় । আমাদের বাঁচতে হবে ।"

রাত ভোর হয়ে আসে, মাচাং-এর নীচে মানুষের পায়ের শব্দ । ঝাঁপ খুলে মাটিতে নেমে নগুরাই দেখে সামনে রুণুতি দাঁড়িয়ে । "নূতন সূর্য্যের আলোকচ্ছটায় রুণুতির মুখ ঝলমল করছে । নগুরাই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে রুণুতির হাত তুলে নিল নিজের শক্ত মুঠিতে ।"

এই গল্প 'জাগরণ', ত্রিপুরার গল্প সাহিত্যে জাগরণের বার্ত্তা নিয়ে এলো। গল্পটি বিশদভাবে বর্ণিত হল কেন না এই গল্পে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা স্পষটতই বুঝিয়ে দেয় এটি পুরাতনের অনুবর্তন নয়, এর বিষয় নূতন, বক্তব্য নূতন, চরিত্র নূতন । বাংলা সাহিত্যের মূল ভূখণ্ডের মানুষজনের কাছে অপরিচিতি উপাদানে তৈরী এই গল্প শুধু গল্পকথা নয়, সমগ্র পাহাড়ি মানুষের জীবন কথা । পাহাড়ের আদিবাসীদের আর্থ-সামজিক জীবন চিত্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আচ্ছন্ন মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রাম, শহর ফেরৎ পাহাড়ি যুবকের সচেতন ক্ষোভ, একই জাতির মানুষজনদের মধ্যে শহরবাসী আর পাহাড়ির দুস্তর ব্যবধান -এই সবকিছুই একেবারে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে । পার্বতী ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের দুর্দশার এই কাহিনী, লেখকের গভীর সহানুভূতির স্পর্শে ফটোগ্রাফির মত নিখুঁত যাথার্থ্যে উপস্থাপিত । রাজন্যশাসনাধীন ত্রিপুরায় বাস করে সর্বশক্তিমান রাজা এবং তাঁর পারিষদ ও কর্মচারীদের সমালোচনা করার যে দুঃসাহস নগুরাই দেখিয়েছে, তা

প্রকৃতপক্ষে গল্পকার বিমল চৌধুরীর সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি । কিন্তু এই সাহসী গল্পকারের গল্পটি প্রকাশ করবার সাহস দেখাতে পারেন নি সেই সময়ের কোনো সম্পাদক । পরে ১৯৪৯ - এ জেল ফেরৎ নেতা প্রভাত রায় তাঁর 'চিনিহা' পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশ করেছিলেন ।

প্রথম গল্প 'জাগরণ' থেকেই দেখা গেল গল্পকার বিমল চৌধুরী তাঁর গল্পের পরিণতিতে সদর্থক জীবন ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । জীবনের কাছে হেরে না গিয়ে, সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, চারপাশের সকলকে নিয়ে মানুষের মত বাঁচবার নীরব শপথ নেয় নগুরাই । নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত নগুরাই রুগুতির হাত ধরে প্রথম সূর্যালোকে পথে নামে । নগুরাই এর এই জাগবণ সমগ্র আদিবাসী পাহাড়িয়া মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে । আরেকটি দিক থেকেও এই গল্পটি অসামান্য গুরুত্বের দাবীদার । ৪৭ সালে এই গল্প লেখার কাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের কোনো প্রশ্নই ছিল না । বহিরাগত বাঙালীরা এসে সরল পাহাড়ি মানুষগুলিকে নিজবাসভূমে পরবাসী করে দিয়েছে-পরবর্তী সময়ের বহুশ্রুত এই অভিযোগ 'জাগরণ' গল্পের সূত্রে মনে পড়বার কোনো সম্ভবনা নেই । কিন্তু উদ্বাস্তুদের আসার আগেও যে এই রাজ্যের ভূমিপুত্রগণ সমান সুখ-শান্তিস্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারেনি, গুরুতর বৈষম্যের শিকার হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী সহজ সরল নিরক্ষর মানুষেরা, সংখ্যালঘু শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত উপজাতি পরিবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নৃপতির অনুগ্রহ লাভের লক্ষ্যে, সংখ্যাগুরু স্বজাতীয় অবহেলা আর তাচ্ছিল্য দিয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এই গল্পের মধ্যে রয়েছে । পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী লেখক আলোচক মন্তব্য করেছেন, ত্রিপুরায় বাংলা ছোট গল্পে সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত 'ত্রিপুরার জল হাওয়া মাটি নিয়ে জীবনযুদ্ধ বিশেষ করে আদিবাসী জীবন তেমনভাবে স্থান পায়নি ।' এই পর্যবেক্ষণের অসারতা বিমল চৌধুরীর প্রথম গল্প তথা ত্রিপুরারা প্রথম ছোট গল্প 'জাগরণ' থেকেই প্রমাণিত হয় ।

১৯৪৯ -এর ১৫ই অক্টোবর স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা অন্যতম অঙ্গরাজ্যরূপে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় । সুদীর্ঘকালের রাজতন্ত্রের অবসানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন রাজ্যের জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । সংস্কৃতি মনস্ক বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকগণ ত্রিপুরার পরিবেশ পরিস্থিতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বভাবের পরিবর্তনগুলি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন । সমকালীন সাহিত্য কর্মের মধ্যে বিশেষ করে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনের ছাপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে ।

স্বাধীনতা যে সমস্ত অনিবার্য অভিশাপ সঙ্গে করে এনেছিল, দেশ ভাগ করেও যে সবের মূলোচ্ছেদ করা যায় নি, তাদের অন্যতম হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সকল ধারাতেই উল্লেখযোগ্য পরিমানে উৎকৃষ্ট রচনার সম্ভার রয়েছে । ত্রিপুরার সাহিত্য এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। গল্পকার বিমল চোধুরী সেই অস্থির রক্তাক্ত সময়কে নিপুণভাবে ধরে রেখেছেন 'অনুভাব' গল্পে । গল্পের নায়ক মকবুল, দুবছর পর পশ্চিম থেকে ঢাকায় ফিরছে। ইতিমধ্যে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। মকবুল দূরে থেকে সব খবরই জেনেছে । ট্রেনে বসে কেবলই তার মনে হচ্ছে কতক্ষণে মায়ের কাছে যাবে । ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি যাবার পথে একটি হিন্দু আর ছয় জন মুসলমান । এলাকার যুবকরা পাল্লা সমান করবার জন্য মুসলমানের সন্ধানে রয়েছে । ভয়ার্ত মকবুল প্রাণ বাঁচাতে নিঃশব্দে নেমে যায় -শাপলা-কলমী-কচুরীপানা ভরা পুকুরে । হাতড়ে হাতড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বুড়ো বটগাছের ঝুরি ও শেকড় ধরে কোমর জলে গলা ডুবিয়ে কেনোমতে মাথাটি ভাসিয়ে রেখে আতঙ্কের প্রহর গোনে মকবুল । একসময় শুনতে পায় উত্তেজিত ঘোষণা, "লোয়ার পুলের উপর নিতাইরে কাইট্যা দোলাইখালে ফালাইয়া দিল - এইটার শোধ নিতে অইবো না .... দেহিনা ইষ্টিশানে দুই একটা লুঙ্গিনি নামে .... এই বইলাম তৈয়ার অইয়া .... নিতাইর জানের বদলা ক্যামনে লই দেহিস তরা, অর রক্তে ছান করুম হাঃ ।" -এরমধ্যি খবর এসে গেছে 'একটা মুসলমান' এই ষ্টেশনেই

নেমেছে এবং রাস্তা দিয়েই গেছে সে। বোবা আতংকে নিস্পন্দ মকবুল জলের ভেতর বসে মৃত্যুর প্রহর গোনে। এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে তিন চার বছর বয়সী ছোট্ট একটি শিশু সকলের অগোচরে কিভাবে যেন একেবারে জলের ধারে চলে এসেছে। পুকুরে ফুটে থাকা রঙীন শালুক আর কচুরীপানা ফুল দেখে মুগ্ধ শিশুটি হাত বাড়িয়ে নির্দ্বিধায় নেমে যায় জলে। দুহাত ভরে ফুল সংগ্রহ করে সে, কিন্তু এবপর আর পাড়ে উঠতে পারেনা। শাপলা শালুক কলমির জলে আটকে গিয়ে আস্তে আস্তে শিশুটি গভীর জলের দিকে গড়িয়ে চলে। নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে নিষ্পাপ প্রাণটিকে রক্ষা করবার বাসনা অদম্য হয়ে ওঠে মকবুলের মনে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার আগেই চোখে পড়ে 'জানের বদলে জান' নেবার আশায় উন্মত্ত ঘাতকের দল, খোলা অস্ত্র হাতে এদিকেই আসছে। এখন ওদের সামনে পড়লে এ জীবনে আর আম্মাকে দেখতে পাবে না। একখন্ড পাথরের মত নিশ্চুপ বসে থাকে মকবুল। কিন্তু এমন সময়েই 'মা-আ-গো' বলে কচি গলার আর্ত চীৎকারে মকবুলের সমস্ত সতর্ক ভাব ভাবনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর পরিণতির কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করে মকবুল দ্রুত গিয়ে শিশুটিকে জল থেকে তুলে আনে, পুকুর ধারে শিশুটিব পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

ততক্ষণে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে সেখানে। আলুথালুভাবে ছুটে এসেছেন শিশুটির মা। মকবুল শান্তভাবে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিল মায়ের কোলে। এমন সময় ছুটে এল এলাকার স্বনিয়োজিত রক্ষক মইন্যা। মকবুলের ভিজা পায়জামা দেখে সে বুঝে গেল মকবুলই সেই সাত নম্বর মুসলমান যার রক্তে স্নান করবে বলে কোমরে ছুরি নিয়ে ঘুরছে সে। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত সামনে দেখেও ভয় ভীতিহীন প্রশান্ত মকবুল কিছুমাত্র বিচলিত হল না। মকবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মইন্যা ধারালো সেই ছুরি বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে মকবুলকে টেনে নিল বুকের ভেতর।

সমস্ত হিংসা আর ক্রূরতার বিপক্ষে মানবতার এই জয়কে অসামান্য বলিষ্ঠতা আর দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন গল্পকার। ছোটগল্পের এই 'বিন্দুতে সুদর্শন', পাঠকের মন ও মননকে উজ্জীবিত করে তুলে। চিরকালের মানবতা বিরোধী দাঙ্গার কথা মনে পড়ে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকবৃন্দ, মন্বন্তর-দেশ ভাগ-স্বাধীনতা-দাঙ্গা ইত্যাদিব পটভূমিকায সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ গল্প উপন্যাস।

সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রে রেখেই প্রধানতঃ বিমল চৌধুবী হাতে কলম তুলে নেন। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, একটু নিরাপদ আশ্রয় আর দুমুঠো অন্নের আশায় সীমান্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন অঞ্চলে। নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের পালা চুকিয়ে তারা চিহ্নিত হল শরনার্থী পরিচয়ে। 'হিজল খালের কান্না' গল্পে বিমল চৌধুরী একটি আট ন'বছরেব ছেলের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের সকল বাস্তুহারা মানুষের আকুলতা আর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রজাতন্ত্রী মাসের সাজানো ইন্দ্রপুরী শিশু উদ্যানের উল্টোদিকে কোনো রাজার একদা রাজ্যাভিষেকের স্মারক মন্ডপের তলায় পোঁটলাপুটলি সহ আশ্রয় নিয়েছে সদ্য বাস্তুহারা একপাল মানুষ সুসজ্জিত শিশুউদ্যানে। এক যাদুকর বাক্সওয়ালা তার বাক্সের ভেতর দিয়ে 'লন্ডন-প্যারিস-রংদার দুনিয়া যা চাও সবকুছ' দেখানোব প্রাতশ্রুতি ঘোষণা করছে উচ্চস্বরে। ভিটেমাটি ছেড়ে আসা ছোট্ট ছেলেটি মেলার আর সব জাঁকজমক দূরে সরিয়ে রেখে ভীরুপায়ে এসে দাঁড়ায় যাদুকরেব পাশে। কম্পিত মুঠিতে পয়সা এগিয়ে দেয় বাক্সওয়ালাকে। কিন্তু এ পয়সা তো এখন পাকিস্তানের পয়সা হয়ে গেছে, এখানে এ পয়সা চলবে না। বিমর্ষ ছেলেটি মিনতি জানায়, ''আমারে তুমি খালি নিশ্চিন্তপুর দ্যাহাও, আর কিছু দ্যাহান লাগবো না।'' অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে যাদুকর, এ নিশ্চিন্ত 'ক্যায়া চীজ হ্যায়!'' আর সেই ব্যাদিত মুখের অতল গহ্বরে ছোট ছেলেটির নিশ্চিন্তপুর হিজল খালের পারে দাওয়া ঘেরা দুটি পর্ণ কুটীর কাজলী গাই পুষি বেড়াল করমচা কামরাংগা সিঁদুরে আমগাছ, স-ব-কি-ছু নিমেষে

তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । আলোর ফুলঝুরি ছড়ানো জমকালো ইন্দ্রপুরী উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণে ডুকরে কেঁদে ওঠে ছেলেটি ।

এ গল্পের কোনো ব্যাখ্যার দরকার হয় না । তীব্র সময় সচেতন গল্পকার বিমল চৌধুরী ১৯৫১ সালে প্রকাশিত 'চিনিহা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই গল্প লিখলেন, 'এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ' গল্পের নামকরণে অনিবার্যভাবে ছায়া ফেলেছে কবিগুরুর সেই অমর রচনা

'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি
মাথা করো নত । এ আমার, এ তোমার পাপ ।'

সেই কঠিন আত্মসমীক্ষা জাত বোধের শরিক হয়ে গল্পকার এখানে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন । বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যিক সততা অনেক সময় বিপদ ডেকে এনেছে । স্বাধীনতা-দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অস্বাভাবিক জনসমাগম হয়েছিল, ছোট্ট রাজ্যটি এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই বিপুল জনরাশির অন্নবস্ত্রে সংস্থান করা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার নাগালে ছিল না । ১৯৪৯ এর প্রথমে ত্রিপুরার খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়ে । খাদ্যের দাবীতে মানুষ আন্দোলন নামে এবং উমাকান্ত একাডেমিতে জনসভায় পুলিশ লাঠি-গুলি চালায়। বিবেকী শিল্পী বিমল চৌধুরী এর প্রতিবাদে গল্প লিখলেন, 'তোরে নাহি করি ভয় ।' সে সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা 'নবজাগরণ' এ ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গল্পটি প্রকাশিত হলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হল । ফলে অনিবার্য রাজরোষের শিকার হল পত্রিকাটি । শেষপর্যন্ত সেটি বন্ধ হয়ে যায় । ত্রিপুরার সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘটনাটি অভিনব হয়ে রয়েছে ।

বহুকাল থেকে লিখে চললেও বিমল চৌধুরীর প্রথম গল্পগ্রন্থ, 'মানুষের চন্দ্রবিজয় এবং তারানাথ প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে 'পৌর্ণমী প্রকাশন' থেকে। সংকলনের দশটি গল্পই বহমান জীবনের বিভিন্ন সময় ও মানসিকতার ধারাবাহী। প্রতিটি গল্পে রয়েছে নতুন সমস্যা নতুন পটভূমি । 'দেয়াল' গল্পের নায়ক পল্টু বেকার যুবক, বৃদ্ধ পিতার সংসারে বাড়তি বোঝার মতো । দাদারা সব চাকরি বাকরি করে, বৌ বাচ্চা নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছে । ধারকরা জামা-প্যান্ট জুতো নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে অফিসে ইন্টার ভিউ দিতে গেলে মালিক জানান তিনি পছন্দ মতো লোক পেয়ে গেছেন তাই আর কারো ইন্টারভিউ নেবেন না । হতাশ পল্টু ঘিঞ্জি বস্তির বাড়িটায় আর ফিরতে চায় না । তার সামনে দিয়েই হাতে চক্‌চকে ইলিশ ঝুলিয়ে রিক্সা করে চলে যায় ছোড়দা 'বাবা কেমন আছে রে' এই বাঁধা গৎ এর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে, উত্তরের অপেক্ষাও না করে । নিষ্ফল আক্রোশ ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে পল্টু । তারপর স্থির করে নেয়, "এভাবে ভেঙ্গে থেঁতলে যাওয়া নয় । চারিদিকের দেয়াল শক্ত হাতে ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবেই । মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সে পথে নেমে পড়ল। " সমস্যার গভীরতা এবং তা থেকে উত্তরণের মানসিকতার এই গল্প, হতাশা বঞ্চনায় আচ্ছন্ন যুবসমাজের সামনে আলোর দিশারীর দায়িত্ব পালন করছে ।

প্রতিবাদ প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কমনীয় হৃদয়বৃত্তির প্রতিও এই লেখক যথেষ্ট মনযোগী ছিলেন । 'অন্য স্বাদ' গল্পের নায়ক রজত, প্রথম যৌবনে একটি মেয়েকে ভালবেসে ছিল, ভালোবাসা পেয়েছে, এই বিশ্বাসও ছিল গভীর । কিন্তু এক আকস্মিক মুহূর্তে প্রেমিকার দ্বিচারিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল সে । মনের জ্বালা ভুলতে অন্যত্র চাকুরি নিয়ে চলে গিয়েও সেই গ্লানিভরা অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেনা রজত । তাই আরেকটি মেয়ে তাকে ভালবেসেছে বুঝতে পেরেও নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে । ভালোবাসা আর বিশ্বাস দুই-ই তার প্রথম প্রেমের সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছে ।

কিন্তু ঘটনাচক্রে অদ্ভুতভাবে একদিন সে সাক্ষী হয় একটি নাটকীয় ঘটনার। যেখানে একটি সুন্দরী বধূ তার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে লালায়িত স্বামীরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করে তাড়িয়ে

দেয় । একচক্ষু হরিণের মত নারী বিদ্বেষী রজত নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্থির ক'র পরদিনই সে যাবে অনীতার কাছে, দুজনে মিলে শুরু করবে নতুন জীবন । গল্পটির বয়ানে অবশ্য মাঝে কিছু শিথিলতা এসেছে । তবু সদর্থক জীবনভাবনা সে ত্রুটিকে অনেকটা ঢেকে রাখে । 'মানুষের চন্দ্রবিজয় এবং তারানাথ'- এই নাম গল্পটিতে এক বেকার যুবককে তার চাকুরিরতা বান্ধবী, রসের আগ্রহ টের পেয়ে টিপ্পনী কেটে বলেছিল 'ওহে বেকার যুবক, ভুলে যেও না ভদ্রলোকের মাসমাহিনা পাঁচশো এবং ভদ্রলোক অবিবাহিত। ।" হঠাৎ একদিন একটি নামী জুটমিলে চাকুরীর আহ্বান নিয়ে বাদামী রঙের লেফাফায় মোড়া চিঠি এল । সে দিনটাও এক ঐতিহাসিক দিন, মানুষ চাঁদে পা রাখবে, তার সাক্ষী হবার জন্য অধীর অগণিত মানুষ রাস্তায় । কিন্তু তারানাথ শুধু অনুরাধাকে খুঁজছে । হঠাৎ চোখে পড়ল যুবসঙ্গীকে নিয়ে অনু রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছে । সে মুহূর্তে জনসমুদ্র উত্তাল । চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন পড়তেই আকাশে উড়ে গেল অজস্র রঙিন হাউই । আর সেই আলোতে তারানাথ দেখে নিবিড় নৈকট্য মাখা দুটি শরীর । "চাঁদ পাওয়া প্রমত্ত জনসমুদ্র ঠেলে তারানাথ নিঃস্বের মত ক্লান্ত পায়ে ফিরে চলে।"

বিমল চৌধুরীর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ভগীরথের তালা' প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে । মাঝখানের এই দীর্ঘসময়েও তিনি ছিলেন ত্রিপুরার পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক । তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থটি ত্রিপুরার গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে সাড়া জাগিয়েছিল । 'সাপ্তাহিক দেশ', 'কৃত্তিবাস' এবং 'আনন্দবাজারে'র মত বিখ্যাত প্রকাশনায় তাঁর গল্পের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে । তবুও দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ বের হতে লেগে গেল তেইশটি বছর । 'ভাগীরথের তালা'-য় রয়েছে আঠারোটি গল্প, যার প্রথম গল্পটি লেখা হয় ১৯৬১-তে আর শেষ গল্পের রচনা কাল ১৯৯৪ । এই বইয়ের বেশির ভাগ গল্পেই মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় । যেমন প্রথম গল্প সোয়াদ । চা বাগানের ম্যানেজার অতিথি বৎসলতার সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে একদিন দুই বন্ধু সামান্য যোগাযোগের সূত্রে হাজির হয় সেখানে । যথারীতি উষ্ণ অভ্যর্থনার শেষে খাবার টেবিলে এল চর্ব চোষ্য-লেহ্য পেয় সুস্বাদু খাবারের রাশি । কিন্তু খাবার মুখে তুলতে গিয়ে থমকে যায় দুই বন্ধু । ম্যানেজার বাবুর পাতে যে শুধু খানিকটা গলানো ভাত, পেঁপে-কাঁচাকলা হিঞ্চেসেদ্ধ আর একবাটি দুধ । তাদের নীরব বিস্ময়ের উত্তরে ম্যানেজার ধীর ভাবে জানালেন গত ছয় মাস ধরে ডাক্তারের নির্দেশে এই তাঁর বরাদ্দ । গলা দিয়ে নামতে চায় না । তাই লোকজন এলে, তাদের সাড়ম্বরে টেবিল সাজিয়ে খেতে বসিয়ে, তাদের খাওয়া দেখতে দেখতে, কোনোমতে সেই গলা ভাত, গলা দিয়ে নামান তিনি । আর যে দিন কেউ আসে না, সেদিন পোষা কুকুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে হাড় চিবিয়ে চিবিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেয় । অদ্ভুত চরিত্র তার অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব । মানুষের মনোগহনের সর্পিল জটিলতার এই আকস্মিক উন্মোচন পাঠককে হতবাক করে দেয় । 'ভগীরথের তালা' গল্পটিতে, সমাজের ধনী-দরিদ্র আর সর্বহারাদের যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে, তার ছবি তুলে এনেছেন লেখক । ফুটপাতের সামান্য দোকানী ভগীরথ প্রাত্যহিক জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে । তার চোখে দিয়েই পাঠক দেখে, সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা প্রায় তাড়িয়ে দিলেন । সংক্রমনের ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজেদের ছেলেটিকে যায় না । আবার একই সময়, হোটেলের কলতলায়, ড্রেনে ফেলে দেওয়া খাবার ধুয়ে নিয়ে ফুটপাতে বসে কাগজের টুকরোয় খেতে নিয়ে 'রাস্তার ছেলে' দুটি কিশোরের চোখ পড়ল 'ন্যাতানো মাছির মতো' ভিখিরি ছেলেটার দিকে । তাকে ডেকে এনে পরম মমতায় নিজেদের ভাতের কিছুটা অংশ তার পাতে তুলে দেয় 'বিশ্বখাটে' ছেলেদুটি । যে সমাজ মনস্কতা এই গল্পের আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে, তা সহজেই পাঠকের মনোযোগে আকর্ষণ করে ।

কোনো গল্পকারের সবগল্পই প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারে না । বিমল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য । 'বৃত্ত', স্বর্গের সিঁড়ি , 'চরিত্র' প্রভৃতি কিছু গল্পের সমাপ্তিতে লেখক অকারণে তাড়াহুড়ো

করেছেন বলে মনে হয়। আরো কিছু গল্পেও ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার নিজের ধ্যানধারনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। 'একটি মোরগ, হঠাৎ' গল্পটি যেন শিক্ষা, সভ্যতা এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির গর্বে নিদারুণ কশাঘাত। ব্রেনটিউমার অপারেশনের পর দুর্বল স্মৃতিশক্তি নিয়ে এক বনেদী ব্যবসায়ী মানুষ খেকো মানুষদের খপ্পরে পড়লেন। তথাকথিত 'নার্সিং হোমে'র মালিক সিক্রেট ফাইলে দেখেন চোখ, কিডনি, লিভার, হার্ট-লাং-ক্ষুদ্রান্ত্রর জন্য প্রচুর লোক ওয়েটিংলিষ্ট এ অধীরে আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। অথচ তার কর্মচারীরা 'মাল' জোগাড় করতে পারছে না চাহিদা মতো। 'দেশে কি মানুষের আকাল পড়লো?' মালিকের গর্জনে বিব্রত ম্যানেজার—এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, সুখবর আছে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার - সহকারী নার্স এসে গেলেন অত্যাধুনিক আন্ডার গ্রাউন্ড অপারেশন থিয়েটারে। খুশিতে বিগলিত ম্যানেজার মালিককে ডাক্তারদের প্রাথমিক রিপোর্ট জানায়ঃ "বডির কনডিশান ইজ ভেরি গুড স্যার .... সবগুলো আইটেম আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্যার .... " ইত্যাদি কিছুক্ষণের জন্য পাঠকের বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে দিয়ে এই গল্প। কিন্তু আমরা জানি আসলে এটি গল্প নয় অত্যাধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আনাচে কানাচে লোভী শয়তানরা যে নরক বানিয়ে রেখেছে, তারই এক ঝলক গল্পকার দেখালেন। গল্পটির নামকরণ সুকান্ত'র বিখ্যাত কবিতাটিকে মনে করিয়ে দিলেও এই গল্পের অন্য কোনো নাম ভাবা যায় না।

১৯৯৯-তে প্রকাশিত তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'নায়কের জন্ম'তে রয়েছে চব্বিশটি গল্প। 'আর এক সমুদ্র', 'গভীর গহনে', নায়কের জন্ম' ইত্যাদি প্রেমের গল্পে পাত্রপাত্রীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সহজ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। গভীর মমতা দিয়ে লেখক কয়েকটি গল্পে নিয়ে এসেছেন বেকার যুবকদের ক্ষোভ আর অবসাদ। কিছুগল্পে উপজীব্য উপজাতি জীবন। আর, সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প 'ত্রিপুরা ৮০', ত্রিপুরাবাসীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যের কলঙ্ক, সেই আশি সালের জাতি-উপজাতি দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা। সে দিনগুলি এখনো মনুষ্যত্বের চরম বিনাশের প্রতীক হয়ে বহুমানুষের স্মৃতিতে বেঁচে আছে। কিন্তু গল্পকার তাঁর স্বভাবধর্ম অনুযায়ী এই গল্পেও হিংস্র পাশবিকতাকে জয়ী হতে দেন নি। বাঙালী সুদাম আর উপজাতি আদিবাসী পুংক্ষিরাই বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশি। সুখে দুঃখে তারা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গী। অতর্কিত দাঙ্গা বেঁধে গেলে হিংস্র উগ্রবাদী স্বজাতির অস্ত্রের আঘাত নিজের দেহে নিয়ে পুংক্ষিরাই বন্ধুকে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সাহায্য করে। আর পরিস্থিতি একটু শান্ত হতেই সুদাম গ্রামে গিয়ে আহত, অচেতনপ্রায় পুংক্ষিরাইকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্ত্তি করায়। প্রচুর রক্ত দরকার। ডাক্তাররা দুর্বল সুদামের রক্ত নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু সুদামের আকুল আর্তিতে তাঁদের আপত্তি ভেসে গেল। .... দুই বন্ধু পাশাপাশি বেড় - এ শুয়ে। একসময় পুংক্ষিরাই চোখ মেলে। সুদামের দিকে তাকায়। এর ঠোঁট নড়ে ওঠে। "সুদামের দিকে চোখ রেখে থেমে থেমে বলে 'আংনিনি নগ হালাবই রুয়ানু ইয়ার ... আমি তোমার ঘর ছাউনি দিয়া দিমু বন্ধু'।

পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের প্রথম ও মধ্যভাগে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন কয়েকজন গল্পকার এসেছেন ত্রিপুরার গল্প জগতে। তাঁদের লেখা - লেখিতে ছোটগল্পের প্রধানুগ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার জনজীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিজাত নানা সমস্যা, সংশয়, সংকট - এর চেহারা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের চেষ্টাও রয়েছে। জগৎ ও জীবনকে দেখার প্রেক্ষিত তাঁদের এক নয়। এক হবার কথাও নয়। কিন্তু এই সব লেখকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সমবেত যোগফল ত্রিপুরার বাংলা গল্পকে দৃঢ় ভিত্তির ওপার দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে, একথা অবশ্যস্বীকার্য। সাহিত্যের কোনো সীমারেখা হয় না। একথা মেনে নিয়েও বলা যায় ত্রিপুরার ছোটগল্প তাঁদের রচনায় স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময়ের তরুণ উৎসাহী গল্পলেখকদের মধ্যে প্রথমেই আসবে দুটি নাম সুখময় ঘোষ ও সুবিমল রায়।

সুখময় ঘোষ

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিনিমাইয়া'র মুখবন্ধে সুখময় ঘোষ লিখেছেন, "আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে ছাপার অক্ষরে আমার যে গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিল, সেটি ছিল একটি প্রেমের গল্প। .... এরপর অবিচ্ছিন্ন বহু গল্পে লিখে গেছি। .... বিচিত্র সব মানুষের একটা স্বতন্ত্র জগত তৈরীর আনন্দই ছিল প্রধান।" গল্পকারের নিজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এবছর তাঁর গল্প লেখার অর্ধ শতক অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। পঞ্চাশ বছর ধরে লেখালেখির জগতে থাকতে পারা যে কোনো সাহিত্য সেবীর পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়।

দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির জগতে থাকলেও এ পর্যন্ত সুখময় ঘোষের প্রকাশিত গল্প সংকলনম মাত্র দুটি - সিনিমাইয়া (১৯৮৮), এবং 'সুরেন মহাজনের নৌকাযাত্রা (১৯৮৯)। তবে সংকলনে নিজস্বতায় ধরা না থাকলেও ত্রিপুরার গল্পের বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সুখময় ঘোষের গল্পের উপস্থিতি প্রত্যাশিত ভাবেই দেখা যায়। আর এসবের বাইরেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর গল্প লিখেছেন তিনি। বিচিত্র চবিত্রের মেলা সেই গল্পের জগতে। দেশ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযন্ত্রণা, দাঙ্গার অভিশাপ, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের হাজারো চাহিদার টানাপোড়েন ব্যতিব্যস্ত জীবন, আর এইসবের মাঝখানে কিছু সন্ধানী সুবিধাবাদী মানুষ - এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বস্তুভূমি। সময়ের দাবী মেনে উগ্রপন্থী সমস্যাও হয়ে উঠেছে কয়েকটি গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।

সিনিমাইয়া গল্প সংকলনে রয়েছে মোট আটটি গল্প : 'সিনিমাইয়া', 'কার্ত্তিক শাসন', 'আদালত প্রাঙ্গণে অসময়ে বৃষ্টি', 'জয়লতা', জগন্নাথের রথ' 'দশমী যাত্রা', 'হিরো ব্যাপারী' এবং 'হাইড্রেন্ট'। 'সিনিমাইয়া' নাম গল্পটিতে আশির দশকে উপজাতি সমাজে যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই উগ্রপন্থী সমস্যাব কিছুটা ছবি ধরা রয়েছে। অম্পি অঞ্চলের হরিরাম বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে জীবিকা নির্বাহ করে। যখন ক্ষেত্রে কাজ থাকে না, সেই ভাদ্র - আশ্বিন মাসে এই বনই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। একা একা বনে যেতে বাজারের অনেকেই তাকে নিষেধ করে। কেউ বলে 'কোনদিন উগ্রপন্থীর গুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইব দেইখ্য।' আবার কেউ বা বলে 'ধহর্‌্যা নিয়া ফাহফরমাস খাটাইব, স্পাই - এর কাজ করাইব। শেষে এহদিকের গুলিও খাইবা, হেইদিকের গুলিও খাইবা।' অনেকেই মনে করে হরিরামের সঙ্গে জঙ্গলের বন্দুকধারীদের যোগাযোগ আছে। গত বছর তার একমাত্র ছেলেকে আঠারোমুড়ায় বাস ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে, হরিরাম এমন সাক্ষী দিয়েছে যে ছেলে সহজে জেল থেকে ছাড়া পাবে না। আশেপাশের লোকজন এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দেহ করে যে গভীরতর কোনো উদ্দেশ্যেই হরিরাম এমন কাজ করেছে।

হরিরাম সবই বুঝে। অন্যকে দোষ দেয় না সে। এখন পরিস্থিতি এতই খারাপ যে কেই কাউকে বিশ্বাস করতে ভরসা পায়না। হরিরাম মেয়ে গুণবতীকে বিয়ে দিয়েছিল টাকাপয়সা খবচ করে। স্বামী সুধাচন্দ্র পুলিশ ব্যারাকে জলবাহক। স্বামীর রোজগারে গুণবতীর সাধ আহ্লাদ মেটে না তাই প্রায়ই দুজনে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। এরই মধ্যে ঘটনাচক্রে একটি অল্পবয়সি যুবক গুণবতীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই সে আসে, অনেক কথা বলে, অনেক স্বপ্ন দেখায় গুণবতীকে। সুধাচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না। সে বউকে সাবধান করে দেয়, লোকটা নিশ্চয় উগ্রপন্থী দলের লোক। গুণবতী বিপদে পড়লে সুধাচন্দ্র কিন্তু বাঁচাতে যাবে না তাকে। গুণবতী যেন ভুলে না যায় যে তার স্বামীও পুলিশের লোক। আগন্তুক রতন আর গুণবতীর ঘনিষ্ঠতা কতদূর পৌঁছেছিল সঠিক না জানলেও আন্দাজ করতে পারে সুধাচন্দ্র, তাই বউকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিল

গুণবতী বাপের কাছে ফিরে এল। পাড়ার সকলেই তাকে ভালবাসে। কিন্তু ইদানীং বাবা হরিরাম ও মেয়েকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছে। কিন্তু এবার সে অনেক সতর্ক। ছেলেটা জেলে রয়েছে, এই বোকা

মেয়েটা যেন বিনা দোষে বাপের কথায় বিপদে না পড়ে । কেবল একদিন মাত্র হরিরাম একটি ছেলেকে তার মেয়ের কাছে আসতে দেখেছিল, তা থেকেই তার সন্দেহ । এর মধ্যে একদিন সুধাচন্দ্র এসে খবর জানায় রতনের নামে পুলিশ ওয়ারেন্ট বের করেছে, গুণবতী যেন সাবধানে থাকে । বউকে দুটো ভালবাসার কথাও বলতে গিয়েছিল সে, কিন্তু গুণবতী কঠিন ভাষায় ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে ।

হঠাৎ একদিন অম্পিবাজারে সর্বত্র পোস্টার হ্যান্ডবিল পড়ে 'বিদেশীরা রাজ্য ছাড়' নির্দেশ নিয়ে । থানার বড়বাবু যথারীতি হরিরামকে ডেকে পাঠান, উগ্রপন্থী'র গতিবিধি সে জানে কিনা । হরিরাম ছোট বয়সে পাহাড়েই ছিল । নিজের হাতে জুম চাষও করেছে সে । কিন্তু আজ বহু বছর ধরে সে সমতলের বাসিন্দা । অথচ এই ধরণের কিছু হলেই সে জানে অবধারিতভাবে তার ডাক পড়বে । এক এক বার তার মনে হয় যে বড় বাবুকে প্রশ্ন করে, "আপনারা এত লোক মিলে যার হদিস পাচ্ছেন না - হরিরাম একা তা পারবে কেন ? পাহাড়ী বলে ? এভাবে বারেবারে আমাদের ওপর দিয়ে আপনার বাহাদুরী কায়েম করতে চান বড়বাবু ।" থানায় এবার তার মেয়ে সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন উঠেছে । সে শুধু বলেছে মেয়ে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে বলে তার বাড়ি থেকে চলে গেছে। তারপর একদিন গ্রামে প্রচুর পুলিশ আসে বনে ঢোকে যায় এবং রাতে হয় প্রচন্ড গোলাগুলি। পরদিন এক মৃত উগ্রপন্থীর পরিচয় জানতে মরীয়া হয়ে উঠল পুলিশ । না হলে যে গোটা এনকাউন্টারটাই উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাবে। কেউই লোকটাকে চেনে না, ডাক পড়ল হরিরামেরও । মৃতের মুখের ঢাকা খুলতেই হরিরাম চমকে যায়, মেয়ে গুণবতীর কাছে একদিন এই ছেলেটাই তো এসেছিল । নিথর শরীরটার দিকে তাকিয়ে হরিরামের চোখে ভেসে ওঠে তার পাগল মেয়েটার মুখ । বুদ্ধিহীনা অবাধ্য মেয়েটা তার । ততক্ষণে সবাই অধীর হয়ে উঠছে, হরিরাম কী বলে শোনবার জন্য । হরিরাম তার বক্তব্য জানায় একটিমাত্র শব্দে - "সিনিমাইয়া - আমি চিনে না । বলে নিঃশব্দে ভীড় ঠেলে ঘরের দিকে পা বাড়াল ।"

কার্ত্তিকশাসন' একটি আধা গ্রাম আধা শহর, গঞ্জ এলাকায় বুনো-হাতির অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার গল্প । প্রথমদিকে যেমন উত্তেজনা ছিল আস্তে আস্তে তা কমতে থাকে । পরে কিছুটা যেন গা-সওয়া হয়ে যায়, মাঝেমধ্যে হাতি বা হাতিদের এই অভিযান । নিজের চোখে কেউ না দেখলেও সকলের কথাবার্তায় হাতির প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরেই আসে । এমনকি হাতিদের নামকরণও হয়ে গেছে - কার্ত্তিক, গণেশ, গুন্ডা, সুরধনী ইত্যাদি । মাঝখানে কিছুদিন হাতির আনাগোনা বন্ধ থাকায় কিছুটা স্বস্তি পায় মানুষ । আবার বসে যাত্রার আসর। কিন্তু একদিন যাত্রার আসরে মগ্ন দর্শকদের সামনে রক্তাক্ত, প্রায় দলা-পাকানো একটি শিশু কোলে হাহাকার করতে করতে আসে এক মাঝবয়সী কৃষক, হাতি আবার ফিরে এসেছে । হাতির কোনোরকম ক্ষতি না করবার কড়া সরকারি আদেশ অমান্য করেই গ্রামবাসী হাতি ধরার ফাঁদে ধরা পড়ে বিশালকায় হাতি কার্ত্তিক । আহত কার্ত্তিকের আর্তনাদ দু'চারদিন শোনা গেল, তারপর সব চুপচাপ। কেউ জানল না তার পরিণতি কি হল। আর দারোগাবাবু হাতির অত্যাচার বন্ধে কিছুই করতে না পারলেও এবার হাতির জন্য যারা ফাঁদ পেতেছিল তাদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করে দিলেন ।

'আদালত প্রাঙ্গণে অসময়ে বৃষ্টি', গল্পটিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য রয়েছে । আদালতের ভেতরে বাইরে নানা -ধান্দায় লোকজন ঘোরাফেরা করে, বাইরে গাছতলায়ও ভিড় নানা পেশার মানুষের । গল্পের মুখ্য চরিত্র নকুল, তার ব্যবসাটি অভিনব । একটি খাঁচায় পোষা টিয়াপাখি আর মানুষের ভাগ্য লেখা কয়েকটি খাম তার মূলধন । আদালতে নানা মামলা মোকদ্দমায় যারা আসে, তাদের অনেকেই নকুলের কাছে ভাগ্য জানতে ভিড় করে । শিক্ষিত টিয়াপাখি ভাগ্য লেখা খামগুলি থেকে একটা বেছে নিয়ে খদ্দেরকে দেয় । ব্যবসাটির জন্য কিছু চাতুরীর আশ্রয় নকুলকে নিতে হয় বইকি । কিন্তু আইনের নানা ফাঁকফোকর আর উকিলবাবুদের নানা কারসাজিতে রাতকে দিন আর দিনকে রাত করা দেখতে দেখতে হতাশ নকুল মাঝেমাঝে ভাবে তার সব খামগুলোতেই লিখে

রাখবে 'মামলা মোকদ্দমায় নিশ্চিত পরাজয় !' তাহলে আর মিথ্যে আশায় উকিলের খপ্পরে পড়বেনা মানুষ, উকিলবাবুদের তখন গাছতলায় এসে দাঁড়াতে হবে মক্কেল ধরবার আশায়।

লংথরাই পাহাড়ের ভেতর বড় রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা মন্দিরটি উগ্রপন্থী এবং পুলিশ - দুদলেরই 'বিশ্রামচটি'। 'চোর পুলিশ' খেলায় কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না। মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী মেয়ে জয়লতাকে নিয়ে মন্দিরেই থাকে। জয়লতার স্বামী ছিল কোয়াক ডাক্তার। তাকে উগ্রপন্থীরা নিয়ে গেছে শোনা যায়, সে নিজেই চলে গেছে কিনা তা-ও কেউ জানে না। ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে আসা কোলকাতার সাংবাদিক সোমেন জয়লতার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় - যদি কিছু জানা যায়। জয়লতা অশিক্ষিত পাহাড়ি মেয়ে নয়। চোখে মুখে পোষাকে আসাকে শিক্ষা ও সুরুচির ছাপ। সে স্পষ্টই বলে স্বামী উগ্রপন্থী হয়ে থাকলে এই 'বিশ্রাম চটি'তে একদিন সে অবশ্যই আসবে। এই জন্যই জয়লতা এখানে রয়েছে। সাংবাদিকের পেশাদারী প্রশ্নের জবাবে জয়লতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে- "এলে জিজ্ঞেস করবো - এমন কি কাজ করতে সে গেছে যা সবার সামনে করতে পারে না। এমন কি নিজের বিয়ে করাও স্ত্রীর সামনেও না ' আমাকে যারা অপমান করে, আমার সঙ্গে অসভ্যতা করে, এমন কি আমার বৃদ্ধ বাবার চোখের সামনে আমার হাত ধরে টানাটানি করে - এই সব বন্য জন্তুর মাঝখানে নিজের স্ত্রীকে ফেলে যে পালাতে পারে সে কি কোন ভাল কাজ করতে পারে !"

গল্পকার এখানে উগ্রপন্থী সমস্যার সঙ্গে যুক্ত এমন একটি দিকের কথা তুলে ধরেছেন, যা নিয়ে এব আগে তেমন চিন্তা করা হয় নি। বিপদের প্রকৃতি এখানে ভিন্ন ধরণের, কিন্তু এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। সমাজের যেকোনো দুর্যোগে মূল্য দিতে হয় বেশি মেয়েদেরই, এই প্রতিষ্ঠিত ধারণা, জয়লতার অসম্মানিত জীবন কাহিনী আবারও প্রমাণ করে।

'জগন্নাথের রথ', রথ যাত্রায় পুণ্যলোভীদের ভিড়ে পাঁচমিশেলী কথাবার্তা, ইস্‌কনের ছোট রথ আর মূল রথের টান ঘিরে ভক্তদের উল্লাস কখনো ছোটখাট সংঘর্ষে পরিণত হয়, আবার থেমেও যায় রথের দড়িতে টান পড়তেই। 'দশমী যাত্রা' একটি নিটোল পারিবারিক গল্প। দত্তবাড়ির এককালের ডাকসাইটে গিন্নি সুধারাণী এখন নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য পুত্রবধূ মিতার ওপর নির্ভরশীল। চাকুরে বৌমাকে অনেকদিন ধরেই তিনি একটা লেপ কিনে দেবার অনুরোধ করে আসছেন। পুরনো চাদর কাঁথায় আর শীত মানে না। কিন্তু বৌমা ফর্দ মিলিয়ে রিবেট অনুযায়ী পূজোর বাজার করলেও শাশুড়ির ফরমাসটি ফর্দের একেবারে তলায় থাকে। আর সেখানে আসতে আসতে টাকায় টান ধরে যায় ফলে লেপ আর কেনা হয়ে ওঠে না। এমন ভাবেই বছর ঘুরে পূজোর বাজার আসে আর যায়, সুধারাণীর নতুন লেপের একটুখানি উষ্ণতার জন্য কাতরতাও বাড়তে থাকে। মিতা একটা গ্রামের স্কুলে পড়ায়। আজকাল হাজিরার খুব কড়াকড়ি। গ্রামের লোকেরা তাস জুয়া মদ আর গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকলেও স্কুলের স্যার দিদিমনিরা ঠিকমতো ডিউটি করছেন সেদিকে খেয়াল রাখে না। এই স্বনিয়োজিত অভিভাবকদের মালিক মালিক ভাব মিতার অসহ্য লাগে। ঘরের কাজকর্ম, দুটো ছেলেমেয়ের যত্নআত্তি, আবার শাশুড়ির সবরকম বায়নাক্কা সামলে চাকুরি রাখতে হাঁপিয়ে পড়ে সে। পূজোর বাজার করতে নামে একেবারে শেষ সময়, লিষ্টিতে নিজের মা এবং অবিবাহিতা ছোট বোনটির নামও তুলে নেয়। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত ঠাকুর দেখা ও কেনাকাটা করল মিতা, শাশুড়ির চাদরও লেপের পরিবর্তে একটা নূতন ওয়াড়।

নবমীর রাতে অনেকরাত পর্যন্ত মিতারা মন্ডপে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখলো, বাড়ি ফিরতে ফিরতে টের পেলো শীতের কামড়। মিতার একবার শীতে কাতর শাশুড়ির কথা মনে পড়লো। ওয়ারটা সেলাই না হলেও চাদরটা এখুনি তাঁকে গায়ে দিতে দেওয়া যায়, একথা ভেবে সুধারাণীর ঘুম ভাঙ্গাতে গিয়ে দেখা গেল প্রচন্ড জ্বর এসেছে তাঁর, বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে আছেন তিনি, আর পুরনো ছেঁড়া লেপ কাঁথা এলোমেলো পড়ে আছে

বিছানায় । তক্ষুনি মিতা স্বামীকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে নিজে শাশুড়ির বিছানায় বসলো । ছেলেকে দিয়ে নিজেদের বিছানার লেপ আনিয়ে শাশুড়ির গায়ে দিল আর লেপের নীচে বরফশীতল দুটি পা হাত দিয়ে ঘসে ঘসে গরম করতে চেষ্টা করতে লাগল মিতা । "অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে চাইলো সুধারাণী । মুখের সামনে ঝুঁকে আছে পিঙ্কু আর বড় । সুধারাণী নড়লো না চোখ দুটো পিংকুর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইলো । তাতে যন্ত্রণা না আনন্দ কিছুই বোঝা গেল না শুধু মনে হল জ্বরের আগুনে পুড়ে বৃদ্ধার ছানি পড়া চোখ দুটো যেন বহুদিন পর সেই দত্তবাড়ির গিন্নির জ্বলজ্বলে দুটো চোখ হয়ে সদ্যলগ্ন শিশুর মুখের ওপর আলো ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে ।" - সুধারাণীর এই যন্ত্রণার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন । সংসারের হিসেবের অঙ্ক সবার ক্ষেত্রে সমান হয় না । সুধারাণীর ছোট্ট দুই নাতি নাতনীও ঠাকুমার করুণ আবেদনে বিচলিত হয় না । তারাও জানে "ঠাকুরমার কথায় মায়ের পরিকল্পনার কোন রদবদল হয় না ।"

'দু টাকার একটি সন্ধ্যা' গল্পটি একটি ছোট অফিসের সামান্য কেরানী মেয়ে বেলাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। হঠাৎ করে বাবা মারা যাবার পর ছোট চারটি ভাইবোন আর মাকে নিয়ে সংসারটির দায়িত্ব বেলাকেই নিতে হয়েছে । দাদা বিয়ে করে আলাদা থাকে, সামান্য কিছু টাকা দেয় মাসে মাসে । নুন আনতে পান্তা ফুরোয় - এই হল তাদের সংসারের অবস্থা । তবু এমন পরিস্থিতিতেও অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে বেলা একটি মিষ্টির দোকানে ঢুকে । অনেকদিন ধরে ভাই বোনগুলো আবদার করে আসছে নলেন গুড়ের সন্দেশ খাবে বলে। ক্রেতার ভিড় সামলাতে দোকানের মালিক কর্মচারী সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ উপলক্ষ রয়েছে, তাই অনেকেই প্রচুর মিষ্টি কিনছেন । এর মাঝখানে দু'টাকার সন্দেশ দেবার জন্য বেলার অনুরোধ কারো কানেই গেল না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলো বেলা । বার কয়েক তাগাদা দিয়েও যখন কাজ হল না বেলা ভাবল মালিককে বা কোনো কর্মচারীকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবে । কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল এতে দোকানে উপস্থিত লোকজনদের দৃষ্টি পড়বে তার ওপর আর মাত্র দুটি টাকার মিষ্টির জন্য বেলার এই অস্থিরতা ওদের সকলের হাসির খোরাক যোগাবে । অগত্যা সেই লজ্জা এড়াতে বিমর্ষ বেলা ভিড়েঠাসা দোকানের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো । 'দু টাকার একটি সন্ধ্যা' নামের এই গল্পটি, সাধ ও সাধ্যের সমীকরণে অক্ষম নিম্নবিত্ত মানুষের অসহায়তাকে যেমন দেখিয়ে দেয় তেমনি দারিদ্র্য যে তাদের আত্মসম্মান বোধ নষ্ট করে দিতে পারে নি এই সত্যটিও পরিস্কার হয়ে যায় ।

'সুরবালার নতুন স্বদেশ' - দেশ ত্যাগের পর বাস্তুহারা মানুষজনের নতুন করে শেকড় গাঁথবার বাসনা ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানারকম যন্ত্রণার এক বিশ্বস্ত ছবি । তবে এবার উপলক্ষ যে স্বাধীনতা তা ভারতবর্ষের নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা । একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের অত্যাচারের ভয়ে সপরিবারে ত্রিপুরায় এসেছিলেন সুরবালারা । শরনার্থী শিবিরের দুঃসহ অভিজ্ঞতার পর শিবির ছেড়ে শহরতলীতে ঘর ভাড়া নেওয়া, জীবিকা অর্জনের জন্য নানারকম কাজকর্ম করা - এভাবে কেটে গেছে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর । সুরবালার এখন এই রাজ্যকেই তাদের স্বদেশ ভাবে । সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলার বুদ্ধি থাকায় এখন ওরা মোটামুটি ভালোই আছে । সুরবালা নিয়মিত পার্টি অফিসে যায়, ছেলে সুভাষও পার্টির কাজকর্মে জড়িত । আর সুরবালার মেয়ে পার্টি কর্মী রতনের ঘনিষ্ঠ । কিন্তু হঠাৎই সব গোলমাল হয়ে গেল । কোথায় যেন দুই পার্টির ছেলেদের মধ্যে মারামারি হয়েছে, পুলিশ সুভাষের খোঁজে এল । আসল ঘটনা বোঝার আগেই সুভাষ গা ঢাকা দিতে সন্দেহ আরো পাকাপোক্ত হল । কিছুদিন পর সুভাষ ফিরে আসে ঠিকই, কিন্তু পার্টির ছেলেদের সঙ্গে তার যোগাযোগ কমে যায় । যে ছেলেরা আগে সুরবালাকে দেখলে হাসিমুখে কথা বলতো, তারা এখন মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় । অজানা আশংকায় সুরবালা নিজেকে অভিশাপ দেয় কেন মরতে এসেছিল ।

তারপর একদিন মাঝরাতে একজন এসে সুভাষকে ডেকে নিয়ে গেল এর পরদিন সকালে নদীর পারে

পাওয়া গেল তার মৃতদেহ । সুরবালার বুকফাটা হাহাকারের মধ্যেই পুলিশ এলো, পার্টির লোকজনও এলো 'সুভাষের মরদেহ ফুলে সাজিয়ে মিছিল হলো । সেই মিছিল থেকে স্লোগান উঠল শহীদের রক্তস্রোতের জন্য দায়ী শত্রুরা সাবধান । কিছুদিন পাগলামি করে এখন সুরবালা আবার কাজে যায় জগৎ তার নিয়মেই চলে তবে সুরবালার মুখে শুধু একটাই কথা 'বুঝবা, বুঝবা, একদিন হক্কলেই বুঝবা' এই হকুনের দ্যাশে ক্যান আইছিলো, হেইডা টের পাওযাইয়া ছাড়ব ।'' একটা নির্দিষ্ট সময়ের ছাপ সর্বাঙ্গে ধরে রেখেও এই গল্প বহমান কালের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে । সুরবালার এই যন্ত্রণা শুধু দেশত্যাগের জন্য নয় । দেশেও তো মানসম্মান নিয়ে থাকবার কোনো উপায় ছিল না । জটিল সময় কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ' হয়ে উঠেছে, যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আর ইঙ্গিতও গল্পকার এখানে দিয়েছেন

গরীব ঘরের এক বেকার যুবকের চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে যাবার দিনটিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'রাজপথ' গল্পটি । সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে শৈলেনের শরীরটা ঠিক জুৎ লাগছিল না, মনটাও অগোছালো । রাতে স্বপ্ন দেখেছে একটা লাল জামা পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর দুধারের জনতা বিস্ময়, শ্রদ্ধা নিয়ে তাকে দেখছে । দু'একটা মেয়ে এগিয়ে এসে আরো সাহসী হলো । কিন্তু তারপরই হঠাৎ এক মস্ত ষাঁড় তাড়া করলো তাকে, যখন ছুটন্ত শৈলেশকে প্রায় ধরে ফেলছে, এমন সময় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল । সারাদিনের কাজের তালিকা মনে মনে বলতে থাকে সে । কাগজ পড়া আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি রুটিনমাফিক কাজকর্মের মধ্যে একটি অন্যরকমের ব্যাপার হল আজ তার ইন্টারভিউ, বাবা যদু চাটুজ্জে, সামান্য রোজগারে বহু কষ্টে সংসারের হাল ধরে রেখেছেন । আপাতদৃষ্টিতে তাকে কঠিন কঠোর মনে হলেও কর্তব্যে ত্রুটি করেন না কখনো । শৈলেশের আজকের খরচা বাবদ পুরো একটি টাকা বরাদ্দ করেছেন তিনি । শৈলেনের মনে কিছুমাত্র স্বস্তি নেই, চাকুরির সংখ্যা আর চাকুরির প্রার্থীর সংখ্যার অনুপাত আশা করবার কোনো সুযোগ রাখে নি । তবু একটু যত্ন নিয়েই তৈরি হল সে । চাকরি একটা খুব দরকার, পরিবারের জন্য, এবং নিজের জন্যও, আর অরুণা নামের সেই মেয়েটি যে শৈলেনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে - তার জন্যও ।

বাস থেকে নেমে দ্রুত পায়ে নির্দিষ্ট অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করে সে। কিন্তু হঠাৎই শুরু হয়ে যায় গন্ডগোল - পুলিশ, লাল ফেট্টুন, ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ । এদিকে ঘড়ি জানান দিচ্ছে আর সময় নেই হাতে। কি করবে ভেবে নেবার আগেই প্রচন্ড শব্দ করে কিছু একটা ফাটলো, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, শৈলেন ও ছুটতে আরম্ভ করল - চোখে প্রচন্ড যন্ত্রণা, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না - ''হঠাৎ একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ধাক্কা খেলো শৈলেন । মাথাটা ঘুরে গেলো বন বন করে । তারপর ওখানেই লুটিয়ে পড়লো ।'' প্রতিনিয়ত এমন কতো যুবকের আশা আকাঙ্খার অপমৃত্যু ঘটে, অকালে ঝরে যায় কতো প্রাণ, শৈলেন তাদেরই একজন । রাজপথে বিশালকায় ষাঁড়ের তাড়া থেকে বাঁচতে প্রাণপন চেষ্টা করছে, এমন স্বপ্ন দেখে শৈলেনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আগের রাতে । সেই স্বপ্নই হয়তো চেহারা সামান্য বদল করে প্রচন্ডশব্দ, ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ হয়ে এসেছে মধ্যদিনের ব্যস্ত রাজপথে । কিন্তু এই কঠিন বাস্তবের কাছ থেকে পালাবার কোনো পথ নেই । এই গল্প পাঠকমনে বিষন্নতা জাগিয়ে তুলে ।

সুরেন মহাজনের নৌকাযাত্রা গ্রন্থের নাম গল্পটি লেখকের শক্তির নিদর্শন হয়ে আছে । 'গল্পকার এখানে এক আশ্চর্য নিরাসক্ততায় সুদখোর হিসাবী মহাজনের অর্থগৃধ্নু মনোভাব এবং এর বিপরীতে গরীব গ্রাম্য মাঝি হানিফ মিঞার মনের প্রসারতার ছবি এঁকেছেন । সুরেণ মহাজন দাদনের আদায় এবং তেজারতি ব্যবসায়ের দরকারে বীরগঞ্জ যাবে শুনে স্ত্রী শৈলবালাও সঙ্গী হতে চাইল । বীরগঞ্জে বাপের বাড়ি অনেকদিন দেখেনা । ঠিক হল ছোট দুই ছেলেমেয়েকে শুধু সঙ্গে নেবে । বাসে করে গেলে অনেক খরচ, সুরেন মহাজন চিন্তা করতেই মাথায় বুদ্ধি এসে গেল । হানিফ মিঞা তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নৌকা করেছে, এখনও সব টাকা শোধ দিতে

পারেনি । সঙ্গে সঙ্গেই হানিফকে ডেকে মহাজন নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দিয়ে হানিফকে তৈরী হতে বলে দিল । হানিফ অবশ্য বলেছিল ওই নদীপথ তার অচেনা, আর নৌকায় তেমন দূরপাল্লায় যাবার ব্যবস্থাও নেই কিন্তু মহাজন তাতে কান দিল না । হানিফ কেন যেতে চাইছে না সেটা ভালোই বুঝে মহাজন । কিন্তু ঠিক সেই জন্যই যে কিছু অসুবিধা থাকলেও তার নৌকাতেই যেতে চায় সুরেন মহাজন, তা হানিফের মাথায় আসে না ।

যথাসময়ে নৌকা ছাড়লো । সারাদিন বেশ ভালোই কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হানা দিল বিপদ । জলের স্রোত কিছুক্ষণ ধরেই বড় বেশি বলে মনে হচ্ছিল হানিফের হঠাৎও নৌকা পড়ে গেল স্রোতের আবর্তে প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে নৌকার গতি কমাতে বা মুখ ঘুরাতে পারলো না । চিৎকার করে মহাজনকে বিপদের কথা জানাতেই মহাজনের প্রথম প্রতিক্রিয়া - "এ্যা, আরে কর্সাকি । অই গোলামের বাচ্চা - তুই কি আমরারে জানে মারতে চাস ।" হানিফ কোনো উত্তর না দিয়ে নৌকা বাঁচাতে জলে নেমে পড়ে । বেসামাল অবস্থার নদীর প্রবল স্রোতের ঘূর্ণিতে প্রায় পড়ে যাবার মুখে মহাজনের ছেলে রতন । শৈলবালা ছেলেকে বাঁচাতে আকুল অনুরোধ জানায় স্বামীকে । কিন্তু মহাজনের যে খাতাপত্র ছেড়ে নড়বার উপায় নেই শেষপর্যন্ত হানিফ নিজের জীবন তুচ্ছ করে রতনকে সরিয়ে আনে নিরাপদ জায়গায় ঈশ্বরের কৃপায় নৌকাও কূড়ে থেকে সরে আসে মূল স্রোতে । এরপর নির্বিঘ্নে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে মহাজন সবাইকে সেই বিপদের গল্প শোনাতে লাগলো । সকলেই রায় দিল দোষ হানিফের । যদিও সে কপালে জোর আঘাত পেয়েছে, নৌকাটার ক্ষতিও হয়েছে অনেক, তবু মহাজনের যে ক্ষতি হতে পারতো, তার কাছে এসব কিছুই না । দোষ হানিফের, তাই কোনরকম টাকা পয়সা দেবার প্রশ্নই নেই । তবু মহাজন নৌকা মেরামতির জন্য তাকে বিনা সুদে কিছু টাকা ধার দিয়েছে তিন মাসের কড়ারে । এই সময়ের মধ্যে টাকা শোধ না দিতে পারলে সুদ লাগবে । হানিফের কোনো অভিযোগ নেই । মহাজনের এটুকু সাহায্যই অপ্রত্যাশিত আর মহাজনের স্ত্রী ? হানিফকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছে, "ওষুধপত্র খাইছ । হাজার হউক, বাঁশের কাটা দেখিস, পেটের দায়ে আবার টাকাটা হজম কইরা লাইছ না । তোরারত এইটাই বড় দোষ ।" - একটি গল্পের আধারে বিশ্বরূপ দর্শনের সুযোগ পেয়ে যান পাঠক 'সুরেন মহাজনের নৌকাযাত্রা'য় । সুদখোর মহাজন শ্রেণী ও সহজ সরল ধর্মভীরু গরিব মানুষ তাদের সমস্ত বিশেষত্ব নিয়ে এখানে উঠে এসেছে । আর গল্পের শেষতম উক্তিটি যার, যে স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল - "তুমি মানুষ না পিশাচ । ছেলের চাইয়া সম্পত্তি বড়হইল ", যার কাতর মিনতিতে হানিফ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রতনকে বাচায়, সেই শৈলবালার চরিত্র চিত্রণে সামান্য উপকরণে অসামান্য সাফল্য পেয়েছেন গল্পকার ।

সুবিমল রায়

ত্রিপুরার গল্পজগতে একটি সুপরিচিত নাম । দীর্ঘ পাঁচদশক ধরে প্রায় নিয়মিতভাবে গল্প লিখছেন তিনি । পঞ্চাশের দশক থেকেই মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী', আত্মপ্রকাশ উন্মুখ সাহিত্যমনস্ক ছাত্রযুবাদের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল । পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় খ্যাতিমান লেখক-কবিদের বেশির ভাগই তাঁদের সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন 'প্রাচী'র পাতায় । আর শুধু ছাত্র নয়, অনেক শিক্ষক-অধ্যাপকও এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখে এসেছেন । সুবিমল রায়ও তাঁর কলেজ জীবনে 'প্রাচী' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন । তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক গল্প লিখেছেন তিনি, গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে চারটি প্রথম গ্রন্থ 'বিবর্ণ আবির', প্রকাশকাল ১৯৭২ । 'মানচিত্র এবং অন্যান্য গল্প' দ্বিতীয় গ্রন্থ, এটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে, ১৯৮৯ সালে । এই গল্প সংকলনে মোট ১৫টি গল্প রয়েছে - 'চোখের আলোয়', 'নারকেলের জল', 'দ্বিধা', ঈশ্বরের নবজন্ম', 'মানচিত্র', 'বিন্দুবিন্দু' 'সেই মিছিল', 'প্রেমের পাপ', 'অন্য পথ', 'আলো অন্ধকার', যামিনীর ভালো থাকার শর্ত', 'অস্ফুট ছবি', 'জীবন বৃত্ত', 'আকাশ প্রদীপ'এবং 'আঁধার পেরিয়ে' । ১৯৯৮ তে তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'আত্মজ' প্রকাশিত হয়, এতে গল্পসংখ্যা তেরটি 'মরাগাঙ',

'বিচার', 'ন্যায় অন্যায়', 'বসতি', 'উপনিবেশ', 'পূজার ফুল' 'সমতা', 'ভাঁটার টান', 'আত্মজ', 'প্রগতি', 'বাঁশ ঝাড়ের মানুষ', 'রৌদ্রছায়া' এবং 'ছুটির প্রতিবিম্ব'। সুবিমল রায়ের চতুর্থ এবং সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'যাত্রী' ২০০৩ - এ প্রকাশিত এই সংকলনের চেহারাটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। সূচীপত্রের মোট পনেরটি গল্পের মধ্যে আটটি গল্প নতুন, আর বাকী সাতটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে ছয়, সাত ও আট দশকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সম্ভার থেকে। 'যাত্রী', 'পিয়ারী সেতু', 'প্রেম প্রকৃতি', 'বন্দী সনাতন', 'মুখ', 'চেনা-অচেনা', সংহতির রচনা', বিপন্ন ঈশ্বর' গল্পগুলি সাম্প্রতিক কালের রচনা। 'জাগ্রত সীমান্ত', 'আমি ও আমার সংগ্রাম', 'অনধিকার প্রবেশ', 'নোঙর', 'অমাবস্যার জোয়ার', 'মৃত্যুর জন্ম', 'মা'-র গল্প' পড়ছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সাম্প্রতিক কালের লেখা হলেও 'যাত্রী' গল্প সংকলনের 'পিয়ারী সেতু', 'প্রেম প্রকৃতি' এবং 'জাগ্রত সীমান্ত' গল্প তিনটি একেবারে আনকোরা নতুন নয়। এর আগে তিনটি ভিন্ন প্রকাশনার সংকলন গ্রন্থে এদের দেখা গিয়েছে।

এই বিস্তৃত তালিকার বাইরেও ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থে সুবিমল রায়ের গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'পৌর্ণমী'র রজত জয়ন্তী বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৫-তে 'ত্রিপুরার গল্পকার চার থেকে আটের দশক নামীয় লেখায় প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে সুবিমল রায় তাঁর ছাত্রাবস্থায় এক লেখক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। "সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আনন্দময় রায়, অমল চক্রবর্তী, চিদানন্দ গোস্বামী, সুখময় ঘোষ প্রমুখ গল্পকার। এঁরা শিল্পী বাসর নামে একটি নতুন ধারার সূচনা করেন। তবে সে ধারার মধ্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না। 'কালিকলম' যুগের গল্পে যে হতাশা, অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা দেখা গিয়েছিল 'শিল্পী বাসর' তারই অনুবর্তন ঘটিয়েছে মাত্র।" 'শিল্পী - বাসর' -এর পরবর্তী গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। কিন্তু এই সংস্থার দুজন বিশিষ্ট গল্পকার, শ্রী সুখময় ঘোষ ও শ্রী সুবিমল রায়, সেই ছাত্রজীবনের দিনগুলি থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত লেখালেখির জগতে সক্রিয়ভাবে রয়েছেন। তাঁদের লেখায় কখনো 'কালি কলম' যুগের হতাশা অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতার অনুবর্তন হয়ে থাকলেও গল্পকারগণ সেখানেই আবদ্ধ থাকেন নি। জীবনের বিচিত্র রঙরূপকে তাঁরা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন গল্পে। সুবিমল রায়ের গল্পের জগতের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে সমকালীন সমাজ মানুষের দ্বিধা-যন্ত্রণা, প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তির বেদনা। আবার প্রেম ও প্রয়োজন, নারীপুরুষের সম্পর্কে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে তার পরিচয়ও রয়েছে বেশ কিছু গল্পে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রী। শ্রেণী বিভক্ত এই সমাজ শক্তির মাপকাঠিতে যারা দুর্বল, লেখকের সহানুভূতি তারা সহজেই পেয়েছে।

১৯৬১-তে লেখা 'সন্ধ্যাতারার আলো' গল্পটির উপজীব্য প্রেম। কিন্তু তাহলেও এটি তথাকথিত প্রেমের গল্প নয়। কলেজ জীবনে সন্ধ্যা অমিতাভকে ভালবেসেছিল। অমিতাভদের বাড়িও যেত সে। অমিতাভর মাকে ভাবী শাশুড়ী-স্থানে শ্রদ্ধা ভক্তি করতো, খুব ভাল লাগতো তার অমিতাভর মাকে। অমিতাভরা গরীব কিন্তু সন্ধ্যা তাদের মনের ঐশ্বর্য্যের খবর পেয়েছে। একসময় সন্ধ্যার বাবা-মা মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই একটি পরিবারের মেয়ের জন্য পাত্র স্থির করলেন তাঁরা। সন্ধ্যা এই অভাবিত ঘটনায় প্রথমে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আস্তে মনের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে সে দরিদ্র অমিতাভর বদলে নিশ্চিত সুখী জীবনযাপনের পথই বেছে নিল। বিয়ের কদিন আগে অমিতাভ সন্ধ্যাকে ডেকে এনে সন্ধ্যারই লেখা একতাড়া চিঠি ফিরিয়ে দিল তাকে।

এরপর কেটে গেছে এক এক করে তিনটি বছর। সন্ধ্যার বিবাহিত জীবন কাটছে মসৃণ গতিতে। কিন্তু তার জীবনের প্রথম প্রেমিক অমিতাভর সব খবরই তার কানে আসে, অথবা বলা যায় সব খবরই সে রাখে

এসব খবর আদৌ প্রীতিকর নয়। নম্র ভদ্র অমিতাভ'র চরিত্রে বড়রকমের পরিবর্তন এসেছে। ইদানীং অমিতাভ'র প্রিয় ব্যসন হল মিথ্যে প্রেমের নিপুণ ছলনায় একের পর এক নিষ্পাপ তরুণীকে আকর্ষণ করে কাছে এনে তারপর অবহেলায় দূরে ঠেলে দেওয়া। এরই মধ্যে অনাঘ্রাত কুসুমের মতো তিন তিনটি মেয়ে তার এই ছলনার শিকার হয়েছে। সম্প্রতি এই পর্বের চতুর্থ সংখ্যাটি হল মৃদুলা, অমিতাভ'র নকল ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সে, কিন্তু বিয়েতে তাকে রাজী করাতে পারে নি। মৃদুলা এভাবে ফুরিয়ে যেতে চায় না, তাই সে সন্ধ্যার সাহায্য চায়। সন্ধ্যা বুঝতে পারে, অমিতাভ তার প্রথম প্রেমের শোচনীয় ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেবার জন্যই স্বভাব বিরুদ্ধভাবে চরিত্রহীন লম্পট সেজেছে। এরজন্য সন্ধ্যাই দায়ী। তাই দীর্ঘ তিন বছর পর সন্ধ্যা আবার অমিতাভ'র কাছে ছুটে যায়। আকুলভাবে তাকে অনুরোধ করে এই আত্মহননের পথ থেকে ফিরে আসতে, একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে থিতু হতে। অমিতাভ সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করে, বিবাহিত জীবনে সন্ধ্যা সুখী কি না। এর উত্তরে সন্ধ্যা বলে - "যা পাওয়া যায়, বিয়ের পর মেয়েদের তাকে নিয়েই সুখী হতে হয়।" ছোট্ট এই উত্তরটুকুর মধ্যে রয়েছে অনেক না বলা কথা। জীবনকে দেখার এই ভঙ্গি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

অনেকটা এই ধারাতে লেখা 'ঈশ্বরের নবজন্ম' গল্পটি। প্রথম প্রেম, প্রথম বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলে স্বাতীকে অজয় কোনোদিন ক্ষমা করতে পারে নি। সে ঈশ্বরের কাছে বিচারের প্রত্যাশী হয়েছিল। কিন্তু স্বাতীর সুখের পেয়ালা ক্রমাগত ভরে উঠছে দেখে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে অজয় নিজেই প্রতিশোধে নামল। তার স্বাস্থ্য শিক্ষা-অর্থ-সুনাম-প্রতিষ্ঠার জোরে এক স্বেচ্ছাচারী ভোগী পুরুষ হয়ে উঠল সে। হঠাৎ জানা গেল স্বাতী বিধবা হয়েছে। অজয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া - ঈশ্বর দেরিতে হলেও সুবিচার করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কৃতকর্মের ফলভোগের আশংকায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে।

'মনচিত্র এবং অন্যান্য গল্প' সংকলনের বেশির ভাগ গল্পই বিবরণের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। ছোটগল্পের একমুখীনতা ও ব্যঞ্জনা এবং সর্বোপরি 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনে'র যে প্রত্যাশা পাঠকের থাকে, এক্ষেত্রে তা অধরাই থেকে যায়। তবু এরই মধ্যে 'যামিনীর ভাল থাকার শর্ত' 'জীবন বৃত্ত' এবং 'আঁধার পেরিয়ে' গল্প তিনটি উল্লেখযোগ্য। সমাজ থেকে বাতিল হয়ে 'পাগল' আখ্যাধারী যামিনী তার ফেলে আসা জীবনের সুখের দিনগুলির গল্প শোনায়, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণর মাকে নিয়ে গড়া তার ছোট্ট সংসার, কার্তিক অঘ্রাণ মাসে সারারাত জাল মারত সে আর বাজারে নেবার আগে বাছা বাছা মাছ তার বউ ঘরে রেখে দিত। "আমিও গাইতে পারতাম। সময় পেলেই দুজনে পালা গানের আসরে, তিন্নাথের মেলায় যোগ দিতাম, গানে গানে রাত কাবার হয়ে যেত। দেশে সবাই মিলে খুব ভালই ছিলাম বাবু।" ভায়রা ভাইয়ের চক্রান্তে যামিনী হারিয়েছে তার সংসার, তার পরিবার। পোষ্ট অফিস থেকে সে সংগ্রহ করছে তার বউছেলের কলকাতার ঠিকানা, এবার সে ভাল হয়ে তাদের কাছে চলে যাবে। পকেট থেকে যামিনী যখন তার স্ত্রী পুত্রের ঠিকানার কাগজটা বের করে আনে, দেখা যায় তা খবরের কাগজের এক টুকরো মাত্র। বেদনার বৃত্তটি এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি সমস্যার ওপর গড়ে উঠেছে 'সমতা' গল্পটি। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গ যখন পূর্ব পাকিস্থান হয়ে যায়, অগণিত মানুষ তখন বাস্তুভিটা ফেলে রেখে ঢুকে পড়ে ভারতবর্ষের সীমানার ভেতর। একটা বড় অংশের মানুষ ত্রিপুরায়ও আসে, গ্রহণ বর্জন, সংঘর্ষ সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে নতুন মাটিতে শেকড় গাড়ে সেই সব মানুষেরা। কিন্তু দুশ্চিন্তাহীন নূতন জীবন তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। তাই বাঁচার তাগিদে জাতিবর্ণের মিথ্যা অভিমানের খোলসটাকে দূরে ফেলে দিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে যে কোনো মূল্যে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে মানুষ। 'সমতা' গল্পের সুদীপের বাবা মা দেশবিভাগের পর আগরতলায় চলে এসেছিলেন, সুদীপের জন্ম এখানেই। এখানেই সে বড় হয়েছে, এবার বারো ক্লাশ পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের সহপাঠী বন্ধু বরুণ ইংরেজী তে সুদীপের চাইতে অনেক কম নম্বর পেয়েও অনার্স নিতে

পেরেছে কিন্তু সুদীপ সে সুযোগ পায় নি । কারণ সে 'ট্রাইবাল বা সিডিউল্ড কাস্ট' নয় ।

জ্ঞান হওয়া অবধি সুদীপ দেখে আসছে তার মা লোকের বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝি-য়ের কাজ করে কতো কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন । সে ভাবে কলেজে না পড়ে কোনো একটা চাকুরি নিয়ে সংসার চালাতে মাকে সাহায্য করবে সে । কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েওছে সে । কিন্তু ইন্টারভিউর ভালো হলেও চাকরি হয় নি । কারণ 'উচ্চবর্ণের প্রার্থীকে চাকুরী দেবার মতো বেশি পোষ্ট এখন নেই ।' এরপর কিছু অংশ গল্পকারের ভাষাতেই বলা যাক্ ...... ''সুদীপ ভাবে, চক্রবর্তী টাইটেলটাই তার সর্বনাশ করছে । তা না হলে নিম্নবর্ণের লোক হওয়ার মতো সব গুণই তার আছে । সে খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, দরিদ্র দাসীপুত্র কি নেই তার ? কিন্তু চক্রবর্তী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের সব সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত । উপাধিটা গোপন করে সে নিম্নবর্ণের হয়ে যাবে । টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করবে ।'' আজকের ত্রিপুরার যুবসমাজের একটা বড়ো অংশই সুদীপের এই মানসিকতার শরিক, একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই । তবে গল্পকার এখানেই থেমে যাননি । কলেজের ঘন্টা থেকে সুদীপ বুঝতে পারে পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাশ হচ্ছে এখন । ভারতের সংবিধানে দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকারে বিষয়টি অধ্যাপকমশাই বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তীব্র বিতৃষ্ণায় সুদীপ বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে । হঠাৎ মনে পড়ে যায় ছোটবেলার বন্ধু রাজুর কথা । জাতিতে সে মুচি, একটু বড় হতে৷ বাবার বৃত্তিতে ঢুকে পড়েছিল । এখন বাবার মৃত্যুর পর সে-ই দোকানের মালিক । ব্যবসা ভালই চলছে তার । সুদীপকে সে প্রয়োজনে সবরকম সাহায্য দেবার আশ্বাস দিয়ে রেখেছে । সুদীপ তখনি মনস্থির করে ফেলে, বাড়ি গিয়ে মার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে রাজুর দোকানেই সে কাজে লেগে যাবে ।

এই বেঁচে থাকার সংগ্রামী মানসিকতার ছবি রয়েছে 'জীবন বৃত্ত' গল্পে : এক যুবক একটি বৃত্তাকার চত্বরে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করছে একটা সাইকেল নিয়ে । অবিরত সাইকেল চালনায় বিশ্বরেকর্ড করবার লক্ষ্যে তার এই প্রয়াস, উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি উৎসাহী দর্শকেরও অভাব নেই । কিন্তু ঘটনার নায়ক ছেলেটির চেহারায় সর্বাঙ্গে দারিদ্রের ছাপ, ছেঁড়া ময়লা জামায় কিছু টাকার নোট ঝুলানো থাকলেও এগুলি তার দুরবস্থাকে ঢাকতে পারেনি । অপুষ্টিতে দুর্বল শরীরে শুধু সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে আনুমিক চেষ্টায় সাইকেল চালিয়ে যেতে থাকে । এমন কি এখন থেমে না গেলে তার সমূহ বিপদ হতে পারে, ডাক্তারের এই সতর্কবাণীও অগ্রাহ্য করে সে । এরই পাশাপাশি রয়েছে প্রায় ওরই মতো আরেকটি ছেলে রমেন । চানাচুর বেচে সে রাস্তায় এবং পাড়ায় ঘুরে ঘুরে । এখানে এই জমায়েত তার ভালোই বিক্রি হচ্ছে । 'আসেন, চানাচুর খাইতে খাইতে সাইকেল খেলা দেখেন' - এই চীৎকার দিয়ে আর টিন বাজিয়ে অনেক দর্শককেই খদ্দের পাচ্ছে সে । স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তার আর সাইকেল চালাতে নিষেধ করেছেন শুনে কিছুক্ষণের জন্য চানাচুরওয়ালা রমেন বিষন্ন হয়ে পড়ে । লোকজনের কথাবার্তার মাঝখানে অযাচিতভাবেই নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, 'এখন থামনের অর্থ হয় না । আমি হইলে মরলেও থামতাম না । একটা বিশ্বরেকর্ড .... '' একটু পরেই সমবেত দর্শকের হাততালির মধ্যে থেকে যখন সাইকেলে রেস চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেওয়া হয় তখন রমেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে .. 'এই সুযোগেই তো দুই-চাইরটা পয়সা পাইতাছি । কি কন ?'' - একজন যখন জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করছে, তখন আরেকজন সেখানে সহজে কিছু মুনাফা করে নিতে ব্যস্ত

'আঁধার পেরিয়ে' গল্পের বিষয়ে. বৈচিত্র রয়েছে । নবীনের মা মারা গেলে দামী লাল পাড় ধনেখালি শাড়িতে আর রক্তিম সিঁদুরে সাজিয়ে তাকে শ্মশানে আনা হল । নবীনের বাবার মনে পড়ছিল অজস্র সুখের দিনের স্মৃতি । খেতে পরতে এবং পরিপাটি করে বাঁচতে ভালবাসেন তাঁর দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনী, যিনি এখন সব ফেলে রেখে চিতার ধোঁয়ায় বিলীন হয়ে গেলেন মহাশূণ্যে । ওদিকে চিতার পাশে মৃতার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র নিয়ে মৃদু উত্তেজনা প্রায় ধ্বস্তাধস্তিতে পৌছে গেছে । একটি বৃদ্ধা, এক তরুণী এবং এক বালিকা - তিনজনই

সেই সুন্দর ধনেখালি শাড়িটার দাবিদার । "বাবু শাড়ীডা আমার পছন্দ হইছে । আমি আগে ধরছি । সখ কইরা পরুম মনে কইরা । তারা ছাড়ে না । একটু কইয়া দেন না । আপনি কইলেই দিয়া দিব ।" যুবতীর এই কাতর মিনতির মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে স্ত্রীর বলা একটা কথা "সুন্দর শাড়ি দেখলেই আমার পরতে ইচ্ছে হয় । ইচ্ছে করে সব সুন্দর শাড়ি কিনে নিই ।" মেয়েটিকে ধমকে দিল সবাই । তাঁরা সব জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, একথা বলে তিনি কাদা মাখা শাড়িটা নদীতে যত্ন করে ধুয়ে এনে ঘাসে টান টান করে শুকোতে দিলেন । তারপর তুলে যত্ন করে ভাঁজ করে নিলেন । কানে বাজছিল মেয়েটার একটু আগে বলা কথাগুলো - "আমারে ইডা দেন । আমি পইরা বেড়ামু । নষ্ট করুম না, বেচুম না ।"

ততক্ষণে সব শেষ করে শ্মশান যাত্রীরা ফিরতে প্রস্তুত নবীনের বাবা চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা ও বালিকা চলে গেলও যুবতী মেয়েটি পঞ্চবটীর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে । তাকে হাত তুলে ডেকে এনে শাড়িটা তুলে দিলেন হাতে । মৃদুকণ্ঠে বললেন 'পরিস । যত্ন করে রাখিস ।' আরো কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ব্যথায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল ।

দেশভাগের ফলে বা দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে যেসব মানুষ ত্রিপুরায় এসেছেন, ত্রিপুরার নতুন ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করেছেন, তাদের কথা নিয়ে প্রায় সব গল্পকারই গল্প লিখেছেন । কিন্তু ত্রিপুরায় থাকলেও অতিমাত্রায় হিসেবী, সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ, পা বাড়িয়েই রেখেছে, সুযোগ আসা মাত্র চলে যাবে এ রাজ্য ছেড়ে । সুবিমল রায়ের সন্ধানী চোখ তাদেরেও ধরে এনেছে 'মরা গাঙ' গল্পে । অধ্যাপক স্বামীর স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা সুতপা দেবী তার সাদামাটা স্বামীটিকে নানাভাবে তালিম দিয়ে রাখেন, যাতে তিনি সময়ের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন । ছেলে ত্রিপুরার বাইরে কলেজ পড়ছে । কলেজ ছুটি হয়ে গেলে সে যেন আগরতলায় না এসে কোলকাতায় নিজেদের ফ্ল্যাট-এ থাকে, এ কথা জানিয়ে ছেলেকে চিঠি লিখতে বলে দেন সুতপা স্বামীকে । কেন না প্রদ্যোত আগরতলা এলে কখন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে বলা যায় না। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে ত্রিপুরার মানুষের নতুন মেরুকরণ হয়েছে । দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা জাতি উপজাতির বদলে এখন বলা হচ্ছে উপজাতি অনুপজাতি । তাদের ছেলে প্রদ্যোতের এই নতুন নামকরণ একেবারেই পছন্দ নয় । এর উল্লেখ মাত্রই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে । তাই সবদিক ভেবে মা চান না যে ছেলে বাড়ি আসুক । কোলকাতার ফ্ল্যাটে একা থাকলেও সেটা অনেক নিরাপদ ।

বিকেলবেলা শহরে জাতি উপজাতির শান্তি সম্প্রীতির ব্যাপারে মিটিং আছে, স্বয়ং মন্ত্রী মিটিং ডেকেছেন। অতএব যেতেই হবে, মনে করিয়ে দিলেন সুতপা । আশ্চর্য' প্রদীপবাবুর সত্যিই মনে ছিল না । মিটিং ও অধ্যাপককে কিছু বলতে হলে তিনি যেন চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন, মন্ত্রী যে লাইনে বক্তব্য রাখবেন তিনিও যেন সেই পথ ধরেই যান, একথাও বুঝিয়ে দিলেন সুতপা । স্ত্রীর এই অতিসতর্কতা আর খবরদারীতে ভেতরে ভেতরে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও সে ভাব চেপে রেখে মৃদু হাসলেন প্রদীপবাবু । আর তখনই তাঁর 'গৃহিনী সচিব সখী' ধর্মপত্নী জানিয়ে দিলেন সার কথাটি - "হাসির কথা নয়, ত্রিপুরা কার জায়গা, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কি লাভ । আমরা তো আর এখানে থাকছি না' । প্রদ্যোৎ ডাক্তারী পাশ করলে কলকাতাতেই কাজ করবে । তোমার চাকুরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । তোমার পেনশান হলে, আমিও পেনশান নিয়ে আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে চলে যাব । ত্রিপুরার সাথে আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়ে যাবে " একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন তিনি । তবু একথার উত্তরে প্রদীপবাবুর স্ত্রীর দিকে তাকালেন ব্যথিত দৃষ্টিতে তাঁর বুকের ভেতরেও যে ব্যথা তোলপাড় করছে তা বুঝতে পাঠকের কষ্ট হয় না । সুতপা দেবী যেমন এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি, এর বিপরীতে তেমনি রয়েছেন প্রদীপবাবু

গল্পটিতে আরো একটা ছোট্ট কাহিনী রয়েছে । সুতপাদের কাজের মেয়ে মিনতি আর তার বারো বছরের ছেলে কবীর । বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার সময় বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড গন্ডগোল হয়েছিল, তাতে বিধবা যুবতী মিনতি একমাত্র সন্তানকে নিয়ে জঙ্গল পথে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল । এক ধর্মভাই-এর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে । বড় সাধ, ছেলেটাকে স্কুলে পড়াবে, এরজন্য এদেশী সার্টিফিকেট চাই একটা । সুতপা দিদিমনিকে এজন্য বহুদিন অনুরোধ করেছে মিনতি । প্রদীপবাবু একদিন কবীরকে বলেছিলেন যে ওরা দেশে থাকলেই ভাল হত । সে পড়াশোনা করতে পাবত । কবীব অসহায়েব মত বলে "ওরাত কয় ইন্দুস্তানই আমাদের দেশ । আচ্ছা স্যার কোনটা আমাদেবে দেশ ?" ঠিক এমন সময় কবীরের মা ঘব ঝাঁট দিতে এল । ছেলেব প্রশ্নেব উত্তের সে-ই বলে "আমাগো কোন দেশ নাই । এখানকাব বাঙালীরও কোন দেশ নাই । সুবলদা-ই কইল হাজার হাজার বাঙালী এ ডি সি এলাকা থেইক্যা বাড়ী ঘর ছাইবা পলাইয়া আইতাছে । যে যেখানে পারে আশ্রয় লইতাছে । আমাদের মত এই সব লোকেরও অখন কোন দেশ নাই ।

কবীর তার মাকে প্রশ্ন কবল, আচ্ছা মা, তুমি যে কইছিলা আমাব দাদু দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিছে, হিডা কোন দেশ ?" - কিশোর কবীবেব এই সরল প্রশ্ন সারাটা দিন প্রদীপবাবুর মনের ভেতব ঘুবপাক খেতে থাকে । এর উত্তর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েন প্রবীণ অধ্যাপক । এই একটি গল্পের আয়নায় ধরা পড়েছে ত্রিপুরার মানুষের সম্যাসাদীর্ণ জীবনেব নানা দিক ।

গল্পকার সুবিমল রায়ের গল্পভাণ্ডারে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ' অভিধার দাবীদার 'বিচার' গল্পটি তার ছোট্ট আয়তনে ধরে রেখেছে এক বিশাল সমস্যা আর সেই সঙ্গে এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন । ধীবাজবাবু আর শিবানীদেব একমাত্র মেয়ে জয়াব শবশুর বাড়িতে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ বছব আগে । অভাবিত সেই ঘটনায় প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল । পাড়া প্রতিবেশীরা ভিড় করে এসেছিল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে । মহিলা সমিতি বধূহত্যার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে জয়াব বাবা-মাকে আদালতের শরণাপন্ন হতে উৎসাহ দিয়েছিল । জয়ার এক সহপাঠী মামলা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিল । অথচ পাঁচবছর ধরে মামলা চালিয়ে প্রায় নিঃস্ব এই বৃদ্ধ দম্পতির পাশে আব কেউ নেই আজ । শুভানুধ্যায়ী তাৎক্ষণিক উৎসাহে অল্প দিনেই ভাঁটা পড়েছিল । মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছে । সাক্ষীসাবুদ যাবা ছিল তাবাও মত এবং শিবিব বদল করছে । পাল্লা ভাবি ছেলের পক্ষেই ।

এদিকে দফায় দফায় গত পাঁচ বছরে পেনসনের প্রায় লাখখানেক টাকাব সবটাই ঢালতে হয়েছে এই মামলার পেছনে । উকিল বাবু মামলাটি বাগে আনবার নাম করে অজস্র টাকা নিয়েছেন । কিন্তু ফল কিছু বুঝা যায়নি । ইদানীং উকিলবাবুব উৎসাহ কমে এসেছে । মক্কেলেব সঙ্গে দেখা করেন না পর্যন্ত, শুধু টাকাব খামটা জুনিয়রদের কাছে দিয়ে দেবার নির্দেশ দেন । মামলা আরেক দফা আদালতে উঠবে, এই মর্মে চিঠি এলে ধীরাজবাবু সেটি ফাইলে জায়গা মতো সাজিয়ে রাখতে চান । যাতে আইনের বিচার যে সত্যি রয়েছে, এব একটা প্রমাণ থেকে যায় । ফাইল খুলতেই বেরিয়ে এল মেয়ের লেখা শেষ চিঠিটি, সবকিছুর ওপরেই ছিল সেটা - "বাবা, আমি আর পারছিনা । ওরা আমায় নরক যন্ত্রণা দিচ্ছে । তুমি আমাকে নিয়ে যাও । আমি এখানে আর থাকব না । আমি তোমার আর মার কাছে থাকব । আমাকে বাঁচাও বাবা .... ।"

চিঠিখানা পড়তে পড়তেই অসহ্য মাথাব যন্ত্রণায় ইজিচেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন ধীরাজবাবু । 'আমি আসছি মা, ভয় পেয়োনা, আমি তোমায় নিয়ে যাব', বলতে বলতেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি । আবো মাস দুয়েক পরে মামলার ব্যাপারে আরেকখানা চিঠি এলো শিবানীদেবী নিজেই তার উত্তব দিলেন । বাংলা ভাষাতেই লিখলেন তিনি -

মহামান্য আদালত, তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমার কন্যা জয়া হতাশা জনিত কারণে আত্মহত্যা করেছিল। জয়ার স্বামী এবং শাশুড়ী জয়াকে খুন করেছে বলে আদালতের কাছে যে নালিশ আমরা করেছিলাম তা সর্বৈব মিথ্যা এই অপরাধের জন্য আদালত আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা-ই মাথা পেতে নেব। এই চিঠির মাধ্যমে আমি মামলাটি প্রত্যাহারের আর্জিও মহামান্য আদালতের কাছে পেশ করছি।

পরম শ্রদ্ধাসহ

বিনীতা

শিবানী চৌধুরী

মৃত জয়ার হতভাগিনী মা।''

এই কাহিনীর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হয় না সার্থক ছোটগল্পে যে বা উদ্যত অঙ্গুলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এখানে তার উপস্থিতি পাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারবেন।

সুবিমল রায়ের গল্পে সমাজের সমস্যার নানাদিক প্রাধান্য পেয়েছে। 'ন্যায়-অন্যায়' গল্পে অর্থলোভী ডাক্তারের বিপরীতে রয়েছে গরীব ব্রাহ্মণ ডাক্তার পুরো ফি নগদে না পেলে মরনাপন্ন রোগীর আত্মীয়কে অনায়াসে ফিরিয়ে দেয়। আর চালচুলোহীন বৃদ্ধব্রাহ্মণ বাঁধা পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে দায় উদ্ধার করে দেবার জন্য শ্মশানক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেও একটা টাকাও নিলেন না। কেননা এ টাকা তাঁর প্রাপ্য নয়। জাতি উপজাতি পরস্পরের সন্দেহ সংশয় ঈর্ষা আর সম্প্রীতির কথা রয়েছে 'বসতি' এবং 'উপনিবেশ' গল্পে। 'ভাঁটার টান' গল্পে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে সদ্য আগরতলায় ফেরা তমাল আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণ হেলায় ফেলে ছড়িয়ে রেখে অরণ্যের আদিম বন্যতায় জীবনকে নতুন ভাবে পেতে চায়। 'আত্মজ' গল্প সংকলনের নাম গল্পটি গ্রন্থের নবম গল্প। দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী বিজনবাবুর তিনটি ছেলে মেয়ে, সকলেই শিক্ষিত হলেও কেউ চাকুরি পায় নি। বড় ছেলে অমিত এম এ পাশ করে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছে। কিন্তু সেসব চাকরি গেছে অনেক কম মেধা সম্পন্ন এস সি কোটার প্রার্থীদের কারো কারো ভাগে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর হতাশায় প্রাণবন্ত ছেলেটি এখন চূড়ান্ত রকম অসুস্থ নির্বাচন এসে গেছে, তাই ঘরোয়া মিটিংএ তৎপর বিজনবাবু মেজছেলের কাছ থেকে জানতে পারেন সে ভাজপা দলে নাম লিখিয়েছে। বোন সবিতাকে বারবার পার্টির কিছু ছেলে রাস্তায় জ্বালাতন করে, একথা শুনে আদর্শবাদী বাবা গর্জন করে উঠেন 'ওগুলো নিশ্চয়ই কংগ্রেসী গুন্ডা।' কিন্তু অজিত শান্তভাবে জানায়, 'এরা পাড়ার ক্লাবের এবং ক্লাবটা আপাততঃ তোমাদের পার্টির হাতে।' অজিত দিদির লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ক্লাবের সেক্রেটারীকে ধমকে এসেছে। আর এরই ফলে খয়েরপুর ভাজপার মিটিং সেরে বাড়ি ফেরবার সময় কে বা কারা অজিতকে নৃশংসভাবে মারধোর করে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রেখে দেয়। মিটিং এ জনসংযোগ সুন্দরমতো সেরে খুশি মনে বাড়ি ফিরছিলেন বিজনবাবু। এমন সময় ক্লাবের একটি ছেলে নীচু গলায় খবরটি শোনাল তাকে। ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই এগিয়ে গেল খবর শিকারী পত্রিকা প্রতিনিধি। 'আপনার ছেলে অজিতকে সিপিএম এর কিছু গুন্ডা খুন করার চেষ্টা করেছিল'' এই পর্যন্ত শুনেই বিভ্রান্ত বিজনবাবু চীৎকার করে উঠলেন, 'অজিতকে সি পি এম এর গুন্ডারা মারবে কেন? সি পি এম গুন্ডা পোষে না'' কথা বলতে বলতেই বিজনবাবু সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সাংবাদিক এবং ক্লাবের ছেলেরা বিজনবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।'' সাহিত্য সমাজের দর্পণ, বহুশ্রুত এই বাক্যটি মনে পড়ে যায় এই গল্পটি পড়তে পড়তে। ত্রিপুরার সমাজ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বাতাবরণের চিত্রও গল্পকারগণ তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায় শিল্পীর দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে চলেছেন যে সাহিত্য কর্মীরা এই গল্পকার তাঁদের অন্যতম।

সুবিমল রায়ের এ পর্যন্ত শেষতম সংকলন গ্রন্থ 'যাত্রী'র নাম গল্পটিই গ্রন্থের প্রথম গল্প। একটি জীপ গাড়িতে যত জন বসবার কথা তার চাইতে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে প্রতিটি গাড়ি যাতায়াত করে। সেদিনও এভাবেই যাচ্ছিল, ভেতরে আর মাছি গলবারও জায়গা নেই। জিপের পেছনের লোহার পাটাতনেও যাত্রী দাঁড়িয়ে এবং সহকারী গাড়ির ছাদের ওপর। সকলেই সমান ভাড়া দিয়েই যাবে। তবু মুখচেনা সম্ভ্রান্ত যাত্রীকে বসবার জন্য অচেনা ছা পোষা গরীব যাত্রীকে গাড়ির সিট থেকে নামিয়ে দেয় ড্রাইভার। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছেন নেতাবাবু। ড্রাইভার বিনীতভাবে গাড়ির ভাড়া বাড়াবার প্রসঙ্গ তুলতে তিনি জানালেন 'আমরা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতাছি। শীগগিরই সব মিট্যা যাইব।' এমন সময় দ্রুতবেগে পুলিশের গাড়ি এসে পথ আটকায়। অতিরিক্ত যাত্রী নেবার অভিযোগে আদালতে যাবেন বলে অফিসার সাক্ষী খোঁজেন কিন্তু গাড়ির প্রায় সব যাত্রীই সত্য মিথ্যা নানা অজুহাত দিয়ে নিজেদের অসুবিধার কথা জানায়। যে সাদাসিদে উপজাতি যুবকটি গাড়ির সামনের সিট থেকে সরিয়ে দিয়ে নেতাকে বসতে দিয়েছিল ড্রাইভার, গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে যাওয়া সেই ছেলেটিকে পুলিশ ভয় দেখাল - নাম ঠিকানা সব দিয়ে সাক্ষী না হলে পুলিশ উগ্রপন্থী বলে ধরে চালান করে দেবে। সব খবর খাতায় টুকে পুলিশ চলে গেলে একে একে সবাই যখন মিথ্যে তথ্য দিয়ে কিভাবে পুলিশকে ঠকিয়েছে সে সব কথা বলে হাসাহাসি করছিল, তখন ড্রাইভারের প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি কুণ্ঠিত ভাবে বলে, নাম জিগাইলে তো নিজের নামই কইতে হয়। মানুষ কি পরের নাম কয়?' সহজ সরল এই উত্তরটি সকলের হাসিখুশিকে চাপা দিয়ে দিল যেন। আর ড্রাইভার এই আকস্মিক উৎপাতে প্রচন্ড রেগে গিয়ে যুবকটিকে গাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে রেখে দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সিমনার পথে জায়গাটি বেশ নির্জন। ধারে কাছে কোনো লোকালয় নেই। ড্রাইভার অবশ্য তার কাছ থেকে ভাড়া নেয়নি। আর পরের গাড়িতে আসতে বলে গেছে। তাই 'যুবকটি নির্জন রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে রইল। যাত্রী বোঝাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ঘন কালো বিষাক্ত ধোঁয়া প্রায় ঢেকে দিল ভেদি যুবকটিকে।' সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধানী মানুষজনের ভিড়ে সত্য আজকাল এমন একাকী নির্জনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

সুমন্ত রিয়াং আর সনাতন সরকার দীর্ঘদিনের একান্ত চেষ্টায় বিষ্ণুছড়ার ওপর একটা বাঁশের সাঁকো তৈরি করেছিল, একসময় তা শক্ত কাঠের সেতু হয়ে যায়। ভালবেসে তারা এর নাম দিয়েছিল পিয়ারী সেতু এই সেতু পারাপার করে রায়ত্রিঘর গ্রামের সনাতন সরকাররা এবং রামচৌধুরী পাড়ার সুমন্ত রিয়াংরা। জঙ্গলে এবং সমতলে আসা যাওয়া করে। এই পিয়ারী সেতু শুধু তাদের জীবনযাত্রা সহজ করে দিয়েছে তা নয়, পাহাড় আর সমতলের মানুষের হৃদয়কেও যুক্ত করেছে এই সেতু। তাই পিয়ারী সেতু দু'তরফের কাছেই বড় প্রিয়, বড় গর্বের ধন। কিন্তু তাদের সে আনন্দ আর শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলনা। এক রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল পিয়ারী সেতু। সনাতন আর সুমন্ত কোনওরকমে সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেও তাদের স্বজনেরা যেতে দিলনা - "পিয়ারী সেতু এখন নিরাপদ নয়। নীচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সমতল এবং পাহাড়কে ভাগ করে রাখা বিষ্ণুছড়ায় এখন দুরন্ত স্রোত।" এমনি করেই পাহাড় সমতলের সাধারণ মানুষজনের মিলন সেতু গুঁড়িয়ে দেয় বারবার বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ।

এই নিবন্ধে আলোচিত শেষ গল্পটির নাম "মা'র গল্প"। 'যাত্রী' সংকলন গ্রন্থের শেষ গল্প এটি। আর প্রকাশকের দেওয়া তথ্যে জানা যায় এই গল্পটি লেখকের কলেজ জীবনে লেখা। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'তে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচীর সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলনে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'মা'র গল্প' একটি গল্পের ভেতর গল্প। ছোট্ট একটি পরিবারের কাহিনী। বাবা মা আর দুই ছেলে। বাবা প্রচন্ড বদমেজাজী, ভীষণ রাগী, নাস্তিবাগীশ মানুষ। বড় ছেলে মানব পড়াশোনায় অবহেলা করে বি এ পরীক্ষায় ফেল করলে বাবা আর তার পড়ার খরচ দেবেন না বলে দিয়েছেন। মায়ের খুব ইচ্ছা মানব আবার পড়ুক, পাশ করুক, কিন্তু

মেজাজী স্বামীর রাগকে ভয় পাননি তিনি। অশান্তি বাড়বে ভয়ে চুপ করে কষ্ট সহ্য করেন। তবু একদিন বহুকষ্টে বহু অপমান সহ্য করে স্বামীকে রাজী করালেন তিনি। মানব আবার ভর্তি হল, পড়াশোনায় মন দিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগের মতোই বারমুখো হয়ে পড়ল সে। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। ওদিকে তার বাবা আগেই স্ত্রীকে শাসিয়ে রেখেছেন মানব এবার পাশ না করলে মা-ছেলে দুজনকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। ছেলেও কথা শোনে না, উভয় সংকটে মানবের মা দিশেহারা হয়ে পড়েন। এমন অবস্থায় এক প্রতিবেশিনী দশটা টাকা ধার নিতে এসে জানিয়ে গেলেন তাঁর ছেলে বলেছে মানব রাত জেগে 'ফ্ল্যাশ' খেলে জুয়ার আড্ডায়। মা'র ছোট্ট জগতে, আশার বাসায় মুহূর্তে যেন ভূমিকম্প হয়ে যায়। সে রাতে স্বামী পুত্র যখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায়, তখন হতভাগা মা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। স্বামী পুত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলো না তাকে।

গল্পে শেষ লাইনে একটি ছোট্ট খবর আছে যে বাবার অনুরোধে, মায়ের আত্মার শান্তির জন্য, মানব বি এ পাশ করেছিল। তবে পাঠকের কাছে গল্পটি মায়ের আত্মহত্যার সঙ্গেই পূর্ণতা পেয়ে যায়

পাঁচের দশকে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে গল্প তখনো প্রায় নতুন আগন্তুক। সেই সময় কুড়ি বছর বয়সী কলেজ ছাত্রর লেখা এই গল্প রীতিমতো প্রত্যাশা জাগায়। পরবর্তী পর্যায়ে, বহমান সময়ের গতির সঙ্গে মিল রেখে সুবিমল রায় আরো অনেক গল্প লিখেছেন, লিখছেন। তবু এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রথম এই গল্পটি তাঁর গল্প সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ত্রিপুরায় বাংলা গল্পের ইতিহাস কালগত বিচারে তেমন পুরনো না হলেও সৃজন বৈচিত্র কালের বুকে নিজস্ব অভিজ্ঞান চিহ্নিত করে দিতে সক্ষম হয়েছে, একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় সাহিত্যের রাজপথে গল্পের এই গরিত যাত্রার সূচনায় যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদেরই দু'চার জনের রচনাদির সামন্য প্রচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। মুখ্যত০ পঞ্চাশের কথাকার রূপেই এঁদের গ্রহণ করা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবি, বাস্তবজগতে এবং সাহিত্যজগতে। বিমল চৌধুরী, যিনি ভগীরথের মতোই ত্রিপুরার মাটিতে নিয়ে এসেছিলেন গল্পগঙ্গার ধারা, প্রয়াত হয়েছেন। অন্যরা এখনো লিখছেন, লিখে চলেছেন। সূচনাকাল থেকে তাদের সাম্প্রতিক লেখালেখি পর্যন্ত আলোচনায় আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য হয়তো অপ্রতুল নয়, তবে সংগ্রহ করা কিছু শর্তসাপেক্ষ। সেজন্য কখনো কখনো আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়েছে গল্পসাহিত্যে প্রথম পর্বের লেখকগণ প্রতিষ্ঠিত হতে হতেই এসে গেছে ষাটের দশক। যে সময় একঝাঁক তরুণ লেখক এসে গল্পের জগতকে বহুদূর বিস্তৃত ও গভীর সঞ্চারী করে দিয়েছেন। প্রথম পর্বের গল্পকারদের লেখায় বিষয়ে বৈচিত্র রয়েছে, কিন্তু আঙ্গিক বা প্রকরণের ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো রকম সাহসী পরীক্ষা নিরীক্ষায় অগ্রসর না হয়ে প্রচলিত রীতিকেই গ্রহণ করেছেন একথা বলা যায়, ভালোয় মন্দ মিশিয়ে এই পর্বের লেখকবৃন্দ তাঁদের লেখায় এ রাজ্যের মানুষের আশা-নিরাশা, সংশয়-সংকট, যন্ত্রণা আর ভালোলাগাকে রূপায়িত করতে সফল হয়েছেন।

।।২।।

ষাটের দশকে ত্রিপুরার গল্প জগতে এলেন একদল লেখক, যাঁদের হাতে ছিল ছোটগল্পকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষা বিন্যাসে, নতুন অবয়ব দেবার উপযুক্ত আয়ুধ। রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার দীর্ঘলালিত শান্তির বাতাবরণ উনিশশো সাতচল্লিশেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের মূল্যে অর্জিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তরালে ছিল যে হলাহল, ছোট্ট স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরাকে সেই বিষ অনেকখানিই গ্রহণ করতে হয়েছে নিঃশব্দে। ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্রে না থেকেও দেশভাগ স্বাধীনতা দাঙ্গার পরিণতিতে ত্রিপুরায় নামলো উদ্বাস্তু মানুষের ঢল। জনসমুদ্রে কল্লোলিনী ত্রিপুরার মহারাজা উদার হৃদয় বীরবিক্রম, সাধ্যের সীমা অতিক্রম করেও আশ্রয় দিলেন দুর্গত নিঃস্ব অগণিত পূর্ববঙ্গবাসীকে। এই অভাবিত ঘটনাটি ত্রিপুরার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব

বিস্তার করলো। ত্রিপুরার জনসমষ্টি ভাগ হয়ে গেলো উপজাতি আর উদ্বাস্তু — এই দুই অভিধার। মেরুকরণের এই প্রক্রিয়ায় অস্থির উত্তাল সময়ের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সেই সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক লাভালাভের গোপন অংক। পঞ্চাশের দশকের লেখকদের মতোই এই সময়ের গল্পকারগণও পটভূমি পেয়েছেন সেই অস্থির ত্রিপুরা।

এই জটিল জীবনযন্ত্রণা ছোটগল্পের শিল্প স্বভাবে নিয়ে এলো লক্ষণীয় পরিবর্তন। শুধু গল্প বা কাহিনী কখন নয় জীবনকে তার আপন স্বরূপ প্রতিষ্ঠা দেবার অনেকখানি দায় স্বীকার করে নিলেন এই সময়ের গল্পকারগণ। বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের পারিপাট্যে আর অনুভবের গাঢ়তায় সমৃদ্ধ কিছু গল্প স্থানীয় পরিচিতির সীমানা ছাড়িয়ে, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ভুবনে জায়গা করে নিতে শুরু করেছে এই সময় থেকেই। প্রান্তিক এই রাজ্যের তৎকালীন নানা সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে ষাটের দশকের গল্পকারদের এই প্রাপ্তি মহার্ঘ বলেই স্বীকার করে নিতে হবে

১৯৬৩ সালে লেখকদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'গান্ধার' পত্রিকা। ত্রিপুরার ছোটগল্পের বিকাশে এই 'গান্ধার' এবং সমধর্মী 'হাল' পত্রিকা দুটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর ছিল 'প্রাচী', মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের মুখপত্র, যার হাত ধরে উঠে এসেছেন বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় তরুণ গল্পকার, যাঁদের কেউ ছাত্র কেউ বা অধ্যাপক। ষাটের দশকের বিভিন্ন সময়ে যে সব লেখক লেখার জগতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই পরবর্তী দুই, তিন বা আরও বেশী দশক জুড়ে সৃষ্টি জগতে সক্রিয় রয়েছেন। এঁদের অনেকেই বর্তমানে প্রয়াত, তবুও নিজের নিজের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে এঁরা প্রবলভাবে বেঁচে রয়েছেন।

বিতর্কহীনভাবেই এই পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য। পিতৃ দত্ত 'অমিয়' নাম বদলিয়ে তিনি হয়েছিলেন ভীষ্মদেব। আর সেই মহারথী ভীষ্মের মতোই বহু ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে ত্রিপুরার গল্প জগৎকে তিনি আগলে রেখেছিলেন দীর্ঘকাল। ভীষ্মদেব 'অগরুগন্ধা' নামের একটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ ও লিখেছিলেন। কিন্তু ছোট গল্পই ছিল তার প্রতিভার স্বক্ষেত্র। গল্পকার রূপেই তার প্রথম ও প্রধান পরিচয়। ভীষ্মদেব লেখালেখি শুরু করেছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। বাংলা কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর লেখকদের রচনা তিনি গভীর আগ্রহে পড়তেন। পাঠ্য তালিকায় অপরিহার্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সেই সঙ্গে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতকীর্তি গদ্য শিল্পীগণ। বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গেও কম বেশি পরিচিত ছিলেন ভীষ্মদেব। বহু পঠনের এই গুণ তার মন ও মননকে সমৃদ্ধ করেছে। আর প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চারপাশের মানুষের সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়া, লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে উঠেছে তাঁর সমাজ ভাবনা ও জীবনবোধ।

ভীষ্মদেবের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বুড়া দেবতার মাচাং' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এর প্রায় একদশক পর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সমিধ,' ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'নির্বাচিত ভীষ্মদেব' নামের সংকলন গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও আরো বহুগল্প নানা পত্রপত্রিকায়, সাহিত্য সাময়িকীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন ভীষ্মদেব। জুমিয়া উপজাতি, বন কেটে বসত করা উদ্বাস্তু, মহাজনী শোষণে নিঃস্ব মানুষ, দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের সিঙ্গল টিচার্স স্কুলের শিক্ষক, শহরের বেকার যুবক, রোজগার প্রত্যাশায় মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে শীর্ষাসনকারী সাধু, ধর্মের নামে প্রতারণার ব্যবসায়ী ভণ্ড, চায়ের দোকানের বয়, অবহেলিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, স্মৃতি ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত মানুষ, শ্মশানের ডোম — এরা সকলেই ভীষ্মদেবের গল্প জগতের বাসিন্দা। এদের নিস্তরঙ্গ অবহেলিত জীবন, গভীর মমতায় তিনি গল্পে তুলে এনেছেন।

১৯৬৮ সালে লেখা 'ঠিকানার সন্ধানে' গল্পের অবিনাশ, তার 'দিনগত পাপক্ষয়ের' জীবন যাপনের মধ্যে হঠাৎ জানতে পারে, তার এককালের সহপাঠী বন্ধু অরুণ, হাসপাতালে মারা যাবার আগে, অবিনাশেরই সহকর্মী বিনয়কে বলেছিল, পুরনো বইপত্র ঘেঁটে সে একটা পাহাড়ের খবর জেনেছে, যার ভেতর খনি আছে, যা খুঁজে বের করতে পারলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না। এসব কথা পাগলের প্রলাপ বলে সবাই ধরে নিলেও অরুণ যেন চিতায় পুড়ে ছাই হবার

আগে এই 'সব পেয়েছি পাহাড়ের' স্বপ্নটা অবিনাশের বুকে পুরে দিয়ে গেল। সামান্য চাকুরে অবিনাশ, আত্মপ্রকাশের তাড়নায় মাঝে মধ্যে পত্রিকায় লেখা পাঠায় তা কখনো কাঁটছাট হয়ে ছাপা হয় কখনো বা হয় না। গভীর রাতের তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ ভাবে, সেই পাহাড়ের ঠিকানাটা জানলে, উপযুক্ত শব্দের অভাবে বুকের ভেতরের সব কথাগুলোকে চেপে রাখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ওষুধ ওই পাথরের বুক খাবলে খুঁড়ে নিয়ে আসতে পারতো। গল্পটি শেষ হলেও যাবতীয় সৃজনকর্মের সঞ্জীবনী শক্তি সেই বিশল্যকরণী অনায়ত্ত থেকে যাবার বেদনা অনিঃশেষ রয়ে যায়।

সরকারী অফিসের চাকচিক্য আর নিয়ম কানুনের বহ্বারম্ভের আড়ালে লঘুক্রিয়ার খোঁজ, সাধারণ কমই পান। 'দরখাস্ত' গল্পের অতুলের একবার সৌভাগ্য হয়েছিল বিশেষ কিছু আবেদন নিয়ে শহরের এক বড় অফিসে আসবার। দরখাস্ত সে লিখিয়ে এনেছে, কিন্তু অফিসের কোন ঘরে কার টেবিলে এটি জমা দিতে হবে সে জানে না। এই ভুল ভুলাইয়া এঘর ওঘর করতে করতে একসময় না জেনেই সে ঢুকে পড়ে বড় সাহেবের ঘরে। সেখানে তখন চলছিল বোর্ড মিটিং। রাজ্যের দেশের জনগণের মঙ্গল চিন্তায় নিবেদিত প্রাণ বাবুরা তাঁদের জরুরী সব কাজকর্ম ফেলে রেখে এই উটকো লোকটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর আগে গোটা অফিসের ঘর থেকে ঘরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকা অতুলকে একটা লোকও জিজ্ঞেস করেনি যে কেন এসেছে বা সে কী চায়। এখন বড় সাহেব এবং সমবেত হোমরা চোমরাগণ এই অনাহুত গেঁয়ো লোকটার ব্যাপারে কী করা যায়, আইনের কোন ধারার, সাহায্য নেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে নানা মতামত দিতে লাগলেন। আর হতভম্ব, বিভ্রান্ত অতুল, ভেতর থেকে উঠে আসা ধিক্কার, লজ্জা, ভয়, রাগ, যন্ত্রণা, গালাগাল, সব কিছু চেপে রেখে কোনোমতে সেই ভারী দরজাখানা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে যত্ন করে ধরে রাখা দরখাস্তখানা অতুলের ঘামে ভেজা হাতের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়, অতুল তার দিকে ফিরেও তাকায় না। উড়তে উড়তে যাবেই সে কোন না কোন ঘরে।

'সাহিত্যিক জাগ্রত সমাজ বিবেক', ভীষ্মদেবের কিছু গল্প আমাদের এ কথা মনে করিয়ে দেয়। 'সাধুর লাঠির ইতিকথা' গল্পে লেখক পাঠকদের সামনে অনাবৃত করেছেন সেই বুদ্ধিমান পাষণ্ডদের চেহারা, ধর্মভীরু মানুষের দুর্বলতাকে যারা ব্যবসার মূলধন বানায়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সাধুবাবা তাঁর চরিত্রগুণে এলাকাবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছেন। সাধুবাবার অলৌকিক মহিমায় অন্ধ বিশ্বাসী ভক্তের দল বাবার সেবায় মুক্ত হস্ত, অর্থ এবং বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে দানপাত্র। সাধুবাবার এই গ্রহণযোগ্যতাকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাতে ব্যস্ত চেলাচামুণ্ডাদের দল। তাদের লোভ অসুস্থ, অশক্ত সাধুবাবাকে একবেলা বিশ্রামের সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে নারাজ। ভক্তদের সামনে 'দর্শন' দিতেই হবে, নইলে ভক্তরা উপুড় হস্ত হবে না। অসহায়, নিরুপায়, নিজের ঘনিষ্ঠদের লোভের বৃত্তে বন্দী সাধুবাবার দুর্বল শরীর একসময় বিদ্রোহ করে। কাউকে কিছু না জানিয়েই বাবার ভঙ্গুর দেহ থেকে প্রাণ পাখি উড়ে যায়। ওদিকে পূর্ণিমা রাতে বিশাল ভক্তমণ্ডলী এসে ভিড় জমিয়েছে আশ্রম প্রাঙ্গণে সাধুবাবার দর্শন আকাঙ্খায়। চেলাদের পালের গোদা সাধুবাবার ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারল কী ঘটেছে। কিন্তু অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে চমৎকারভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয় তারা। সাধুবাবা মরেও রেহাই পান না তাঁর চেলাদের হাত থেকে। তাঁর চিরসঙ্গী লাঠিটিকেই বাবার প্রতিনিধি বানিয়ে ফেলে সর্দার চেলা বাইরের ভক্তদের কাছে এসে ঘোষণা করে সাধুবাবা পূর্ণিমা রাতে পর্বতে চলে গেছেন গভীরতর সাধন ভজনের আগ্রহে। আর স্নেহের ভক্তদের জন্য রেখে গেছেন তার হাতের লাঠিখানা। লাঠিটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে এনে সাধুবাবার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেয় শিষ্যরা। সমবেত জনতা 'জয়ধ্বনি করে ওঠে।' বিশাল ভক্তমণ্ডলীর দানধ্যান অব্যাহত রাখতে সাধুবাবার জায়গা নেয় তাঁর হাতের লাঠি। আর ওদিকে তখন চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে সাধুবাবার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁর মৃতদেহ।

'সাধুর লাঠির ইতিকথা' লিখতে গিয়ে ভীষ্মদেব একটি মুখবন্ধ রেখেছিলেন। যদিও তাঁর অজানা ছিল না যে ছোটগল্পের কোনো ভূমিকার দরকার হয় না। সুখের কথা, পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধিত অবস্থায়, অর্থাৎ ভূমিকা ব্যতিরেকে 'সাধুর লাঠি' নামে 'নির্বাচিত ভীষ্মদেব' এ গৃহীত হয়েছে।

উপজাতি জীবনের সুখদুঃখ, চাওয়া পাওয়ার কাহিনী ভীষ্মদেবের অনেক গল্পের উপজীব্য। 'বুড়া দেবতার মাচাং' গল্পের শত্রুঘ্ন আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষের মাধ্যমেই জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু উন্নয়নের অগ্রদূত সরকারী বাবুরা ক্রমশঃই পাহাড়ী এলাকাতেও ঢুকে পড়েন। পীচ বাঁধানো রাস্তা তৈরী হয়, সমস্ত বন কেটে বসত এগিয়ে আসে, কোনও বন আবার 'রিজার্ভ' চিহ্নিত হয়ে যায়। 'সব জায়গা যদি 'রিজার্ভ' হয়ে যায় তবে আমরা জুম করব কোথায়?' এই প্রশ্ন বুকের ভেতর দাবিয়ে রেখেই শত্রুঘ্নরা ক্রমশঃ আরো গভীর অরণ্যে সরে যেতে থাকে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান হয়ে মঙ্গলাকে শত্রুঘ্ন শহরের স্কুলে পাঠিয়েছিল। ছেলে বড়োবাবুদের স্কুলে পড়ে বড়ো হবে, বাপের মতো পাহাড়ী জুমিয়ার কষ্টের জীবন তার নিয়তি হবে না, এই আশায় যথাসাধ্য টাকা পয়সা মঙ্গলাকে দিয়েছে সে। কিন্তু বছরখানেক আগে একবার টাকা চাইতে মঙ্গলা পাহাড়ে এলে বাপ বলে 'টিলায় আর টাকা নেই কোথেকে টাকা দেবো। জুম নাই, চাষ নাই তিল ধান নাই, বাঁশ কাটলে আগাম পয়সা, টিলাই বা কোথায়? সব লোকে গিজ গিজ।' তারপর মঙ্গলা আর আসেনি। শহর শত্রুঘ্নর ছেলেকে গ্রাস করে নিয়েছে। সভ্য নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া মঙ্গলা আর কোনোদিন টিলায় ফিরে যাবে না — এমনকী বুড়ো বাপকে দেখতেও না জুম চাষের টিলা নেই, শরীর অশক্ত, ছেলে দূরে সরে গেছে — শত্রুঘ্নর মাথার মধ্যে সব যন্ত্রণাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে তার দমবন্ধ করে দেয়। ছেলে আসবে এই আশায় পিট পিটে চোখ দুটোকে টান টান করে আঠারোমুড়ার বুক চিরে নামা রাস্তাটার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শত্রুঘ্ন। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে একবুক অভিমান নিয়ে ফিরে চলে তার মাচাং এর ভাঙ্গা বাসায়।

গল্পটি আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও এর ব্যঞ্জনা সীমিত নয়। শত্রুঘ্নর দুঃখ সমস্ত পাহাড়ী মানুষের দুঃখ আর প্রতিকারহীন অনিবার্য সমস্যারই প্রতিচ্ছবি। তার চেয়েও বড় কথা, গল্পকার এখানেই থেমে যান নি। "মঙ্গলা হয়ত আর আসবে না। কিন্তু শত্রুঘ্ন এই রুক্ষ টিলার বুকে, বিবর্ণ মাটির উপর তার সেই বহুদিন আগের কাঁঠাল বেচা টাকায় কেনা খাকীর কোটটার হাজার জানলা খুলে প্রত্যাশার বীজ শুধু বপন করেই যাবে — টাক্কালটা মাটির বুকে এক এক কোপ দিয়ে যেমন ধান, তুলা, চিনরার বীজ বুনে যেত ঢাল থেকে শীর্ষ দেশ অবধি, যেমন তারপর শুধু জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষার ব্রত, কখন বিদীর্ণ মৃত্তিকা থেকে জন্ম নেবে আকাঙ্ক্ষিত ফসল।"

এই গল্প যখন লেখা হয়েছিল, তারপর তিন দশকেরও বেশী সময় কেটে গেছে। আমরা দেখছি শত্রুঘ্নদের প্রত্যাশার বীজ নিষ্ফলাই থেকে গেছে। তবু গল্প শেষের এই সদর্থক ভাবনা গল্পটিতে নতুন মাত্রা এনে দেয়।

ভীষ্মদেবের গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য, অসাধারণ। জুমিয়া-উপজাতি, বন কেটে বসত গড়া উদ্বাস্তু, মহাজনী শোষণে নিঃস্ব হওয়া মানুষ, দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের সিঙ্গল টিচার্স স্কুলের শিক্ষক, শহরের বেকার যুবক, চায়ের দোকানের বয়, অবহেলিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত মানুষ, শ্মশানবাসী অস্পৃশ্য চণ্ডাল — এরা সকলেই তাদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা নিয়ে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। একটা জায়গায় তাদের মিল রয়েছে — তা হলো জীবনের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ।

'বাঘ' গল্পের গ্রামবাসীরা আততায়ী মানুষ খেকো বাঘের আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে বি ডি ও র কাছে দরখাস্ত দেবার খসড়া বানায় মিটিং এ বসে। মহাজন হরিঘোষ যেটি তৈরী করে 'সরকারের কাছে সাধু কথা কইতে হয়, অর্দ্ধেক কইতেই বুইজ্যা ফেলে', তাই 'সরকার বাহাদুর' সম্বোধনে দরখাস্ত শুরু হয়। গ্রামবাসীরা কেউ নিজের চোখে বাঘ দেখেনি। কিন্তু পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, যখন সন্ধ্যা হতেই সবাই ঘরে ঢুকে যায়। ব্রজর ঘরে ক'দিন ধরে আলো জ্বলে না। একফোঁটা তেলও নেই, এরকম অন্ধকার রাত তারা আগেও অনেক কাটিয়েছে। কিন্তু এখন দুটি বাচ্চা নিয়ে ব্রজর বউ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। দোকানী হরি ঘোষ সাফ জানিয়ে দেয় ব্রজকে দেবার মতো একফোঁটা কেরোসিন ও তার কাছে নেই, অথচ নিজের বাড়িতে চারকোণায় চারটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখে সারা রাত। বাঘতাড়ুয়া

রেখেছে মোটা মাইনে দিয়ে। ব্রজর কেমন বিশ্বাস হয়ে গেছে বাঘটা কখনোই মহাজনকে খেতে পারে না। মনের মধ্যে আবর্ত পাকায় একটা প্রশ্ন "কেষ্ট কহা, তোমারে কই, কাউয়ার মাংস কাউয়া কি কহন ও খায়?"

দেশভাগ যেসব মানুষকে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দিয়েছে, তাদের একটা বড় অংশ ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা কখনো শরণার্থী, কখনো রিফিউজী, কখনো উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে ত্রিপুরার বহু লেখক গল্প লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্প উপন্যাসে একে অন্যতম বিষয় রূপে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্ব আর জনজীবনের ভিন্নতা এখানকার গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। 'বাঁশের বুকে ফুল' গল্পের গৌরাঙ্গও সব ছেড়েছুড়ে এসে সরকারের কাছ থেকে ডোল বাবদ কিছু টাকা আর কিছু টিলাজমি পেয়েছিল। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সেই নতুন জায়গায় থিতু হবার সময় সরকারী বাবু কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন কোথায় পাট ফলাবে, কোথায় ধান আর কোথায় করবে তরিতরকারীর বাগান। কিন্তু কিছুদিনেই গৌরাঙ্গ বুঝে যায় 'এই লালমাটির টিলায় পাট, লাউ, কুমড়ো কাগজে হলেও মাটিতে হয় না। লতাগুলি কেটে ফেল্লে ও আবার গজায়। ওরা নাম দিয়েছে রিফিউজী লতা, মরেও মরে না বেঁচে থাকার কি দুর্দান্ত ইচ্ছা'। ঠিক যেন এই মানুষগুলোর মতোই। অনেকেই খুঁজে নিয়েছে পাকিস্তানে মাল পাচারের সহজ রাস্তা। বৌ তুলসী এরমধ্যেই মা হতে চলেছে, কিছু টাকার ধার নিতে গৌরাঙ্গ মহাজনের গদীতে গিয়েছিল। ফসল উঠলেই সুদ সহ দেনা শোধ করে দেবে। কিন্তু বাঁশের গাছে ফুল ফুটেছে, আকাল আসছে, দেনা শোধ দেবার প্রশ্নই উঠে না, এই যুক্তিতে মহাজন তাকে ভৎর্সনা করে 'তুলসী আর সময় পেল না পোয়াতী হবার?' যাবার সময় তুলসী আবদেরে গলায় বলেছিল, 'আমার লাইগ্যা কয়টা জিলাপি আনবা গো?' কিন্তু জিলাপীর বদলে গৌরাঙ্গ উল্টে একটা রাগ নিয়ে এসেছে। ঠিকই তো, 'বাঁশে বাঁশে যখন ফুল এসেছে, কুয়োর তলাটা যখন হাঁ করা মরা শিয়ালের মত, ধান গাছগুলি যখন খড় হয়ে গেল মাটির উপর তখন মাগী বাচ্চা পোয়াবে? জিলাপী খাবে?' -- এই অকারণ রাগের ভেতর একটি অসহায় অক্ষম মানুষের হতাশা আর যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, গল্পকার যার সহমর্মী হয়ে যান।

'রাজা ভরত' গল্পের অবিনাশ 'একাই প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক, অফিস কেরানী, পিয়ন। তার স্কুল, সিঙ্গল টিচার্স স্কুল — সরকারী নাম।' লোকালয় থেকে বহু দূরে পাহাড়ের নির্জনতায় সকালের দিকে গুটিকয়েক নেংটি পড়া ছেলেমেয়েকে প্রাণপণে অ-আ থেকে দশমিক অংক ধরাতে চেষ্টা করে অবিনাশ। ছাত্র সুখরাম দূরের দোকানে লবণ কিনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে। মুখবন্ধ লবণের বস্তা সামনে রেখেই সাহেবাবু বলেছেন যুদ্ধ লেগেছে, যুদ্ধ মানে লবণ নেই, তেল নেই, আলো নেই। সুখরাম চার আনার লবণের জন্য আস্ত একটি টাকা দিতে পারে নি। তার বাবা দীর্ঘদিন রোগশয্যার, কিন্তু টিলা পার করে বহুদূরে ডাক্তার, তাই চিকিৎসার প্রশ্নই উঠে না। ছাত্র শিক্ষক দুজনেই শুনে মিলিটারী গাড়ির কনভয়ের শব্দ জীবনের জন্য শান্তি আনতে লম্বা লাইনে কনভয় যাচ্ছে।'

বহুরূপী মানুষের বিচিত্র চেহারা ভীষ্মদেব তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বাৎসরিক নাম সংকীর্তন উৎসবে চা দোকানের এক প্রহৃত এবং তাড়িত বালক হয়ে ওঠে আসরের মধ্যমণি 'ব্রজবালক'। আশেপাশের দোকানদার ব্যবসায়ীরা বিক্রি বাটা ঠিক রেখে নাম যজ্ঞ গানে বুক ভাসায়, তলপেটে পেট্টি বাঁধা সারাদিনের রোজগার বাঁ হাতে সামলে রাখে আর ডান হাতে চোখ মুছে। একলব্যের গুরু দক্ষিণা দেবার সেই বহুশ্রুত কাহিনীকে 'মহাভারতের কথা' গল্পে নতুন করে শুনিয়েছেন গল্পকার। বনস্থলীর এক নিষাদবালকের শরচালনা নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ আচার্য দ্রোণ পিতামহ ভীষ্মের কাছে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন সেকথা। কিন্তু ভীষ্ম গম্ভীর হয়ে গেলেন। এ বিষবৃক্ষ বাড়তে দেওয়া ভুল হবে। রাতের গভীরে দুই মহারথী নিভৃতে আলোচনা করলেন কর্তব্যকর্ম বিষয়ে। ঈশ্বরের বিধান ভিন্ন বলেই পাপ আছে, পুণ্য আছে, মানুষ আছে, আছে তার কর্ম বর্ণ ভেদ। পরদিনই আচার্য গেলেন গভীর বনের অভ্যন্তরে, আবাধ্য দেবতার আবির্ভাবে অভিভূত কৃষ্ণকায় জীর্ণ বাস বালকের আভূমি প্রণতি গ্রহণ করে দ্রোণ দাবী করলেন গুরু দক্ষিণা — দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। স্তম্ভিত বালক চোখের পাতা ফেলতে ভুলে যায় মুহূর্তের জন্য। তারপরই দুই হাতে একটি রক্তমাখা বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে

আচার্যদেব দ্রুত ফিরে চলেন শিবিরের দিকে। দক্ষিণা দেবার সময় বালকের চোখে জল থাকলেও কালো ঠোঁটের দুই প্রান্তে ছিল সূক্ষ্ম চাপা হাসি, যা তিনি দেখেও দেখেননি।

তারপর — ভীষ্ম আর দ্রোণ পাশাপাশি বসে আছেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছিলেন না। "পিতামহ ভীষ্মদেব ভাবছিলেন ভারতবর্ষ কি বিশাল এবং কি অজ্ঞাত। কোন অগোচরে কত বালক বাড়ছে কে জানে? কিন্তু কেউ কোন কথা বলছিলেন না — কেননা শব্দগুলোর অর্থ নিজেদের অসহায় করে তুলতে পারে।"

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এই গল্পে ভাষার দার্ঢ্য, বর্ণনার গাম্ভীর্য আর অন্তর্লীন সম্ভবতঃ 'মহাভারতীয়' গল্পটি। ঋষি বিশ্বামিত্র নগর আর অরণ্যের মাঝামাঝি তপোবনে বাস করেন। নগর থেকে ব্রাহ্মণ বালকরা এসে গুরুগৃহে থেকে বিদ্যালাভ করে ফিরে যায়। মহামুনি তাঁর গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশ্ববাসীকে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশঃ বদলে যায়। তিনি সংবাদ শুনেছেন বিশাল অঞ্চল জুড়ে অন্নের জন্য অসহায় মানুষের আর্তনাদ। গ্রাম পাহাড় জনপদ উজাড় করে শ্রেষ্ঠীরা ইন্দ্রপ্রস্থে যে বিত্ত বৈভব গড়ে তুলেছিল, তারাও আজ দিশাহারা। সাধনা আর বিদ্যাচর্চায় জীবন কাটিয়ে আজ দুমুঠো অন্নের জন্য রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে ও কষ্ট হয়। এদিকে অসুস্থ স্ত্রী, পুত্র অন্নাভাবে মৃতপ্রায়। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত নেই, জলাশয় শুকিয়ে গেছে। জিতেন্দ্রিয় মহামুণি ক্ষুধা তৃষ্ণা বহুদিন পর্যন্ত আটকে রাখতে সক্ষম হলেও এক সময় তিনিও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। রিক্ত শূন্য ভূর্জপত্রের পাহাড়। একটিও বলে দিতে পারছে না — এক মুঠো ভাতের গন্ধের কথা, যে কোন একটু খাবারের কথা, এক বিন্দু জলের কথা। হায়?'

তিনি হেঁটে চলেন গভীর বনের দিকে — দুর্গন্ধে ভরা ব্রাত্যপল্লী, জীর্ণ কুটীর, মদের নেশায় চুর নারী পুরুষেরা অশ্লীল আমোদে মত্ত। এখানে কার কাছে একটু ভিক্ষা পাবেন, এরা সবাই যে হয় ঘুমন্ত না হয় নেশায় মৃতের মত। এখন চরাচর সব মুছে গেছে তার কাছ থেকে। অন্ধকারে যা সংগ্রহ করেন তার দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে আবার জিভে লালা ও যেন জমে। বস্তির কেউ কেউ হঠাৎ জেগে ওঠে, অন্ধকার লুকিয়ে থাকা লোকটিকে সামনে আনে আর দেখে অবাক হয়ে যায়। এ যে বিশ্বামিত্র! ভগবান। দেহে ছায়া পড়তে বলে ওরা কোনদিন তপোবনের ধারে দিয়ে হাঁটে না। বিশ্বামিত্র আকুতি ভরে যেন প্রার্থনা করেন — 'শান্তি দাও — তবে এই খাদ্যটুকু আমাকে ঘরে নিতে দাও।' 'এ যে অভক্ষ্য কুকুরের মাংস' — বড় ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কে যেন বলে।

"বিশ্বামিত্র একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আমি আমার পুত্রকে স্ত্রীকে বাঁচাতে চাই আমিও বাঁচতে চাই। আমিও বাঁচতে চাই। আমি বহু তপস্যা করেছি তবু যা জানিনি আজ জানলাম। সুনীতি দুর্নীতি ভাল শব্দ। কিন্তু সময়ে বদলায়। দেহ না বাঁচলে তো কিছুই বাঁচে না — যদি বেঁচে যাই, তবে তপস্যার সময় পাব — সময় পাব প্রায়শ্চিত্তের। কুকুরের মাংস? হোক। বাঁচাবে তো। জীবনের চেয়ে তো বড় কিছু নেই।'

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী ষাটের দশকের একেবারে শুরুতেই লিখতে শুরু করেন। দুই দশক জুড়ে যেসব গল্প লিখেছেন তা থেকে আটটি গল্প নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিকেলের ময়দান' প্রকাশিত হয়। এর বহু বছরবাদে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তার 'নির্বাচিত গল্প' নামের সংকলনগ্রন্থ। বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহিত্যপ্রেমী প্রকাশকের পছন্দই মূলতঃ প্রাধান্য পেয়েছে। সনাতন শ্রেণীভেদ বর্ণভেদের বাইরে নূতন যে ভেদের প্রাচীর ক্রমশঃই বিশাল এবং দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে, সেই ধনী-গরীব, শিক্ষিত - অশিক্ষিত, শহুরে গ্রাম্য, জাতীয় দেয়ালগুলি গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন বলে যারা দাবী জানান, সেই দাবী কতটা যথাযথ আর কতটা প্রচার সর্বস্ব, কালিপদের গল্প পড়তে পড়তে সে প্রশ্নটা আমাদের মনে আলোড়ন তোলে। সাধারণ মানুষের দিনগত পাপক্ষয়ের মতো জীবনযাপনের খুঁটিনাটি দিকগুলো তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বেশির ভাগ গল্পের চরিত্ররা উঠে এসেছে প্রতিদিনের পরিচিত পরিবেশ থেকে, যাদের আমরা দেখি, কিন্তু লক্ষ্য করি না।

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তীর গল্পটি কালিপদের লেখকসত্তাকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। উঁচু টিলায় চা-বাগান, নীচে লুঙ্গায় জলা জমিতে ধান ভাগাভাগির নির্দিষ্ট শর্তে জমি দিয়েছে ষষ্ঠী চরণকে। ষষ্ঠী দুবছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে

মনেব মতো কবে তৈবী কবেছে জমি। কিন্তু ম্যানেজাব এখন জমি ষষ্ঠীব কাছ থেকে ফেবৎ নিতে চান। নানাভাবে চেষ্টা কবেও ষষ্ঠীতে বাগ মানাতে না পেবে ম্যানেজাব মাঠে দলবল পাঠিয়ে দিল। ষষ্ঠী সঙ্গেব লাঠি নিয়ে এগিয়েছিল, কিন্তু ম্যানেজাবেব সাকবেদ বুধন দূব থেকে তীব ছুঁড়ে মাবল। সে তীব গিয়ে বিঁধল ষষ্ঠীব ডান হাতে। সে হাসপাতালে না গিয়ে বা তীব খুলে নেবাব চেষ্টা না কবে থানায় ছুটলো। এব আগে দাবোগাবাবুকে অনেকবাব ম্যানেজাবেব জুলুমেব কথা বলেছে সে, কিন্তু দাবোগাবাবু প্রমাণ চান। এবাব সে হাতে নাতে প্রমাণ এনেছে। থানাব পুলিশকে ষষ্ঠী বুঝালো ম্যানেজাব তাব কাছ থেকে যত ধান পাবে, ষষ্ঠীব বক্তজল কবা পবিশ্রমে তৈবী জমি অন্যকে বাগী দিয়ে অনেক বেশী পেতে পাবে। তাই এই ষড়যন্ত্র।

ষষ্ঠীব হাত ফুলে উঠছে, টনটন কবছে, তবু সে দাবোগাব কথায় ও তীবটা খুলে নিল না। সে চায় তাব অভিযোগ লিখে নেয়া হোক, তীবটা প্রমাণ রূপে জমা বাখা হোক এবং ম্যানেজাবকে ধবে আনা হোক। বহু তাল বাহানাব পব বিপোর্ট তৈবী কবে দাবোগাবাবু হেসে বললেন "বুজছিত। অহন তিবড়া খুল আগে হ, তব কেইসটা ত দাহন লাগে অই।" কিভাবে যেন ষষ্ঠী বুঝে যায় দাবোগাবাবুব বিপোর্টে তাব অভিযোগ কোনো গুরুত্বই পায় নি। ষষ্ঠী দুবন্ত ক্রোধ সংযত বেখে থানা থেকে বেবিয়ে বওনা দেয় শহবে। একটানা বাব মাইল পথ বোদেব মধ্যে হেঁটে সে হাকিমেব এজলাসে পৌঁছয়, হাকিম দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা, তিনি নিশ্চয়ই ন্যায়বিচাব কববেন। সাবাপথ ষষ্ঠী মহড়া দিয়ে এসেছে ধর্মাবতাবকে কি বলবে। একসময় তাব মনে হয় হাকিম ম্যানেজাবকে শাস্তি দিয়ে হয়তো জমিটা তাকে দিয়েই দেবেন। এই জমি তো তাবই হাতে গড়া।

কিন্তু হাকিম এজলাসে নেই। অদৃষ্টেব এই পবিহাস বিপর্যস্ত ষষ্ঠী আদালত ঘবেব বাবান্দায় বসে পড়ে। হাতে গেঁথে থাকা তীব সমস্ত শবীব বিষয়ে তুলেছে ততক্ষণে, জ্বব আসছে, 'জিহ্বা তালু গলা বেয়ে বুকেব ভেতবে এবং ক্রমশঃ প্রতিটি শিবায় আবো জলেব জন্য প্রার্থনা, অনন্ত হাহাকাব বিস্তৃত।'

অবশ্য বেশীক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হলো না ষষ্ঠীকে। 'শ্রীপুব চা বাগানেব ম্যানেজাবেব উপব হামলা কবাব অপবাধে গ্রেপ্তাব হওয়াব ষষ্ঠীচবণ মাতাল অথবা শিশুব মত এলোমেলো পা ফেলে আদালত ঘবেব বাবান্দা থেকে নেমে আসে।

নবেন্দ্রনাথ মিত্রেব 'জমি' গল্পটি প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়। তবে কালিপদ আবো মিতবাক, আবো বেশি দায়বদ্ধ। 'বোশনাই' গল্পেও দেখি ছোট চাষী গোবিন্দ যৎসামান্য জমিটুকু ধবে বাখতে পাবলো না 'মুই কি কবম? বাপডাব আতে জমিন গ্যাল। বিডাঅ যায়।' মণ্ডলেব কথায় গোবিন্দ বউ মেয়ে নিয়ে শহবে মেলা দেখতে এসেছে। মণ্ডল বলেছে 'দেইখ্যা আইঅ গিয়া, তুমাব আমাব লাইগ্যাইত এগুলান । নাগবদোলা, পুতুল নাচ, হাসি চীৎকাব, পুকুবে নৌকাবিহাব আব সবকিছু ছাপিয়ে আলোব বোশনাই। গোবিন্দ দিশাহাবা হয়ে পড়ে। সামনে সাবি সাবি প্যাভেলিয়ন, সবকাবেব উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞেব ঢালাও ফিবিস্তি। দেখতে দেখতে 'গোবিন্দ যখন ক্লান্ত প্রায়, তাব চোখ ধানেব বোঝা পোঁতা চৌকোণা একখণ্ড সবুজ জমিতে আটকে যায়। দেয়ালে মানচিত্র ঝোলে। কর্ষিত, অকর্ষিত জমি, সমতল, টিলা জমি, সেচহীন, সেচ জমি, পাম্পসেট, গভীব, অগভীব নলকূপ। সাব আব উন্নত ধবনেব বীজেব নমুনা। লেখায়, চিত্রে, সংবাদে 'ভূমিসংস্কাব না কবে, চাষীব হাতে জমি না দিয়ে ' চৌকোণা সবুজ জমি গোবিন্দব চোখে ঝুলেই থাকে। শূন্যে কোন উদ্যানেব মত। পবগাছাব মত শিকড় বুঝিয়ে।' আলোব বোশনাই এ উজ্জ্বল উঁচু মঞ্চে বক্তৃতা হয়, গান হয় — গোবিন্দব জমি কেবলই শিকড় ঝুলিয়ে মঞ্চ থেকে মাটিতে নেমে আপ্রাণ বস টানতে চায়। আব সর্বাধিক ফলনেব জন্য পুবস্কাব প্রাপ্ত দম্পতিব বিশাল ছবিব ভেতব 'মণ্ডল হাসে, গোছা গোছা ধানেব বোঝা মাথায় নিয়ে, পেছনে ঢেউ খেলানো যেন অন্তহীন শস্য প্রান্তব।'

'শিয়াল' গল্পেব নিবাবণ, দেশ ছেড়ে এসে সবকাবেব দয়ায় টিলাজমিতে আবাব ঘব তুলেছে। কিন্তু বাস্তুহাবা মানুষদেব নতুন বসতিব ওপব নজব পড়েছে লোভী সুযোগ সন্ধানীদেব। শহব বাড়ছে, এদিকে অফিস কাবখানা হচ্ছে,

এখন জমি ধরে রাখলে সোনার দামে বেচতে পারবে তাই নিত্য দালাল ঘোরাফেরা করে। নিবারণের মুরগী ঘরের বেড়া ভেঙ্গে শেয়াল মুরগী নিয়ে যায়। শেয়ালের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে নিবারণ ফাঁদ তৈরী করে কিন্তু মহাজন কাঞ্চন ঋণের দায়ে তার জমিটুকু দখল করে নেবার যে নীল নকশা তৈরী করছে, সেই মানুষ শেয়ালের গ্রাস থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে পারবে কিং গল্প শেষে এই উত্তরহীন প্রশ্ন পাঠকের ভাবনাকে জাগিয়ে দেয়।

কালিপদ এক বিশেষ রাজনৈতিকবোধে বিশ্বাসী। তাঁর সম্পর্কে ভীষ্মদেব বলেছেন — 'যে বোধে কালিপদ মিছিলে যান, যে চেতনায় তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সচেষ্ট যে বিশ্বাসে সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী, যে শ্রদ্ধায় ছাত্রকে কিছু দিতে চান — ঠিক একই বোধ, চেতনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধে ও নিষ্ঠায় তিনি লেখেন।' 'ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে গমন' গল্পে রাজা সত্যব্রতর চন্ডাল ত্রিশঙ্কুতে রূপান্তর আর তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত ঋষি বিশ্বামিত্রের ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যর্থ চেষ্টার সুপরিচিত মহাভারতীয় কাহিনী তিনি সামাজিক স্তর বিন্যাসের, জাতিভেদ আর বর্ণভেদ সৃষ্টির পেছনে যে সুগভীর কৌশলী মনোভাব ক্রিয়াশীল, তা পরিস্ফুট করার কাজে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি একদেশদর্শী নন। নিরাসক্তভাবে তিনি দেখিয়েছেন, স্বার্থের বেড়াজাল থেকে কেউই মুক্ত নন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, কিন্তু সে বিদ্রোহ ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না, ছিল যে ক্ষমতার অংশভাগী হবার জন্য। আর চণ্ডাল ত্রিশঙ্কুও আজ যাঁদের বিরুদ্ধে ন্যায় অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, রাজা থাকাকালীন তারাই ছিলেন রাজার নির্ভরতার অবলম্বন। দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যা বলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাতে চাইলেও এই দুই মহাশক্তির ক্ষমতার লড়াইয়ে বিপর্যস্ত ত্রিশঙ্কু স্বর্গমর্ত্য কোথাও আশ্রয় পেলেন না। মাঝখানে নিরালম্ব ঝুলে রইলেন। বিরুদ্ধ শক্তির পাশাখেলায় সাধারণ মানুষ কিভাবে ঘুঁটি হয়ে যায় গল্পে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

'দিনলিপি' গল্পের সদানন্দ নিজের গ্রাম ছেড়ে শহর আগরতলায় এসেছিল — ভালোভাবে বাঁচবে বলে কিন্তু জীবন ধারণের তীব্র প্রতিযোগিতার চাপ সহ্য করতে না পেরে আবার সে গ্রামেই ফিরে যায়। কিন্তু 'সাপ' গল্পের রিক্‌শাওলা ষষ্ঠীচরণ, 'নিশানা' গল্পের নমজয় ত্রিপুরা, 'সময়ের হাত' গল্পের অনিনাশরা হার মানে না। প্রতিবাদে প্রতিরোধে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। যেমন শক্তি মদে মত্ত মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই, তেমনি নির্বিকার প্রকৃতির খেয়ালী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা জীবনের এক আদিম চালিকা শক্তির প্রেরণায়। তাই খরার তীব্র জ্বলনের পর বর্ষা এসে যখন সব ভাসিয়ে দেয়, জল ঢুকে যায় বিজয়দের বাঁশের খুঁটি, খড়ের চাল আর কাঁচা ভিতের একমাত্র ঘরে, তখন জীবন রক্ষার জন্যই পরিবারের সবাই যন্ত্রের মতো কাজ করে। একটি চৌকিকে আরেকটির উপর উঠায়। 'তার উপরে কাপড়-চোপড়, বাসন কোসন, কাগজপত্র, চাল তুলে কেরোসিন স্টোভে অমিয়া ভাত বসায়। নিশানাথ একপাশে শুয়ে থাকে। পল্টু অমিয়ার কোলের কাছে। আর তারা অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে ভাত হবার। জল নামা বা নৌকা আসার বা আরো জল বাড়লে চালে উঠার চিন্তা তো পরের।' এই তীব্র জীবন মুখীনতা গল্পের চরিত্রকে এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। কালিপদ'র গল্প সংখ্যায় তেমন বেশি নয়। কিন্তু গল্পের বিষয় ভাবনায়, চরিত্র চিত্রণে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুকে সনাক্ত করে তাকে বিদ্ধ করার নির্ভুল নিশানায় এবং ঝরঝরে গতিশীল ভাষার প্রয়োগে প্রতিটি গল্পই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। কালিপদ যেন মগ্ন মৈনাকের মত — যতটা প্রকাশিত তার চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত রাখেন নিজেকে -অগোচরে।

ডঃ কার্তিক লাহিড়ী ও ঋতেন চক্রবর্তী ষাটের দশকে কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য নানাভাবে তাঁদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে 'পরিচয়' গোষ্ঠীভুক্ত লেখক কার্তিক লাহিড়ী একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। গল্পের আঙ্গিক ভাবনায়, প্রকরণ বিন্যাসে, গ্রন্থন নৈপুণ্য ও উপস্থাপন কৌশলে নতুন ধারার সূচনায় তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। ১৯৮৫ সালে 'আমার বাগানে এত ফুল' নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরের পত্রপত্রিকায় এবং গল্প সংকলনেও তাঁর গল্প স্থান করে নিয়েছে।

'তাঁর মৃত্যুর ধারা বিবরণী' ১৯৭৫ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার একাধিক গল্প সংকলনে সেটি গৃহীত হয়। ছোট গল্পের পরিচিত সংক্ষিপ্ত আয়তনের তুলনায় গল্পটি বেশ বড়ো। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য গল্পের ভাষ্য ব্যবহার ও বর্ণনা রীতির অভিনবত্ব। প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করে এক সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় ঈশ্বরতুল্য সর্বশক্তিমান এই মানুষটি যে কখনো রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জনগণ তা বিশ্বাসই করতে পারে না। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করে একের পর এক হৃৎশূলের আক্রমণ থেকে তাঁকে বাঁচাতে, বেতারে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বুলেটিন বের হয় উদ্বেগ নিরসনের জন্য। অগণিত মানুষ, যাদের বুকের ওপর দিয়ে শাসনের স্টীমরোলার চালিয়ে এসেছেন তিনি দীর্ঘকাল, তারা প্রাসাদের বাইরে নীরব প্রতীক্ষায় থাকে।

"তিনি অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন নীরবে
আর মনে মনে দেখেন
এদিক সেদিক যেদিক
সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
আর সেই আগুনের শিখা লকলকিয়ে এগিয়ে আসে
কে বলি এগিয়ে আসে
আরও এগিয়ে আসে, একেবারে তাঁর কাছে
আর তিনি এই প্রথম ভয়ে চোখ বুজে ফেললেন
আর খোলেন না।"

জনশক্তির কাছে স্বৈরাচারী শাসকের পরাজয়ের এই কাহিনী নতুন নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গিটি অভিনব। ত্রিপুরার মাটিতে লেখা না হলেও কার্তিক লাহিড়ীর গল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়টি বুঝতে এটি আমাদেরে সাহায্য করে।

'মেয়ে অথবা মেয়ে মানুষের' বিষয় ভাবনা ও প্রকরণের বৈচিত্র্যে অসাধারণ একটি রচনা। গল্প লিখছেন এক গল্পকার, কিন্তু নিজের লেখা নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। কিছুটা লিখে থেমে যান, বিরক্ত হয়ে বোর্ড থেকে লেখাটি খুলে দলা পাকিয়ে ফেলে দেন। আবার লিখতে শুরু করেন, 'কলমের ডগায় যা আসবে তা ই-লিখবো' — এই মনোভাব নিয়ে। এভাবেই গল্পটি শুরু হয়েছে। নাটকের মতো পাত্রপাত্রীদের সংলাপ পর পর সাজিয়ে তৈরী হয়েছে এটি।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কিছু অত্যাধুনিক নারীপুরুষের বিচিত্র সম্পর্ক জাল, বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে বিপুল মালিন্যভরা অর্ন্তজীবন, তাদের চাওয়া পাওয়া হিসেব নিকেশের জটিল অঙ্ক, সমস্ত টানাপোড়েন নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন কার্তিকবাবু। গল্পের ভেতর গল্প বলা, বাহুল্যবর্জিত ক্ষিপ্রগতি ভাষা ও নিরুত্তাপ ভঙ্গীর অন্তরালে যে প্রতীতি এবং জীবনবোধ প্রবাহিত, তা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার আধিপত্য খর্ব করতে দুই সাহসী নারী বহুজনের উপস্থিতিতে সহবাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তাদের প্রাক্তন প্রেমিক/স্বামী/বর্তমানে প্রেমিক/স্বামী হতে ইচ্ছুক পুরুষরাও সেই বহুজনের কয়েকজন।

১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল, সেই মর্মান্তিক ঘটনা ত্রিপুরার সর্বস্তরের শুভ চেতনা সম্পন্ন মানুষকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। শিল্পী সাহিত্যিকরা সেই দুঃসময়কে ধরে রেখেছেন কথায় কলমে। 'মানুষের মুখে মানুষ' গল্পের চিত্রকর শিবুর কাছে খবর আসে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিষ্ণু ঠাকুরের (দা) ঘায়ে নিহত হয়েছে। আর আরেক বন্ধু অখিরা প্রাণ দিয়েছে আততায়ীর ছুরির ফলায়। এই হিংস্র জাতিদাঙ্গার কোনো কারণ খুঁজে পায় না শিবু। নদীর পাড়ে এসে নিশ্চুপ বসে থাকে, ছবি আঁকার কথা ভাবলেই মনে পড়ে 'রক্তের লাল রঙের মধ্যে দুটি শরীর শুয়ে আছে শব হয়ে।' নদীর স্রোতে সেই দুটি মুখ ভেঙ্গে ভেঙ্গে অজস্র হয়ে যায়, শিবু আর চিনতে পারে না। বিভ্রান্ত শিবুর

নদীর বুকে ছুঁড়ে দেওয়া একটা ঢিল শব্দ হয়ে বিক্ষোভ ছড়াতে থাকে বহতা জলের কিনারে কিনারে। আর তখনি শিবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার পরবর্তী ছবির বিষয় — বেড়ালের মুখ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় পাখি যেমন ডানা ঝাপটায়, তেমনি 'মানুষের মুখে মানুষ ছটফট করছে মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ার জন্য দারুণ রোষে।'

আগের গল্প দুটির তুলনায় এটি নিতান্তই সাদামাটা লেখা। লেখকের নিজস্ব শৈলী এখানে অনুপস্থিত। ত্রিপুরার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক কার্তিক লাহিড়ীকে বলেছেন 'লেখকদের লেখক।' গল্প লেখার নতুন রীতি নতুন ধ্যান ধারণা যেমন তিনি এনে দিয়েছেন, তেমনি বহু নবীন লেখক প্রেরণা, উৎসাহ এবং পথের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। তবে একথাও বলা দরকার যে গল্পের বিষয় বা ভাষা বা রচনারীতি নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা সবসময়ে সফল হয়নি, কখনো তা পাঠকের আগ্রহকে স্তিমিত করে দিয়েছে।

ঋতেন চক্রবর্তীর গল্প সংখ্যায় বেশি নয়। ষাটের দশকে ত্রিপুরায় এসেছিলেন, এখনো রয়েছেন। তবে লেখালেখি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। 'সামনের দরজা' নামে তাঁর একটি গল্প গ্রন্থ ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পুতুলের মেলা দেখা' গল্পের পুতুল বৌদির দূর সম্পর্কের ভাই অবনীকে প্রায় জোর করে রাজী করিয়ে মেলা দেখতে যায়, যদিও আগের দিনই পুতুল বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘুরে এসেছে। আলো ঝলমলে মেলায় সরকারী স্টলে সাজানো মডেলে প্রগতির অসংখ্য নমুনা। প্রতিশ্রুতিতে জ্বলজ্বল করে অজস্র বিজ্ঞাপন। সবকিছুকে যেন স্বপ্নের রাজ্য মনে হয় পুতুলের। আবার তক্ষুনি অনুভব করে এসবের সঙ্গে তার মনের কোনো যোগ নেই। আলোয় ভরা মেলা থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই চারদিকের জরাজীর্ণ নোংরা চেহারা বড় বেমানান লাগে পুতুলের। অবনীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কটি মধুরতর হতে পারছে না দুবছর পেরিয়েও, কারণ সামান্য স্কুল মাষ্টারির আয়ে সংসার পাততে অবনী সাহস পায় না। পুতুলকে বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে অবনী চলে যায়। অন্ধকার ডোবার পাশ দিয়ে সরু মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে পুতুল। চায়ের দোকানের কেরোসিনের আলোতে পথ সামান্য দেখা যায়। পুতুল কোনোদিকে তাকায় না 'বড় দরিদ্র চারদিক। চাকুরিহীন, কর্মহীন, খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন, অপরিষ্কার মলিন বিবর্ণ জীবন .... আশা ভরসাহীন এ অন্ধকারে সেঁধোতে সেঁধোতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে রক্তে নরম কব্জীতে আসে দৃঢ়তা। অন্যকিছু করার নেই বলেই কাপড়ের আঁচল শক্ত করে ঠোঁটে দাঁত চেপে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায়।' লেখকের প্রতিবাদী চেতনার আভাস রয়েছে গল্পে, কিন্তু ছোটগল্পের ঋজু কাঠিন্য বা আঁটসাট গড়ন অনুপস্থিত। আশির দাঙ্গা নিয়ে লেখা গল্প 'মশাল'। উপজাতি যুবক ধনঞ্জয়, জাত ভাইয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হবার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে ঘর ছেড়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝে যায় মুক্তির সংগ্রামের নামে নিছক লুটপাট আর নরহত্যাতেই এরা পটু। তাই প্রথম সুযোগেই সে পালিয়ে এসে উঠেছে এক বাঙালী বন্ধুর বাসায়। খবর চাপা থাকে না, উগ্র উপজাতি বিরোধীদের হাত থেকে ধনঞ্জয়কে বাঁচাতে প্রাণ দেয় বন্ধু গুণপদ। বাঁশের মাচায় গুণপদকে নিয়ে শবযাত্রায় প্রধানের হাত থেকে জ্বলন্ত মশাল নিজের হাতে নিয়ে ধনঞ্জয় সকলের আগে আগে চলে। আর মশালের মত জ্বলে তার চোখ। সেই সময়ের ত্রিপুরার একটি জ্বলন্ত সমস্যাকে নিয়ে লেখা হয়েছে গল্পটি। কিন্তু অনাবশ্যক বিস্তৃতি এবং একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুর অভাব পাঠকের প্রত্যাশাকে পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারে নি। ক্রিয়াপদে সাধুরীতির ব্যবহারে আলাদা কোনো মাত্রা যুক্ত হয়নি।

ত্রিপুরার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা জগতের প্রবাদ পুরুষ ভূপেন্দ্র দত্ত ভৌমিক, সকলের ভূপেনদা, ছিলেন এ রাজ্যের সাহিত্য সেবীদের খুব কাছের মানুষ। অনামী, উঠতি লেখকবৃন্দের অন্যতম উৎসাহ ও ভরসাস্থল এই মানুষটির কলমের জোর ছিল অসামান্য। কিন্তু কোনো সৃজনধর্মী সাহিত্য কর্মে তা নিয়োজিত হয় নি। ব্যতিক্রম শুধু একটি গল্প, যা ত্রিপুরার একাধিক গল্প সংকলনে গৃহীত হয়েছে। 'রুদ্ধশ্বাসের সমুদ্র যাত্রা' নামের এই গল্পটিতে কলকাতার বাসে অফিসটাইমের নিত্য যাত্রীদের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা যেন বাস্তবের এক অবিকল প্রতিচ্ছবি।

বেকার যুবক সুবিনয় চাকুরিরত দিদির সঙ্গে তার অফিসে যাচ্ছে একটা চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে। দিদির পাশে বসে যেতে যেতে সুবিনয় লক্ষ্য করে একটি সদ্যতরুণী যাত্রী কিভাবে তার পুরুষ সহযাত্রীদের অসভ্যতার শিকার হচ্ছে।

বিরক্তি, গোপন রাগ আর অস্বস্তি গোপন করতে সে চোখ ফেরায়। পাশেই বসে আছে দিদি। অনিবার্যভাবেই সুবিনয়ের মনে হয় ওই মেয়েটির মতো তার চাকুরে দিদিকেও প্রতিদিন ভিড় বাসে অফিস যাতায়াতের পথে কতোরকম বিশ্রী অসভ্যতার মোকাবেলা করতে হয়। অস্বস্তি বেড়েই চলে। বাসযাত্রীদের নানারকম টুকরো রসালো আলোচনা, হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামান্য দু'চারটি আঁচড়ে এক একটি চরিত্র ফুটে উঠেছে। যাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে হঠাৎ সুবিনয়ের মনে ছুঁচ ফুটায় একটি প্রশ্ন — ভাই-এর চাকরির ব্যবস্থা করতে গিয়ে দিদিকে কোথাও কিছু মূল্য দিতে হয়েছে কি? জোর করেই এই অসুন্দর কৌতূহল দমিয়ে রাখে সুবিনয়।

চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুবিনয় ভাবে। ''চাকরি, চাকরি অফিস বাড়ী। দশ্টা পাঁচটা। ট্রাম-বাস। উঠতি-পড়তি। ছুটতি নামতি। ... পেটে ভাত থাকলে ওসব কিছু নয়। .... অর্থে সমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের সামনে উপকূলের অস্পষ্ট তটরেখা। সুবিনয়ের নাবিক মন — ঢেউয়ের দোলায় উথালি পাথালি খেতে লাগল। পীরে নিজের পাদদেশ থেকে কবে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছিল মনে নেই। সামনে উপকূল। গ্রেড ২০০-৩৫০ টাকা। .... চোখের সামনে আঙ্গুর লতানো কুটীরের ছবি। ধনরত্নের দেশ। ইন্ডিয়ানা — ডালহৌসী স্কোয়ার। বেনেপাড়া। স্কাইস্ক্রেপার। লিফ্‌ট। প্রমোশন ...।'' সুবিনয়ের ভাবনার বৃত্তে চলমান সময়কে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তবে ছোটগল্পের প্রত্যাশিত তীক্ষ্ণতা এখানে নেই। প্রাধান্য পেয়েছে বিবৃতি ধর্মিতা।

অনিল সরকার ত্রিপুরার সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। গল্প তিনি কমই লিখেছেন, কবিতা এবং ছড়ার তুলনায়। 'রক্ত করবী' এবং 'লাশকাটা ঘর' গল্প দুটি একাধিক গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'রক্ত করবী' ত্রিপুরার রাজনৈতিক পালাবদলের এক অস্থির সময়ের গল্প। ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের শাখা কমিটির সভাপতি গুরুপদের বড় ছেলে, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের অঞ্চল সম্পাদক সুবল, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার দিনই আক্রান্ত হয়েছিল। কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু বল্লামুখ গ্রামে থাকতে পারে না সে, পালিয়ে বেড়ায়। কখনো কখনো প্রাণ হাতে করে রাতের অন্ধকারে বাড়ী এসে দেখে যায় তার মা, স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে। আবার রাত থাকতেই উঠে বেরিয়ে পড়ে, সূর্য ওঠার আগেই পার হতে হবে তিনখানা পাড়া, একটি নদী, তারপরই বাংলাদেশ' — যেখানে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে সুবল। কিন্তু একবাতে আর ফেরা হলো না সুবলের। দক্ষিণ পাড়ার খাল পাড়ে লাশ হয়ে পড়ে রইল তার মুন্ডহীন দেহটা।

বিরোধী পক্ষের ছেলেরা প্রথমে বাবা গুরুপদ'র বোতগারের পথ বন্ধ করে। বোন নন্দিতার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাদেরই দৌরাত্ম্যে। গ্রাম ছাড়তে হয়েছে ছোটভাই বাবুলকে। আর সুবল নিজে আজ 'রক্তের ভাসানে শুয়ে আছে যেন লক্ষীন্দর'। ... 'পার্টি কর্মীরা সরাসরি এলেন না। এলে পুলিশের সামনেই খুন হয়ে যাবেন এমন ভয়ংকর দিন।' সুবলের স্ত্রী অমিতা শাঁখা ভাঙ্গল না, সিঁথির সিঁদুর মুছল না। কান্নায় চোখের পাতা ভিজে এলেও কাঁদে না সে। এই গল্পের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পকারের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ছাপ।

রাজনৈতিক বিশ্বাসকে শিল্পে পরিণত করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, বাংলা গল্প উপন্যাসে, নাটক কবিতায় মাঝে মধ্যে তা দেখা গেছে। কিন্তু 'রক্তকরবী' সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি।

'লাশকাটা ঘর' গল্পের পটভূমি কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লী। ''গলিটায় ঢোকার প্রাক্‌কালে মন্দিরে মন্দিরে স্থবির ঈশ্বর। তারপরই দেশী মদের দোকান। তারপর মেয়ে পট্টি ঈশ্বর মদ ও মেয়ে মানুষ নিয়ে গলিটার ইতিহাস। ভবিষ্যত বর্তমান এবং অতীত। এই অন্ধগলির এক নারী অন্নপূর্ণার দেখা স্বপ্নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানের পংকিল জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক সমস্ত দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই লেখকের 'ফসল' গল্পেও আধুনিক জীবনের শূন্যতা, হাহাকার, সংশয় ও সংকট রূপায়িত হয়েছে।

মানস দেববর্মণ বাংলা ছোট গল্পের জগতে আসেন সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প সে সময় ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের আঙ্গিক নির্মাণে, ভাষা ব্যবহারে, চরিত্রের

বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টিতে যত্নবান এই লেখক অল্পকালের মধ্যেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'দশ টাকা পাঁচ টাকার গল্প' নামের একটি গল্প সংকলন ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী' ত্রিপুরা গল্প সাহিত্যে নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছে।

গল্পের মূল চরিত্র শহরবাসী ত্রিপুরী যুবক সৌগত বেকার। চাকুরীর ফর্ম পূরণ করতে মাতৃভাষার কলামে এসে তার হাত থেমে যায়। ভাবনার এক তরঙ্গ যেন বিস্তৃত হতে হতে ক্রমশঃ মনের গভীরে ঢুকে পড়ে। বাবা রাধাচরণ বলেন 'কি অইব, লিইখ্যা দে — বাংলা।

কিন্তু লিখতাছিত ত্রিপুরী, তঅইলে মাতৃভাষা বাংলা অইব কেমনে।

একটা ফুডা তিপ্রা কথা জানছ? জানছ না হিডা হগগলে জানে, তব ডিরেক্টারেও জানে, হিডা হাচা কথা সিডাই লেখ। রাধাচরণ রেগে উঠেন। তিনি নিজে ও তিপ্রা জানেন না।'

এই প্রথম কোনো গল্পের চরিত্রকে আমরা এ পর্যন্ত অদেখা এবং অনালোচিত এক সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখি। জাতিতে আদিবাসী ত্রিপুরী হয়েও আজন্ম নাগরিক পরিবেশে থাকায় সৌগত নিজের মাতৃভাষা জানে না। 'রাধাচরণের পিতৃপুরুষ খাঁটি ত্রিপুরী অর্থাৎ পাহাড়িয়া,' কিন্তু তিনি ছিলেন মহারাজার স্নেহধন্য। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় এলে তাঁর সম্বর্ধনায় যে জমায়েত হয়েছিল, সেই উৎসবের ছবিতে নিজেকে চিহ্নিত করে তিনি সবাইকে দেখান। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাবার অনেক আগেই যে ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল বাংলা, ছেলের বাঙালী বন্ধুকে সে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌগতর এখন এসব শুনতে আর ভাল লাগে না।

বন্ধু ঝন্টু সান্ত্বনা দেয় ''তর দুষ কি! মফঃস্বলে মফঃস্বলে আছিলি ঘরে বাইরে দুইখানেই বাংলা কথা। ঘরে বাইরে একটাতেও চলে না এমন ভাষা তুই জানবি কেমনে? আর এইখানে তর বন্ধুত আমরাই। দেববর্মা বন্ধু তর নাই ই।

সৌগত বলে, থাকলেই কি হইত। টাউনের এক পার্সেন্ট দেববর্মাও তিপরা ভাষা জানে কিনা সন্দেহ।''

টাউনের দেববর্মারা এখন যেমন বাঙালীর সঙ্গে বেশী বৈবাহিক সম্পর্ক করেন, রাজআমলে তেমনি নেপালী, মণিপুরী বা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার রেওয়াজ ছিল, একথা সৌগত জানে। তাদের দৈহিক গড়ন সৌন্দর্যের তৈরী মাপকাঠিতে পাশ নম্বর পায় না একথাও তার জানা। তাই বান্ধবী রমা যখন বলে 'তোমাকে দেখতে অনেকটা ঠিক আমাদের মত', তখন প্রথমটায় সে খুশী হলেও 'তোমাদের' আর 'আমাদের' শব্দ দুটি ক্রমশঃ রাজ্যব্যাপী এক বিশাল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুরূপে তার কাছে প্রতিভাত হয়।

'একটা কঠিন দায়িত্ববোধের চেতনায় পীড়িত বোধ করে' সৌগত গল্পে তাকে ধরতে কলম হাতে নেয়। বন্ধু বিমল আর সৌগত দুজনেই নিজেদের পুরোমাত্রায় সচেতন লেখক বলে বিশ্বাস করে, তাই লেখকের দায়িত্ববোধে সৌগত তার গল্পের কলম মানবতার পক্ষেই টেনে নিয়ে যায়, অর্ধসমাপ্ত গল্প নিয়ে সে বিমলের বাড়ী হাজির হয় বিমলের মতামত মানতে, যদিও কে জানে বিমলরা তাকে বুঝতে ভুল করবে না।

— ''দুঃসাহস না হইলেও তর সাহস আছে, মানতেই হইব। তুই গল্পটারে কই টাইন্যা লইয়া যাইতাছত .... মানে বুঝতাছ ত? .... অনেক দেরী হইয়া গ্যাছে রে।

কিন্তু আমার জন্মত' এখনই। একটা বোয়াল মাছের পেটের ভিতর থিকা একটা ছোট মাছকে কাটা ছেঁড়া কইরা বাইর করণের হাঙ্গামা কষ্ট অনেক। উভয় পক্ষ কাটা ছেঁড়া আঘাতে ব্যথা কমবেশী পাইবই ''

বিমলের প্রশ্ন আর সৌগতর উত্তর, বাঙালী আর উপজাতি আদিবাসী দুই ঘনিষ্ট সাহিত্যসেবী তরুণের আলাপচারিতা মাত্র নয়। ত্রিপুরার জনজীবনে স্পষ্ট যে দুটি ভাগ তৈরী হয়ে গেছে, এরা দুজনেই যেন নিজ নিজ অংশের প্রতিনিধি, তাদের অজান্তেই।

সৌগত অবিবেচক নয়, সে বুঝে দোষ কারো একার নয়। এবং সেই সূত্রেই ত্রিপুরায় বাঙালীর এবং বাংলা ভাষার এই বাড়বাড়ন্ত আর একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য সে বাঙালী ত্রিপুরার অধিপতি মহারাজাদেরকেই দায়ী করে। রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা এবং সাহিত্যকর্মে বাংলাভাষার ব্যবহার ছিল সর্বব্যাপী, তাই ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকার বাসনায় আদিবাসী সমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উদ্যোগী অংশ দ্রুত ধরে নিয়েছিলেন যে 'নিজের খোলস একটু পাল্টানো দরকারী-ই।'

গল্পের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশ পরিস্থিতি এক থাকলেও পাত্রপাত্রী কিছুটা বদলে যায়। সৌগত বাড়ী ফিরে দেখে, তার মায়ের বইনারী (সই) স্বামী সহ ঘরের মেঝেয় বসে আছে, সামনে ভাগে ভাগে টাটকা সব্জি সাজানো। ওরা থাকে শহর থেকে বহুদূরে পাহাড়ে। খরায় পাহাড়ের সমস্ত টিলা জমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই শহরে এসেছে জীবন জীবিকার তাগিদে, 'অপিস, কাচারিত একডা কাম লইয়া দেনা মামু' — এই আকুতি সৌগতকে আরো চমকে দেয়। সৌগতর মা বইনারীকে পাহাড় থেকে একটা ময়না ধরে এনে দিতে অনুরোধ করলে সে বলে, 'অহন অইলে কই পাইব? আগে কইলি না কিরে আমার তা অইলে এই এক্কু-অ ডাঙ্গর অইয়া গেছে নানান কথা কয়। অগ্‌গল তিপ্‌রা কথা। তরা অইলে কিছু বুজত না''।

বনের পাখী খাঁচাবন্দী হয়ে তিপ্‌রা কথা তাদের শিখে নিয়েছে অবলীলায়। কিন্তু শহুরে শিক্ষিত ত্রিপুরীরা সেই মাতৃভাষার কিছুই বুঝবে না। সরল পাহাড়ী রমনীর সোজাসাপ্টা কথার ভেতর লেখক নিপুণভাবে ব্যঙ্গের ছুরি লুকিয়ে রাখেন। সৌগত পুরুষটিকে তাকিয়ে দেখে, সেই ছোটবেলায় বাবার কাছারিতে মানুষগুলিকে যে চেহারায় পোষাকে কথাবার্তায় দেখতো, এত বছর পেরিয়েও তাতে কোনো পরিবর্তন আসে নি। অথচ সৌগতদের সঙ্গে এদের চেহারার কতো মিল। সৌগত মনের ভেতর উথালপাথাল চলতে থাকে। সে মামুর কাছে তিপ্‌রা ভাষা শিখতে চায়। শুনে সবাই হাসে, কিন্তু সৌগতর দৃঢ়তার কাছে হার মেনে মামু রাজী হয়। ওরা চলে যাবার পর মা সব্জীর দাম তিনি যা দিয়েছেন, তার সঙ্গে এখানের বাজারদরের একটা হিসেব করতে চাইলে ছোটভাই বাবুল বলে, 'দিছত মা আড আনা। একডা চাল কুমড়ার দামই আড আনার বেশী। হ, ঠকাইয়া যাও।'

সমস্যার একটা নতুন চেহারা এখানে আমরা দেখতে পাই। উপজাতি জনসমাজ বাঙালীর আধিপত্যে দিশাহারা, আবার তাদেরই শহুরে শিক্ষিত অংশ, সহজ সরল পাহাড়ীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

সৌগত ক্রমশঃ মামার কাছে শিখতে থাকে তিপ্‌রা ভাষা তার মাতৃভাষা। বন্ধু বিমল তির্যকভাবে তাকে বলে, নিজের ভাষা না জানলেও শুধু ট্রাইবেল বলেই সে চাকুরী পাবে। কিন্তু সত্যি যেদিন সৌগত চাকুরীর ইন্টারভিউ দিতে গেল, নিয়োগ কর্তা প্রথমেই জানতে চাইলেন তার মাতৃভাষা কি? 'আমরা বাংলা ভাষার কথা বলি', এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলেন। 'ত্রিপুরী। সারা ঘর দমকা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।' এই ভাষা সে জানে কি না, এর উত্তরে সৌগত বলতে যাচ্ছিল সে মামুর কাছে শিখছে, একবার শেখা হয়ে গেলেই মাথা উঁচু করে । কিন্তু 'হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো তার সমস্ত কথা পাঁচটা বিরাট গহ্বর দাঁতের আঁকশি দিয়ে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে।' এই সমবেত হাস্যরোলে সামিল হয়েছেন তার এক দূর সম্পর্কিত কাকাও, যিনি যোগ্যতা বলে টেবিলের ওপাশে বসেছেন।

উদাসীন উদ্‌ভ্রান্ত সৌগত বাড়ী ফিরে দেখল মামু বসে আছে। 'কঠিন পোষণ মামুর কব্জি চেপে ধরে সৌগত এতক্ষণ বলল -'

আন নিনি অর তুলাঙগই থাংদি আং আবন তংনানি- -আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল না — আমি ওখানেই থাকব।'

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু গল্পকার আরেকটু এগিয়ে গেছেন। মামু সৌগতর ভাবভঙ্গী অবাক চোখে দেখছিল। একথা শুনে সে 'হ হ করে হাসতে থাকল। হাসতেই থাকল। তার পরিষ্কার মুখের অন্ধকার হাঁ ক্রমশঃ বিস্তৃত। বিস্তৃত। স্থির। সৌগত বলল, -- বিশ্বাস কর।'

চাকুরী প্রার্থী সৌগতর অভিজ্ঞতার বর্ণনায় গল্পকার কিছুটা অতিকথনের আশ্রয় নিয়েছেন। সমস্ত গল্পে তিনি জীবন বাস্তবের বিশ্বস্ত রূপকার। কিন্তু সমাপ্ত অংশের এই নাটকীয়তা গল্পের গাঢ়তাকে সামান্য তরল করে দিয়েছে। আর গল্পের সর্বশেষ বাক্যটি বাহুল্য মাত্র। এটি বাদ দিতে পারলে ছোটগল্পের উপযুক্ত সমাপ্তি পাওয়া যেত। তবে এই ছোটখাট বিষয়গুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী' গল্পে এ রাজ্যের শ্রেণীবিভক্ত মানুষ তাদের আশা-নিরাশা, চাওয়া-পাওয়া, রাগ-দুঃখ সবকিছু নিয়ে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে এসেছে।

'সীমানা' গল্পের মনমোহন গ্রামের মহাজন কনাই পালের লোভের গ্রাস থেকে সামান্য চাষের জমিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। জমিতে ফসল হল না, প্রচণ্ড খরা। পাথরে সিঁদুর লেপা মা শুভচণ্ডীকে ভাবে তোলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে সারাদিনে কেজিখানেক চাল পায়। কিন্তু অবসন্ন শরীর টানতে না পেরে গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নেবার ফাঁকে চুরি হয়ে যায় চালের থলি। উদ্‌ভ্রান্ত মনমোহন ভাবে পাষাণী মা শুভচণ্ডী' আর বুকের মধ্যে একভার পাষাণ নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। পথে জনস্রোত, পালের বাড়ি বাসন্তী পূজা। অষ্টমীর সন্ধ্যায় খিচুড়ি লাবড়া দিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাবে কানাই পাল। মনমোহন কোনমতে কাঁধের শুভচণ্ডীর ঘর নামিয়ে জায়গা দখল করে উপোসী বৌ-ছেলেকে আনতে বাড়ি ছোটে। ফিরে আসতে আসতে 'মানুষের জমাট বাঁধা কপাটে সারাটা গেট আটকে আছে। মনমোহন সুবল সুবলাকে দুই ডানা দিয়ে শরীরের সাথে লেপেট ধরে। শরীর শিলা খণ্ডের মত শক্ত করে কাত হয়ে জমাট মানুষে ফাটল ধরিয়ে ভেতরে ঢুকতে থাকে।' তার নিশানার শুভচণ্ডী দেবী কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত কানাই পাল বিড়বিড় করে 'এত লুক, হালার এত লুক।' মণ্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে রাখা খিচুড়ীর পাত্রগুলির দিকেই সকলের লোলুপ দৃষ্টি। পুজো শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে — পালের এই নির্দেশের পরোয়া না করে মণ্ডপের সীমানা নির্দিষ্ট করা বাঁশের ওপর দিয়ে ওই খিচুড়ির কাছে পৌঁছাতে চায় অগুন্তি উপোসী মানুষ। সুবল, সুবলার সঙ্গে মনমোহনও একসময় বুক দিয়ে বাঁশ ঠেলতে থাকে। একটু পরেই 'বাঁশের বাঁধুনি খুলে গিয়ে কাঙ্গালীদের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ জলস্রোতের মত হুড়মুড়িয়ে খিচুড়ীর পাত্রে গিয়ে পড়ে।'

পেটের খিদে মেটানোর জন্য মানুষকে যে কতো রকমের পথ নিতে হয়, জীবন আর জীবিকার এই বিচিত্র সম্পর্ক জাল মানস 'শিবঠাকুরের দয়া' গল্পে একেবারে ভিন্ন দিক থেকে নিয়ে এসেছেন।

আনন্দ তার বিধবা মেয়ের নয় বছরের ছেলে শ্রীদামকে গাজনের শিব সাজতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু শ্রীদাম ভয়ে কেঁপে ওঠে। গতবছর সে একজনকে শিবঠাকুর সাজতে দেখেছে। 'একটা লম্বা লোহার শিকের এক প্রান্ত মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে গাল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। শিকের দু'প্রান্তে জবাফুল আটকানো, মুখ বেয়ে কষের ধারা।' শ্রীদামের ভয় দূর করতে আনন্দ হাত দিয়ে নাতির পিঠ চাপড়ায়। — 'আরে-র' র'। হুনছ্না। ভাত খেতে পাবি, দেখছ্ নাহ শিবু কত চাল লইয়া ফিরত, কত ট্যাহা। তোরে টাউনের মাইন্‌ষে পেন্নাম করব। তুই ঠাউর অইবি। তুই খাইবি, তুব মা খাইব, আমরা হগগলে ভাত খামু, এত্তো এত্তো। . . কত বাত, মাছি বইরা থাকব কালা অইয়া, হক্কাল বেলা পান্তা করুন, হুক্না মরিচ পুড়া দিয়া হেই ভাত খাবি, আমরা হক্কলে খামু। ভাতের খেবানে বলদা দুইডা পাকের ঘরের দুয়ারে আইয়া মাথা তুইল্যা দাড়াইব। ছড়াইয়া মাহঝখানে ফাক কইর‍্যা তেতুলের জল ঢাইল্যা মাখবি। খাইতে খাইতে আয়রান অইয়া যাবি।' — ভাত খাওয়া নিয়ে এ যেন অন্তহীন সুখ স্বপ্নের রূপকথা। মহাশ্বেতাদেবীর 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে জটী ঠাকুরাণীর ছেলের ভাতের প্রতি সেই অমোঘ আকর্ষণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

'জীবন' গল্পে জেলে নিকুঞ্জন যন্ত্রণা মানস নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মাছ ধরতে গিয়ে জালে আটকে পড়া বিশালমাছের ঘায়ে ডান কাঁধে চোট পায় নিকুঞ্জ। সে আর কখনো জাল বাইতে পারবে না, এই দুঃখ কিছুটা ভুলে থাকতে বাড়িতে টুকটাক কাজ করে, ছোট্ট এক চিলতে জমিতে তরিতরকারী লাগায়, নাতির দেখাশোনা করে। সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ায় বৌমাকে টাউনে বাবুদের বাড়ি কাজ নিতে হয়েছে। তার গোটা কয়েক জাল রয়েছে। নিজের হাতে বোনা, কত স্বপ্ন আর কত সাধ এই জালের সুতোর ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে রয়েছে তা নিকুঞ্জ ছাড়া আর কেউ বুঝে না। ছেলে প্রায়ই জাল

বিক্রি করে দিতে বলে। কিন্তু সে রাজী হয় না। মাঝে মাঝে সে নদীতে ছিপ ফেলে কিন্তু জাল পাওয়ার সে আনন্দ অধরাই থেকে যায়। একসময় নিকুঞ্জ অসুখে পড়ে আর টাউনের ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসে ছেলে বাপের সামনে দাঁড়ায়. 'মাখন তোমার জাল দুইডা নিত আইছে। টাউন যা' অনের আগে আগুরি হের কাছ থিকা দাম লইয়া লইছি।' নিকুঞ্জ একটুও চমকায় না। জীবনের দাবী নিঃশেষে মিটিয়ে দিতে হবে। ওই ছেলের আনা বড়ি 'দু-আঙুলের ফাঁকে ধরে মুখ ভর্তি জলে ফেলে দিয়ে দ্রুত ঢোক গেলে নিকুঞ্জ।'

শহরবাসী চাকুরে বাবুদের সুযোগ সন্ধানী মানসিকতার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে 'পাঁচ টাকা দশ টাকার গল্প' গ্রন্থের নাম গল্পের গ্রাম্য দিনমজুর রসময়। পিকনিক করতে আসা দলের রসময়কে রাজী করালেন পাঁচ টাকা দেবেন এই কড়ারে। রসময়ের মাথায় পিকনিকের যাবতীয় জিনিসপত্রও তুলে দিলেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে তিনি তিন টাকা দিয়েই রসময়কে প্রায় তাড়িয়ে দিলেন। একটু পরেই দেখা গেল সবকিছুই রয়েছে কিন্তু দেশলাই আনা হয়নি। জনবসতি দোকানপাট থেকে দূরে জঙ্গলে নিরুপায় এই দলটির মুখপাত্র অনিমেষ তখন অদূরে বসে বিড়ি ধরাতে থাকা রসময়ের কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল। তখন 'রসময় হাতের মুঠিতে দেয়াশলাইটা শক্ত করে চেপে ধরে সোজাসুজি অনিমেষের চোখের দিকে তাকায়, বলে, — দশ ট্যাহা লাগব। আগাম দ্যান।' এসব গল্প স্থানীয় সমস্যা নিয়ে লেখা হলেও আবেদনের গভীরতায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে ত্রিপুরার গল্প জগতে কবিদের আনাগোনা শুরু হয়। ছোট গল্পের সঙ্গে কবিতার অন্তঃস্বরূপের গভীর ঐক্য থাকায় এই ঘটনাকে অভিনব বলা যায় না। তবুও, কবির কলমে লেখা গদ্য আমাদের উপলব্ধিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে, এই স্বীকৃত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছেন এমন কবি গল্পকার এ রাজ্যে তেমন নেই। ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ছোটগল্পেরও এক মনোযোগী শিল্পী। গল্পগ্রন্থ 'জঙ্গম' ছাড়াও বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পে বিষয়ের বৈচিত্র্য দেখা যায় কখনো কখনো। আবার পরিচিত জীবন পরিচিত জগৎকেই নতুনভাবে তুলে ধরেন কোনো কোনো গল্পে। তবে কাব্যের মৃদু নির্যাস দিয়ে বাস্তবকে মুড়ে দিতে চান নি তিনি। বিচিত্র জীবনকে তার স্বরূপে প্রকাশ করাই গল্পকার কল্যাণব্রত'র লক্ষ্য। দেশভাগের আগের পূর্ববাংলার গ্রাম তাঁর চেতনার গভীরে শেকড় গেড়ে আছে। বাস্তুহারার যন্ত্রণা ও সেজন্যই তিনি পরিমাপ করতে পারেন সহজেই।

মদন ফকিরের বাপ মরবার আগে 'মোটা রঙীন পুঁতির মালা তুলে দিয়ে গিয়েছিল ওর হাতে। ওটাই জোত জমি, ওতেই যাদু। একটা তামার পয়সা দিয়ে ক্রীতদাসের স্বত্ত-ভোগ-দখল কিনে গিয়েছিল বাপের কাছ থেকে।' এক সময় সেই ক্রীতদাস নবাবের দৌলতে তার দরজায় হাজার মানুষ পিল পিল করে আসতো। কিন্তু কেন যে তিনি পুরুষের কেনা গোলাম নবাবকে আর বশে রাখতে পারল না সে নিজেই জানে না। এই নবাব তার বাপের ভাষায় 'মক্কেল' 'এর বড় কষ্ট, বড় হাহাকার। শরীরের লাশটা নেই — অথচ লাশ থাকবার সময় যত লোভ, যত রাগ ইচ্ছা ছিল — সব তেমনি থাকে। তৃষ্ণায় বুক ফাটলেও জল খেতে পারে না। পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারে না বলে এর ঘাড়ে তার ঘাড়ে, এসে ভর করে।' এখন মদন তার মনিব নয় — শত্রু মদনকে এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে দেখলেই সে তাকে জেরে ফেলবে। তাই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, হাতে পুতির মালা জড়ানো ছোট লাঠির মাথায় ঘুঙুর বেঁধে, মদন কেবলি হাঁটতে থাকে, ছুটতে থাকে, আর ভাবতে থাকে। — 'কিমতে যাম। কন্ডেওন আঁই কনে যাম আঁই মইবাম, এ্যাইমতে মইবাম। খাঁডাই থাই এর জাঁতি মাইত্তো চাঁয়, চুডিতচাঁপি ধরি গলা' জোন টানে এর — টানে এর ছিঁডি লাইতো চাঁয়। অ'ইন্দার কবি আর গেঁচর লই যাঁইত চাঁয়। কিমতে যাম, আঁই কনে যাম।' — অপরিচিত এই ভাষার দূরত্ব পেরিয়ে মদনের অস্তিত্বের সংকটের কাছাকাছি যেতে বেশি সময় লাগে না। অশরীরির সঙ্গে থেকে থেকে সে নিজেও যেন সকলের কাছে অমনটাই হয়ে গেছে তার ভয় দুঃখ সমাজের কাউকে স্পর্শ করে না। এই অসীম একাকীত্বকে সঙ্গী করে মদন পথ চলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জন বসতিহীন নির্জনতায় 'হয়া বিসমিল্লা রহমান এবরাহিম' হাঁক পেড়ে মদন ভয় তাড়াতে চায়। পাতলা

কুয়াশার মধ্যে মদন দেখে কে যেন তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুটা ভরসা পায় সে। কিন্তু লোকটা এখানে এলো কি করে, এ প্রশ্ন মনে জাগতেই মদন ছুটতে লাগল। 'মদন ফকির পালাচ্ছে। কোথায় যাবে মদন? মদন এভাবে খুন হতে চায় না। মদন খালি নিজের মতো নিজে মরতে চায়।' — এই গল্প 'আসঙ্গ'। বিষয় যেমন প্রচলিত ছকের বাইরের, বর্ণনায়, শব্দ ব্যবহারেও কিছুটা নিজস্বতার ছাপ রয়েছে। প্রায় না শোনা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে গল্পের স্থানিক চরিত্র ফুটে উঠেছে।

'অবতরণের বেলা' গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে — 'মহারাণী সত্যবাণের গাছ হতে পারল না। কারণ ওর ডালপালা নেই। ফুলের পাপড়ি নেই। পাতা ঝরাবার দুঃখ নেই। আকাশ নেই বলে মহারাণী পাখি হতে পারল না।' — গল্প শুরুর এই নতুন ধরন, সহজেই পাঠককে উৎসুক করে তোলে। কিন্তু উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে নির্বাণরা সামান্ত গ্রাম মাধবপুরে আশ্রয় নিয়েছিল। কিশোর নির্বাণের খেলার সাথী ছিল দয়াল, প্রমিলা আর মহারাণী। চঞ্চল কিশোর মহারাণীর গাছ হবার বড় সাধ ছিল। আবার 'ইচ্ছে করলেই তো এ পুকুরের জলে ঘুরে বেড়াতে পারি। পাখি হয়ে যেতে পারি' — এমন কথাও সে অবলীলায় বলে যেত। বিয়াল্লিশ বছর পর শহরবাসী নির্বাণ বন্ধু সুহাসের সঙ্গে সেই গ্রামে এসেছে। এত বছর পরেও চারপাশের প্রকৃতি ঠিক একই রকম, প্রকৃতির জরা নেই। আর সকলেই বদলে যায় কুঁড়িয়ে যায়। মহারাণীর খবর নিতে সে খুঁজে বার করে সেই পুরনো ভিটে বাড়ি কিন্তু মহারাণীর ভাই দয়াল জানাল মহারাণীর বিয়ের পর যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে একসময় বন্ধ হয়ে গেছে। সে শুনেছে নিঃসন্তান মহারাণী খুব কষ্টে আছে। যাকে দেখতে, যার কথা শুনতে নির্বাণের এত আকুলতা, যাকে সে ভাবতে অপুর বোন দুর্গারই অন্যরূপ, সেই মহারাণীর কষ্টের সংবাদটি নির্বাণকে কেমন যেন নির্বাক করে দেয়। ফেরার পথে নির্বাণভাবে 'আসলে জগৎ সংসারের আবহমান নিয়মেই যা কিছু হয়। আবেগ, আসক্তির জন্য কষ্ট পায় মানুষ। সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করল নির্মাণ।' — স্পষ্টতঃই গল্পের কাহিনী এবং পরিণতিতে কোনো ইংগিতময়তা বা ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে না। সম্ভাবনা কিন্তু ছিল।

'জঙ্গম' সম্ভবতঃ কল্যাণব্রতর শ্রেষ্ঠ গল্প। মানুষের মনোলোকের গহন জটিলতার কিছুটা আভাস এই গল্পে রয়েছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিষয়ে ও আঙ্গিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা তখন যে স্বল্পসংখ্যক গল্পকার শুরু করেছিলেন, কল্যাণব্রত তাঁদের অন্যতম।

একটি পত্রিকার প্রুফরীডার সোমনাথ পাগল স্ত্রীকে ভালো করার সমস্ত চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে দাখিল করে দিয়েছে। তখন যে পাগলামির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্ত অসুখ। মালতী ছ'দিন ধরে হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন। নিতান্ত সাদামাটা, দুশ্চিন্তা আর দারিদ্র্যে কুঁজো হয়ে যাওয়া সোমনাথ কবিতা লেখে মাঝে মধ্যে, পাড়ার দুর্গাপূজার স্যুভেনির ছাড়া যে কবিতার আর কোনো জায়গা নেই। 'কারোর কাছে নিজের দুঃখের কথা বলেও না সোমনাথ। নিজের কবিতার কাছেও না।' সোমনাথের মনিব মোহিত একটি স্কুলের সভায় সভাপতি হয়ে গেলে সোমনাথ কাছেই তার বাড়িতে মোহিতকে নিয়ে যায়। কালো, বেঁটে, ছোট চুলের একটা মেয়ে চা নিয়ে এলো। স্বাস্থ্য ভালো থাকায় আর প্রাণোচ্ছলতার গুণে কুৎসিত মনে হয় না। ছেলে কোথায় জানতে চাইলে সোমনাথ জবাব দেয় 'ও পিসির বাড়ি গেছে। ভাবছি শ্রাদ্ধের আগে ওকে আর আনাবো না।' — 'একটা মানুষ না হয় বাঁচবেই না। তা বলে এভাবে বলতে হয়?' মোহিতের এই ভাবনা বাকি না হতেই সোমনাথ আবার বলে 'ভাবছি মালতীর একটা কিন্যা হয়ে গেলে ওকে স্থায়ীভাবে এখানে নিয়ে আসবো।' মোহিতের অস্বস্তি বাড়তে থাকে। এই মেয়ের বয়সী মেয়েটাকে সোমনাথ বিয়ে করবে? কিন্তু পরক্ষণেই মোহিত জানতে পারে সুহাসী নামের এই হাসামুখী মেয়েটি বোবা। বাবা-মা নেই, গরীব ভাই বোনটাকে এখানেই বিয়ে দিতে চায়। মালতীর সম্পর্কিত বোন এই সুহাসীর কাছে ছেলে নকুল ও ভালো থাকে? সোমনাথ উদাসীন ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিল, কিন্তু মোহিত যেন ধাক্কা খাবার মতো চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। বেরিয়ে যাবার মুখে সোমনাথ মোহিতকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে গেল ছোট একচালার ভেতর। এই প্রথম সোমনাথকে যেন একটু উৎসাহিত দেখা গেল সন্ধ্যার

অন্ধকাবে সোমনাথেব কথা শোনে — 'এ ঘবেই মাল্তীব শেষ ক'টা দিন কেটেছে। হয বেঁধে বাখতাম, না হয আটকে বাখতাম। এখন তো আব   গলা ভ'ব হযে আসে ক্রমশঃ। মোহিত ভাবে, কী দেখাবে সোমনাথ? গল্পেব সমাপ্তিটুকু লেখা থেকেই তুলে আনতে পাবি — ' দেখুন স্যাব।'

— হঠাৎ টর্চ জ্বলে উঠলো। মোহিত দেখলো বাশি বাশি খড়, শুকনো পাতাব ভেতব সাবি সাবি ডিম সাজানো বযেছে। মুবগীব ডিম। এক মুহূর্তে উবু হযে ডিমেব গাযে কান পেতে কি শুনতে চাইলো সোমনাথ। 'সময হযে গেছে। বাচ্চাগুলো একে একে ডিম ফেটে বেরুবে। সূর্যেব আলো লাগতে নেই, -- তাই এমন যত্নে বেখেছি। স্যাব আমি বললাম, একটাও মববে না, দেখবেন স্যাব, একটাও না।' দুর্জ্ঞেয আলো মনুষ্য চবিত্রেব জটিল বিন্যাসেব ওপব লেখক যে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ কবেছেন, গল্পেব ভুবনটি তাতে উজ্জ্বল হযে উঠে।

বাজধানী আগবতলাব বাইবে, বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকায, মহকুমা শহবে বা গ্রামেও সাহিত্যচর্চাব সূত্রপাত লেখাব বিষযে বা বক্তব্যে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায না মানিক চক্রবর্তী এই ধাবাব একজন শক্তিশালী গল্পকাব। আগবতলা থেকে বহুদূবে উত্তব ত্রিপুবাব কৈলাশহবে বাস কবেও ত্রিপুবা এবং ত্রিপুবাব বাইবেব অনেক পত্র পত্রিকাব সঙ্গে তিনি সাহিত্যচর্চাব সূত্রে জড়িত ছিলেন। তাঁব প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অবিনাশেব চাবি', ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হযেছিল। তাঁব অকালমৃত্যুব পব ১৯৯৬ সালে বেব হয 'নির্বাচিত গল্প'। গল্পেব পাশাপাশি কবিতাও লিখতেন তিনি। গল্পেব অন্তবঙ্গ ও বহিবঙ্গ স্বভাব নিযে নাড়াচাড়া কবাব দিকে তাঁব ঝোঁক ছিল। তবে এই পবীক্ষা নিবীক্ষা খুব কম গল্পেই সদর্থক ভূমিকা নিতে পেবেছে। 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থে আটটি গল্প বযেছে — 'ঘুন পোকা ও পদম বাহাদুবেব হাসি', 'বিজযেব অনুতাপ এবং প্রতিবোধ', 'তিনজন অবিনাশ এবং শিম্পাঞ্জী,' 'পবাজিত লোকটা এবং আগামী দিন,' 'অবিনাশ এবং সেই চাবি', 'পর্যটক প্রাণেশবাবু এবং সঙ্গিনী', 'সুপ্রকাশেব মানস ভ্রমণ', 'নিখিল এবং শব্দেব হাতিযাব।' গল্পেব নামকবণেব বেলাযও মানিক অনন্যবকম।

তাঁব বেশিব ভাগ গল্পের চরিত্রই একটা বিশেষ বাজনৈতিকবোধেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত। আমবা জানি, এসব ক্ষেত্রে দাযবদ্ধ লেখক কিছু সংকটেব মুখোমুখি হন। সচেতন আত্মপ্রত্যয নিযে সেই সংকটেব মুখোমুখি হন সচেতন আত্মপ্রত্যয নিযে সেই সংকটেব সীমাবেখা পাব হতে পাবলে তবেই তাঁব বচনা সাহিত্যেব প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকাব পায। মানিব চক্রবর্তীব গল্প পাঠে মনস্ক পাঠক বুঝতে পাবেন গল্পকাব প্রাযশঃই সেই গণ্ডি থেকে বেবিযে আসতে পাবেন নি। গল্পে যে সম্ভাবনাব বীজ ছিল, উপস্থাপনাব কাবিকুবি থাকলেও তাবা সতেজ শস্যে পবিণত হযনি। কিন্তু যেখানে তিনি সে দ্বিধা কাটিযে উঠতে পেবেছেন, বা ভিন্নতাব বিষয বেছে নিযেছেন, যেসব গল্পে তাঁব শক্তিব পবিচয পাওযা যায।

'ঘুনপোকা ও পদম বাহাদুবেব হাসি' গল্পেব উত্তমপুরুষ বক্তা সন্দেহ আব অবিশ্বাসেব ঘুন পোকায কুবে খাওযা বুক নিযে সুবাতাসে বাঁচাব আশায পাহাড়ে এসে প্রকৃতিব অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হযেছেন। চা-বাগানেব ঢেউ খেলানো সবুজ গালিচাব ভেতব দিযে সঙ্গিনীকে নিযে হাঁটতে গিযে দেখলেন গাছেব ডালে অতিকায বাদুড়েব মতো একটা গ্যাস বেলুন লটকে আছে। দামী বিদেশী জিনিষ ভর্তি ছিল সেটা। সবাই লুটোপুটি কবে, ভাগাভাগি কবে নিযে গেছে। তিনি পেলেন একটি পুস্তিকা, যাতে লেখা আছে ' ভাবতবর্ষেব স্থানে স্থানে ধর্মদ্রোহী কমিউনিস্টগণ জাতি বিদ্বেষ ধর্মবিদ্বেষ বীজ বপন কবিতেছে ভূমি সন্তান আপনাবা অপবেব দাসানুদাস হইযা আব কতদিন কালাতিপাত কবিবেন? ' এব ক'দিন পবই এক ভোববেলায হৈ চৈ শুনে ঘুম ভেঙে কথাবার্তা, কাবো হাতে বা শাণিত কুকবী এদেব মধ্যে বযেছে তাদেব বিশ্বস্ত অনুগত সেবক কুশবাহাদুবও। সে-ই এসে জানাল বাগান ছেড়ে চলে যেতে হবে। 'ভূমিসন্তানেব অধিকাব প্রতিষ্ঠাব জন্য ওবা আন্দোলনেব ডাক দিযেছে। বাগানে স্ট্রাইক ডাকা হযেছে। ওদেব দাবি গোর্খাল্যান্ড। সুজযা দেখলেন দেযালে আলকাতবা দিযে লেখা হযেছে 'জয গোর্খাল্যান্ড — সুভায ঘিসিং জিন্দাবাদ।' — শৈলশহবেব এই উদাব প্রশান্তিতেও ঘুর্ন পোকাবা তাঁব বুক কুবে খেতে শুরু কবে। একটা সমঝোতাব চেষ্টায এগিযে যেতে গিযে স্ত্রীব কাছে বাধা পান তিনি। আব কুশ বাহাদুবেব ছোট্ট ছেলেটা তাব মাযেব কোলে শব্দ কবে হেসে উঠে। পদম বাহাদুবেব 'পুতু পুতু ছেট

চোখ প্রায় ঢেকে গেল। কচি মুখ থেকে জল তবঙ্গেব মতো হাসি ছড়িয়ে পড়লো সাবা শবীবে।' — গল্প শেষের এই হালিব জলতবঙ্গ কিন্তু গল্পের শবীব থেকে বাজনীতিব কটু গন্ধ মুছে দিতে পাবে নি।

'বিজয়েব অনুতাপ এবং প্রতিবোধ' গল্পেব উৎসে বয়েছে পৃথিবীব প্রথম আণবিক বোমা 'ছোট খোকা'ব নির্মাণ এবং তাব ধ্বংসলীলা। বহু বছব পব সে কালান্তক মাবণ বোমাব আঘাত হানাব দিনটিতে একদল বৈজ্ঞানিক গেলেন অভিশপ্ত সেই জায়গাটিতে, প্রার্থনা ও অনুতাপ জানাতে। ১৬ই জুলাই, ভোব পাঁচটা বেজে উনত্রিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড, প্রাণঘাতী সেই মুহূর্তে সমবেত জনতাকে হিংসাব বিরুদ্ধে সবব হতে, সক্রিয় হতে আহ্বান জানান বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক একদিন যাঁব প্রতিভা নির্দয় খুনীদেব কাছে নতজানু হয়েছিল দলেব কনিষ্ঠতম সদস্য বিজয় বিশ্বাস মনে মনে উচ্চাবণ কবেন ঃ

'তববাবি ফেলে দিয়ে শোষকেব দল

মুখোমুখি হবে এসে শেষ বিচাবেব '

কিন্তু বুম্ বুম্ বুম্ বুম্ শব্দে তিনি শিহবিত হয়ে ওঠেন। 'লাতিন আমেবিকা, আফ্রিকা এশিয়া, লেবানন, ইবান ইবাক, কাম্পুচিয়া ভিয়েতনাম সিয়াচীন ' বিজয়েব শবীব ক্রমশঃ বড হতে হতে বিশাল পাহাড হয়ে যায়। অগুণতি বুলেটেও তাকে বিদ্ধ কবতে না পেবে হতাশ বন্দুকবাজেব দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান তিনি।

'চেয়াবে বসে আছেন বিজয় বিশ্বাস। হাতে মানুষেব ইতিহাস।' ইতিহাসকে সাহিত্যে তুলে আনতে গেলে তথ্য ও সত্যেব যে মেলবন্ধন জরুবী, গল্পটিতে তাব অভাব বয়েছে।

'পবাজিত লোকটা ও আগামী দিন' গল্পেব শাসক শক্তিব নিষ্পেষণে, সিসা আব এসমেব অস্ত্রহাতে মালিকেব বশংবদ যন্ডামার্কা লোকটা মজুবদেব বিবাট নিশ্চিল থেকে মেঘ গর্জনেব মত উঠে আসা আওয়াজ দুনিয়াব মজদুব শুনতে শুনতে আব জন সমুদ্রেব স্রোত দেখতে দেখতে হঠাৎ বামনেব মতো ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায় বাতাসে। আব সে চলে যেতেই বদ্ধ ঘবেব ভেতব —

'নকুলেব বলিষ্ঠ হাত দবজাব ছিটকিনি স্পর্শ কবে ফুলমণিবও।

১৯৭৮ সালে লেখা এই গল্পে সেই কঠিন সময়কে ধবে বাখতে চেয়েছেন লেখক। 'যা কিছু কবা চলবে না, ধমঘট কবা চলবে না, আমাব নাম নিয়ে ওঠবোস কবতে থাকো, সুবোধ বালক হয়ে থাকো' এই কড়া নির্দেশ এবং তাবই প্রতিক্রিয়াব গণজাগবণেব চিত্রটি মোটা দাগে এঁকেছেন তিনি। শিল্পীব স্বাধীনতা, শিল্পেব শালীনতাব কতোখানি বক্ষা কবতে পেবেছে সে বিচাবে যান নি।

১৯৮৩ সালে লেখা 'অবিনাশ এবং সেই চাবি' আব ১৯৮৫ তে লেখা 'নিখিল এবং শব্দেব হাতিয়াব' গল্প দুটি প্রায় কাছাকাছি বিষয় নিয়ে লেখা। লেখাব ধবন, ভাষা ভঙ্গী অনেকটাই একবকম। আব দুটি গল্পেই বেশ কিছু অংশেব বর্ণনা আব ভাষায় একেবাবে হুবহু মিল বয়েছে। এব কোনো কাবণ গল্পকাব জানান নি বলে আমাদেব কৌতূহল নিকত্তব থেকে যায়।

ঠিক তেমনি 'সুপ্রকাশেব মানস ভ্রমণ' গল্পটিবই বর্ধিত রূপ 'অস্থিব অশ্বখুব' নামেব ত্রিপুবাব নির্বাচিত বাংলা গল্প সংকলনেব অন্তর্ভূত 'একদা অন্ধকাবে' গল্পটি। 'একদা অন্ধকাবে'তে কাহিনীকে আবো টেনেছেন লেখক। অচেনা পথেব শেষে বিকাশ (প্রথম গল্পেব সুপ্রকাশ) এসে পৌঁছুল ঠিকানায়। তাদেব বাড়িতে ছোট থেকে বড হওয়া নন্দলাল কুর্মি এখানে 'নন্দদুলাল ব্রাহ্মণ'। নন্দলাল পৈতা দেখিয়ে ছোট ম্যানেজাব পান্ডেজিব সমতায় উঠেছে। 'পৈ তেটায় সবসময় একটা ফুবফুবে সুখ লেগে থাকে।' কিন্তু বিকাশ তাকে 'চেনা বামুনেব পৈত লাগে না' — মনে কবিয়ে দিলে নন্দ এক নতুন বোধে উদ্দীপ্ত হয়। কত কত মানুষ পৈতে ছাডাই বেঁচে বর্তে আছে। ব্যাপাবীব ধন এই পোশাকী চাদবেব কোনো দাম নেই — ভাবতে ভাবতে নন্দলাল পৈতে খুলে ফেলে। এক আলোকময় তৃপ্তিতে ওব শবীব মন ভবে যায়। গল্পেব

শরীরকে দীর্ঘায়িত করার একটিমাত্র কারণ খুঁজে পাওয়া যায় — পৈতার অসারত্ব প্রমাণ। কিন্তু গল্পত্বের নিরিখে ভালো লাগে প্রথম গল্পটিই।

'তিনজন অবিনাশ এবং শিম্পাঞ্জী' মানিক চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ গল্প। অবিনাশ — সুমিতার স্বামী আর তুতুলের বাবা অবিনাশের — মনোবিকলনের নিপুণ ছবি তিনি এই গল্পে উপস্থিত করেছেন। অন্তর্ভাবনার দহন মানুষকে কিভাবে ছাই করে দেয়, আধুনিক সভ্যতা আভিজাত্য আর জৌলুসে ভরা মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখে তার জান্তব চেহারা, গল্পকার তন্নিষ্ঠভাবে অবিনাশের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সব দেখিয়েছেন। গ্রাম্য সহজতার, ভণিতাবিহীন সারল্যের অন্য নাম 'মাসবীপুরের গন্ধ' — অবিনাশ সহ্য করতে পারে না বলে তুলতুলে কন্যা তুতুলের মুখ ছুরির ফলায় চেঁছে নেয় সে, তার তালিকায় সুমিতাই অবশ্য এক নম্বরে। রোদ চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে অবিনাশ তিন চেহারার তিনজন অবিনাশকে দেখতে পায় — মাঝখানের অবিনাশ অনেকটা তার মতো, ডানপাশের মুখটা ধূর্ত পকেটমার বা চোলাই মদের কারবারীর মতো, আর বাঁ পাশের চেহারা রেসের মাঠের জকি বা চিড়িয়াখানার বড়ো শিম্পাঞ্জীটার মতো। মানুষের বিভক্ত সত্তার পরিণতিহীন পরিক্রমা, সবকিছুর মধ্যে থেকেও আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, গল্পের ভেতরে লেখক ধরে রেখেছেন গল্প শেষে অবিনাশের এবং অন্য অনেকের বমির শব্দ অর্থহীন অস্তিত্বের দ্যোতক হয়ে উঠে।

অরুণোদয় সাহার গল্প 'একটি পেরেক ও অন্যান্য শস্ত্র' কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'তে বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালে। 'একটি লোক চাকুরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে জুতোর শুকতলা পর্যন্ত ক্ষইয়ে ফেলে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। তারপর একদিন পেরেক ঢুকে যায় পায়ে। তবু সে বিশ্রাম নেয় না, নানা জায়গায় যায়। সর্বত্রই জোটে প্রত্যাখান — এমন কী প্রেমিকাও বিমুখ হয়। বিধ্বস্ত দেহমনে ঘরে ফেরে সে। আর একা ঘরে তার জ্বরতপ্ত শরীরটা আস্তে আস্তে ধনুকের মতো বেঁকে যায়।' কলকাতার 'দৈহিক বসুমতী' পত্রিকার রবিবারের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'কোকিল কালো' গল্পটি, ১৯৬৭ তে। একটি অন্ধ যুবকের গল্প দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সাহিত্য সাময়িকীতে গল্প লিখলেও এই লেখকের কোনো গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় নি।

বিষয় বৈচিত্র্য, স্বচ্ছন্দ গতিশীল গদ্য, আর সহজভাবে গভীর কথা বলতে পারা, তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তেমনি লক্ষণীয় তাঁর লেখায় প্রেমের গল্পের সংখ্যাধিক্য। ত্রিপুরার গল্পকারগণ তাঁদের যাত্রা শুরুর পরও বহুবছর পর্যন্ত নিখাদ নিটোল প্রেমের গল্প সেরকমভাবে লেখেন নি। ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক জীবন, উপজাতি বাঙ্গালীর সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, পরবর্তী সময়ে আশির দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার চিত্রণ এই সবই গল্পকারদের লেখার মুখ্য উপকরণ হয়ে রয়েছে। প্রেমের গল্প এঁরা যে একেবারেই লেখেন নি তা নয়। কিন্তু সীমাবদ্ধতার দিকটি সেখানে স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত। অথচ, মানুষের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের অপ্রতিহত প্রাধান্য সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, কোনোকালেই ছিল না

প্রেমের অভিঘাত মানুষের জীবনে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, অরুণোদয়ের বেশ কিছু গল্প সেই হৃদয় তোলপাড় করা অনুভূতিকে ধরে রেখেছে। 'উদ্ভিদ', 'অনুরাধা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', 'শ্যালিকা সংবাদ', 'চন্দন কাঠের বোতাম', একেকটি নিটোল প্রেমের গল্প। মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে পাঠক সহজেই চরিত্রের গভীরে পৌঁছে যায়।

উপজাতি জনজীবন, আশির দাঙ্গা তাঁর গল্পেও বিষয় হয়ে এসেছে। সেখানেও জীবনকে তিনি নিজের মতো করে দেখেছেন। 'মংকুরুই' গল্পে এক আদিবাসী যুবকের নিরালম্ব অসহায় অবস্থায় ছবি রয়েছে। সম্ভবতঃ দাঙ্গায় হতাহত মানুষের সঙ্গে সে হাসপাতালে আসে। শহরের উপজাতি ডাক্তার তার নাম জানতে চাইলে সে কোনো উত্তর দেয় না বলে ডাক্তার টিকিটে তার নাম দেয় 'মং কুরুই', অর্থাৎ 'নাম নেই।' নির্বাক মংকুরুই হাসপাতাল থেকে পালায়। তারপর কার্ফু ঘোষিত এলাকার যুবদল, থানায় পুলিশ, পাহাড়ের স্বজাতি সকলের কাছে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হতে হতে এক সময় চলে যায় গভীর অরণ্যের নির্জনতায়। সেখানেই 'বোবা কালা' ঘোষিত মং কুরুই মুখ খোলে — 'আমি কথা বলতে

পারি। কথা সব শুনিও। আমি তোমাদের সবাইকে চিনে ফেলেছি।' বিমানের শব্দে তন্দ্রায় ব্যাঘাত ঘটলে, ঈষৎ বিরক্ত হয়ে অনাবৃত পশ্চাৎ দেশ সভাতার দিকে ফিরিয়ে মংকুরুই পাশ ফিরে আবার শোয়।'

সিনাইহানি স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক গুড়াকেশ ভট্টাচার্য আর সিনাইহানি গ্রামের মেয়ে শিলং পড়ুয়া দেবভক্তি রিয়াং কে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'নষ্টচন্দ্র' গল্প। দেবভক্তির সঙ্গে গুড়াকেশের সহজ মেলামেশায় তার স্বজাতি যুবকেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে এক সন্ধ্যায় গুড়াকেশকে ধরে জঙ্গলে নিয়ে যায়। মুখে রুমাল বাঁধা যুবকেরা, কেউ গুড়াকেশকে মেরে ফেলার পক্ষে আবার কেউ, দু'লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে, শহরে তার বাড়িতে চিঠি দেবে ঠিক করে। কিন্তু কোনোটাই হয় না, দেবভক্তি এসে তার জাতভাইদের ধিক্কার দিয়ে, গুড়া কেশকে লোকালয়ে ফিরিয়ে আনে। সমগ্র গল্পে অনুচ্চারিত প্রেমের মৃদু সুরভি ছড়িয়ে রয়েছে, আবার জীবন বাস্তবতাকেও কোথাও অস্বীকৃত হয় নি। পাত্রপাত্রী এবং বিষয় নির্বাচনে অভিনবত্ব রয়েছে।

উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা গল্প 'রিফিউজী লতা' এবং 'দণ্ডকারণ্য'। পুনর্বাসনের নামে, বাস্তুহারা অগণিত মানুষকে নিয়ে সরকার এবং সুযোগ সন্ধানী লোভীদের পাশা খেলার নিষ্ঠুর সত্য, পাঠকের দরবারে বিশ্বস্তভাবে পৌঁছে দেয় গল্প দুটি। 'শালারা' গল্পের বিষয় হয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার - ইঞ্জিনীয়ারের মিলিত প্রতাপে দিনমজুর গ্রামবাসীর অসহায় জীবন।

ত্রিপুরার মহারাজাদের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চার পুরুষ ব্যাপ্ত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিছু গল্প লিখেছেন অরুণোদয়। 'আবিষ্কার' উত্তরাধিকার, হে অতীত কথা কও' 'দর্পণে কার মুখ' প্রভৃতি গল্পের চরিত্ররা — ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে পাঠকের অন্তর্ভাবনার শরিক হয়ে যায়। বিদেশের পটভূমিকায়ও কয়েকটি গল্প লিখেছেন, তিনি, 'ট্রিশার মুক্তি,' 'বিলাতী জন্ম-মৃত্যু বিয়ে', 'ভেনেজুয়েলার মেয়ে' ইত্যাদি। জীবনযাপন আর ধ্যান ধারণায় পূবের সঙ্গে পশ্চিমের যত দূরত্বই থাকুক না কেন, সত্তার গভীরে মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য নেই, একথাই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে গল্পের পরিণতিতে।

গল্পের আঙ্গিক নিয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষায় না গিয়ে, জীবন যে রকম, সেভাবেই তাকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি।

কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প জীবন শুরু করেছিলেন কমল কুমার সিংহ। পরবর্তী সময়ে আগরতলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ গল্পরই পটভূমি ত্রিপুরার বাইরে, মুখ্যতঃ বিহার এবং আসাম। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আর তাদের প্রতি সংঘটিত বঞ্চনার চিত্র তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে। গল্প রচনায় প্রথাগত রীতির বাইরে যান নি। প্রায় গল্পেই দেখা যায় গল্প জুড়ে গড়ে ওঠা আবহ লেখক শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন না। 'রেশমী', 'ফুলমতিয়ার সংসার' ইত্যাদির গল্পে মাঝে মধ্যে বিষয়ভাবনা ও চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা দেখা গেলেও, ছোটগল্পের গাঢ়বদ্ধ সামগ্রিক প্রতীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে, দুর্বলতা দৃষ্টি এড়ায় না 'ভাইব্রেশন', পোরবন্দরের পরিবেশে এক বাঙালী হয়ে যাওয়া অবাঙালী যুবক, আর বাঙালী শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠা এক অনুচ্চারিত মধুর সম্পর্ক, কিভাবে এক গাড়ী দুর্ঘটনায় অসময়ে শেষ হয়ে যায়, তার গল্প।

বিশ্বজিৎ চৌধুরীর গল্প 'কাকতাড়ুয়ার সুখ এবং দুঃখ', 'শান্তনুর অজ্ঞাতবাস' 'সূর্যাস্তের পর সৃজন', 'স্বর্গের পথে একা' — ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা আর এই পৃথিবীতে অপরিচয়ের অনুভূতি তাঁর গল্পকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে জীবনের জটিলতা কিভাবে মানুষকে তার জালে আটকে ফেলে তা যেমন বিশ্বজিতের গল্পে দেখা যায়, তেমনি মানুষের প্রতিবাদী স্বভাবও গোপন থাকে না। গল্প ভাষায়ও তিনি উল্লেখের দাবীদার। যুক্তি আর আবেগের টানাপোড়েনে গড়া গল্পে, কখনো বা কবিতার নিঃশব্দ পদ সঞ্চার ঘটেছে। গল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বভাবের বিচারে, পূর্বসূরীদের চাইতে ভিন্নপথে যাত্রার বাসনা, লেখকের সীমিত মাত্রায় সফল হয়েছে।

'সমীরের প্রতিদ্বন্দ্বী' এক বেকার যুবকের আত্মসমীক্ষার গল্প, কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে যে নতুন অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক হানাহানির জেরে অকালমৃত দলীয় দাদাকে দাহ করতে একদল যুবক শ্মশানে যায়, সবাই মদ খায়, ভিতরে মাল ভরা বিড়ি টানে। দিদি মল্লিকা, মল্লিকার প্রেমিক মৃণাল, মল্লিকার সহকর্মী সমীরের সঙ্গে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোড়া পুতুল, কন্ট্রাক্টার সুনীল এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই সমীরের আলাদা আলাদা অনুভবের বৃত্ত তৈরী হয়। অনুক্ষণ চেনা মুখের এক অচেনা লোক সমীরকে তৈরী হয়। অনুক্ষণ চেনা মুখের এক অচেনা লোক সমীরকে অনুসরণ করে চলে, ওর কাছে লোকটা কি চায় না ভেবেই সমীর ছুটে পালাতে থাকে।

'কাকতাড়ুয়ার সুখ এবং দুঃখ'। গল্পেও মানুষের আশ্রয়হীন, মমত্বহীন, অসহায় একাকীত্ব ধরা পড়েছে। বুল্লি, যার বাবা, কোথায় যেন চলে গিয়ে, আর ফিরে আসে না, যার মা, বংশিরাম মহাজনের বাড়িতে ধান কাটায়, যার খেলার সাথী মুনিয়া, বারণ না শুনে, তেল কলে কাজ করা তপনের সঙ্গে সিনেমা দেখতে শহরে চলে যায়, সেই বুল্লি কাকতাড়ুয়াকে দেখে, — 'রোদে পুড়ে জলে ভিজে ওর নিঃশব্দ খেতের ভিতরে একা ঠিক বুল্লির মত।' গল্পের সমাপ্তিতে এক ঝাঁক বুনো পাখি আকাশ থেকে নেমে এসে ঠুকরে খায় বুল্লির চোখ মুখ, বুক। আর সে রক্ত মাংসহীন শরীরের দুহাত ছড়িয়ে দেয় উত্তরে এবং দক্ষিণে।

পার্বতী ত্রিপুরা, তার সমস্ত ভৌগোলিক বৈচিত্র্য নিয়ে, গ্রাম, পাহাড়, টিলা, লুঙ্গায় বাস করা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে উঠে এসেছে বিমল সিংহের গল্প উপন্যাসে। রাজনীতি তাঁর পেশা হলেও সাহিত্য সৃষ্টির বাসনা মনের গভীরে নেশার মতো কাজ করে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'আলোর ঠিকানা', ১৯৮৩ সালে এবং '৮৫ তে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মনাইহাম' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লংতরাই', ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া, আরো চারটি উপন্যাস রয়েছে তাঁর। 'আলোর ঠিকানা'য় ছয়টি গল্প এবং 'মনাইহাম'-এ রয়েছে চারটি। তাঁর গল্পে প্রথমেই চোখে পড়ে বর্ণনার নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র বাস্তবতা। প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি পরিস্থিতি, অনুপুঙ্খ যথার্থতা দিয়ে তৈরী করেছেন গল্পকার। যারা আমাদের আশেপাশেই রয়েছে তাদেরও যে আমরা একেবারেই জানি না, বা হয়তো কম জানি, বিমল সিংহের গল্প, আমাদের সেই অসম্পূর্ণতাকে দেখিয়ে দেয়।

'ইভেললেইর মেয়ের বিয়ে' — গল্পের শুরুটা এরকম — 'খলুই নদীর বাঁকের পূর্বদিকে শিয়াল কাঁটার বন পেরিয়ে এক কল্কি তামাক টানার পথ হাঁটলেই এই গাঁয়ের মণ্ডপ।' একটি মণিপুরী অধ্যুষিত গ্রামের মানুষজনই এই গল্পের চরিত্র। মণিপুরী সমাজের নিয়মকানুন, আচার আচরণ, প্রথা বিশ্বাস, সংস্কার, নানা খুঁটিনাটি দিক এতো সুন্দরভাবে, নিখুঁতভাবে অন্য কারো লেখায় ফুটে উঠেছে কিনা সন্দেহ। মণিপুরী মেয়েদের চরকিতে সুতা কাটা, কাপড় বোনার প্রতিযোগিতা উৎসব, ইভেলকেই আর ধনবাবুর প্রাক্ বিবাহ সংক্ষিপ্ত অনুরাগ পর্ব পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখে। ইঙেললেই বউ হয়ে যায় শাউলী গাঁয়ে। কৃষিপ্রধান গ্রামটিতে পূর্ববাংলা থেকে বাঙালী রিফিউজী আসায় জমির দাম আগুন। কঠিন সময়ের চাপে অনেকেই বাড়িজমি বেচে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। বাঙালি প্রভাবেই ইঙেললেইর মেয়ের নাম রীতা। ইঙেললেই কাপড় বুনে পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ের কাপড় বোনার সুতো তারা যোগাড় করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এলাকার শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক ধনবাবু তার মৃদঙ্গ বিক্রী করে, সেই টাকায় সুতো কিনে আনে। বন্ধ জল করা টাকায় তৈরী বড়ো সাধের বাড়াটা, সুযোগ সন্ধানী মহাজন রমাপতি পোদ্দারের হাতে তুলে দেবার শর্তে মেয়ের বিয়ের টাকা যোগাড় করে ইঙেললেই'র স্বামী। রীতা বুঝে এ বিয়ে ওর বাবা মাকে ঘরছাড়া করছে। ছোট ভাই বিক্রমের দিকে তাকাতে রীতার যেন বুক ভেঙে যায়। প্রতিবেশী বুড়ি, রীতাকে বিয়ের পর জামাইকে নিয়ে, পানগুয়া খেয়ে আসার নিমন্ত্রণ জানালেও রীতা স্থির প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বিমলের গল্পভাষা সাদামাটা, তার গল্পের চরিত্রদের মতোই। কিন্তু এরমধ্যেও কখনো, চমৎকার কিছু গদ্য, আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়। 'দীঘির জল স্বচ্ছ, সেই জলে রোজ একদল হাঁস শামুক খুঁজে বেড়ায়, আর আয়না দেখে পালকের মাঝে সিঁথি কাটে।' জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় এই ছবি বেমানান হবে না। কিন্তু 'আলোর ঠিকানা' গল্পের

শুরুতে এই ছবি থাকলেও গোটা গল্প জুড়ে রয়েছে, মহাজনের অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা। একটি গ্রাম্য হাটের বর্ণনাতেও দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। প্রথম গল্পের কাহিনী সূত্র ধরেই গল্পকার এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু প্রথম গল্পের সংহতি এখানে নেই। গ্রামবাসীর প্রতিবাদ প্রতিরোধকে রাজনৈতিক রঙ দিতে গিয়ে গল্পে এসেছে অনাবশ্যক বিস্তৃতি 'ধারে বহে ধলাই' গল্পটির এই একই কারণে সার্থক হতে পারেনি। 'গোলাপের ছেলেবেলা' গল্পে চা বাগানের কুলির ছেলে গোলাপের চোখ দিয়ে দেখা তার জগৎ ও জীবনের অনবদ্য ছবি দেখতে পাই সংলাপের ভাষাও বাগিচা শ্রমিকের একেবারে নিজস্ব। 'বসনের ঠাকুরমা', গল্পে বিমল, একই সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছেন স্বর্গ নরক। ললিত রূপিনীর ছেলে বাঁশিরাম, প্রতিবেশী সুরেন দাসের মায়ের কোলেপিঠে বাড়ে। দুটি পরিবারে মিল যেমন, ঝগড়াও হয় তেমনি দাবানলের মতো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়েও। সুরেনের মা বাঁশিকে বুকে নিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে রক্তপিপাসু দুই যুযুধান শক্তির বর্শার তীক্ষ্ণ ফলায় বিদ্ধ হয়ে যায়। মনুষ্যত্বের অবক্ষয় আর মানুষের মহিমা 'এই অসাধারণ গল্পের কথা শরীর গড়ে তুলেছে। 'জাবেদ আলীর আজান' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়, দেশ ছেড়ে আসা মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, আর শাসক প্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে। 'কাঁসার বাটি', বিমলের অন্য গল্পের সমমানের নয়। বিপথের পথিক', উগ্রপন্থীর ধরে নিয়ে যাওয়া দুটি তরুনের মর্মান্তিক পরিণতির গল্প। বিমল সিংহ যথার্থই একজন সময়, সমাজ ও বাস্তব সচেতন গল্পকার।

সুজয় রায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'এই জীবন, এই দাহ' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। দশটি গল্প নিয়ে তৈরি এই সংকলনের বেশির ভাগই লেখা হয়েছে ষাটের দশকে। 'ক্রমশঃ অন্ধকারে', 'এই জীবন, এই দাহ', 'পুনর্জন্ম', 'বয়ঃসন্ধি', 'ওর ছায়া', 'মৃতের মিছিলে কল্যাণ', 'ঈশ্বরের মৃত্যু', 'দুপুর', 'মানবিক' এবং শেষ বাসের যাত্রী।' প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশের দীর্ঘদিন পর ১৯৯৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শরীর জমিন' প্রকাশিত হয়, 'বধ্যভূমি' নামের তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশ পায় ২০০১ সালে। 'দূরের কুয়াশা' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন সুজয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শরীর জমিন' এ রয়েছে নয়টি গল্প — 'তোষক,' 'কুসুম পাঁচালী', 'এক আয়না, দুই প্রতিবিম্ব,' 'নীল মাছি', 'বাসি ফুল ও বিস্ফোরণ', 'চতুষ্পদ', 'শনি', 'মনোরমার দুঃখ' এবং 'শরীর জমিন'। এসবের বাইরেও কিছু অগ্রন্থিত গল্প রয়েছে নানা পত্র-পত্রিকায়

সুজয় রায়ের গল্প সংখ্যায় অল্প নয়। তবু বিষয় ভাবনায় বা জীবন চিত্রণে সাফল্যের দাবীদার হতে পেরেছে খুব কম গল্পই। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবন বৃত্তেই ঘোরাফেরা করেছেন গল্পকার। পরিচিত জীবনের ছবি গল্পে নিয়ে এসেছেন আন্তরিক যত্নে। 'এই জীবন, এই দাহ' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ক্রমশঃ অন্ধকারে,' এক হতভাগ্য সদ্যমৃত যুবকের স্বগতোক্তি। বিধবা মা যাকে মানুষ করবেন বলে গ্রাম ছেড়ে শহরে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটির বয়স বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, কিন্তু মায়ের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বড় সে হতে পারেনি। পরিবর্তে কুসঙ্গে তলিয়ে গেছে অন্ধকারের জগতে। পুলিশের খাতায় মাথার দাম ধার্য হয়েছে চার হাজার টাকা। ঐ অন্ধকার জগতেরই তথাকথিত এক বন্ধু তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রেমিকাকে, আবার পুলিশেও খবর জানাল তার গতিবিধির পরিণতিতে ছেলেটি এখন রক্তে ভাসা লাশ, সাদা চাদরে ঢাকা, ওডিকোলন ছেটানো শরীরে শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় ছেলেটির নাকে এসে লাগে তার নিজের হাতে লাগানো নিমগাছের মিষ্টি গন্ধ। শৈশবে যে মায়ের আঁচল শান্তি আর নিরাপত্তার বোধ জাগাতো, সেই মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে কেউ নেই, কিছু নেই। উদ্দামী বন্ধুদের কাঁধে খাটিয়ায় চড়ে রওনা হয় ছেলেটি। পাঠকের মনে জাগিয়ে রাখে বিষণ্ণতার বোধ।

নাম গল্প 'এই জীবন, এই দাহ', নিতান্ত সাদামাটা গল্প একটি বেকার ছেলের মানসিক যন্ত্রণার কাহিনী। 'ঈশ্বরের মৃত্যু' গল্পের বেকার ছেলে প্রশান্ত তার প্রেমিকা অপর্ণার কাছ থেকে বিদায় নেয়, কেননা সে বুঝেছে 'প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন যার অনেক টাকা পয়সা, ধন দৌলত, তার প্রেম করা সাজে। আমার মত হৃদসর্বস্বের প্রেম করা অর্থহীন।' বেকার প্রশান্ত কি করে সতেরোশ কর্মচারীর পুরোভাগে থেকে 'আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো বুঝা গেল না। মিছিল দমাতে পুলিশ এল, লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, রণক্ষেত্র

সমস্ত এলাকা একসময় গুরুতর আহত প্রশান্ত চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তুলনামূলকভাবে বড় গল্প 'দুপুর', কিন্তু কোনো বক্তব্য নেই, পাঠককে কোথাও নিয়ে যায় না এ গল্প

'শরীর জমিন' — এর গল্পগুলিতে গল্পকারের পরিণত চিন্তা ভাবনার ছাপ রয়েছে। 'তোষক' গল্পের দোকান-কর্মচারী বিলাস, তাদের বাড়িতে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও দেখে বাবা একদিন নতুন এক তোষক এনে ভাঙ্গা খাটে পাতে। তার মুনিষ-খাটা বাপ ধনামুনি, মনিব বলে, বড়লোক মনিব অবনী শীলের বাড়ি থেকে তোষকটি পেয়েছে সে। বিলাসের বাবা যে প্রায়ই সব্জি চুরি করে, ফল চুরি করে, পুকুরের মাছ তুলে বিক্রি করে দেয়। এ খবর বিলাসকে দেয় অন্য চোররা। বিলাস বাবার দোষ দেখে না, বুঝে এসব দীর্ঘ বঞ্চনার ফল। কিন্তু কি এক অনির্দেশ্য কারণে বাবার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে নতুন তোষকে শুতে রাজী হয় না বিলাস। তার মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ, যেদিন চেরি ব্রীজের তলায়, সমারোহে সঙ্গে অবনী শীলকে দাহ করা হল, তার পরদিনই দলাপাকানো বড় এক পুঁটুলি নিয়ে বাড়ি এল বাবা। আনকোরা নতুন তোষক। বিলাস বুঝে গেছে এ বাবার পাওয়া তোষক নয়, অবনী শীলের অন্তিম যাত্রার তোষক। তাই হঠাৎই যখন বাবা মরে গেল, বিলাস মায়ের, এমন কি প্রতিবেশিদের আপত্তি সত্ত্বেও বাবার বিছানার সেই নতুন তোষক বাড়িতে না রেখে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে তুলে দিল বাবার চিতায়। 'শনি' গল্প এক কঠিন সময়ের পরিচয় দেয়। মানুষের মূল্যবোধ, মায়ামমতা সমস্তই কীভাবে এই কঠিন সময়ের চাপে কর্পূরের মত উরে যাচ্ছে, নিষ্ঠুর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার। পুলিশ কনস্টেবল অবিনাশ, চাকরি করে শহরে। গ্রামের বাড়িতে রয়েছে তার স্ত্রী এবং আড়াই বছরের একটি মেয়ে। স্ত্রী আবার গর্ভবতী। এই অবস্থায় হঠাৎ ই এক রাত্রে কতিপয় দুষ্কৃতি সেই গ্রামের বাড়িতে ঢুকে অবিনাশের স্ত্রীকে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা ঘটে ঐ ছোট্ট মেয়েটির চোখের ওপর। অবিনাশের কাছে খবর আসে। এরপর তার প্রতিক্রিয়া - ' বউডা গেছে? কিন্তুক এখন মাইযাডার কি অইব? ইভাবে পারব কেডা? যাও একটা পুলা অইতো ইডা ও অইল না? এখন আবার মাইযাডা মাথায চাইপ্যা, বুঝা অইয়া রইব না তো? ইস, ইভারে আবার বইখ্যা গেল ক্যেরে?'

গন্থের নামগল্প 'শরীর জমিন' এর দীপা মধ্য বিত্ত সমাজের সেই অগণিত মানুষদেরই একজন, যারা নিজেদের জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্তির দুঃখ, সন্তানের সাফল্যের মধ্য দিয়ে উশুল করে নিতে চায়। কিন্তু দীপার স্বামী মণিভূষণ সহজ সরল মানুষ, অথবা জীবনের প্রতি কোন মোহ নেই তার। স্ত্রীর যাবতীয় উচ্চাশার সঙ্গে মণিভূষণ কিছুতেই একাত্ম হতে পারে না। এবং এর বিপরীতে, একমাত্র সন্তানকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠার মৃগয়া ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছেড়ে দিতে গিয়ে, মণিভূষণের পিতৃহৃদয় বেদনাবিদ্ধ হয়ে যায়।

ষাটের দশকের শেষভাগ থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন নন্দী কর। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মহানায়ক মহাপ্রস্থান' প্রকাশিত হয়, ১৯৮৪ তে। মোট এগারোটি গল্প রয়েছে এতে বিষয় এবং আঙ্গিক, কোথাও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব নেই ১৯৮৭ তে আবারো এগারোটি গল্প নিয়ে বের হয় 'সূর্য দীঘল ছায়া', এর দশ বছর পর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত হয় 'আলোয় ফেরা' গল্প সংকলন, এতে রয়েছে সতেরোটি গল্প, জাতি উপজাতির সমস্যা ও সমন্বয়ের দিকে জোর দিয়েছেন গল্পকার তাঁর বেশ কিছু গল্পে। 'ইন্টারভ্যু' গল্পটির বিষয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে। মাধ্যমিক পাশ মেয়ের জন্য একজন নামকরা প্রাইভেট টিউটর যোগাড় করবার প্রক্রিয়া চলছে। মা শোভনা মেয়েকে নিয়ে দুবার গেছে স্যার-এর বাড়ি, একবার নাম লেখাতে, একবার ইন্টারভ্যু দিতে এখন তৃতীয় তথা শেষবার সমস্ত কাগজপত্র জেরক্স এবং ওরিজিনাল নিয়ে বাবা অসীম রওনা হলো টিচার এর বাড়ির সামনে বিশাল ভিড, অনভিজ্ঞ অসীম অন্যদের কথাবার্তার ভেতর থেকে জানতে পারে ইনি কোশ্চেন সেটার, সেজন্য সকলেই এর কাছে ছেলেমেয়েকে পড়াতে চায়।

একবারে একশত জনকে পড়াতে পারেন। কারো চলবে টেস্ট, কারো বা নোট নেয়া কারো বা ভাষণ শোনা। স্ত্রী শোভনাও তাকে বলে দিয়েছিল, স্যারের ওখানে ছাত্রদের ক্রমবিভাজন আছে। নোটস্ সেভাবেই তৈরি করা হয়। কেউ পাশ, কেউ ডিভিশন, কেউ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসছে – প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থা আলাদা।' অভিভাবকগণ

ভেতরে যাচ্ছেন, আবার বেরিয়েও আসছেন। 'কেউ বিজয়ী কেউ বা বিজিত পুরু — অন্যত্র সংগ্রাম ক্ষেত্র খুঁজতে চলেছেন। সিকন্দারের কাছে হার মানতে রাজী নন।' লেটার মার্কস না থাকায় অসীমের মেয়েকে ভর্তি নিলেন না খ্যাতনামা টিউটর মশাই, কেননা নিজের সুনাম তিনি ধূলায় মেশাতে পারবেন না। এই গল্প নামেই গল্প, আসলে এটি গল্প হলেও সত্যি, একথা পাঠকদের বুঝতে দেরী হয় না।

ষাটের দশকের গল্পকারদের বেশিরভাগই পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয়ভাবে লেখালেখির জগতে রয়েছেন। আবার পরিবর্তমান সময়ের প্রতিনিধি হয়ে এক ঝাঁক নবীন লেখকও কথা সাহিত্যের জগতে এলেন। তাঁদের দেখার চোখ আর লেখার রূপ দুটোই অন্যরকম। ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে সত্তরের দশক নানাদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, সময় মনস্ক গল্পকারগণ সেই সূত্রগুলিকে কাহিনী বয়নে গ্রহণ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের একাংশের মুক্তির সংগ্রাম, ত্রিপুরার কমবেশি সুস্থির জনজীবনে আবার তরঙ্গ তুলেছে এই সময়। চল্লিশের দশকের দীর্ঘকাল পর আবার এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাকে নিতে হয়েছে আশ্রয়দাতা ও রক্ষকের ভূমিকা। সাময়িক আশ্রয়ের সন্ধানে আসা অগণিত শংকিত মানুষকেই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের সেনানী এবং সেনাপতিদেরও খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, আস্থা আর আশ্বাস অকাতরে দিয়েছিল এই ত্রিপুরা রাজ্য। এই সমস্ত ঘটনার একটা বড় ধরনের প্রভাব জনজীবনে পড়েছে প্রায় অনিবার্যভাবেই।

'সত্তরের দশক মুক্তির দশক' — এর ঢেউ ও ত্রিপুরাকে স্পর্শ করেছিল। সব মিলিয়ে তৈরী হয়েছিল এক টাল-মাটাল পরিস্থিতি। এই সময়ের বুক থেকে উঠে আসা নবীন লেখককুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রধানত প্রচ্ছন্ন সংশয়, নৈরাশ্য, হতাশা এবং ব্যর্থতাকে পুঁজি করেই। কিন্তু শুধু এই গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ রইলেন না এঁরা। জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার পুঁজি, রাজপথ থেকে গলি খুঁজি পর্যন্ত সমান তীক্ষ্ণতার সমান যত্নে পরিক্রমণের সারাৎসার গল্পের আধারে ধরে দিয়েছেন। গল্পের প্রকরণগত বিন্যাসের ক্ষেত্রেও পূর্বসূরীদের থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরে এসেছেন সত্তরের দশকের নতুন গল্পকারগণ। এই সাহসী ব্যতিক্রম ত্রিপুরার গল্প জগতে শুভলক্ষণ রূপেই চিহ্নিত হয়েছে। কেননা, ক্রমগত পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধনের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের গতিশীল সত্তার প্রাণস্পন্দন অব্যাহত থাকে, অনিঃশেষ হয়ে ওঠে জীবনীশক্তি।

কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী ঃ সমকালীন প্রেক্ষিতে

শিশিরকুমার সিংহ

প্রাক্- কথন ঃ

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। ত্রিপুরা প্রাচীনকালে বৃহৎবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ রাজ্যের সীমানা বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য ত্রিপুরার গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ইংরেজদের শাসনকালে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন করদ রাজ্য। পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু সমতল ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য (যাকে চাকলা রোসনাবাদ বলা হয়ে থাকে) ইংরেজশাসকদের কর দিতে হোত। এমনকি পরবর্তীকালে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইংরেজদেরকে সোনার মোহর নজরানা হিসাবে দিতে হোত ত্রিপুরা রাজ্যটি ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়

ত্রিপুরা রাজারা ছিলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীভুক্ত (তিব্বতি - বর্মী গোষ্ঠীর)। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে ত্রিপুরাতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশিকাল ধরে বাংলাভাষা তথা বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, মুঘল এবং ইংরেজ - শাসনকালেও এ রাজ্যের প্রধান সরকারিভাষা বাংলা (আর একটি সরকারী ভাষা—আদিবাসী জনজাতিদের প্রধান ভাষা ''ককবরক'')। এ রাজ্যের মোট ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬৯% শতাংশই বাঙালি।

ত্রিপুরা রাজ্যে ঠিক কবে থেকে বাংলাভাষার ব্যবহার শুরু হয় এবং বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা মুস্কিল। তবে একটি প্রচলিত মত এই যে মহারাজা ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১-১৪৬২) সময়েই বাংলাভাষার ব্যবহার শুরু হয়। ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থে 'রাজমালা'র প্রথম লহরটি ধর্মমাণিক্যের নির্দেশে রাজ পুরোহিত (চন্তাই) দুর্লভেন্দ্র এর সহায়তায় পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রচনা করেন। এই তথ্যটি সঠিক হলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বাংলাভাষার চর্চা শুরু হয় প্রায় ৫৫০ বছর আগে তা বলা যায়। তবে 'রাজমালা'র প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড ডি সি সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী 'রাজমালা' অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। ড সুকুমার সেনও মনে করেন, 'বাঙ্গালা 'রাজমালা' উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই ' ত্রিপুরা রাজ্যে শাসনকার্যে বাংলাভাষা ব্যবহারের সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় মহারাজা কল্যাণমানিক্যের (মৃত্যু ১৬৬০) একটি

ব্রহ্মোত্তর সনদকে ' সনদটি ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে ৩৫২ বছর আগে লিখিত। মহারাজা কল্যাণ মানিক্যের পুত্র 'রাজর্ষি' গোবিন্দমানিক্য (১৬৬০-৬১ এবং ১৬৬৭-১৬৭৬) এবং তাঁর পরবর্তী রাজাদের বিভিন্ন সনদ, তাম্রশাসন, রাজ অধ্যাদেশ শিলালেখ ও মুদ্রা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে রাজকার্যে কমপক্ষে সাড়ে তিনশ বছর ধরে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পটভূমি ঃ

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলতে হলো এজন্যে যে, ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত রাজ্য এবং তার অধিবাসীদের সম্পর্কে মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সঠিক ধারণা নেই। বাংলাদেশের বাইরে আরাকানে মগরাজাদের রাজত্বকালে যেমন দৌলত কাজি, আলাওল প্রভৃতি কবিরা (১৭শ শতাব্দীতে) বাংলাভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, ঠিক তেমনি ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতাতে বাংলাভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।'রাজমালা' ছাড়াও 'গাজিনামা' (১৬৭৩-১৭১০), 'চম্পকবিজয়' (১৬৯০-১৭০০), 'কৃষ্ণমালা' (১৭৬০-৮৩) প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক জীবনী কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজপরিবার শুধু যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাই নয়, স্বয়ং রাজারা এবং তাঁদের পুত্র - কন্যারাও বাংলা - সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। মহারাজা ধন্যমানিক্য থেকে শুরু করে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য (১৯২৩ -১৯৪৭) পর্যন্ত সকলেই সাহিত্য সংগীত ও শিল্পকলায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এইসব রাজাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের (১৮৬২-৯৬) কথা। বীরচন্দ্র ছিলেন একজন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ।' তাঁর সময়েই প্রশাসনিক বাংলা ভাষার সংস্কার সাধিত হয়। তিনিই 'ভগ্নহৃদয়' - এর কবিকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করেছিলেন ' তাঁরই অনুপ্রেরণাই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী কবিতা চর্চা শুরু করেন এবং বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কবি-কথা ঃ প্রসঙ্গ ও পরিমণ্ডল

মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের কন্যা মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাময়ী। প্রথাগত শিক্ষালাভ করা একজন নারী, বিশেষ করে রাজকুমারীর পক্ষে, তখন ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু কন্যার বিদ্যানুরাগ দেখে স্বয়ং মহারাজাই তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মহারাজার অনুরাগ সর্বজন বিদিত কন্যারও কাব্য কবিতার প্রতি গভীর আকর্ষণের পরিচয় পেয়ে মহারাজা তাঁকে উৎসাহিত করেন পরে ত্রিপুরার প্রখ্যাত রাজ কবি মদন মোহন মিত্রের ওপর অনঙ্গ মোহিনী দেবীর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পন করা হল রাজ কবির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অনঙ্গমোহিনী কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন তাছাড়াও তার অগ্রজ রাধাকিশোর মানিক্যও (মহারাজা রাধা কিশোর, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু-রাজা) অনঙ্গমোহিনীকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেন। রাজপরিবারের সাহিত্য সংগীত শিল্পকলার অনুকূল পরিমণ্ডলে অনঙ্গমোহিনীর কাব্য চর্চা ধীরে ধীরে সার্থক হয়ে ওঠে সর্বোপরি কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, সাহচর্য ও উৎসাহদান অনঙ্গমোহিনীর কবি সত্তার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয় ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার অনুকূল পরিমণ্ডল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক ঃ

'এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুত সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের শক্তর যেমন করে প্রজাকে রক্ষন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। এই পরিবারে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

আমি পেয়েছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দীর্ঘতর হয়েছিল।' (১৩৩২ সালের ১২ ফাল্গুন কবিকে আগরতলায় যে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় তার প্রতিভাষণে কবি ঐ কথাগুলি বলেন।)

'কবি' রবীন্দ্র সম্মেলন

সংখ্যা, ১৩৩২ বাং

।। প্রতিভার বিকাশ।।

ত্রিপুরাতে বাংলাসাহিত্য চর্চার যে ধারাটি ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে আসছিল সেই ধারাটিই রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় সাতবার আগমন (প্রথমবার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন, ১৯০০ খ্রিঃ) এবং ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে প্রবল গতিবেগ লাভ করে। 'রাজমালা'র যুগ থেকে ত্রিপুরার যে সাহিত্য বৈষ্ণবীয় ভাবও পয়ার ত্রিপদী ছন্দের বাঁধাগণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল মহারাজা বীরচন্দ্র তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার সফল প্রয়োগ করেছিলেন। জীবন-চরিতমূলক এবং বৈষ্ণবীয় কাব্য কবিতা রচনার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি মানবিক প্রেম প্রীতিমূলক গীতিকবিতার সূচনা করেন। আর তাঁর প্রতিভাময়ী কন্যা অনঙ্গমোহিনী গীতিকবিতার সেই ধারাটিকেই পরিপুষ্ট করে তোলেন এবং ভাষাও ছন্দো বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। অনঙ্গমোহিনী একদিকে যেমন রাজ-পরিবারে কাব্য চর্চার জন্য উৎসাহও প্রেণা লাভ করেন অন্যদিকে তেমনি তাঁর স্বামী উজীর গোপীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে গভীর প্রীতি ও আন্তরিক সহায়তা লাভ করেন তা তাঁর কাব্য সাধনাকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলে। স্বামী গোপীকৃষ্ণের উৎসাহেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথমকাব্য 'কণিকা' (১৭ই পৌষ ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ/ ১৯০১ খ্রিঃ)। রাজ কবি মদনমোহন মিত্র 'কণিকা'র ভূমিকায় অনঙ্গমোহিনীর কবি প্রতিভার পরিচয় দান করতে গিয়ে লিখেছেন

'স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা রাজ্যে কবিতা ও গীতে কাব্যের দেশব্যাপী স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন. রাজদুহিতাও কবিত্বে স্বভাবতঃ পিতৃপদানুসারিনী।

কনিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কয়েকটি কবিতা বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে, কোমল ভাষায় প্রাণের আবেগ ফুটিয়াছে। রাজকুমারীকে আমি একান্ত স্নেহ করি ইহার কবিতা পড়িয়া সুখী হই। ইনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন। আমি ইহার রচিত উপহারটি পড়িয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি নাই ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, ইনি সুস্থ শরীরে প্রতিভা বিস্তার করিয়া আজীবন কবিতার সেবা করুন।' 'কনিকা' কাব্যে বিভিন্ন বিষয়ের মোট বারটি কবিতা রয়েছে। তবে মানব প্রেম ও নিসর্গ প্রকৃতিই অধিকাংশ কবিতার মূল অবলম্বন। উষা, মধ্যাহ্ন, নিশীথ সঙ্গীত, বর্ষা, বসন্ত উষায় প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রকৃতি বিষয়ক এবং অভিজ্ঞান, স্মৃতি ও অন্তিমবাসনা শীর্ষক কবিতা তিনটি প্রেম ও বিরহ বিষয়ক। 'কনিকা' কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্গত পিতা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে —

'আজকে এসেছি পিত,   নিয়ে মম কাব্যকথা,
সঁপিতে চরণে আশা করি,
কিন্তু হায় পিতৃদেব   রহিয়াছ আলোকিয়ে
না জানি অন্যের কোন্ পুরী'

যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় কবিতা লেখার হাতেখড়ি সেই স্বর্গীয় পিতার প্রতি একদিকে যেমন কবি হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে

'কনিকা' কাব্যের নিসর্গ প্রীতিমূলক কবিতাগুলির মধ্যে 'বসন্তউষায়' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটিতে বসন্ত ঋতুর উষাকালীন প্রকৃতির যথাযথ চিত্র কবির ভাষায় এভাবে অঙ্কিত হয়েছে '

'দেখিনা মলয় বায় মৃদু মধু বহি যায়.
বকুল পড়িছে ঝরিঝরি,
কুসুমে কুসুমে ঘুরে বেড়োয় ভ্রমর উড়ে
মৃদু মৃদু গুন্ গুন্ করি।'

মননের গভীরতা

গভীর প্রেম ও ভালোবাসার যখন জীবনতরী স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলছিল ঠিক সেই সময়েই তাঁর জীবনে নেমে আসে ভয়ানক বিপর্যয়। তাঁর প্রিয়তম স্বামী গোপীকৃষ্ণের অকাল মৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে বিহ্বল করে দেয়। কিন্তু স্বামীর প্রতি সুগভীর প্রেমে সেই শোক বিহ্বল অবস্থায় কবিতার নৈবেদ্যরূপে প্রকাশিত হয় আঁখিজল, সান্ত্বনা, চিরস্মৃতি, বর্ষানিশায়, ভালবাসার পরিনাম, স্বপ্ন, বর্ষা উষায়, পরাণ না যায়, বিরহে, নিশীথে, কল্পনা, দিবা অবসানে, মৃত্যু, নীরব, মরণ, বর্ষায় প্রভৃতি শোক নীতিমূলক কবিতাগুলিতে। 'শোকগাথা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ 'শোককাব্য।' প্রখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১ ১৯৪২) 'লোকগাথা'র ভূমিকায় যেকথা লিখেছেন তা অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবি প্রতিভার মূল্যায়নে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য '

পাঠকগণ এই কবিতাগ্রন্থের প্রত্যেক কবিতায় রচয়িত্রীর কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। যে ছবি সম্মুখে রাখিয়া এই শোক গাথাগুলি গীত হইয়াছে, সেদিকে তাকাইতে গেলে পাষাণ হৃদয় ও গলিয়া যায়। ত্রিপুরার রাজপরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে রাজপরিবারের খ্যাতি বঙ্গদেশব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণও যে উহাতে অনুরাগিনী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'

কবি বিজয়চন্দ্রের উক্তি যে কতখানি যথার্থ তা অনঙ্গমোহিনীর 'চিরস্মৃতি' কবিতাটি উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে --

'দিবস রজনী হৃদে জাগে নিতি নিতি,
কেবলই বিষাদময় সেই শেষ স্মৃতি।
জন্মশোধ বিদায়ের বিষাদ চুম্বন,
যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন।
আকুল বিষাদভার হাতে হাত রাখি,
চেয়েছিল অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি।
এ বিষাদ ছবি জাগে হৃদি নবপনে,

এ করুন গীতিভাসে মৃদু গুঞ্জরণে।
সমস্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শুধু সেই স্মৃতি — রেখা হৃদয়েতে ভায়।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করি যে পোষণ,
রাখিয়াছে সেই স্মৃতি করি সযতন।''

বাক্—শক্তিহীন স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণা — কাতরতা কবি হৃদয়কে যে কতো গভীর বেদনায় মথিত করেছিল তারই সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উদ্ধৃত চরণগুলিতে। স্বামীর মৃত্যুর পারও হৃদয়ে প্রেমের স্মৃতি অম্লান। তবে হৃদয়াবেগকে তিনি আশ্চর্যভাবে সংহত করেছেন। গভীর প্রেমের আবেগ ও শোকের প্রাধান্য ভাবের গভীরতা বিপর্যস্ত করে দেয়নি।

'শোকগাথা' কাব্যের 'নিবেদন' - এ কবি তাঁর সেই সময়ের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

'নিয়তির নিদারুন নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহারই করুন উচ্ছাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে ..... শোকগাথা আমার জীবনের বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ন হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র।'

এই বেদনা, এই বিষাদ কবি অতিক্রম করেছেন। তিনি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, পরলোকে সারে আবার তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাঁর মধুময় বাণী শুনবেন —

'নহে ইহা কেবল স্বপন;
মরণের অন্তরালে,
মণ্ডিত কিরণজালে
আছে দেশ উজ্বল ভবন;
প্রাণে পশে সদা বিবেকের বাণী,
সে লোকে শুনিব পুন সেই মধু বাণী।'
(— মৃত্যু)

এ প্রসঙ্গে স্ববতই মনে পরে যায় কবি রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) কাব্যের কবিতাগুলির কথা। কবি প্রিয়তমা মৃণালিনী দেবীর অকাল প্রয়ানে (২৩ নভেম্বর, ১৯০২) গভীর দুঃখ শোক ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তবে সেই শোক পত্নী প্রেমকে আরও পরিপূর্ণ ও গভীর করে তোলে। ৮ সংখ্যক কবিতাটিতে তাই আমরা দেখতে পাই কবি প্রিয়ার সঙ্গে কবির মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই —

'মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা - সনে
এ বিচ্ছেদ - বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছে একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশ কাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।'

কবি প্রিয়া কবির জীবনে মৃত্যুর মাধুরী মিলিয়ে কবির বিষাদময় জীবনকে মধুময়তায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কবির অনুভবে —

'আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমাব গৌবব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমনি আমার জীবনে।'

প্রতিভার পরিণতি

অনঙ্গমোহিনী দেবীর পরবর্তী কাব্য 'প্রীতি'র (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) 'পেয়েছি' কবিতাটিতেও প্রিয়তম স্বামীকে দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একান্ত করে পাওয়ার কথাটি ব্যক্ত হয়েছে —

১

'তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়;
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে
দুখেরে করি জয়।

২

আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে;
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ - বাসে।

৩

আসেরে সুখ, দুঃখ দলি'
চাহিনি আমি তারে;
বিকশো নব প্রীতির কলি
নব সুরভি ভারে।

৪

এ দেহ প্রাণ, তোমার কাছে
দিয়াছি সঁপে আমি;
আমার গানে জড়িয়ে আছে
তোমার সুর স্বামী।'

প্রিয়তম স্বামীর অকাল - মৃত্যু কবি হৃদয়ে গভীর শোক ও বেদনার সৃষ্টি করলেও সে বেদনা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। স্বামীর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তিরূপে সমাপ্তি হয়েছে 'প্রীতি' কাব্যের ৩৪টি কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের বহু কবিতাতেও পত্নী প্রেমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'অশরীরী জাগরণ' — এ কবির জীবনে দুঃখের আঁধার রাত্রির অবসানে নতুন অরুণোদয়ের ইঙ্গিতটি সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে কবির গভীর রোম্যান্টিক দৃষ্টি ভঙ্গী ও ইন্দ্রিয়ঘনতার পরিচয় সুস্পষ্ট কী অসাধারণ নৈপুন্য হৃদয়ের গভীর চেতনা লোকের অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেছেন তা কবিতাটিতে উদ্ধৃত দেখানো যেতে পারে —

'চেতনা যতই যেতেছে ডুবিয়া
ততই জীবন জাগিছে।
বেদনাপূর্ণ প্রাণের উপরে
সুখের পরশ লাগিছে।
নিষ্ঠুর দূরতা আজি নাহি আর,
কঠোর বিরহ মরেছে আমার,
বিফল নহেরে আমার বাঁধন
অলীক নহেরে সাধনা।
সুখ তরঙ্গে ধুয়েছি অঙ্গ
মুছিয়া ফেলেছি যাতনা।
নব অনুভব প্রত্যক্ষ দলিত;
নাহি ভবিষ্যৎ নাহিরে অতীত;
সীমাহারা এক মাধুরী আসিয়া
যেতেছে পরাণে লাগিয়া।
চেতনা যেতেছে ডুবিয়া আমার জীবন উঠিছে জাগিয়া।।

'অদৃষ্ট প্রেম' নামক কবিতাটিতে প্রিয়তম পরলোকে অবস্থান করলেও তিনি যে এজগতে তাঁর স্পর্শ অনুভব করছেন, তাঁর কণ্ঠের মধুর গতি শুনতে পাচ্ছেন, — এই ভাবটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে —

'আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়, —
পাব না দেখিতে কভুও;
ওগো নয়ন দুটির কোণায় কোণায় —
ফুটিয়া উঠিছ তবুও।
এ কি ? স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে —
তোমারি পরশ লাগিছে;
একি? অরুন কিরণ নয়নে ভাসিয়া —
তোমারি দরশ জাগিছে।

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের 'ছবি' কবিতাটির —

'নযন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই' — ইত্যাদি

চরণগুলি স্বতই মনে পড়ে তবু কিছু অনঙ্গমোহিনীর কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা চোখ এড়িয়ে যায় না। বিশেষ করে —

'এ কি মিশ্রিত সুখ? অমৃতে গবল?
কাঁদি কেন সুখে মাতিয়া?
এ যে দাহণ করিয়া কবিছে শীতল;
করিছে মুক্ত বাঁধিয়া।'

— এই অংশটিতে বিপরীত ভাবের শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কবি হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গভীর প্রেমের জন্যই সুখেও কাঁদে মানুষ, বন্ধানের মধ্যেও মুক্তি অনুভব করে, আবার দহিত হয়েও অনুভব করে একান্ত শীতলতা।

'কবিতা' অনঙ্গমোহিনীর কাছে বিলাসিতা নয, তা তাঁব গভীর অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। অন্তবে যে দুঃখ ও বেদনা অনুভব কবেছেন তাকেই তিনি তাঁব কবিতায় রূপ দান কবেছেন। তাঁব নিজেব কথায় —

'আমাব কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
মধু সিক্ত নহে বাণী,
দুঃখ — দিগ্ধ প্রাণখানি,
শুষ্ক চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
আমার ছলনা নাই, —
পাবনা যা, প্রিয় তাই,
উতরিতে সিন্ধুপথে, জানি, নাহি ভেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।'

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে সে সময়ের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই পারিবারিক সূত্রেই অনঙ্গমোহিনী দেবীর সঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি আন্তরিক স্নেহ ও উৎসাহ লাভ করেন। অনঙ্গমোহিনী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'কণিকা' ও 'শোকগাঁথা' কাব্যদুটি উপহার দেন। সেই কাব্যদুটি পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিকে যে একটি সুপ্রশংসা চিঠি লেখেন সেটি নীচে উদ্ধৃত করা হোল ঃ

শান্তিনিকেতন

মাননীয়াসু,

বোলপুর

আপনার রচিত 'লোকগাথা' ও 'কণিকা' উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার — অথচ কলানৈপুণ্য ও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ — এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থ দুটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

আপনি নিশ্চয় জানেন আপনার পিতা আমাকে স্নেহ করিতেন এবং আপনার ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজও আমাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন; আপনাদের পরিবারের সহিত আমার এই আন্তরিক প্রীতি সম্বন্ধ আছে বলিয়া আপনার কবিত্ব পরিচয়ে আমি বিশেষভাবে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

আপনার এই কবিত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা সার্থকতা লাভ করুক এই আমার কামনা।

ইতি—
১৭ই শ্রাবণ ১৩১৮
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচিত তিনটি কাব্যের কবিতা ছাড়া ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবির আরও বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলি আজও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। 'বঙ্গভাষা' [১০] 'রবি',[১১] প্রবাসী[১২] 'গোমতী'[১৩], প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। সেইসব কবিতাগুলির মধ্যে 'জন্মভূমি' 'সিন্ধুতীরে', 'সেথা তুমি', 'আমার ঘর' কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'আমার ঘর' কবিতাটিতে জীবন সম্বন্ধে কবির গভীর অনুভূতির ও রং শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'সুখের কথায় চমকে উঠি, দুঃখ নিয়ে ঘর করি
দিনের আলো ঠেলে ফেলে, টেনে আনি শর্বরী
দুঃখ আমার নিজের সৃষ্টি
নিজের ধন যে বড় মিষ্টি
পরের দেওয়া সুখের ওপর কেন আমি ভর করি।'

আমরা আগেই বলেছি যে, ত্রিপুরার রাজপরিবার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। রাজারা, রানীরা এবং রাজকুমারীরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের 'হোরী' 'শ্রী শ্রী ঝুলন গীতি' কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলিতে বৈষ্ণবীয় প্রেমভাবনা ও হরি ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মহারাজা বীরচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীও বৈষ্ণবীয় ভাবের কবিতা রচনা করেছেন।[১৪] শুধু তাই নয়, পিতা বীরচন্দ্র এবং কবি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে 'ব্রজবুলি'তেও পদ রচনা করেছেন। অবশ্য সব কবিই ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বিদ্যাপতিও গোবিন্দ দাসের ব্রজবুলি পদগুলি থেকেই। এ প্রসঙ্গে কবির 'প্রীতি' কাব্যের 'বর্ষায়'

কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধার করে ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দান করা যেতে পারে ঃ

' সখিরে,
মেঘ বরখে ঘন,
গুরু গুরু গরজন,
তিতলহ তরুলতা কুঞ্জ;
চমকে বিজুরি মরি,
কানন গহন ভরি,
ছাওল হিয়া তম—পুঞ্জ।
আজি এ বাদর নিশা,
আঁধিয়ারা ভরা দিশা,
বরখে নীরদ ঘন বারি—
ঝরই যৈছন ঘন,
ঐছল বরখন,
ঝর ঝর নয়ন হমারি !'

অনঙ্গমোহিনী ও সম - সাময়িক মহিলা কবি ঃ

কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর জীবন ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সম - সাময়িক আরও যে চারজন প্রখ্যাত মহিলা কবির কথা মনে পড়ে যায় তাঁরা হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩) ও প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৩)। অনঙ্গমোহিনীর মতো উক্ত চারজন প্রখ্যাত কবিও জীবনে গভীর শোকের আঘাত পেয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কামিনী রায় ছাড়া আর সবাই খুব কম বয়সেই প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়েছেন। গিরীন্দ্র মোহিনীর দশ বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যু তাঁর হৃদয়ে যে গভীর শোকও বেদনার সৃষ্টি করেছিল তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'অশ্রুবানী' নামক কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে। 'উপহার' শীর্ষক কবিতাটিতে কবি লিখেছেন ঃ

'এ নয় সে অশ্রুরেখা, মানান্তে নয়ন কোলে
ঝরিতে যা চাহিত না দেখা হলে ফুলবান।
সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে —
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কমল হারে।
এ শোকাশ্রু ! নিরাশার যাতনা গরল ঢাকা,
এ শোকাশ্রু ! বাসনার অনন্ত পিপাসা মাখা,
এ শোকাশ্রু ! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন,
এ শোকাশ্রু ! জীবনের জনমান্ত আলিঙ্গন।'

রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' (১৯০২/১৩০৯) বঙ্গাব্দ) কাব্যটি অশ্রু কণা'র পনের বছর পরে এবং অক্ষয় কুমার বড়ালের (১৮৬০ ১৯১৯) এষা' কাব্যটি (১৯১২/১৯১৩ বঙ্গাব্দ) পঁচিশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। তাই বলা যায় গিরীন্দ্র মোহিনীই আধুনিক গীতিকবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম লোকগীতিকাব্য রচনা করেন।

মানকুমারী বসুরও বিবাহ হয় দশ বছর বয়সে এবং তাঁর যখন মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হল। অনঙ্গমোহিনীর মতো তাঁর কাব্য স্ফূর্তির পেছনেও স্বামীর উৎসাহ ও সহমর্মিতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু সেই সহমর্মী স্বামীর অকাল মৃত্যু তাঁকে শোক বিহ্বল করে তোলে। আর তার ফলে সৃষ্ট হয় অসাধারণ শোক কবিতা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং কবি হেমচন্দ্রও তাঁর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর 'একা' নামক একটি কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধার করে তাঁর শোকদগ্ধ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পরিচয় দেওয়া হোল ঃ

।।একা।।

১

'একা আমি, চিরদিন একা,
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেনবা স্বপিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুয়াশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা।'

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যর আর একজন প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায়। উচ্চশিক্ষিতা (অনার্সসহ বি.এ.), বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রী এই কবি জীবনে একের পর এক আঘাত পেয়েছেন। সন্তানের মৃত্যু, দুর্ঘটনায় স্বামীর অকাল মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। আর তার ফলে হৃদয় নিংড়ানো কবিতা বের হয়ে এসেছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। 'অশোক সঙ্গীত' সনেটগুচ্ছ, ১৯১৪) নামক কাব্য সংকলনের কবিতাগুলিতে কবি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের ১৯ নম্বর কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এরকম ঃ

'তুমি যদি না দেখিলে, শোভা শোভা নয়,
তুমি যদি না শুনিলে, মিছা মোর গান,
তোমাকে না দিনু যদি, জ্ঞানের সঞ্চয়
নিরর্থক বহা।'

অথবা তাঁর 'সুখ' নামক কবিতাটিতে কবির হতাশা ও বিষাদময়তার প্রকাশ যে কতো মর্মস্পর্শী তা নীচের উদ্ধৃত অংশটি থেকেই বোঝা যাবে —

'গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল;
সকলি গিয়াছে কি আছে আর?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন মরণ একই মত।'

অনঙ্গমোহিনীও শোকাঘাতে গভীর বেদনা অনুভব করেছেন, কিন্তু কামিনী রায়ের মতো হতাশা তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়নি। তাঁর বেদনার প্রকাশ আরও সংহত ও সংযত।

মহিলা কবিকুলের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনিও বিদুষী (বি.এ.)। একুশ বছর বয়সে ১৮৯২ সালে তাঁর বিবাহ হয়, আর মাত্র তিনবছর পরেই ১৮৯৫ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র সন্তান তারাকুমার (জন্ম ১৮৯৪) এর অকালমৃত্যু হয় ১৯০৬ সালে। স্বামী ও সন্তানের মৃত্যুর আঘাত তাঁর বুকে গভীরভাবে বাজলেও তিনি ক্রমশ সেই দুঃখ ও আঘাত জয় করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে মনোনিবেশ করে। ড. কল্যাণী প্রামানিক তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন ঃ

'দুঃখই কবির প্রধান সুর। কিন্তু দুঃখই একমাত্র সুর নয় এবং দুঃখ যে কত বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবে হৃদয় আকাশকে রঞ্জিত করে কত বিচিত্র ভাবনায় ব্যঞ্জিত হতে পারে, প্রিয়ম্বদার কাব্য পাঠে তার আভাস সহৃদয় পাঠকচিত্তকে উন্মুখ, ব্যাকুল করে তোমাকে।'[১৫]

তাই তিনি দুঃখকে জয় করে নতুন জীবনের সন্ধান কবতে চেয়ে বলেছেন ঃ

দূবতর দিগন্তবে দেখা দিবে স্তবে স্তরে,
নব মেঘে নবীন জীবন।
— (অংশু, বর্ষশেষ)

স্বামীপুত্রহারা একজন নারীর হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনা যে কতো সংহত ও সুন্দররূপে প্রকাশ করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'কথা কও' কবিতাটির নিচে উদ্ধৃত অংশটি ——

'কথা কও, কথা কও, দূর দুরান্তবাসী,
তোমার কণ্ঠের সাড়া সমীরণে আসি
জাগাক নিদ্রিত বনে মর্মের রাগিনী,
ঝিল্লীতান মধুপের মাধবী কাহিনী,
প্রজাপতি ইন্দ্রধনু পক্ষ সঞ্চালিয়া
অস্ফুট কোরক কানে আসুক বলিয়া
নব অভিনব কথা, তন্দ্রা পরিহরি
আরক্ত কপোল দল জাগুক শিহরি,
অবারিত হৃদয়ের পরিমল ভার,
ব্যাপ্ত হোক বক্ষভরি নিশীথ দিবার।'

অথবা 'বিচ্ছেদে' শীর্ষক কবিতাটিতে বিরহ বেদনার যে অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা সত্যিই প্রশংসনীয় —

'তুমি আজ সুদূরে বসিয়া,
প্রতি চিন্তা শুধু যায়   অশ্রু হয়ে ঝরে যায়
আলোর মিনতি এত মানেনাক হিয়া।
প্রত্যেক নিশ্বাস পাত   হয়ে পড়ে অকস্মাৎ
দীর্ঘশ্বাস আকুল বিধুর।
কম্পিত কাতর হাসি   আজি দেখা দেয় আসি
বার বার পুষ্পদান ব্যথা ভরপুর।'

উপসংহার ঃ

গবেষক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গের মহিলা কবি'তে (কলিকাতা, ১৩৬০) বিস্মৃত প্রায় ৫৪জন মহিলা কবির কবি প্রতিভার মূল্যায়ণ করে এক মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন। সত্যিই আমরা খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু ভুলে যাই। তাই একসময়ে যেসব মহিলা কবি বাঙালির হৃদয়কে আনন্দ বেদনায় উদ্বেল করে তুলেছিলেন তাঁদের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। কবি মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা স্কুল— পাঠ্য বই এ কিছুকাল আগেও স্থান পেত, এখন বোধহয় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা সকালে বাদ পড়ে গেছেন। অথচ উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকে প্রধান পুরুষ কবিদের পাশাপাশি এঁরাও শ্রদ্ধা ও খ্যাতির উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন। ত্রিপুরার কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীও আজ বিস্মৃত প্রায়। ত্রিপুরার বাইরের কবিতা প্রেমীরা বোধ হয় তাঁর নাম ও জানেন না। অথচ একসময়ে এই প্রতিভাময়ী কবি যে অসাধারণ কবিতা লিখে সেকালের বিখ্যাত কবিদের, এমনকি কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেরও সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিলেন তা আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি। ব্যক্তিগত শোক কীভাবে বিশ্বগতশোকে রূপান্তরিত হয়ে সবজন হৃদয়বেদ্য হয়ে উঠতে পারে, — তা অনঙ্গমোহিনীর 'শোকগাথা ও 'প্রীতি' কাব্যের কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্য — সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র থেকে বহুদূরে এক প্রত্যন্ত প্রদেশে থেকেও তিনি এখন থেকে প্রায় একশবছর আগে যে অপূর্ব গীতি কবিতার রচনা করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এতো দূরে থেকেও যে তিনি তাঁর সমকালের বিখ্যাত মহিলাকবিদের সঙ্গে সমাসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। অনঙ্গমোহিনীর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা নিয়ে গবেষণা করলে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে যে তিনি সত্যিই একজন উচ্চ প্রতিভাময়ী কবি ছিলেন।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১ সম্পাদকীয়, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫ 'রাজন্যী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা,' শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

২ '১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমার শক্তিপীঠ বিষয়ক গ্রন্থে আমি বলিয়াছিলাম যে, যদিও 'রাজমালা'র প্রথম লহর খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর (অর্থাৎ সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর (অর্থাৎ সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে) লিখিত হইয়াছিল।' — 'বাংলা ভাষা ভাষীদিগের ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি কথা' (প্রবন্ধ), ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, জনসংযোগ পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে, ১৯৭৫।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪, সুকুমার সেন, আনন্দব্, ১৯৩৮।

৪. ব্রহ্মোত্তর সনদ, ১৫৭৩ শকাব্দ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ। — রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৩, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬।

৫. মহারাজ গোবিন্দমানিক্যই রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটকের প্রধান চরিত্র।

৬. মহারাজা বীরচন্দ্র 'হোরী' (১৮৯২), 'শ্রীশ্রী ঝুলনগীতি' (১৮৭৮), 'প্রেম মরীচিকা' (১৮৮৬), 'অকাল কুসুম' (১২৯৬ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ), 'উচ্ছ্বাস' (১৮৮৬), 'সোহাগ' (১২৯৩ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কাব্যগুলি রচনা করেন। তিনি সংগীতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদুভট্ট, ওস্তাদ কাশেমালী খাঁ, সেতার বাদক নিসার হোসেন তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। আরও দ্রষ্টব্য 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থ, কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত।

৭. 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প. ব. ১৯৮৯ পৃঃ ৬১।

৮. মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য, ত্রিপুরার মহারাজা।

৯. মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য।

১০. 'বঙ্গভাষা' — সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা সম্পাদিত।

১১. 'রবি' পত্রিকাটি নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মণের সম্পাদনায় ১৯২৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

১২. প্রবাসী — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৩. গোমতী — ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪. দ্রষ্টব্য ঃ 'বৈষ্ণব কবিতায় অনঙ্গমোহিনী, অধ্যাপক মোহিত পুরকায়স্থ, 'দৃষ্টিকোণ ঃ অনঙ্গমোহিনী শতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

১৫. কবি চতুষ্টয়ী, সম্পাদনা বানী রায়, পৃঃ ৪২৭, মিত্র ও ঘোষ পাব্, কলি-৭৩, প্রকাশ ১৯৭৬।

ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চা

সিরাজুদ্দীন আমেদ

ভূমিকা ঃ

উত্তর পূর্ব ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য হল ত্রিপুরা। এর আয়তনে ১০,৪৯১ বর্গ কিমি। এই রাজ্যটি আসাম, মিজোরাম ও বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। এর আন্তর্জাতিক সীমানা ৮৫০ কিমিরও বেশি। 'ত্রিপুরা' শব্দটি 'তুই' এবং 'প্রা' এব সংস্কৃতায়িত রূপ। 'তুই' — এর অর্থ 'জল' এবং 'প্রা' — এর অর্থ 'কাছে'। পরবর্তীকালে 'তুই প্রা' শব্দটি সংক্ষিপ্ত হয়ে 'তিপরা' রূপ লাভ করেছে। এখানকার আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীগুলি এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে 'তিপরা' নামে অভিহিত করে থাকে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও ত্রিপুরা ঃ

বর্তমানে ত্রিপুরায় যে সব ধর্মীয় সম্প্রদায় বাস করে তাদের মধ্যে প্রধান হল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান। এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি মূলত তিনটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তারা হল মগ, চাকমা এবং বড়ুয়া। চাকমা সম্প্রদায়ের নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী আছে। এরা প্রধানত কৈলাশহর, অমরপুর, সাব্রুম, উদয়পুর এবং বিলোনিয়া মহকুমায় বসবাস করে। ত্রিপুরার চাকমা গোষ্ঠী বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এক সময়ে বসবাস করত। বর্তমানে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই চাকমাদের একটি বড়ো অংশ রয়েছে। মগ গোষ্ঠী দাবি করে যে, বুদ্ধদেব যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা সেই বংশের বংশধর। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে দেখা যায় যে, মগ গোষ্ঠী বর্তমান মানমার (বর্মা) দেশের আরাকান অঞ্চল থেকে এক সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। এরা বর্তমানে ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাস করে। ত্রিপুরার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী হল সবচেয়ে ছোট এবং এরা ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মগ সম্প্রদায় তিব্বতী-বর্মী (চীনা-তিব্বতী) ভাষা গোষ্ঠীর আরাকানী উপভাষায় কথা বলে। অপরদিকে চাকমা গোষ্ঠীর ভাষা হল চাকমা ভাষা। এই ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত শৌরসেনী এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এবং এই ভাষা নবীন ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলা,ওড়িয়া, অসমীয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিকট। তবে এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে তিব্বতী-বর্মী ও থাই ভাষার শব্দ রয়েছে। এই ভাষা শুনলে মনে হবে, অসমীয়া ভাষা এবং বাংলা ভাষার অন্তর্গত চট্টগ্রামী উপভাষার

সঙ্গে চাকমার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বড়ুয়া সম্প্রদায় সাধারণত বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করলে মগ, চাকমা ও বড়ুয়া সম্প্রদায়কে মঙ্গল জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এই তিনটি সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও এদের প্রত্যেকের আলাদ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা এবং রীতি রয়েছে। এই তিনটি সম্প্রদায় 'হীনযানী' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। মগরা হল আরাকানী জনগোষ্ঠীর একটি দলছুট অংশ এবং বড়ুয়া সম্প্রদায় হল এই মগ সম্প্রদায়েরই একটি উপগোষ্ঠী। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা শিক্ষিত, তারা নিজেদের প্রাচীন বিহারের মগধ অঞ্চলের হিন্দু রাজবংশী রাজবংশের বংশোদ্ভূত বলে মনে করে।

২০০১ সালের প্রভিশনাল সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ত্রিপুরার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ৮৬,০০০। (দ্রঃ সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া ২০০১, সিরিজ ১৭, পৃঃ ৩)।

প্রাচীন বাংলা ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

বর্তমানে পণ্ডিতদের ধারণা এই যে, বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় ঘটেছিল সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রিঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ অব্দে)। কালক্রমে এই ধর্ম বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর বর্ণনা থেকে ধারণা করা হয় যে, খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি যখন বিহার থেকে বাংলার তমলুক অঞ্চলে (তাম্রলিপি) আসেন, তখন বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেন।[১] বর্তমান ত্রিপুরা সংলগ্ন কুমিল্লা (একসময়ে কুমিল্লা ত্রিপুরার অন্তর্ভূক্ত ছিল।) শহরের কাছে গুনাই ঘর (গুনাই গড়) গ্রামে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ৫০৬-৭, মতান্তরে ৫০৭-৮ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা বন্য গুপ্ত সেখানকার বৌদ্ধ আশ্রম ও বিহারের অধিবাসী ভিক্ষু সংঘের সংরক্ষণের জন্য একদণ্ড ভূমি দান করেছিলেন।[২] এছাড়া পরবর্তীকালে হিউয়েন সাঙ, শেং চি এবং ই-ৎ সিং প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মগধ রাজ্যের সর্বত্র এবং বাংলাদেশের কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত এবং সমতট অঞ্চলে (প্রাচীন ত্রিপরা এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।) মহাযানী ও হীনযানী সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার ভিক্ষু বসবাস করতেন এবং তারমধ্যে সমতটের রাজধানীতেই অবস্থিত প্রায় ২০টি বৌদ্ধ বিহারে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) থেরবাদী (হীনযানী) ভিক্ষু বাস করতেন।[৩]

শেং চি-র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমতটের রাজধানীতে প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) ভিক্ষু ভিক্ষুনী থাকতেন। সমতটের রাজা রাজভট ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন এবং প্রতিদিন তিনি 'প্রজ্ঞা পারমিতা'-র লক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন। এছাড়া বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি যে শোভাযাত্রার আয়োজন করতেন, তার সামনে থাকত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি।[২]

পরবর্তীকালে বাংলার পাল রাজাদের আমলে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীন ত্রিপুরা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ও চর্চা শুরু হয়। তবে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী মহাযানী সম্প্রদায়রা প্রাচীনপন্থী তথাকথিত হীনযানী সম্প্রদায়কে কোনঠাসা করে ফেলে। কারণ, প্রচলিত শৈব, শাক্ত এবং দেহবাদী যোগী সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন প্রথা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মে ঢুকে পড়ে। ফলে বজ্রযান, সহজযান এবং তান্ত্রিক জনপ্রিয় লোক বিশ্বাসগুলি মহাযানী সম্প্রদায়ের নিত্যচর্চা ও চর্যার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।[১] মূলত মহাযানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচারগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্চাপদগুলোতে এবং পরবর্তীকালে শশিভূষণ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত, অন্যান্য চর্যাপদে (দ্র. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'নবচর্যাপদ' গ্রন্থ) হীনযানী বা থেরবাদী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচার বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা হয়েছে।

ত্রিপুরার রাজ্য সংলগ্ন বর্তমান বাংলাদেশের ময়নামতী ও পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে প্রাচীন সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের 'পিলাক' নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরায় যে সমস্ত অঞ্চলে বুদ্ধ মূর্তি ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি সহ ব্যাপক ও সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে সেই অঞ্চলগুলি হল — ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা), বিশালগড় (পশ্চিম ত্রিপুরা), এবং উদয়পুর, বিলোনিয়া ও অমরপুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা)। তবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির বিশ্লেষণ এখনো করা হয়নি। যাইহোক, ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত মধ্য পিলাক, ও পশ্চিম পিলাক অঞ্চলে যে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে এই ধারণা করা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আগেই এই সমগ্র পিলাক অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তবে এইসব অঞ্চলের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলের বৌদ্ধরা মহাযানী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্নস্থানে যে চাকমা,মগ ও বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা বসবাস করেন, তাঁদের সঙ্গে প্রাচীন বাংলা ও ত্রিপুরার মহাযানী সম্প্রদায়ের কোনো যোগ নেই ত্রিপুরার বর্তমান বৌদ্ধরা হীনযানী মতবাদে বিশ্বাসী করেন।

ডঃ হেইনস বেশার্ট মনে করেন যে, অশোকের রাজত্বকালে পূর্বভারত ও বর্মা অঞ্চলে ('কুকি-ভূমি') বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং পরবর্তীকালে মগধ অঞ্চলে তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাংলা থেকে পলায়ন করে 'কুকি ভূমি'তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[২] সম্ভবত পাল আমলেই মহারাজা বন্য গুপ্ত (খ্রিঃ ৫০৭-৮) উপরিউক্ত তাম্র শাসনে ভূমিদানের বিষয়টি খোদিত করেন।

তবে অন্যান্য তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের গোড়ায় উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হওয়ার পর বিজয়ী রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন এবং ভিক্ষুদের বিতাড়িত করে বুদ্ধের পদচিহ্ন - সম্বলিত প্রস্তরখণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। একথা হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ৭০০ ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক সংস্কৃতে রচিত একটি বৌদ্ধ গ্রন্থেও রাজা শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাজা শশাঙ্ক সম্ভবত হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেদের বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উৎখাত করেন। তারাই ব্রহ্মদেশের আরাকানে গিয়ে আশ্রয় লাভ করে। পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় যে মগ ও বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা আরাকান থেকে চলে আসে, তারা ঐ আরাকানী হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা আজও করে চলেছে। তবে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা বর্তমানে বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও মিজোরামে বসবাস করছে, তারা আরাকানী বৌদ্ধ হীনযানী সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী নয়, তারা সিংহলী (শ্রীলঙ্কা) হীনযানী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এইসব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নানা মতবাদ ও তাদের স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে এবং পরবর্তীকালে মগধ অঞ্চলে খ্রিস্টিয় ১৩শ শতকের প্রথম দিকে তুর্কী আক্রমণের ফলে যে সব বৌদ্ধধর্মের লোকেরা 'কুকি ভূমি'তে আশ্রয় লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের অনেক পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা গোষ্ঠীদের রানী কালিন্দী ১৮৬৪ সালে আরাকানের সংঘ রাজা সরমিত্র মহাস্থবিরকে আরাকান থেকে তাঁর রাজ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এবং তাঁকে এই বলে অনুরোধ করেন, যেন তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। সংঘরাজার এই আন্দোলনের ফলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি যে,

১৯৫৬ সালে যখন ২৫০০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদযাপিত হয়, তখন পূর্ববঙ্গে মোট ৩১০টি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল এবং শুধুমাত্র চট্টগ্রামেই ছিল ২৪০টিরও বেশি।[১১] এই থেরবাদী চাকমা গোষ্ঠী ১৯৭৬ সালে যখন ২৫২১তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব পালন করে, তারপর থেকে ত্রিপুরায় বুদ্ধমন্দিরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালে ত্রিপুরায় বুদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা ছিল ২৮০ এবং এবছর ২০০২ এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫০-এ।[১২]

ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের কারণ হিসেবে পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ তিনটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন — ১. শ্রীলঙ্কা থেকে থেরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের আগমন ও পুনর্জন্ম, ২. বর্মী থেরবাদী ঐতিহ্যের দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাপক প্রচলন এবং ৩. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব একথা সত্য যে, হিন্দু, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মীয় মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা আসার ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবুও অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে ১৯ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের পুনবার্বির্ভাব ঘটেছে।[১৩] এই কারণগুলির জন্যই ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্বিকাশ ও চর্চা সম্ভবপর হয়েছে মনে হয়।

ত্রিপুরার মগ ও বড়ুয়াদের ধর্মীয় আচার ঃ

'মগ' শব্দটি বিভ্রান্তিকর। ডঃ হেইনস্ বেশার্টের মতে আরাকানী বৌদ্ধরা 'মগ' নামে পরিচিত কিন্তু তারা নিজেদের 'মার্মা' নামে অভিহিত করে থাকে। মগরা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী, তবে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক মানুষ হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস করে।[১৪] তারা তাদের প্রধান দেবতাকে 'ফোবা' বা ভগবান বুদ্ধ বলে ডাকে। কিন্তু তারা সারি (চিনি), কালী, গঙ্গা এবং বড়া দেবতা (চিচি) ইত্যাদি দেব দেবীরও পুজো করে। মগ অধ্যুষিত প্রতিটি গ্রামে বুদ্ধ মন্দির বা 'খেয়াঙ' থাকে। এই মন্দিরের পুরোহিতকে বলা হয় 'সামফ্রা'। ডঃ বেশার্ট তাঁর 'কনটেমপোরারি বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল অ্যান্ড ত্রিপুরা' প্রবন্ধে, পার্বত্য অঞ্চলের 'মার্মা' সম্প্রদায়ের ধর্মকে ক্রুদ, লেভি স্ট্রস প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ মিশ্রিত একটি বিশেষ ধর্মরূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৫]

ত্রিপুরার মগরা আরাকানী উপভাষায় কথা বলেন। মগ-বড়ুয়া বা বড়ুয়ারা ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করলেও তারা বাংলাভাষীদের কাছাকাছি বসবাস করে এবং বাংলা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে।[১৬] কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক প্রথা, রীতি-নীতি এবং প্রথানুগ আইনকানুন আছে। এই সামাজিক আইনগুলির দ্বারা তাদের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক শাস্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিবাহের সময় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বর তার বধুর গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয়। তার আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু মঙ্গলসূত্রটি বরের হাতে তুলে দেয়। অপরদিকে চাকমা সম্প্রদায়ের বিবাহ হিন্দু আচার ও প্রথাগুলিকে অনুসরণ করে থাকে।

চাকমাদের ধর্মচর্চা ঃ

যদিও ত্রিপুরার চাকমা সম্প্রদায় বৌদ্ধ হীনযান ধর্মে বিশ্বাসী, তবুও তাদের পুজোর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদ যথেষ্ট প্রকট।[১] তাদের পুজো, আচার ইত্যাদি পরিচালনার জন্য মোট চার ধরনের পূজারী আছে। যথা — ১. ভিক্ষু, ২. রাউলি ৩. ওঝা এবং ৪. গাঙকুলি। ভিক্ষু হল বৌদ্ধ সাধু। রাউলিরা প্রথানুগ রীতি-নীতিগুলি পরিচালনা করে। ওঝা দেবতার ক্রোধ এবং অশুভ আত্মার ক্ষতি থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রাচীন গানগুলি গেয়ে শোনায় গাঙকুলি।[১৮]

চাকমাদের পুজো ও উৎসবগুলি চার রকমের। যেমন — ১. পরিবার সম্বন্ধীয় ২. গুষ্টি বা গোত্র -নির্ভর, ৩. গ্রাম-নির্ভর এবং ৪. সর্বজনীন পুজো বা অনুষ্ঠান -নির্ভর। পরিবার ভিত্তিক পুজোগুলির মধ্যে

রয়েছে — ঘরচুমলাঙ, মা — লাক্কি-মা, কাজাইপানি বা গঙ্গা ধর্মকাম বা বুদ্ধ ইত্যাদি দেবদেবীর পূজো। গ্রামভিত্তিক পূজোগুলি হল — থানামানা (মা-কাকি মা, গঙ্গা, ধলেশ্বরী, ভূতরাজা ইত্যাদি) এবং বুরপারা (মাতা, গঙ্গা, বিয়াত্রা, বাজমাটি)। গুত্তি বা গোত্র সম্বন্ধীয় পূজোগুলি হল — গুট্টি ভাট অথবা ভাত্‌দ্য। শেষের এই ধরনের পূজো সাধারণগত ভগবান বুদ্ধ এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত পূজোগুলি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চাকমারা একনো পর্যন্ত প্রকৃতি পুজো ও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী এবং তারা অশুভ আত্মাকে বিতাড়িত করবার জন্য তান্ত্রিক পূজো পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। ত্রিপুরার চাকমারা সর্বজনীন যে-সব উৎসব পালন করে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রথ টানা, বিজু উৎসব পালন এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপন। এছাড়া আরও যেসব উৎসব রয়েছে সেগুলি হল প্রভারানী পূর্ণিমা (লক্ষ্মী পূর্ণিমা বা কোজাগরী পূর্ণিমা), কঠিন চিবর দান ইত্যাদি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে লক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিনমাস সময়ের মধ্যে চাকমাদের কোনো বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হয় না। ১৯৯৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকার প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে পশ্চিম পিলাকের অন্তর্গত 'ঠাকুরাইন টিলা' অঞ্চলে 'পিলাক উৎসব' পালন করে আসছেন। এই অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে সাম্প্রতিককালে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব নিদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মের দেব-দেবীর মূর্তিরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

পট্টিকেরক এবং পিলাকে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ঃ

ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার পট্টিকেরক বা পট্টিকেরা নামক স্থানটিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।[১৭] প্রাচীন ত্রিপুরার (তিপেরা) ময়নামতী পাহাড়ে প্রচুর বৌদ্ধ আশ্রম পাওয়া গেছে। সমগ্র পাহাড়টি বৌদ্ধ স্তূপে ভর্তি। এই স্তূপের আকারও বিভিন্ন প্রকারের। এই স্তূপগুলিকে মোট ১৮টি ভাগে ভাগ করা যায়। ৫ নং স্তূপটি হল সবচেয়ে বড়ো। একটি পুঁথিতে ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত (মূল ছবি থেকে নকল করা) ১৬টি হাত বিশিষ্ট দেবী 'চুণ্ডা'র একটি ছবিতে লেখা আছে 'পট্টিকেরে চুণ্ডাবরভবন চুণ্ডা' শব্দগুলি।[১৮] এটি হল 'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' গ্রন্থের পুঁথি এবং এটি বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৯] পিলাকে ১৮টি হাত বিশিষ্ট একটি চুণ্ডা দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, যা দেখতে অবিকল পট্টিকেরাতে প্রাপ্ত ছবির মতো।

পাহাড়পুর, ময়নামতী এবং পিলাকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির (টেরাকোটা) মূর্তি, প্রস্তরমূর্তি ও ব্রোঞ্জমূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য একই রকমের। এই মূর্তিগুলির সঙ্গে গুপ্ত ও পাল যুগের মূর্তিগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পিলাকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে ধারণা হয় যে পূর্বভারতের বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির আর একটি বিস্তৃত কেন্দ্র ছিল পাহাড়পুর-ময়নামতী-পিলাক অঞ্চল।

বর্তমান দক্ষিণ ত্রিপুরার একটি ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে পিলাক নামাঙ্কিত স্থানটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আমরা আগেই বলেছি যে, পিলাক অঞ্চলটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত — পূর্ব পিলাক, মধ্য পিলাক ও পশ্চিম পিলাক। এই অঞ্চলটি জোলাইবাড়ি, পিলাক, দেবদারু এবং কলসি ইত্যাদি বিস্তৃত লোকালয় জুড়ে অবস্থিত। এইসব স্থানে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মেরই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি রয়েছে। সমগ্র অঞ্চলের এখানে ওখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন ধরনের মূর্তিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই মূর্তিগুলি হল — বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, তারা, লোকনাথ, মারীচ, চুণ্ডা, নৃসিংহ, মহিষমর্দিনী, মহাদেব, সূর্য, বিষ্ণু, গণেশ ইত্যাদি। ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি (খ্রিঃ ৮ম শতক), প্রস্তরনির্মিত তারা, অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ হরিতী ও বিষ্ণু মূর্তি

(এগুলির সবই খ্রিঃ ৯ম শতকের) এবং খ্রিস্টিয় ১০ম শতকে নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ সমগ্র পিলাক অঞ্চলের বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্ননিদর্শনগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে এখানে উভয় ধর্মীয় সংস্কৃতি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছিল অথবা উভয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। এথেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মধ্যে স্থাপিত সুসম্পর্ক ও বহুধর্মীয় ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সম্ভবত এই মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই পিলাক বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির কী কারণে অবলুপ্তি ঘটল তা নিয়ে আজও কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তবে 'ঠাকুরাইন টিলা' ও পার্শ্ববর্তী স্থানের ভৌগোলিক পরিবর্তিত অবস্থা (যেমন মুহুরী নদীর নিকটবর্তী অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, মূর্তিগুলির ক্ষয় ইত্যাদি বিষয়গুলি) থেকে এই ধারণা করা যেতে পার যে, মুহুরী নদীতে ব্যাপক বন্যার প্লাবনে এই স্থানটি সুদীর্ঘকাল জলের নীচে থাকার ফলে এই প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানটি ধ্বংস হয়ে যায়।

'পিলাক' শব্দের উদ্ভব ঃ

পিলাক অঞ্চলে কোনো প্রস্তরলিপি বা খোদিত অন্যতর নিদর্শন আজও পাওয়া যায়নি। তবে বেশ কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে যার উপর 'পিরাক' বা 'বেরক' শব্দটি লেখা রয়েছে। এখানে 'পিলাক' নামক শব্দটির অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বর্মা (মায়ানমার, দেশের আরাকানের অন্তর্গত ম্রোহাঙ্ নামক স্থানে অবস্থিত একটি প্যাগাডো বা বৌদ্ধমন্দিরের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে 'পিলাক্ক বনক' শব্দ দুটি পেয়েছেন। এটি খ্রিস্টিয় ৮ম শতকে আনন্দ চন্দ্র নামে কোনো ব্যক্তির দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। ধ্বনিতত্ত্বের পরিবর্তন সূত্র অবলম্বন করে 'পিলাক' শব্দটিকে এইভাবে পুনর্গঠিত করা যায় — পিরক পিলাক্ক পিলাক। তবে 'পিরাক' শব্দটি সংস্কৃত 'পরশু' নামক শব্দ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'ক' ধ্বনির পরিবর্ত (কগ্নেট) রূপ হল 'স'। সাধারণত ইওরোপে 'ক' ধ্বনির সংরক্ষণ এবং প্রাচ্য খণ্ডে 'স' এব আবির্ভাব ঘটেছিল। সংস্কৃত 'পরশু'-র গ্রীকপরিবর্ত (কগ্নেট) শব্দ হল 'পেলেকু'। ইন্দো ইুরোপীয় 'পেলেকু' থেকে অ্যাসিরিয় 'পিলাক্কু' এসেছে। এই 'পিলাক্কু' পিলাক্ক পিলাক এর উদ্ভব সম্ভব।

এই রকম সিদ্ধান্তের আরও একটি কারণ রয়েছে। বর্তমান 'পিলাক' অঞ্চলের পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চলে আজও বিভিন্ন উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে স্থানীয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপজাতিগোষ্ঠীর ভাষা হল 'ককবরক' (যা ১৯৭৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত)। অতীতে এই ভাষায় প্রচুর ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং সেগুলি আজও প্রচলিত। এছাড়া প্রচুর ককবরক শব্দের ভিতরে ইন্দো ইউরোপীয় শব্দের সংক্ষিপ্ত/ পরিবর্তিত রূপ 'ইনফিক্স' রূপে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত কোনো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী/ জনগোষ্ঠী ('পরশু' গোত্রের) একটি দলছুট গোষ্ঠী হিসেবে একসময় এখানে আসে এবং ককবরক ভাষীদের পূর্বতন গোষ্ঠীর সঙ্গে খ্রিস্টের জন্মের আগেই তাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'পিলাক' নামক শব্দটি তারই স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। অতএব, পরশু পিলাক্ক পিলাকু পিলাক-এর বুৎপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

যাইহোক, পিলাক অঞ্চলের মাটির নীচে আরও খননকার্য ঘটলে এবং প্রাপ্তব্য বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হলে এ বিষয়ে হয়তো আমরা আরও বেশি আলোকিত হতে পারবো।

ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা ঃ ভারতভুক্তির আগে ও পরে

ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমের মৃত্যুর পর ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর। এর আগে মহারাজা বীরবিক্রম ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা করেন। তিনি চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ভ্রমণ করেন এবং ওই সব দেশ থেকে ভগবান বুদ্ধের নানা মূর্তি এবং অন্যান্য প্রতীকী স্মারক উপহার সংগ্রহ করে আনেন। বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে ইঙ্গ-জাপান যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ত্রিপুরার সেনাবাহিনীর একটি অংশ যোগ দেয় যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে তারা চারটি অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি এবং আরাকানের সেন্ডওয়ে নামক স্থানে অবস্থিত একটি বৌদ্ধমন্দির থেকে একটি প্রকাণ্ড আকারের ঘন্টা নিয়ে আসে। তারা মহারাজ বীরবিক্রমকে এগুলি উপহার দেয়। মহারাজ 'ভিক্ষু সংঘ'কে আগরতলার কুঞ্জবনের 'বিজয়ন্ত' প্রাসাদের কাছেই বৌদ্ধমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন। এখানেই 'বেনুবন বিহার' নামে বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হয় এবং মহারাজার অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরটির উদ্বোধন হয় ৪ঠা মে ১৯৪৭ এ। এখানে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিয়ে আসা চারটি বুদ্ধমূর্তি এবং তাৎকালিক পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা মহারাজা নলিনাক্ষ রায় প্রদত্ত একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত বুদ্ধমূর্তি বেদীর ওপর স্থাপন করা হয়। মহারাজা বীরবিক্রম এবং তাঁর রাজপরিবারের সদস্যগণ এই বুদ্ধমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। মহারাজার পক্ষে মহারাজকুমার কিরীট বিক্রম 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করেন এবং 'ভিক্ষুসংঘ'কে রাজকীয় দানস্বরূপ 'বেনুবন বিহার' অর্পণ করেন।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ১৯৫৬ সালে রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে ২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ' এই উপলক্ষে তাৎকালিক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি পি মৌর্য এখানে আসেন এবং উৎসবে যোগ দিয়ে ভাষণ দেন। এরপর আগরতলা 'বেনুবন বিহার' বৌদ্ধমন্দিরে ২০০০ সালের ৫ই নভেম্বর পবিত্র 'খঠিন চিবর দানোৎসব ২০০০' অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধমন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন। ২০০১ সালের ৭ই মে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী উত্তর ত্রিপুরার লমতরাই উপত্যকায় অবস্থিত 'ময়নামা' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ২৫৪৫ তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবে যোগ দেন এবং এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।'

ত্রিপুরার বৌদ্ধ ভিক্ষু, মঠাধ্যক্ষ, পূজারী প্রমুখ বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ এখানকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'মৈত্রেয়ী, প্রজ্ঞা ও করুণা'র আদর্শ দীর্ঘকাল ধরে প্রচার করে আসছেন। ত্রিপুরার বৌদ্ধ সম্প্রদায় আজ এক অভূতপূর্ব যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ইদানীং কিছু খ্রিস্টান মিশনারী ও বিদেশী শক্তির সহায়তায় এখানকার কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী প্রত্যন্ত অঞ্চলের বৌদ্ধদের ক্রমাগত সামাজিক সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তার নেতিবাচক ফলশ্রুতি হিসেবে ত্রিপুরার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো পরিচয়ের কিংবা অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়নি। কারণ, ত্রিপুরায় সুদূর অতীতকাল থেকে আজও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমন্বয়ের ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল রয়েছে।

শেষের কথা ঃ

ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে নানাভাবে ঋণী। কারণ, প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার, আশ্রম, মঠ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে যে সব বিদ্যার

চর্চা হয়ে এসেছে, তা আমাদের দর্শন, ধর্ম, ধর্মীয় সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদিকে শুধু সংরক্ষণই করেনি, তার চর্চাও অব্যাহত রয়েছে। উত্তর ভারতের পূর্বপ্রান্তে বৌদ্ধ দর্মের বিকাশ হলেও তা দক্ষিণ ভারত এবং ভারতের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূখণ্ড, ইরান, আফগানিস্তান, সিংহল, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাম্পুচিয়া, লাওস, চীন, জাপান এবং রাশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজ প্রভৃতি সমগ্র ভূখাঞ্চলে জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। খ্রিস্টান এবং তৎপরবর্তী ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সেবা, অহিংসা এবং মানবিক মূল্যবোধের আবির্ভাব ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনুভূত হয়।

উত্তর ভারতে অভ্যন্তরীণ কারণে বৌদ্ধরা মহাযানী ও হীনযানী নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেও উত্তর ভারতে বারবার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনসহ ভারতীয় দর্শনের চর্চা দক্ষিণ ভারতই বহুকাল ব্যাপী ধরে রেখেছিল। হয়তো সেই বৌদ্ধ সংস্কৃতি-চর্চায় 'হীনযান' মতাদর্শই প্রবল ছিল। তবু এইসব সম্প্রদায়গত বিভেদ সত্ত্বেও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আমাদের নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আজও করে চলেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের আগে আমাদের দেশের বিদ্যাচর্চায় বিদ্যার্থীর প্রশ্নাতুর ও অনুসন্ধিৎসু হওয়ার একটা সীমা ছিল। তখন আচার্যরা তাঁদের শিষ্য-শিষ্যাদের নিরন্তর জিজ্ঞাসাকে বাধা দিতেন। (স্মরণীয়-যাজ্ঞবাল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী সম্পর্কিত এবং অন্যান্য 'ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা' সম্পর্কিত উপনিষদের কাহিনী সমূহ।) পরবর্তীকালে বৌদ্ধরাই ভারতীয় ষড়দর্শনের বিভিন্ন দিক (যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা) এবং বৌদ্ধ ও লোকায়ত দর্শনের নানা বিষয়াদির যুক্তিপূর্ণ চর্চা করে এসেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের জ্ঞানচর্চা সমৃদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ বা সংশয় এবং প্রশ্নই হল জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির মূল উপায়।[৩১]

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হীনযান ও মহাযান নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেও উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের অন্তত চারটি মতাদর্শ মেনে চলেছে। যেমন — ১ রাগ, দ্বেষ, মোহ থেকে মুক্ত থাকা; ২ মহাবিশ্বের উৎপত্তিহীনতা ও ধ্বংসহীনতা সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করা; ৩ যুক্তি-তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায় হিসেবে কার্যকারণবাদকে গ্রহণ ও ব্যবহার করা এবং ৪. বুদ্ধদেবের মোট চারটি সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করা (যেমন — ক দুঃখ আছে, খ দুঃখের কারণ আছে, গ. দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ঘ. দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।)

হীনযান সম্প্রদায় মূলত নৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মহাযান সম্প্রদায় প্রধানত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন। হীনযানীরা সংরক্ষণশীল এবং ব্যক্তিগত নির্বাণে বিশ্বাসী। অপরদিকে, মহাযানীরা কিছুটা অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার ও প্রথার সঙ্গে সমন্বয়ী মনোভাবাপন্ন এবং উদারপন্থী বলে তারা সমস্ত জীবের নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট। সম্ভবত সেজন্যই উত্তর ভারতে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি ঘটে থাকতে পারে এবং এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের বৃহৎ বলয়ের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দেয়।

ত্রিপুরায় অতীত ও বর্তমান কালের বৌদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে যথাক্রমে মহাযানী ও হীনযানী উভয় সম্প্রদায়ের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। অতীত ত্রিপুরার ভূখণ্ডে বৌদ্ধ সংস্কৃতি মহাযান বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল বলেই তখন প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর সমন্বয়ী সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বর্তমান ত্রিপুরায় হীনযান বৌদ্ধধর্মের আচার, প্রথা ও আদর্শের পুনর্জাগরন ঘটেছে। কিন্তু 'হীনযান' ধর্ম সংরক্ষণশীল বলে অভিহিত হলেও ত্রিপুরার হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি মহাযানীদের মতোই তান্ত্রিক মতবাদ, অশুভ আত্মার বিতাড়ন এবং অন্যান্য আচার ও প্রথা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আগেই বলেছি, বর্তমান

ত্রিপুরায় মগ এবং বড়ুয়া নামে আরাকান থেকে আগত হীনযানী সম্প্রদায় এবং চাকমা নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত আর একটি হীনযানী সম্প্রদায় রয়েছে। উভয় হীনযানী সম্প্রদায়ই থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হল সিংহলী থেরবাদী ঐতিহ্যনুসারী এবং আরাকান থেকে আগত মগ ও বড়ুয়ারা হল বর্মী থেরবাদী পরম্পরার উত্তরসূরী।[৩২]

দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক ও দেবতামুড়া এবং উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি ও ধর্মনগরের কালাছড়া অঞ্চলে যে বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির সহাবস্থান ও সমন্বয় দেখা গেছে, তার ঐতিহ্য বর্তমান ত্রিপুরায় আজও প্রবহমান। কারণ চতুর্দশ দেবতার মন্দির, বিভিন্ন উপজাতির ধর্মীয় পূজানুষ্ঠান, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পুজো-পার্বণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সকল উৎসব ও অনুষ্ঠানে জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদে সকলেই সমানভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

সূত্র ও টীকা

১। লি ইয়ুং-সি সম্পাদিত 'ফা-হিয়েনস রেকর্ড অব বুদ্ধিস্ট কানট্রিজ', পৃঃ ৭৭, দি চাইনিজ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বেজিং।

২। সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৬৬, পৃঃ ২ এবং ওমেশ সায়গল ঃ 'ত্রিপুরা —ইটস্ হিস্ট্রি অ্যানন্ড কালচার', কন্‌সেপ্ট্ পাবলিসিং কোং, ১৯৭৮, পৃঃ ১০৭।

৩। স্যামুয়েল বিল ঃ 'লাইফ অব হিউয়েন সাঙ', ১৯৪৪, পৃঃ ১৩১-৩৩।

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪১৪।

৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্‌টস্', ১৯৯৫, কলকাতা,(ইনট্রোডাকশন) পৃঃ ৩৩-৩৭।

৬। ওমেশ সায়গল ঃ 'ত্রিপুরা—ইট্‌স্ হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার', পৃঃ ১০৮।

৭। দীপক ভট্টাচার্য ঃ 'পিলাক কথা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ১৯৯৯, পৃঃ ২১।

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (১ম খণ্ড), পৃঃ ৬৭।

৯। কে. পি. জয়সওয়াল ঃ 'ইমপিরিয়াল হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ইন বা সান্‌স্‌ক্রিট টেক্‌স্ট' পৃঃ ৪৯।

১০। ওমেশ সায়গল ঃ 'ত্রিপুরা—ইট্‌স্ হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার', পৃঃ ১০৮।

১১। ওই, পৃঃ ১০৯।

১২। আগরতলার অভয় নগরের প্রবীন সাংবাদিক শ্রী শ্রুতোরঞ্জন খিশা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

১৩। সুনীতিকুমার পাঠক ঃ 'নিউ ট্রেন্ডস্ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড আরকিওলজি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ — 'দি কালচার — স্কোপ অব দি বুদ্ধিস্ট্‌স ইন নর্থ ইস্ট ইনণ্ডয়া', আদিত্য প্রকাশন, দিল্লি, পৃঃ ২৭৫।

১৪। 'এডুকেশন মিস্‌সেলেনি', ৪র্থ খণ্ড, শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৮৬।

১৫। শশধর বিক্রমকিশোর দেববর্মন ঃ 'দি ট্রাইব্‌স্‌ অব ত্রিপুরা — আ ডিসার্টেশন', ১৯৮৬, ত্রিপুরা সরকার, পৃঃ ২৭-২৮।

১৬। সুরেন দেববর্মন ঃ 'দি চাকমাজ অ্যান্ড মগ্‌স্‌', আগরতলা, ১৯৮৭, পৃঃ ৪৩, ৪৮-৪৯।

১৭। পান্নালাল মজুমদার ঃ 'দি চাকমাজ্‌ অব ত্রিপুরা', গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা, আগরতলা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৪৯।

১৮। শশধর বিক্রমকিশোর দেববর্মন ঃ 'দি ট্রাইব্‌স্‌ অব ত্রিপুরা — আ ডিসার্টেশন', পৃঃ ৩১।

১৯। দীপককুমার বড়ুয়া ঃ 'বিহারস ইন অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া', ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস মনোগ্রাফ সিরিজ নং ১০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৮৯।

২০। ঐ।

২১। দীপক ভট্টাচার্য ঃ 'পিলাক কথা' পৃঃ ৩৬।

২২। ঐ, পৃঃ ১৯।

২৩। ঐ, পৃঃ ২৫।

২৪। টি বারো ঃ 'সানস্‌ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ', পৃঃ ১২-১৩ এবং পরেশচন্দ্র মজুমদাব ঃ 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১ম খণ্ড), সারস্বত লাইব্রেবী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪।

২৫। পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪২।

২৬। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান লেখকের।

২৭। ভিক্ষু আর্যমিত্র ঃ 'আগরতলা বেনুবন বিহার', বুদ্ধজয়ন্তী বুলেটিন, আগবতলায় ২৫৩১ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, ৬ নভেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪-৯।

২৮। ঐ, পৃঃ ১১।

২৯। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কোজাগরী বা লক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস বর্ষা-বাদলের ঋতু বলে এই সময় ভিক্ষুরা বাইরে যেতে পারেন না। সে জন্য গৃহস্থ বৌদ্ধরা ভিক্ষুদের আশ্রম বা বিহারে এসে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে যান। এই দানকে 'কঠিন চিবর দান' নামে অভিহিত করা হয়।

৩০। দ্রঃ নির্বাণ নগর বন বিহারের সচিব শ্রী মহীয়ান চাকমা কর্তৃক ২০০১ সালের ৭ই মে তারিখে প্রকাশিত প্রচারপত্র।

৩১। এ বিষয়ে 'মিলিন্দ ফঞ্‌হো' (প্রাচীন ভারতের গ্রীক রাজা মিনেন্দার-এর প্রশ্ন ও নাগ সেনের উত্তর-সম্বলিত গ্রন্থ) স্মরণীয় ও তুলনীয়।

৩২। সুনীতিকুমার পাঠক ঃ 'নিউ ট্রেন্ড্স্ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড আরকিওলজি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ — 'দি কালচার— স্কোপ অব দি বুদ্ধিস্ট্স্ ইন নর্থ ইন্ডিয়া', পৃঃ ২৮৪।

[এই প্রবন্ধটি রচনার ব্যাপারে শ্রী কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শ্রী শ্রুতোরঞ্জন খিশা, ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইব্যাল রিসার্চ সেন্টার লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক এবং প্রয়াত ড. কমল কুমার সিংহের যে সাহায্যে ও সহযোগিতা পেয়েছি, সে জন্য তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রবন্ধটি প্রয়াত ড কমল কুমার সিংহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘরূপে নিবেদন করলাম।]

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস

তপোধীর ভট্টাচার্য

নিষ্ঠুর ইতিহাস বাঙালির বাসভূমিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। নিরাশ্রয় ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে বাঙালির মনন ও সৃষ্টির পরিসর। বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ নিতান্ত মোটাদাগের হিসাব-নিকাশে রুদ্ধ ও ভোঁতা করে দিয়েছে বাঙালির মেধা ও চৈতন্যকে। তাই স্মৃতি- সত্তা ভবিষ্যতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ করে বাঙালি ভুলে থেকেছে তার সহজ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় আর অস্তিত্বের বহুবাচনিক অবিজ্ঞানকে। নইলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানচিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা খণ্ডিত ও ঝাপসা হত না। রাজনৈতিক ভূগোলের দোহাই দিয়ে আমাদেব হাজার বছরের বহমান চেতনা স্রোতকে কার্যত অস্বীকার করতাম না। তাই আমরা মুখে বলি সমগ্র বাংলা সাহিত্য, কিন্তু বোঝাই পশ্চিমবঙ্গে রচিত সাহিত্য। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য-লোভন সাহিত্য। তাতে কলকাতার অজস্র ছোট পত্রিকায প্রকাশিত ব্যতিক্রমধর্মী এবং তারুণ্যের শৌর্যে ও লাবণ্যে স্পন্দিত রচনা পুঞ্জ মনোযোগেব বাইরে বযে যায়।

পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়, মহকুমায় স্থানিক পরিসরের বিপুল বৈচিত্র্য কীভাবে জীবনের অনিঃশেষ সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা আবিষ্কারের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে ব্যক্ত-হচ্ছে, তাকে প্রাপ্য গুরুত্ব না দিয়ে মফঃস্বলের সাহিত্য বলে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা স্পষ্ট । যেন মহানাগরিক কলকাতার কৃত্রিম ও প্রাতিষ্ঠানিক পণ-সাহিত্যই মূল স্রোত ; এর বাইরে সমস্তই প্রত্যাখ্যাত অপর। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের চোখ ধাঁধানো জৌলুস ও মন মাতানো মাদক ঐ মফঃস্বলের লিখিয়েদের কতভাবে যে নিরুদ্যম ও ভ্রষ্ট করে দেয়, তার ইয়ত্তা নেই। জীবনবিচ্ছিন্ন কথকতার মাদক প্রতিষ্ঠানের প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে মিথ্যার আড়ম্বরকেই সত্য করে তোলে।

বাঙালির প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসংলগ্ন অসংলগ্ন আধুনিকতা, নব্য আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদেব বিভ্রম চোরাবালির অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। 'আমরা এবং 'ওরা'র বিভাজন এমনভাবে মান্যতা পেয়ে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের চেয়েও প্রেক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের খোলস মুক্ত বাংলাদেশ কতটা বাঙালির সাহিত্য আর কতটা বাংলাদেশীর, এই নিয়ে মিথ্যা ও বিপজ্জনক তর্কও কোনও কোনও মহলে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গ আপাতত মুলতবি রেখেও এই জরুরি কথাটুকু বলে নেওয়া দরকার যে বাঙালির সত্তা এক ও অবিভাজ্য। তাই তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মনন ও সৃষ্টি ভূগোল -নিরপেক্ষ অখণ্ড বাঙালির সম্পদ। অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে অজস্র উচ্চাবচতা, অন্তর্বয়ন ও কৌলিকতার ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। কলকাতাব ছাঁচে এই সমৃদ্ধি ব্যক্ত নয় বলে তাকে নস্যাৎ করলে আধিপত্যবাদী ঔদ্ধত্যই প্রমাণিত হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস্তবতার নানামাত্রিক ভিন্নতা ইতিহাসের নির্মিত । বাঙালির প্রব্রজনও

ইতিহাসের বহু অন্ধ বিন্দুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদিক দিয়ে আসামের বরাক উপত্যকা এবং ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা মনোযোগ দাবি করে। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা না করে বাঙালির সামূহিক জীবনবৃত্তের সমান্তরালতা এবং সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিকতার বহুস্বরিক তাৎপর্য স্পষ্ট করা যাবে না। আপাতত এই বাক্যটিকে সংকেত হিসেবে ধরে নিয়ে লিখতে পারি, উপন্যাস যেহেতু দ্বিবাচনিক কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, ত্রিপুরার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিশিষ্টতাই সেখানকার বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমটির স্বাতন্ত্র - দীপ্ত পরিসর নির্মাণ করেছে। পার্থক্য প্রতীতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি সূক্ষ্মভাবে ভূগোল ও ইতিহাসের যৌথ নির্মিতি যেন। এখানে ছোট একটি স্পষ্টীকরণ দরকার। ইতিহাস মানে ধূসর অতীত নয়, চলমান ইতিহিাস থেকে বর্তমানের সত্তাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক রাজনীতি, প্রতাপ ও প্রান্তিক বর্গের নিরন্তর সংঘর্ষ এবং সমঝোতা প্রয়াসের বন্ধ্যাত্ব উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় পুনর্গঠিত হয়ে চলেছে। কলকাতায় বা ঢাকায় যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের কুহক যে ধরণের জটিল সত্যভ্রম উৎপাদন করে, তার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ত্রিপুরার রচিত বাংলা উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা অসম্ভব। তেমনই ব্যক্তিসত্তা ও সামূহিক সত্তায় প্রতিবিম্বিত আপাত সময় আর প্রকৃত সময়ের গ্রন্থনা কীভাবে ঐসব উপন্যাসের মুখ্য আধেয় — তা নিবিড় পরিশীলনের বিষয়।

দুই

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতা ঃ দুটোই হয়তো এক। তবু যে কথাগুলি আলাদাভাবে মনে এল, এর কিছু সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে। বাঙালি ও উপজাতির সহাবস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বিরাক্রিয়ায় অবিরল। তবু ধ্বংসের উন্মত্ততার মধ্যেও সৃষ্টির প্রেরণা অব্যাহত ঃ এরও অজস্র প্রমাণ রয়েছে। বাঙালি ও উপজাতির সহাবস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বিরালাপের যে আবহ গড়ে উঠেছিল, তা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিষক্রিয়ায় আবিল। তবু ধ্বংসের উন্মত্ততার মধ্যেও সৃষ্টির প্রেরণা অব্যাহত ঃ এরও অজস্র প্রমাণ রয়েছে। শিল্পায়ন শূন্য প্রদেশে পুঁজির বিকাশ মন্দগতি ; ফলে সমাজের গভীরে স্থবিরতা এখনও অনড়। আগরতলা রাজধানী ঠিকই ; কিন্তু আধুনিক নগরের চরিত্র তার পক্ষে অনর্জনীয়। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য অচলায়তন, অথচ বিচিত্র কূটাভাসে বামপন্থী রাজনীতি সেখানে যথেষ্ট সফল। উপন্যাস যে ব্যক্তিকে খোঁজে, তার পরিসর জুড়ে শুধুই স্বরিবোধিতা ও অনন্বয় তাই অবধারিত। বড়ো সময় ও ছোট সময়ের দ্বান্দ্বিকতা কখনও স্পষ্ট, কখনও ঝাপসা। তাই উপন্যাসের বিন্যাস মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ে ; কোনও কোনও লেখকের সংবেদনায় তা ধরা পড়ে যায় বলে একে সচেতন ভাবে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে বৌদ্ধিক নির্মিতির আশ্রয় নেন তাঁরা।

সাধারণভাবে উত্তর - পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য পুরোপুরি ছোট পত্রিকা নির্ভর। ত্রিপুরাও ব্যতিক্রম নয়। তবে সংবেদনশীল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে আগরতলা কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। ছোট ছোট কিছু প্রকাশন সংস্থা মোটামুটিভাবে গত এক দশকে গড়ে উঠেছে। রাজধানীতে ও বিভিন্ন জেলা -সদরে, মহকুমা শহরে বইমেলার নিয়মিত আয়োজন হচ্ছে বলে স্বল্পপুঁজির প্রকাশন সংস্থাগুলি উপন্যাস ও গল্প সংকলন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। উত্তর -পূর্ব অন্যান্য অঞ্চলের মতো ত্রিপুরাতেও ছোটগল্পের গৌরব তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে উপন্যাস রচনার নিরিখে ত্রিপুরা কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে আরো একটি কথা অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উপন্যাস অভিধার অন্তরালে রয়েছে কল্পনায় গড়া প্রতিবেদন, যার ভিত্তি বাস্তবতা হলেও শেষপর্যন্ত তা সমান্তরাল আরেক বাস্তবের সুপরিকল্পিত অভিব্যক্তি। এই নির্মাণও সূক্ষ্মভাবে লেখকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্বভাবত ত্রিপুরায় রচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনও সেখানকার স্বতন্ত্র বাস্তবের নিজস্ব আখ্যান। বানানো গল্প খুঁজতে হয় না তাতে; গল্প তৈরী হয়েই আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কিংবা সময়ের আঁচে মানুষ মানুষীর ঝল্‌সে যাওয়ায়। সমস্ত ধরনের উপকরণ অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে ত্রিপুরার উপন্যাস। কেননা এখানকার সমাজ-জীবনের ইতিহাস নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সত্য হলো সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে জীব বিশ্বের দ্বিরালাপ সন্ধান।

উপন্যাস শিল্প নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার বদলে ত্রিপুরার ঔপন্যাসিকেরা সময় স্বভাবের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিরাতভূমির লোকায়ত জীবন, বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক বীক্ষা, কথকতার বিন্যাস প্রায়ই অপরিশীলিত উপাদান হিসেবে প্রতিবেদনে আত্তীকৃত হয়েছে। ক্লদ লেভিস্ট্রাউস যেভাবে 'raw' ও 'cooked' এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন, সেই নিরিখে বলা যায়, এখনও ত্রিপুরার উপন্যাসে 'raw' বা কাঁচামালের উপস্থিতি বেশি প্রকট। এইজন্যে মনে হয় উপন্যাসের নির্মাণে নির্মিতি অনুপস্থিত ; যথাপ্রাপ্ত উপাদানের কথকতাসুলভ উপস্থাপনা বেশি লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিমল সিংহের 'লংতরাই' নামক আখ্যানের কথা লিখতে পারি। ত্রিপুরার মন্ত্রী বিমল সিংহ উগ্র পন্থীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পরে যতটুকু সময় থাকত, ত্রিপুরার জনজীবন মন্থন জাত অভিজ্ঞতাকে নানা ধরনের বয়ানে রূপান্তরিত করতেন। 'বিমল সিংহ রচনা সমগ্র' (১৯৯৯) এর প্রাক্‌কথনে ('আমার কথা') লেখকের সহধর্মিনী বিজয়লক্ষ্মী জানিয়েছেন, "তাঁর স্বপ্ন, রাজনীতি এবং সাহিত্যের মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিল না। তারা প্রায় একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এখন অনেকেই বলেছেন বিমল সিংহের সাহিত্যে এখানকার জীবনচর্যা অনাবিল ভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এই জীবনের মধ্যেই সম্পৃক্ত ছিল বিমল সিংহের সত্তা। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন পাহাড়ে সমতলে নিপীড়িত মানুষজনের মধ্যে মিশেছিলেন তাদের একজন হয়ে, বিপ্লবের এক সৈনিক হয়ে সেই জীবনকে মূর্ত করতেই তাঁর সাহিত্য। তাই জীবনের রক্তমাংস এত প্রবল তাঁর সৃষ্টিতে। ... বিমল সিংহের সাহিত্যে জাতি উপজাতি আত্মিক সম্পর্কের যে প্রকাশ ঘটেছে তা শুধুমাত্র সাহিত্যিক রচনা নয়, তা এক উজ্জ্বল বাস্তব। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সেই আত্মীয়তার সেতুবন্ধকে রক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই বন্ধনকে ধ্বংস করতে উদ্যত যে শত্রুরা তাদেরই হাতে নিহত হয়েছে বিমল সিংহ। যেন নিজের রক্ত দিয়ে ভালোবাসার নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা করে গেলেন।"

বিজয়লক্ষ্মী যাকে বলেছেন 'উজ্জ্বল বাস্তব', ত্রিপুরার আলো -হাওয়া রোদ অন্ধকারে খচিত হয়ে তা আখ্যানের গভীরে সমান্তরাল অপর বাস্তবের গ্রন্থনা তৈরী করেছে। ঔপন্যাসে যাদের উপস্থিতি নিতান্ত বিরল, পার্বত্য জনপদের সেইসব ব্রাত্য নিম্নবর্গীর জনদের উপস্থাপনা প্রমাণ করে যে গণসংগঠনের নিরলস নির্মাতা সত্যিই ব্রাত্য জীবনের ছায়া ও অন্ধকার ঘেরা পরিসরে গভীর সংবেদনা নিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। আর, রঞ্জন রশ্মির দৃষ্টি দিয়ে যাবতীয় নির্মোক ভেদ করে পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রাত্য সমাজের সামূহিক অন্তঃসারে। তাই ভালবাসার নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। উপজাতির অনাবিষ্কৃত জীবনচর্যায় ঔপন্যাসিকতার সম্ভাব্য পরিসর কতখানি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, মূলত সেদিকে তর্জনি সংকেত করেছেন বিমল সিংহ। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করে নির্মাণ করেছেন ভরকামুনি ও সাজেরুঙের মতো কুশীলবদের —বাংলা সাহিত্যে যে ধরণের উপস্থিতি সাধারণ দেখা যায় না। আগেই লিখেছি, রচনাকার গণসংঠনের নেতা, জনগণের হৃদস্পন্দন অনুভব করতে করতে লেখার স্পৃহা দেখা দিয়েছিল। উপন্যাসের শিল্পরূপ নয়, তাঁর কাঙ্খিত ছিল সেই জীবনের আখ্যান যাতে লোক জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গের সমন্বয়ে জেগে ওঠে বহুস্বর। ব্যক্তি নয়, জনগোষ্ঠীর যৌথ জীবন সম্পর্কে বিশ্বস্ত আলেখ্য রচনা করতে চেয়েছিলেন বিমল। আরণ্য সংস্কৃতির অপরিশীলিত আদিমরূপ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সুরে - তালে লয়ে বাঁধা হৃদয়ের উপাখ্যান লিখতে চেয়েছেন তিনি। লোকবিশ্বাস লোকগাথা কিংবদন্তী ইত্যাদির গ্রন্থনায় আখ্যানে কথকতার সংরূপ আভাসিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় লেখকের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

পড়তে পড়তে মনে হয়, লেখকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আনন্দই আখ্যানের আবরণে ব্যক্ত হয়েছে। জন্ম মৃত্যু-প্রেম-সুখ-দুঃখে দোলায়িত ব্রাত্য জীবন লেখকের সংবেদনশীল মনের স্পর্শে কবিতার মতো রমনীয় হয়ে উঠেছে। হয়তো সব মিলিয়ে উপন্যাসের আদল ফুটে ওঠেনি কিংবা গ্রন্থনার শিথিলতাও এড়ানো যায়নি; তবুও জীবনের প্রগাঢ় ও আন্তরিক উন্মোচনের জন্যে 'লংতরাই' আমাদের আকর্ষণ করে। বিশেষত বয়ানের সমাপ্তিসূচক অংশের কাব্যিকতা

নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজীবনকে নিবিড় সৌন্দর্যে বিধৃত করেছে ঃ "সাজেরুণ্ড তখনো ইস্কুলের উঠানে কচি কচি ছেলেদের কথা ভাবছে। কানে বাজছে দূর থেকে ইস্কুলের সেই ছেলে - ভোলানো বাঁশির ডাক পাহাড়ের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত চির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা পাহাড়ের শিশুদের ঘুম ভাঙিয়ে। রঙ্গিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুণ্ড। চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। কোলের ছেলেটা তার এমনি করে বাঁশের ডাকে ছুটে যাবে। ইস্কুলের ময়দানে কচি হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুড়ে কচি ঘাস অমন অপার বিস্ময়ে সূর্যের দিকে তাকায়"।

তিন

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই চিহ্নায়িত বাচনের স্রষ্টা মূলত রাজনৈতিক কর্মী। কী অফুরন্ত 'milk of human kindness' (শেক্সপীয়ার) এর অধিকারী হলে এমন দৃষ্টির স্পর্শমণি সঞ্চারিত হতে পারে ভাষায় ! আসলে জীবন পুনর্গঠনের ভাবাদর্শ রয়েছে বয়ানের মর্মমূলে। এই নিরিখে 'লংতরাই'—এর সঙ্গে স্মরণীয় 'লংতরাই আমার ঘর' (১৯৯৬), যার লেখক ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবাদ প্রতিম জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী । না লিখলেও চলে, ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে উপস্থাপিত করার কোনো মানে হয় না। এই বয়ানটি যে প্রকাশ করেছেন তিনি, এর পেছনে কিছুমাত্র সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নেই ; রয়েছে ইতিবাচক সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। লেখক স্বয়ং 'মুখবন্ধ' লিখতে গিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন "আমার ইচ্ছা ছিল একটি বড় গল্প লেখা, যেখানে ত্রিপুরার জনজীবনের বৈশিষ্ট্য এবং পাহাড়ি বাঙালির সংগ্রামী জনস্রোতকে এক শিবিরে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়। সে উদ্দেশ্যে লিখতে শুরু করি 'লংতরাই আমার ঘর' বড় গল্পটি। বর্তমান জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উপজাতি বাঙালি ঐক্যের উপর আঘাত হানার বিপদ উপস্থিত করেছে, তা লক্ষ্য করে, আমি এখন আমার বড় গল্পটি বিলম্ব না করে প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করছি। ... আমি আশা করবো 'লংতরাই আমার ঘর' গল্পটি, তার জাতি - উপজাতি ঐক্যের ভূমিকা গ্রহণ করতে সফলকাম হবে। এই বইয়ে যে সকল নাম ও ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা সকলই কাল্পনিক । যদি কোন প্রকৃত নাম বা ঘটনার সাথে তার কোথাও মিল ঘটে থাকে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।"

এই মুখবন্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে যে নৃপেন চক্রবর্তী পোড় খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক নন। রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (বিশেষভাবে বৈপ্লবিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী) দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। এ তার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক প্রচার আন্দোলনের বিশিষ্ট ধরন। এদিক দিয়ে নৃপেন চক্রবর্তী ও বিমল সিংহ একই পথের পথিক। তবে প্রথমোক্তজন উপন্যাসের আদলকে ঢিলেঢালা ভাবেও অনুসরণ করেননি ; কিন্তু শেষোক্তজন নান্দনিক মাত্রা সম্পর্কে হলো নাকি বড়ো গল্প — এ নিয়ে তাঁর সামান্য অভিনিবেশও নেই ; কেননা তাঁর অম্বিষ্ট শুধু বক্তব্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী যেমন তেমন কাঠামো। এই জন্যে তিনি 'বড় গল্প' এর পাশাপাশি 'গল্প' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। কাহিনী তাঁর কাছে নিছক আধার ; আধেয় হলো বাঙালি ও জনজাতির জনস্রোতকে শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখানো। উদ্দেশ্য সফল হলেই তিনি খুশি ; তা উপন্যাস হলো নাকি অন্য কিছু, এ তাঁর বিবেচনার বিষয় নয়। মনে পড়ে মাও জে দঙ-এর বিখ্যাত প্রবাদ প্রতিম মন্তব্য ঃ বেড়াল ইঁদুর মারছে কিনা, সেটা বিবেচ্য, বেড়াল কোন্ রঙের তা দেখার দরকার নেই। মূল কথা হলো, ভাবাদর্শগত সংগ্রাম শুধু প্রায়োগিক রাজনীতিতে নয়, সাহিত্য -সংস্কৃতির প্রকরণে পরিচালিত করা চাই।

বিমল সিংহ ও নৃপেন চক্রবর্তীর প্রতিবেদন ত্রিপুরার উপন্যাস বিশ্বের অন্তঃশায়ী বাস্তব উপলব্ধির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি হলো বাস্তব ও কল্পনার মধ্যবর্তী ধূপছায়ায় সঞ্চারমান কিছু মানুষের ছবি। নৃপেন চক্রবর্তী ঔপন্যাসিক নন বলেই মুখবন্ধ এই অনাবশ্যক সতর্কীকরণ দিয়েছেন ঃ "এই বইয়ে যেসকল নাম ও ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা সকলই কাল্পনিক ।" তিনি বলুন আর না বলুন, বাঙালি ও জনজাতির অজস্র মানুষ মানুষীর মিছিল যে সূত্রধর লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাস্তব থেকে উঠে এসেছে, এতে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকে না। ত্রিপুরার সামাজিক -অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে নৃপেন চক্রবর্তী সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে লক্ষ্য করেছিলেন।

বস্তুত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপুঙ্খের বিন্যাস এবং মানুষ - মানুষীর মনের অন্তঃস্বরের উদ্ভাসন আমাদের বিস্মিত করে। ত্রিপুরার কথাকারদের জন্যে তাঁর এই প্রতিবেদন সময় ও সমাজের নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ 'লংতরাই আমার ঘর' মূলত পরিশীলিত লিখন বিশ্বের প্রাক্‌কথন।

চার

নন্দকুমার দেববর্মার 'ঠিকানা কিরাতভূমি' (১ম পর্ব) (২০০০) ত্রিপুরার একান্ত নিজস্ব পরিসরের উপন্যাসায়ন। তবে বিমল সিংহ কিংবা নৃপেন চক্রবর্তী যেভাবে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উত্তাপ আখ্যানের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত করে যৌথ জীবনের উপন্যাসিক প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন, নন্দকুমার সেই ধরণ অনুসরণ করেননি। নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে (বিমল সিংহ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য) লংতরাই শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিসর নয়, তাস সার্বিক সামাজিক - রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র এবং জীবন পুনর্গঠনের চিহ্নায়ন প্রকরণের উৎস । দৃষ্টান্ত হিসেবে মধুতি-অনীতা নিখিলের কথোপকথন সূত্রে উত্থাপিত লেখকের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি ঃ "সমগ্র লংতরাইয়ের রাশি রাশি জল যখন বিরাট বন্যার আকার ধারণ করে, সারা দেশে যখন জোয়ার দেখে না, কেবল তারাই এভাবে প্রশ্ন করে । (অর্থাৎ 'পাহাড়ীদের উন্নতি হবে কিভাবে')

.... তার মানে, সেই জোয়ারে তুমি এমন ভাবে ভাসতে চাও, যাতে তোমার নিজস্ব কোন সত্তা না থাকে।

ডোবা যদি বলে কচুরীপানা আর কাদা আমার অলংকার, বন্যার জলে তাকে হারাবো না —তবে আমার কিছুই বলার নাই .....

তুমি কি বলতে চাও, কচুরীপানা ছাড়া আমাদের আর কোন কিছুই নাই গর্ব করার ? আছে, অনেক কিছু আছে। কিন্তু দেশে যতক্ষণ জোয়ার না আসবে ততক্ষণ তার সন্ধান পাবেনা, তার বিকাশ হবে না। আর যখন জোয়ার আসবে তখন আমরা প্রস্ফুটিত হবো নিজেদের শক্তিতে সকল সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। যারা এই জোয়ারের পথ রুখে দাঁড়ায় তারা আমাদের রাখতে চায় কাদার মধ্যে ডুবিয়ে, নিজেদের স্বার্থে। আমাদের সংগ্রাম শুধু তাদের বিরুদ্ধে।'

এই বাচনের অন্তঃসার স্পষ্টত রাজনৈতিক মাত্রা সম্পন্ন। বাঙালি ও উপজাতীয়দের যৌথ দ্বিরালাপ কেন ব্যাহত হয়েছে এবং কাদের স্বার্থে, এর একটা সংকেত পাওয়া গেল এখানে। লেখা বাহুল্য যে এই বাস্তবতা একান্তভাবে ত্রিপুরার। তাই নন্দকুমারের উপন্যাসেও এই বাস্তব যুগপৎ আধার এবং আধেয়। গোবিন্দ কৃষিশ্রমিক : তাকে ঘিরে আবর্তিত হয় বয়ান। তবে নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজন অবলম্বন হলেও লেখক-স্বরও নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে। যেমন প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে পাচ্ছি ঃ "সোনা সোনা পাকা ধান কাটার স্বপ্ন, গোলা ভরে উঠার স্বপ্ন তাগাদা দেয়। সে স্বপ্ন দিনক্ষণ বোঝে না। গোবিন্দ যেখানে সেখানেই স্বপ্নরা। কি রাত কি দিন"। তবে সেই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কতখানি, এই সত্য উন্মোচনেই ঔপন্যাসিকতা প্রতিষ্ঠিত হলো কিনা — এধরনের প্রশ্ন পাঠকের মনে দেখা দেয় নিশ্চয় । কার গোলা ভরে ওঠে ফসলে— এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা অবশ্য একটু পরেই হয়ে যায় ঃ 'নিজের জমি নয় হরিরাম কাকার'। আমরা লক্ষ্য করি, সংলাপে এবং বিবরণে আঞ্চলিক বাচনের উপস্থিতি বাস্তবকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে। মোট চার জনের জমি চাষ করে গোবিন্দ এবং কাজ করতে করতে ভাবে ঃ "মাটির মায়া কারে কয় জমির মালিকরাই জানে না। ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুইল্যা আমরার ঘাম চুইয়া খায় তার" ।" (ঐদেব) এতে বোঝা যাচ্ছে, লেখকের শ্রেণী দৃষ্টভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু উপন্যাস দানা বাঁধে বহুস্বরে, উপকরণের বাহুল্যে তার উপস্থাপনার নানা মাত্রিকতায়। এক্ষেত্রে নন্দকুমার কতটা সার্থকতা অর্জন করেছেন, এটা পাঠকের ভেবে দেখতে হয়। "ভোর হতেই সরীসৃপের মতো লাঙ্গল চালিয়ে চাষ করতে শুরু করে" গোবিন্দ। তারও আছে ভালবাসার মানুষ : শকুন্তলা, যাকে সে পাওয়ার কল্পনা করে। গোবিন্দের সূত্রে লেখক ত্রিপুরার গ্রামীণ সংস্কৃতির চলচ্ছবি তৈরী করেন। প্রসঙ্গত আসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা। সুবল-যুগল এবং অন্যান্য কুশীলবেরা সময় ও সমাজস্বভাবের ধুপছায়ার প্রতিনিধি।

ক্রমশ বয়ানে যুক্ত হয় ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বাস্তবতার জটিলতব সমস্যাগুলি। আদিবাসীবাঙালির দ্বন্দ্ব যে শ্রেণী সংগ্রামের পরিপন্থী. মূল কুশীলব গোবিন্দের ভাবনা সূত্রে তা ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক ঃ 'কিছু করার নেই অযথা পাহাড়ী বাঙালি করবে একদল মানুষ। আসলে দুইটাই জাত আছে দুনিয়ায় ধনী আর গরীব । হরিরামরা ধনী আর গরীব। হরিরামরা ধনী আর গোবিন্দরা গরীব।" ধীরে ধীরে আগরতলার পরিবেশ সম্পৃক্ত হ.য় পাঠকৃতিতে কিন্তু সমস্ত থাকে ভাসমান মেঘের মতো। আসলে ঔপন্যাসিক সচেতন ছিলেন, তাকে এসময়ের কথকতায় ত্রিপুরার প্রধান সংকটগুলিকে টানা পোড়েন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপোষক রাজনৈতিক অবচেতনাকে কীভাবে সমাজের চলমান ইতিহাস থেকে ছেঁকে নিতে হবে. এই চিন্তাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান চালিকা শক্তি। অথচ ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ব্যক্তি পরিসর সে সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করে, এই সত্যও অস্বীকার করা শক্ত। নন্দকুমার এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সমঝোতা করতে চেয়েছেন : সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে — এমনও বলা যায় না। উপন্যাসের ভরকেন্দ্র নিশ্চয় হতে পারত গোবিন্দ ও শকুন্তলার একবাচনিক সম্পর্ক ; কিন্তু সেক্ষেত্রে উপস্থাপনার বিন্যাস অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। পাঠকৃতির একাধিক অন্তর্বয়নের মধ্যে একটা স্পষ্ট যে লেখক ত্রিপুরী ও বাঙালির সম্পর্কগত রাজনৈতিক অন্তঃসার কর্ষণ করতে চাইছেন। প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আধারিত বিভিন্ন ব্যক্তি জীবনের উচ্চাবচতা মন্দমন্থর ভঙ্গিতে উন্মোচিত হয়েছে। যুগল, আয়েষা, হারুন, সুনীল, দীনেশ, বলাই, মরণ, নারান ওস্তাদ ঃ কম বেশি ব্যক্তি পরিসরেরই ধারক, সামাজিক রাজনৈতিক পরিসর চকিত ঝিলিক দিয়ে যায় মাত্র।

মাঝে-মাঝে সাংগঠনিক উদ্যোগের বিচ্ছিন্ন কিছু ছবি পাওয়া গেছে। প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনের মতো কিছু কিছু ইংরেজি উদ্ধৃতিও অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় তথ্যগুলি রূপান্তরিত হয়েছে কিনা ! এটা ঠিক, বহু প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ বয়ানে নিয়ে এসেছে সমসাময়িক জীবনের নানা গ্রন্থিলতার ইশারা। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সুশৃঙ্খল বিন্যাস উপন্যাসে ফুটে উঠল কিনা. সেটাই বিবেচ্য। কখনো কখনো মনে হয়. নিতান্ত এলোমেলো ভাবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছেন কথাকার। প্রধান কুশীলব গোবিন্দ এরই অভিঘাতে সূত্রধারক সত্তা হতে পারে নি এবং অন্যান্য কুশীলবের সঙ্গে তার সম্পর্কের গ্রন্থনাও শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে অবাঞ্ছিত একবাচনিকতায় আক্রান্ত হয়েছে বয়ান। অথচ গোবিন্দকে খুব যত্ন করেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন নন্দকুমার । সে কৃষি শ্রমিক, দরিদ্র কিন্তু চিত্তবিত্তে ঋদ্ধ. সুকণ্ঠী গায়ক, সংবেদনশীল, বইপ্রিয় এবং জগৎ পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সতর্ক ভাবুক। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে প্রেমিক : আসলে আপন অনুভূতির সৌরভে আপনি বিভোর। পাঠকৃতির যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে, তা প্রথম পর্বের উপসংহার মাত্র —একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এরপর কী হলো গোবিন্দ ও শকুন্তলার, ব্যক্তিসত্তা অন্বিত হোল কিনা সামাজিক সত্তায় — তা ক্রমশ প্রকাশ্য। আমাদের কৌতূহল কীভাবে মেটাবেন লেখক, তা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।

আপাতত পাঠকের নজরে পড়বে বিবরণেরও নিম্নবর্গীয় ধরণ, ত্রিপুরায় প্রচলিত বঙ্গীয় উপভাষার অনায়াস প্রয়োগ, জাতীয় ও আঞ্চলিক সমস্যার প্রতি সাবলীল দৃকপাত, নৈসর্গিক অনুপুঙ্খের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। সেই সঙ্গে রয়েছে গ্রাম ও নগরের বিচিত্র সহাবস্থান, কৌম রীতিনীতি ও নতুন সময়ের অনুষঙ্গের সমান্তরাল উপস্থিতি। "নারান ওস্তাদ ক্ষেপে বেগুন হয়ে আছে" —এজাতীয় প্রয়োগ বয়ানের নিম্নবর্গীয় স্বভাবকে ধরিয়ে দেয়। ভাবা যায়, কোনও উপন্যাসের নায়ক গামছা পরে পায়খানায় যাচ্ছে ? এ আসলে অপরিচিতি অন্য পরিসর. যেখানে বাঙালি উদ্বাস্তু জনজাতির মধ্যে জমিদখলের লড়াই কিংবা বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগলবন্দির মতো গম্ভীর প্রসঙ্গগুলিও খেলাচ্ছলে উত্থাপিত হয়। ইতিহাস সংস্কৃতি ভাষাপ্রসঙ্গ ঃ সমস্তই বুদ্বুদের মতো দেখা দেয় এবং মিলিয়ে যায়। লেখক শ্রেণী শোষকদের অবস্থানকেও গাঢ় করে তোলেন নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌক্তিক অসঙ্গতিও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। নইলে জমির মালিক পরিবার সব থেকে নিরাপদ মনে করলেই আমাদের মঙ্গল"। যেহেতু লেখকস্বর খুব একটা অন্তরালে নেই, এই উচ্চারণের জন্যে যুগল বা গোবিন্দ বা ওদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত কাউকে বেছে নেওয়া যেত।

উপন্যাস তো কাহিনী নয় শুধু, চলমান সময় আর বিকাশমান পরিসরের বিশ্লেষণ। সন্ধিকালীন ত্রিপুরায় কোনও উগ্রপন্থী কেন-ই বা বেকারসমস্যা, কেন বাঙালি উপজাতির মিথ্যা দ্বন্দ্ব, এবং কীভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া অগভীর জলে সফরী সঞ্চারণ করছে, এই সব এই উপন্যাসের প্রকৃত নেপথ্য কিন্তু দ্রুত সঞ্চারমান ছায়ার মতো বিষয়গুলি আখ্যানে কোনও গভীর অভিঘাত তৈরী করতে পারেনি। লিখতে লিখতে নন্দকুমার অবচেতন মনে সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন, গোবিন্দ মূল গায়েন হলেও তাকে দিয়ে ভরসা করতে হয়েছে। কিন্তু এতে ব্যক্তি স্বর ও সামাজিক স্বরের দ্বিবাচনিকতার ভরকেন্দ্রটি বিচলিত হলো কিনা, এ বিষয়ে খটকা জাগে মনে। অবশ্য লেখকের বীক্ষণবিন্দু স্পষ্ট হয়ে যায় যুগলের ভাবনাসূত্রে :

"সামাজিক ভাবে এখানকার লোকদের মধ্যে সম্ভবত প্রকাশবোধ আর পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার চিরাচরিত প্রথা বা অভ্যাসের জন্য দায়ী শ্রমজীবনের যে পরিবর্তন তীব্র বেগে মানুষের ভেতর প্রবেশ করেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে ছোটখাট পরিবার তৈরী হচ্ছে। একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ পাচ্ছে না রাখছে না। উৎপাদনের জন্যে জমি যা ছিলো সেগুলো ছোটছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে এক শ্রেণী শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে গেছে এবং বিরাট অংশ শিক্ষাহীন হয়ে শ্রমজীবীতে পরিণত হচ্ছে। জুম চাষ করে বেঁচে থাকা মানুষেরা যে সংস্কৃতিকে হাজার বছর ধরে লালন করে এসেছে সেখানে ব্যাপক পরিবর্তন এসে সব কিছুই এলোমেলো করে দিয়েছে।"

এই ভাবনার বিচ্ছুরণই ত্রিপুরার আদিবাসীর অস্তিত্বগত সংকটের প্রশ্নটি উদ্ভাসিত করে তোলে। তবে, একটু আগে যেমন লিখেছি, এইবোধ উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় কতটা রূপান্তবিত হয়েছে, এই নিয়ে পাঠকের সংশয় যায় না। "মাটির সঙ্গে যাদের নাড়ীর টান তাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত বলে চিহ্নিত করা যায় না।" — এই উপলব্ধি সত্ত্বেও গোবিন্দ বা হারুনের সঙ্গে যুগল বলাইয়ের ব্যবধান কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এইজন্যে ঔপন্যাসিকও গবেষকের বৌদ্ধিক বয়ানের সঙ্গে মূল আখ্যানের স্রোতকে পুরোপুরি মেলাতে পারেননি। তাছাড়া সুদখোর মহাজন ও খুদে জমিদারদের যৌথ শোষণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা উল্লিখিত হলেও ঔপন্যাসিকতার আধেয় হতে পারেনি।

অস্তিত্ব মানে যে সমান্তরালতার প্রত্যয়, এই কেন্দ্রীয় বোধ লেখক স্বরের সঞ্চালক হলেও স্পষ্টবাচনে অভিব্যক্ত নয়। তাই মনে হয়, ঔপন্যাসিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়েও সমস্যার গভীরে যেতে পারেননি। তিনি জানেন যে "ত্রিপুরীদের ভাষা সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে রাজনীতি নির্ভর করবে সঠিক মূল্যায়ন আর প্রয়োগের উপর"। কিন্তু এইসব কথা পাঠকৃতির অন্দর মহলকে অন্তর্দীপ্ত করে তুলতে পারেনি। তাই 'ঠিকানা কিরাতভূমি' (প্রথমপর্ব) সম্পর্কে লেখকের বাচন ব্যবহার করেই লিখতে পারি : "অন্তঃসলিলা গোমতীর ঢেউ এব ছোট ছোট কলতানও যেন ধীরে মন্থরে চলেছে, যেন যেতে হয় তাই যাওয়া। এ যাওয়ার কোনও সাধ নেই, উদ্দেশ্য নেই, শুরু নেই শেষও নেই"।

পাঁচ

লোকান্তরিত ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের একমাত্র উপন্যাস 'অগরুগন্ধ' (১৯৯৫) আসলে রূপান্তরিতহীন সময়ের আখ্যান। আবার সেইসঙ্গে ইতিহাসের গর্ভ থেকে জায়মান আগরতলার রূপান্তরেরও প্রতীকী বৃত্তান্ত। নন্দকুমারের উপন্যাসেও আগরতলার প্রসঙ্গ রয়েছে, তবে নিছক অনুষঙ্গ হিসেবে। যেভাবে বেশ কিছু বাংলা উপন্যাসে কলকাতার নাগরিক স্বভাব উপন্যাসের আধেয় হয়ে ওঠে, সেভাবে অবশ্যই নয়। তবে ভীষ্মদেব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিসরের বদলে যাওয়াকে লক্ষ্য করেছেন নাতি - প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার সঙ্গে। 'অগরুগন্ধ' নামকরণে যে সংকেত রয়েছে, তার তাৎপর্য লেখক স্বয়ং এভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন : "জব চার্নকের মত কেউ এসে নোঙর গেড়ে বসেনি। গড়ে তোলেনি বাণিজ্য ও রাজনীতির কোনও সিংহ দুয়ার। পুরাণ হাভেলী থেকে কৃষ্ণকিশোর এসেছিলেন শিকারের সন্ধানে বনজঙ্গল আর জলার এই মধ্যবর্তী এলাকাটায়। আগরতলার জলা জঙ্গলা কাটিয়ে মাথা তুলে আস্তে আস্তে দাঁড়ায় দূর দূরান্তের মধ্যে অগুরগাছের গন্ধ যেমন চিনিয়ে দেয় অন্য বনস্পতি থেকে তার পার্থক্য — আগরতলাও চিনিয়ে দিয়েছে

নিজেকে। উদাব ভালবাসা ডেকে এনেছে অনেককে। কালেব প্রতিটি বাঁকে বাঁকে নিজেকে কেমন নীবব সাক্ষী বেখেছে।" স্পষ্টত লেখকেব ভালবাসা যেন প্রতিটি শব্দকে অগরুব মতোই সুবভিত কবে তুলেছে। কালস্রোতেব অভিঘাতে দীর্ণ আগবতলাই লেখকেব কাছে অগরুগন্ধা।

অবশ্য ক্ষীণকায় এই বচনাটিকে সার্থক উপন্যাস বলা শক্ত। প্রাণেশ চৌধুবী শিবানী অবনীমোহন সবমা বমনীমোহন নিশি এবং সবাব উপবে বাজ পবিবাব আব নানা ধবনেব সংস্কাবও কিংবদন্তীব উপস্থিতি সত্ত্বেও পাঠকৃতি এক বাচনিক বয়ে গেছে। গান যেভাবে সমে ফিবে আসে, বাববাব ফিবে এসেছে লেখক স্ববেব এই আর্তি ঃ আগবতলা আব আগবতলা নেই , কালস্রোতে ভেসে যাচ্ছে সমাজ ও সংস্কৃতিব শান্ত এবং আপনাব গন্ধে আপনি বিভোব পবিসব। 'অগরুগন্ধা'ব প্রাবম্ভিক বাচনেব বিশেষ ধবনই ইঙ্গিত দেয়, বিগত কালেব কথকতা শুনছি যাব পবতে পবতে মিশে আছে দীর্ঘশ্বাসমথিত স্মৃতিপট। সূচনাব নৈসর্গিক অনুপুঙ্খগুলি লুপ্ত সময়েব বৃত্তান্তেব পক্ষে মানসসই যখন ত্রিপুবা স্বাধীন ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব বার্তা ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশে বাতাসে। "মাঠ খাখা কবে, গোলা শূন্য কবে, বাজাব খালি কবে মিলিটাবিবা ধান নিয়ে যাচ্ছে।" কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনেব প্রাচীব তাতে কেঁপে ওঠে নি। স্বাধীন ত্রিপুবাব বাজধানী আগবতলাব বুকে অজস্র ফুলেব গন্ধ নিয়ে বীতিমাফিক শবৎ আসছিল তখন। কথকস্বব জানিয়েছে তাই, "এ জীবন বড দুলকি চালেব। অগাধ সময় যেন অপেক্ষায়। হবে, হচ্ছে, হয়ে যাবে।"

কিন্তু লেখক ভীষ্মদেব বুঝেছিলেন, এ আসলে সত্যভ্রম ঃ সময় কখনও অপেক্ষায় থাকে না তাই স্বাধীনতা আন্দোলনেব অর্থ বাজা কিংবা বাজকর্মচাবী প্রাণেশ চৌধুবী না বুঝলেও এব ঢেউ সুদূব ত্রিপুবাব বাজধানী আগবতলায় পৌঁছায় । তাব 'ঘুমেব মেজাজ ভাঙ্গে একটু একটু কবে' কেননা তা অবধাবিত। বাইবেব বাস্তব অভিঘাত তৈবী কবে , নিজেব অজ্ঞাতসাবে ব্যক্তি পবিসবে ও মনোভঙ্গিতে বূপান্তবেব ছোঁয়া লাগে। বাজপুবোহিত বংশেব নবীন সদস্য অবনীমোহন তাই পত্রিকা পড়ে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষেব খোঁজ খবব বাখে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কীভাবে জনযুদ্ধেব চেহাবা পেল সেই আলোচনা শোনে। কথকস্বব জানায় 'পুজো আচা নাবায়ণ শিলাব পব আব একটা যে জীবন কোথা থেকে চড়াব মতো জেগে উঠে -- যেমন পাথব বুকে জেগে উঠে হঠাৎ কবে বিস্তীর্ণ কিছু"। আসলে এই জায়মান অস্তিত্বেব বোধ সময় লালিত। সুবেন্দ্র লাহাব বড ছেলে যে প্রজা সমাজ গড়ে তোলে, বন্দেমাতবম বলে, ব্যায়াম কুস্তিব আখড়া কবে আগবতলাব নিস্তবঙ্গ জীবনে তবঙ্গ তোলে , সেও সময়েব অভিঘাত। সংবেদনশীল অবনীমোহন এইসব দেখে শুনে অনুভব কবে 'ভেতব কোথায় যেন ধ্বস নেমে যাচ্ছে' তিনি ক্রমশ নিজেব মুদ্রাদোষে একা শুধু আলাদা হয়ে যান ঃ "কেমন এক অসহায় বোধ জাগে । তিলে তিলে গড়ে ওঠা জীবনেব ছক বাঁধা পথটাকে কেমন যেন অকাবণ মনে হয়। কেবল দর্শক -- কেবল দেখে যাওয়া -- ছোট্ট আগবতলা ছাড়িয়ে যাচ্ছে -- লোক বাড়ছে আগবতলাব ভেতবেব শান্তি আব সুখ যেন থাকছে না চাও না চাও বদলে তো যাচ্ছেই উপবেব দিকে তাকালে সব ঠিক কিন্তু ভেতবে যেন এক অদ্ভুত দোলা।"

এই হলো ঔপন্যাসিকতাব অবলম্বন এই সূত্রে আসে পঞ্চাশেব মন্বন্তবেব অভিঘাত পুবোনো আগবতলাব ভেতব থেকে নতুন কালেব বাতাস নিয়ে জেগে ওঠে আগবতলা। ভীষ্মদেব বিহঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য কবেন যুদ্ধেব কালেব সময়েব চেহাবা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। 'চালেব মন আট টাকা' এই খবব অবনীব দাদা বমনীমোহনকে বিবাগ কবে দেয় তাঁব সামন্ততান্ত্রিক সংস্কাবে প্রতিভাত হত: 'পাপ খাইয়া আইতাছে পুব থাইক্যা' আব অবনীমোহন ভাবে 'অকালেব দীর্ঘ হাত আগবতলাতেও অবশেষে এসে পৌঁছচ্ছে। (তদেব) অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিব চাপ কবালেব হাঁ-এব মতো গ্রাস কবছে আগবতলাব চিবচবিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপতুল্য অবস্থানকে 'কেউ দূবে থাকতে পাবে না'। এ এক সময় এসময় আগবতলাই বল আব যাই ই বল দুর্দিন দু'ওপিঠ শকুনেব ডানাব ছায়া পড়বেই (তদেব) এই উপলব্ধিই উপন্যাসেব পর্বপাঠ যা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কাবেব অচলায়তনে বড়োসড়ো আঘাত হানে। [illegible] সমাপ্তি [illegible] প্রসঙ্গ সম্পর্কিত বিববণে এই বার্তা পাচ্ছি অবনীমোহনেব মনে জিজ্ঞাসা চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। দুর্গাপূজাব সময় [illegible] লুকিয়ে বাখাব সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত আশঙ্কা ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাঁর অসহায়তার বোধ স্পষ্টত সময় সঞ্জাত। রূপান্তরের অনুভবে বয়ান শেষ হয় যখন, পাঠকের মনেও জিজ্ঞাসা অনুরণিত হতে থাকে ঃ বিশ্বাস অবিশ্বাস মঙ্গল অমঙ্গল পাপ পুণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সংস্কারের ছক বাঁধা জীবন 'কালের বাতাসে' ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। রমনীমোহন প্রাণেশ চৌধুরীরা এর তাৎপর্য স্বীকার করতে চান না কিন্তু অবনীমোহন কালের মন্দিরার অমোঘ ধ্বনি শুনতে পান। তিনি যতটা বর্তমানের, তার চেয়ে বেশি আসন্ন ভবিষ্যতের মানুষ। ঔপন্যাসিক কিছু কিছু অনুষঙ্গ বিন্যাসে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন ঃ "বাড়ীতে এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেলাই করা সার্ট পরেন, ধুতির সাথে সার্ট।" তাঁর পথে পথে হেঁটে বেড়ানোও যেন চিহ্নায়িত, কেননা দাদা রমনীমোহনের কাছে তা লজ্জার। একমাত্র তিনিই বোঝেন, "একটি নতুন বাতাস খুব আস্তে হলেও বইছে"। রাশিয়ার কি হচ্ছে, চীনের মানুষ কি লড়ছে এসব তিনি শুনতে চান। লেখা ব্যক্তিত্বের উন্মোচক, কিন্তু লেখার তীব্র আবেগ যে জাগে তাঁর মধ্যে ঃ এও তো সময় স্বভাবের অভিঘাতে ঘটে।

রাজ অন্তঃপুরে ব্যভিচারের ইঙ্গিত মূলত বদ্ধ সময়ের বার্তাবহ। কুসুমকুমারী শৈল চন্দ্রমুখীরা ঐ রুদ্ধ পল্বলের বুদ্বুদ। তখন নারী -পরিসর পিতৃতন্ত্রের পিঞ্জরে বন্দিনী ; তাই সরমাকে বলা যায় নিরুদ্ধ কালের সৃষ্টি। সামাজিক পরিসরে ভাঙন শুরু হয়েছে, এও সময়েরই কথকতা। পাহাড়ী প্রজাদের মধ্যে রাজার নিয়ম বদলে দেওয়ার লক্ষণ নিয়ে মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা, রাজার নিয়ম বদলে দেওয়ার লক্ষণ নিয়ে মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা, রাজার বন্ধ্যা ক্রোধ, রিয়াং উপজাতির মধ্যে জায়মান বিদ্রোহের দূরাগত পূর্বাভাস ঃ সময়ের এইসব বিভঙ্গের মধ্যেই ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বদলে গেছে আগরতলা। ভূগোল ও ইতিহাসের অন্তর্বয়ন সম্পর্কেও মনোযোগী ভীষ্মদেব ; কিন্তু প্রণালীবদ্ধ বিন্যাস না -থাকায় উপন্যাসের বয়ান খুব এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তারই মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে এই তাৎপর্যবহ উচ্চারণ ঃ "গণ্ডীর বাইরেও জীবন আছে — এ কথাটা আগরতলার মেঘচাপা আকাশে দু-একটা ক্ষীণ নক্ষত্রের মত ভেসে আসে"। কিন্তু যারা রক্ষণশীল এবং রূপান্তরপ্রবণ সময়ের প্রাণ স্পন্দন অনুধাবনে ব্যর্থ, তাদের কাছে প্রতিভাত হয় 'আগরতলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে'। দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্রতীপতা অনিবার্য বলেই জমাট বাঁধা অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয় অবনীমোহনের মতো কেউ একজন, যার এক পা হয়তো পেছনের দিকে কিন্তু অন্য পা নিশ্চিতভাবে সামনের দিকে। তাই সংস্কারকে অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকতে পারে না সে, আবার সাহস করে আসন্ন কালকে আবাহনও জানাতে পারে না। তবু তার অসহায়তার বোধেই ঔপন্যাসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। একটি জগৎ শেষ হয়েছে অথচ নতুন জগৎ ঠিকমতো জন্মও নিচ্ছে না — এরকম আলো আঁধারি সময় চিহ্নিত। আর, সেখানেই বয়ান পৌঁছায় সমাপ্তি বিন্দুতে ঃ "তাহলে কি সব বদলে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস নিয়ে যে বাড়ির ভাবনা তাকে ভাবাচ্ছিল — একটি পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল, রাজ্যের কল্যাণ অকল্যাণের ভাবনায় ভাবিয়ে তুলছিল—তা মিথ্যা হয়ে গেল। আটকালো না। তাহলে দেবী কি দেখেন নি ? তা বিশ্বাস করতে বড় ভয় করে। অবনীমোহনের মনে ধ্বস নামে আরো বিরাট জায়গা জুড়ে। আসন্ন ছয় মাসের যাবতীয় সুখ সম্পদ যার আশীর্বাদ পেলেন তার প্রতি অবিশ্বাস কেমন যন্ত্রণা দেয়"।

ছয়

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য থেকে যখন দীপক দেবের রচনায় পৌঁছাই, প্রকৃতই মনে হয় যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। 'কামারশালা', 'সালোক সংশ্লেষ' নামক ছোটগল্পের দুটি সংকলনে বুঝি, আগরতলার মন্থর নগরায়ন এবং ত্রিপুরার পরিসরে আমূল রূপান্তর আত্তীকৃত করে ভাষাবিশ্বে ও চেতনাবিশ্বে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটাতে চাইছেন দীপক দেবের মতো কথাকারেরা। প্রাগুক্ত চারটে ঔপন্যাসের তুলনায় দীপকের 'রক্তমাংসের শরীর' (১৯৯৪) কথাবস্তু, উপস্থাপনা, মূল্যচেতনা — সমস্ত দিক দিয়েই জটিল জগতের বার্তা বয়ে আনে। উত্তম পুরুষের বাচনে উপস্থাপিত এই উপন্যাসে নারী -পুরুষের যৌন সম্পর্কের টানাপোড়েন অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার নানা ছায়াতপের সঙ্গে মিশে গেছে। দীপক যেন বারবার আখ্যানের আকরণ থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি পাঠকদের সম্বোধন করতে চেয়েছেন। ঘুরে ফিরে এসেছে জীবন সম্পর্কিত নানা ধরনের দার্শনিক ভাবনার অনুরণন। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আখ্যান এই উপন্যাসের বহিরঙ্গ কাঠামো মাত্র। বিবরণ বারবার ঝুঁকে পড়ে কিমিতিবাদী গ্রন্থনার দিকে। চলমান বাস্তবের আদল মাত্র থাকে তাই, প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে যায় উপন্যাসের নিজস্ব বাস্তব ; বলা ভালো, বাস্তব ও অধিবাস্তবের ছায়াধ্বজ।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির তুলনায় দীপকের পাঠকৃতি পুরোপুরি আলাদা, কেননা তাতে আগরতলা কোথাও স্পষ্টভাবে উপস্থিত নেই।

এই উপন্যাসে অবচেতনা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ভূমিকা অনেকখানি। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষাও মূলত অন্তর্মুখী। তবে অন্তর্বাস্তবের উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাস্তবের সানুপুঙ্খ গ্রন্থনাও যে জরুরী, দীপক তা মনে রেখেছেন। তাঁর বৃত্তান্ত নাগরিক স্বভাবে লালিত, তবে ঐ স্বভাবের বিশিষ্ট ভৌগোলিক অভিজ্ঞান না থাকার ফলে ত্রিপুরার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছাপ কোথাও উপস্থিত নয় কথক মনোরঞ্জন, রূপা নাম্নী নারী, ছায়াদি কথকের মা ও সুবল মামা ঃ এদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বয়ান। তবে কথক চরিত্রের উপস্থিতি এত সর্বগ্রাসী যে প্রাগুক্ত চরিত্রগুলি সহ অন্য কারো সঙ্গেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথাযথ দ্বিরালাপ গড়ে ওঠেনি। মনোরঞ্জন তুখোড় ব্যবসায়ী বাবার ছেলে, কয়েকঘর ভাড়াটের মালিক। কিন্তু তার শ্রেণী পরিচয় নিলে লেখকের আগ্রহ নেই, জৈব অস্তিত্বের তাড়নাকে দার্শনিকতার মোড়কে পরিবেশন করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম চৌদ্দটি পরিচ্ছেদের তুলনায় শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ সময় ও বিবর্তিত ভাবনার নিরিখে বিষমানুপাতিক। কথকের মা ও সুবল মামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জনিত প্রতিক্রিয়া ছায়ার সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। বয়ানের যে নিজস্ব যুক্তি-শৃঙ্খলা থাকে, তাকেও খানিকটা ব্যাহত করেছে শেষ তিনটি পরিচ্ছেদের উপস্থাপনা। বস্তুত কথক মনোরঞ্জন প্রায় সবটুকু অভিনিবেশ পেয়েছে বলে সমগ্র পাঠকৃতি একবাচনিকতায় আক্রান্ত।

নামকরণের মধ্যে পরাপাঠ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে লেখকের আগ্রহ ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার প্রতি তার মনোযোগ শিথিল করে দিয়েছে। দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ('আক্কিলার ধন ভক্কিলা খারে'— জাতীয় অভিব্যক্তি) বাচনে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য খুব একটা চোখে পড়ে না। কথক অস্তিত্বের উপস্থাপনায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ থাকলেও তা নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের সঙ্গে অন্বিত হয়নি বলে চলমান জীবন সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট সমালোচনা গড়ে ওঠেনি। মানবিক সম্পর্কের বিন্যাসে আলো-আঁধারির অভিব্যক্তি লেখকের অন্বিষ্ট ছিল যদিও, এক ধরনের প্রাজ্ঞোক্তি পরিবেশন করার প্রতি ঝোঁক থাকায় চিন্তা প্রণালী সর্বদা সংহত হয়নি। কখনও কখনও মনে হয়, অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত সম্ভাবনাকে লেখক স্বয়ং অন্তর্ঘাত করেছেন। তাই আত্মসমীক্ষার প্রস্তাবনা আছে, প্রকৃত সমীক্ষা নেই। লেখকের ভাবনাকে বুঝে নিই বয়ানের নিম্নোক্ত অভিব্যক্তি থেকে ঃ

"জীবন যে কীভাবে সরে সরে যায়। বা কীভাবে ধীরে ধীরে শেষের দিকে চলে, হিসেব রাখা বড় কঠিন। দুরন্ত সময় খোলাখুলি করে ফেলে সব কিছুকেই। এগিয়ে পিছিয়ে চলে ঘটনা। অনেক সময় একসুতোয় বাঁধা পড়ে, অনেক সময় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিছুদিন পর পরিপূর্ণ স্মৃতিও আসে না। বিভ্রম হয়। ছবির বদলে অন্য সব ছবি আসে।" আসলে এই তাঁর উপন্যাস বীক্ষার মর্মকথা এবং সেই সঙ্গে জীবনের দর্শনও। এইসূত্রে লেখক শেষপর্যন্ত এই উপসংহারে পৌঁছে যান ঃ "জীবন আসলে কাউকেই খালি করে না। এক আপাত উপসংহারে পৌঁছে দেয়। নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, প্রেম-অপ্রেম সবই আছে। তবে নিক্তিমাপা কিছুই নয়। জীবনের কোনও অগ্রিম হিসেব নিকেশ চলে না।" কিন্তু এই পরাবাচন উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত হলে ভালো হত।

১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পরিত্যক্ত প্রদেশ' আসলে একই মলাটের মধ্যে দু'টি অনু উপন্যাসের সংকলন। 'পরিত্যক্ত প্রদেশ' বাইশ পৃষ্ঠায় এবং 'বদ্বীপ' চল্লিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শুধু পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে নয়, কথাবস্তুর স্বভাব বিচারেও 'পরিত্যক্ত প্রদেশ'কে বড় গল্পের বর্গভুক্ত করাই উচিত, অনু উপন্যাস নয়। পূর্ববর্তী রচনায় আগরতলা স্পষ্টত উপস্থিত ছিল না কিন্তু এই বয়ানে ত্রিপুরার অস্থির সামাজিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক ও অন্য আনুষঙ্গিক তথ্য সচেতনভাবেই বিবৃত হয়েছে। এখানেও উত্তমপুরুষের বাচনে কথাবস্তু গ্রথিত হয়েছে, আর, বকুল মনোবাসী মথুরা ঘোষ ঃ কেউ সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হতে পারেনি তবে লেখকের অভিপ্রায় ছিল, ছিন্নমূল সমাজ ও দহনময় সময়ের উৎকেন্দ্রিকতা প্রকাশ করবেন। এলোমেলোভাবে বহুপ্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সব মিলিয়ে সম্ভাব্য অনু উপন্যাসের বয়ন তৈরী হয়নি।

'বদ্বীপ এর বয়ানেও আগরতলার পরিসর উপস্থিত। আর, 'পরিত্যক্ত প্রদেশ' যেখানে মূলত ব্যক্তি —একাকের পিঞ্জরের বিবরণ —'বদ্বীপ' এর উপস্থাপনার সামাজিক অস্তিত্বের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। সুচরিতা ও তিলকের বৌদ্ধিক যৌনতা, রাজনৈতিক প্রতাপের স্থূলতা ও কদর্যতার প্রতিনিধি অখিল রায়ের উপস্থাপনা, অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তবতা, পারিবারিক সম্পর্কের নানারকম টানাপোড়েন - এই সব কিছুর সংশ্লেষণে যে পাঠকৃতি গড়ে উঠেছে, তা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যহীন যেন। জীবন সম্পর্কিত ভাবনা যে লেখকের রয়েছে, তা বুঝতে পারি ; কিন্তু সময়ের দহনবেলা বহির্ভূত থেকে যায় বলে মূল কুশীলব সুচরিতা শেষ পর্যন্ত উৎকেন্দ্রিক অবস্থানের প্রতিনিধি হয়ে পড়ে। কথকস্বর নিজেরই অজ্ঞাতসারে আত্মসমালোচনা করেছে যেন ঃ "একটা আদর্শ না থাকলে কি লেখক বা কবি হওয়া যায়" ঃ আসলে সুচরিতা তিলক সোমনাথ ঃ প্রত্যেক আত্মপ্রতারক ; ওরা খণ্ড সময়ের পিঞ্জরে বন্দী। প্রত্যেকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে "সব কিছুকে ঋণাত্মক করে দেখার প্রবণতা" লেখকের বাচন অনুসরণ করে বলা যায়, 'বদ্বীপ -এ "কিছু সম্পর্কহীন ঘটনা বোলতার ঝাঁক থেকে উড়ে আসা বিচ্ছিন্ন বোলতার মতো শরীরে হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে চলে যায় দূরে ক্রমাগত।" (তদেব) যে জগতে "সার সার জীবিত মানুষকে মৃত মানুষ বলে মনে হয়" তার নিবিড়তার বিশ্লেষণ কাম্য ছিল। এইভাবেই ঘাটতি রয়ে গেল ঔপন্যাসিকতার গ্রন্থনায়। উপসংহার সূচক দুটি বাক্যও বিশ্বাস্য হয়ে উঠল না ; "ঘুরে দাঁড়ায় সুচরিতা এবং চিন্তা করে সেও ব-দ্বীপটার এমন একটা অংশ হয়ে গেছে, যেখানে পলিমাটির স্তর জন্ম দিয়ে দিয়েছে খানিকটা কিছু শক্ত ভূমি এবং সেখানেই প্রোথিত হয়ে আছে সে।

রাস্তায় পা রাখে সুচরিতা।"

উপন্যাসের বিবরণ চিহ্নায়িত না হলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। একই ভাবে প্রত্নকথার নতুন ভাষ্য ও পুনর্নির্মাণ যদি করতে না পারেন লেখক, তাকে কিছুতেই পাঠকৃতির শ্লাঘ্য পদবি দেওয়া চলে না। সমুদ্র মন্থন বিষয়ক প্রত্নকথা অবলম্বনে রচিত "পারিজাত বৃক্ষ' (১৯৯৭) তাই দীপক দেবের গৌরব বৃদ্ধি করেনি।

সাত

গল্পকার হিসেবে সুপরিচিত অনুপ ভট্টাচার্য 'পাখি ও পালক' (১৯৯৭) ও 'হরিমন্দ্য' (২০০০) নামক দুটি ছোটগল্প সংকলনের পরে প্রকাশ করেছেন 'প্রিয় ভূমি' নামক উপন্যাস (২০০১)। বলা হয়েছে "উপন্যাসটির প্রতি অণু বিস্তারে উঠে এসেছে বর্তমান ত্রিপুরার অন্তঃকরণ"। দীপক দেবের সঙ্গে প্রতিতুলনায় অনুপ ভট্টাচার্যের ১৩৮ পৃষ্ঠার উপন্যাস বহরে নিঃসন্দেহে বড়ো। উপন্যাসিক আগরতলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে যে কেবলই উৎকেন্দ্রিকতা দেখতে পান, তাঁর উপস্থাপনায় স্পষ্ট। 'প্রিয়ভূমি' নামকরণে একধরনের রোমান্টিক কোমলতা থাকলেও উপন্যাস পড়া শেষ মনে হয়, এর নাম অনায়াসে হতে পারত কৃষ্ণ বিবর। কেননা ইতিহাসের চড়াই উৎরাই সাধারণভাবে ত্রিপুরাকে এবং বিশেষভাবে আগরতলাকে যে নব্য সামাজিক নির্মিতির স্নায়ুকেন্দ্র করে তুলেছে, স্পষ্টত অনুপ তা দেখতে পাননি। চলমান ইতিহাসের মধ্যে নাতি প্রচ্ছন্ন অন্ধবিন্দুগুলি তাঁর প্রতিবেদনের ব্যক্তি পরিসর ও সামাজিক পরিসরের নিয়ন্তা। লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসকে যতখানি আড়ালে থাকতে হয়, তা বয়ানে অনুপস্থিত। ফলে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যখনই উত্থাপিত হয়েছে, তা প্রতিভাবাদর্শ প্রসূত একরৈখিকতায় আক্রান্ত। সায়ন তালুকদার ফিরে এসে নিজের পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছে। সায়ন উপন্যাসের প্রধান কুশীলব বটে ; কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তার ভূমিকা প্রত্যক্ষ নয় ; সে যেন পরোক্ষতায় আক্রান্ত ও প্রায় নিরপেক্ষ গ্রহীতা মাত্র প্রাক্তন প্রেমিকা দেবযানীর স্মৃতিও প্রবল নয় খুব ; বস্তুত বয়ানে এই স্মৃতির ভূমিকা নিতান্ত গৌণ। উপন্যাসের একেবারে শেষে দেবযানীর সঙ্গে পুনর্মিলন হয় যদিও, পাঠকৃতির নিজস্ব যৌক্তিক পরম্পরায় দেবযানী আসে না। নিয়ন্তা লেখকের ইচ্ছায় দেবযানীর সঙ্গে এই পুনর্মিলন ঘটে।

নিখিলেশ ও মঞ্জু উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র। কিন্তু তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক একটুও বিশ্বাস্য হতে পারেনি। এই দুজনের কেউই নিজস্ব স্বভাবের যৌক্তিকতায় প্রতিষ্ঠিত নয়। মধুমতীর নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী ভূমিকা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে মঞ্জু লক্ষ্যশূন্য। উপস্থাপনা যেন নারী পরিসর সম্পর্কে লেখকের কোনও স্পষ্ট বক্তব্য নেই বলেই সম্ভবত মঞ্জু স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসমান। বিধবা মঞ্জুকে বিয়ে করেছিল নিখিলেশ কিন্তু তাদের পরবর্তী দাম্পত্যে উদ্ভাসনের বদলে শুধুই আদিগন্ত চোরাবালির বিস্তার ঘটেছে। নিখিলেশের সঙ্গে রাধার প্রায় খোলাখুলি যৌন সংসর্গ সম্পর্কে লেখক স্বয়ং পরোক্ষভাবেও কোনও সমালোচনা উপস্থাপিত করেন নি। এমন নয় যে নিখিলেশ প্রেমিক, বরং তাকে মনে হয় রিপুসর্বস্ব মানুষ। কিংবা অমানুষ, কপটতা অগভীরতা বিশ্বাসঘাতকতা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যার চরিত্রলক্ষণ। শিউচরণের কাছ থেকে সে মোটা টাকা কমিশন খায় মামাতো ভাই ও বন্ধু সায়নের বাড়ি বিক্রি করার দালালি হিসেবে। না বন্ধু না স্ত্রী — কারো কাছে সে পার্টি করে নিছক কিছু সুবিধা পাবে বলে। উপন্যাসের শেষে একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার জন্য তার ও মঞ্জুর চারিত্রিক প্রবণতার সঙ্গে মেলে না মনে হয়। সব মিলিয়ে, আগাগোড়া নিখিলেশের উপস্থাপনায় রয়ে গেছে অসামঞ্জস্য।

বয়ানের প্রারম্ভিক বর্ণনায় রোমান্টিক দৃষ্টিকোণের যে আভাস রয়েছে, কেন্দ্রীয় চরিত্র সায়ন যদি সেই সুরে লয়ে গ্রথিত হত —নামকরণের ইঙ্গিতও সমর্থিত হতে পারত। কিন্তু দেবযানীকে প্রাপ্য পরিসর থেকে বঞ্চিত করার উপন্যাসের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে। "সময় সব রকম সম্পর্কের বাঁধন কেমন আলগা করে দিয়েছে" – সায়নের এই আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রিয় জন্মভূমি তাকে প্রত্যাখান করে নি। দেবযানী ছাড়াও মঞ্জু, তারিণী, দিলীপ, সুদীপ নিশ্চিতভাবে তার প্রমাণ দিয়েছে। অনুপ তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে সাধারণভাবে ত্রিপুরার এবং বিশেষভাবে আগরতলার ইতিহাস সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতির আবহকে অন্তর্বয়ন হিসেবে সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর বেদনা ক্ষোভ ক্রোধ অভিযোগ ঃ কোনও কিছু লুকিয়ে রাখেন নি তিনি। তবে ঔপন্যাসিক নিরপেক্ষ না হলে চলে না, একথা পড়তে পড়তে বারবার মনে আসে। ফুটবলে রেফারি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুরু করলে যেমন খেলার তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই পাঠকৃতির সূত্রধার কোনও পক্ষে যোগ দিলে ঔপন্যাসিকতা ধ্বস্ত হয়ে যায়। সায়নের চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে আগরতলার ভূগোল, জনজীবন, অর্থনৈতিক আবহ, উগ্রপন্থার অভিঘাত, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। সঞ্চরমান বুদ্বুদের মতো আধা নাগরিক জীবনের নানা আলো আঁধারি ভাসে এবং ভোবে। দীর্ঘ প্রবাসের পরে সায়ন নিজের পলায়ন, সত্তা আবিষ্কার করতে কিংবা শেকড়সুদ্ধ নিজেকে উপড়ে ফেলতে এসেছে — লেখক স্বয়ং এই আভাস দিলেও বয়ানের পরবর্তী পর্যায়ে তার যৌক্তিক বিকাশ ঘটান নি।

উপন্যাসের ভাষা নিয়ে অনুপ কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যান নি। সায়নের অনুভব সম্পর্কে তাঁর ভাষা এরকম: "বুকের ভেতর স্বপ্নরা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে করতে তার মুহূর্তগুলো ক্লান্ত হয়। সর্বস্ব বুঝি লুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার। অভিজ্ঞতা স্মৃতি দুঃখ সুখ শোক সব —সব।" আবাল্যের শহরের সৌন্দর্য, জল হাওয়া মাটি মানুষের অপূর্ব কোমল স্পর্শ তার জীবনের শেকড় বাকড় এবং সেসব উপড়ে ফেললেই সে ছিন্নমূল হয়ে যাবে, এমন যার প্রাথমিক অনুভব, উপন্যাসে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কোনও দ্বন্দ্বময় আবহ রচিত হলো না। সায়নের সমস্যা বহির্বৃত হয়ে রইল, অন্তর্বৃত হলো না। জমি কেনা বেচা নিয়ে রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র উপস্থাপিত হলো যদিও, ঔপন্যাসিক কাছে কাঙ্ক্ষিত গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ কিন্তু দেখলাম না। বরং সাধারণভাবে প্রচলিত কিছু অগভীর ধ্যান ধারণাকে বয়ান আগাগোড়া অনুসরণ করে গেল। যেমন, "পলিটিক্যাল পার্টির মত সরকারও পার্টি ধর্ম জাতপাত প্রভিন্সিয়েলিজম নিয়ে রাজনীতি করে" এই মূল বক্তব্যের অজস্র তরঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে বয়ান জুড়ে। কমিশনারের চক্রান্ত ও সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের বিস্তৃত বিবরণে এর প্রমাণ পাচ্ছি। বাস্তবের প্রতিস্পর্ধী অন্য এক বাস্তব রচনার দিকে ঔপন্যাসিক অভিনিবেশ এত বেশি যে বয়ানের মূল ভরকেন্দ্রটি অটুট রাখার দিকে তিতিন তত মনোযোগী হতে পারেননি। ফলে নামকরণের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। সায়নের ভাবনায় কথকস্বরের উপস্থিতি স্পষ্ট ঃ "কী নিঃসীম অন্ধকার। এ শহরটা — এই রাজ্যটাই বড় বেশি অন্ধকারে ডুবে আছে"। উত্তরপূর্ব ভারতের অনগ্রসরতা জনিত মূল সংকটকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে গেলেও লেখক কখনও খুব বেশি গভীরে যান নি। রাষ্ট্রযন্ত্র, আধিপত্যবাদ, বামপন্থা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত কিছু ধারণা দ্বারা তিনি পরিচালিত, এমন মনে হয়। নৈতিকতা,

শিক্ষা, মূল্যবোধ — সমস্ত কিছু থেকে বিচ্যুত নিখিলেশের মধ্যে অধঃপতিত প্রজন্মের ক্ষয়িষ্ণু চেহারার প্রতিরূপ দেখেছে সায়ন। কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা রাজনৈতিক আবহের একবাচনিক রূপই শুধু পরিস্ফুট করেছেন লেখক।

আসলে বৌদ্ধিক নৈরাজ্যপন্থার প্রাথমিক পাঠকৃতি কখনও কখনও উপন্যাসের সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিভাবাদর্শ যখন সঞ্চালক, বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু থাকে না কোনও। তা যদি না হত, সায়নের চিন্তায় সংশয়ের এই প্রগাঢ় ছায়া পড়ত না ঃ "আচ্ছা কোন্ কাজটা নৈতিক আর কোন্টা অনৈতিক, কে ঠিক করবে সেটা ? সমাজ আর সমাজের মানুষজন ? সমাজ আর তার মানুষজনের চেহারা কি আগে পরে এক আছে ? কত বদলে গেছে, আশপাশটাকে নিয়ে আধুনিক মানুষজনের মানসিকতা। এখন তো ইন্টারনেট-ই মেলের যুগ মানুষ এখন, কোন্টা পাপ কোনটা পূণ্য, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন ? প্রয়োজনই বড়। প্রয়োজনে পাপ করলে প্রায়শ্চিত্তের আর দরকার পড়ে না"। এই যে ভাবনা, তা কী রোমান্টিক সায়নের পক্ষে সঙ্গত যে উপন্যাসের উপসংহারে, বহুদিনের অদর্শনের পরেও, দেবযানীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে ? অতএব আধুনিকতাবাদী বীক্ষণ সম্পর্কে লেখকের মৌল অভিপ্রায় কী — এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা উঠে আসে। দৃষ্টিকোণ কখনও পরিসর নিরপেক্ষ হতে পারে না অর্থাৎ মহানাগরিক পরিসরের বিশ্ববীক্ষা চরিত্রগত ভাবে আগরতলার মতো শ্লথগতি আধা-নাগরিক পরিসরের বিশ্ববীক্ষা থেকে স্বতন্ত্র বাধ্য। অনুপ নিজেও তা জানেন; কেননা সায়নের চিন্তাতেই পাচ্ছি "উত্তরপূর্ব ভারতে জটিল জনজীবন আর অস্থিরতা নিয়ে তো মহাকাব্য লেখা যায়। এখনও বাংলা সাহিত্যে। এদিকটা অন্যবাদী রয়ে গেছে।"

আট

কবি সমরজিৎ সিংহ যখন উপন্যাস লেখেন, তাঁর কাছেও একই প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু গভীরে যাওয়ার অনীহার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় পরিসর নিরপেক্ষ নিরীক্ষাপ্রীতি অর্থাৎ প্রায়োগিক কৃৎকৌশলের প্রতি একমাত্রিক নিষ্ঠা। অনুপ ভট্টাচার্যের বয়ানে লেখকের প্রকট উপস্থিতি এক ধরনের আর সমরজিৎ সিংহের প্রতিবেদনে তা অন্য ধরনের। বয়ানে গ্রন্থনায় রৈখিকতা ভেঙে দেওয়ায় প্রবণতা লক্ষ করি ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক দুলাল ঘোষের মধ্যেও। 'সম পরিমাণ মাটি' (১৯৯৮) নামক ছোটগল্প সংকলনের পরে তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ঃ অগ্নিসূত্র (২০০০) ও ছদ্মবাস (২০০১)। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে দুলাল ঘোষ স্পষ্টত অনুপ ভট্টাচার্যের সহযাত্রী। তবে ১৮৪ পৃষ্ঠায় উপন্যাস 'অগ্নিসূত্র' উপস্থাপনার বিশিষ্টতার লক্ষনীয়। সত্তর ও আশি-র দশকের অস্থির ও দহনময় দিনগুলিতে সাধারণভাবে ত্রিপুরার এবং বিশেষভাবে আগরতলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসর কীভাবে বিক্ষত ও আন্দোলিত হচ্ছিল— তারই কল্পনানিষিক্ত প্রতিবেদন 'অগ্নিসূত্র'। তার নামকরণে যে লেলিহ আগুনের ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে, নানা দিক থেকে তার ওপর আলোকসম্পাত করেছেন দুলাল। অনুপ যে 'অনাবাদী' পরিসরের কথা বলেছেন, তা-ই কর্ষিত হয়েছে যেন 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসে। ত্রিপুরার ভূগোল নির্ধারিত বাধ্যবাধকতায় বাঙালি ও উপজাতির সংশ্লেষণ সক্রিয় ছিল যতদিন, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিসরের পুনর্নির্মাণ ততদিন ইতিবাচক দ্যোতনা বয়ে এনেছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ অন্ধবিন্দুর তাড়নায় ঐ প্রক্রিয়া যখন ব্যাহত হতে লাগল, ভাবাদর্শ, প্রাণিত পুনর্গঠন হারিয়ে গেল প্রতিভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষক আধিপত্যবাদের চোরাবালিতে। নেতির সেই নৈরাজ্যময় অন্ধকার আগরতলার আধা-নাগরিক পৌরসমাজে যেসব বিকট কৃষ্ণবিবর তৈরি করেছিল, 'অগ্নিসূত্র' -এর আখ্যান অধারিত হয়েছে সেই বিমানবায়িত পরিবেশে।

শানিত সেনগুপ্ত সামাজিক ইনফের্নোর ফসল, তার বোন জুঁইও। তাদের বাবা-মা দিবেন্দু অতসী সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি খুইয়ে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি। দুলালের উপন্যাসে শুধুমাত্র ত্রিপুরা ও আগরতলা নয়, আসামের কাছাড় জেলা শিলচর করিমগঞ্জ নানা অনুপঙ্খ সহ উপস্থিত। সেইসঙ্গে উত্তরপূর্বের বহির্বলয়ও লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শানিত আমাদের মনে করিয়ে দেয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আর্ত উচ্চারণ "অন্ধকার

আছি অন্ধকাব থাকবো অন্ধকাব হবো'' । শানিত প্রবলতব ভাবে এবং জুঁই গৌণত প্রমাণ কবে 'The time is art of joint" দু'জনে ভাবে সত্তাব প্রকৃত অভিজ্ঞান জানাব জন্যে বাস্তব নামক প্রতাপেব বন্দীশালায় আঘাত হানে কিন্তু সেই আঘাত বহু গুণিত হয়ে তাদেবই প্রত্যাঘাত কবে মনে হয় যেন আঁদ্রে জিদেব মতো সত্তাব ব্যতিবেকী পাঠ ওবা তৈবী কবতে চায় নিজেদেব উৎকেন্দ্রিক জীবনে। দু'জনেই যুগপৎ বেপবোয়া এবং অসহায়, দাহ্য এবং দাহক। নিজেদেব জীবনেব পাঠকৃতি ওবা নিজেবাই নৈবাজ্যেব উপকবণ দিয়ে লিখে গেছে। কিন্তু সত্যি কী জীবন সম্পর্কে শানিত বা জুঁই স্বেচ্ছায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পাবে ? নাকি তাদেব ছিন্নমূল উৎস পবিচয় অমোঘ হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

সমকর্মী পঙ্কজ তলাপাত্র, যাকে লেখব স্বয়ং 'নবপশু' বিশেষণ দিয়েছেন কেন বিপ্লবেব কথা বলে ? এই কার্নিভালেব বঙ এত ঘোব কালো কী এইজন্যে যে অনুপেব উপন্যাসেব মতো দুলালেব উপন্যাসও নিঃশ্বাস নেয় মূলত প্রতিভাবাদর্শে? ঔপন্যাসিক সত্য জানেন যেমন, প্রতিসত্যও কী একই ভাবে জানেন না ? মনে আসে কবি বণজিৎ দাশেব কিছু বিখ্যাত কবিতা পঙক্তিব বিষণ্ণ আর্ত অমোঘ উচ্চাবণে।

''সত্য কি আমবা জানি না। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজেব ছায়াব মতো । এই সত্যসন্দিগ্ধ চিবজীবনে, মিথ্যাই শেষপর্যন্ত আমাদেব একমাত্র নিঃসংশয় উপলব্ধি সেই অর্থে, আমাদেব একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য। আমাদেব আশ্রয়। খুব সম্ভবত, আমবা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি। জিন এব গূঢ়তম সন্ধ্যাভাষায় হয়তো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যাব সংজ্ঞা এবং ব্যবহাব বিধি'' । (ডায়েবী থেকে) ছিন্নমূল শানিত ও জুঁই তাই মিথ্যাব সঙ্গে বাঁচে , তাদেব আস্তিত্বিক পবিধি মূলত নেতি ও নৈবাজ্যেব দুর্গ। সেই দুর্গেব তাবাই স্রষ্টা ও অধীশ্বব। জুঁই শবীব দেয় যাব, শানিতেব একান্ত নিজস্ব নবকেব সঙ্গে তাদেব কোনও না কোনও যোগসূত্র আছে। সংবাদপত্রেব মালিক পার্টিব নেতা, পুলিশ অফিসাব একই নবকেব প্রহবী ও বাসিন্দা। 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসেব কথনবিশ্ব জুড়ে এদেবকে প্রতাপ বিচ্ছুবিত হয়েছে। বণজিৎ এব 'দুর্গেব ভিতব নাটক' কবিতাব বাচন অনুসবণ কবে লেখা যায় জুঁই ও শানিতেব দুর্গেব বাইবে শোনা যায় শুধু হিজড়েদেব কোলাহল। ওবা ''দুর্গ ছেড়ে পালাতে চাইবে কিন্তু পাবাবে না, কাবণ তাব প্রতিটি পদক্ষেপ তৈবী হবে একটি কবে নতুন দুর্গেব গোলক ধাঁধা।'' জুঁই এব জন্যে নিবঞ্জন বৈদ্য যেমন, তেমনি শানিতেব জন্যে লালিমা দেববর্মা । স্পষ্টত 'অগৰুগন্ধা'ব আগবতলা প্রত্ন ইতিহাসেব ধূসব মতো 'অগ্নিসূত্র' এ হাবিয়ে গেছে। ঔপন্যাসিকেব চোখে ধবা পড়ে, ক্ষমতা দখলেব বাজনীতি আগবতলা সহ ত্রিপুবাকে জ্বলন্ত ইনফের্নোতে বূপান্তবিত কবেছে দান্তেব মতোই এই নবক সম্পর্কে বলা চলে ঃ 'abandon all hope ye ueho enter here'

কিন্তু সেই মৌলিক প্রশ্নই ফিবে আসে আবাব ঃ ঔপন্যাসিক কী শুধু একবাচনিক জগৎ নির্মাণ কববেন ? অজস্র চবিত্রেব ও অনুষঙ্গেব ভিড়ে সময় ও সমাজেব যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে দ্বিবাচনিক কল্পনাব অবকাশ কী ঔপন্যাসিক ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্মূল কবে দিয়েছেন ? বয়ানেব বহু বৈখিকতা, আঞ্চলিক উপভাষাব অন্তবর্বয়ন, সমকালীন ইতিহাসেব প্রেক্ষিত ঃ এইসবই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য । কিন্তু ঔপন্যাসিক কোথাও পাঠকৃতিব ভবকেন্দ্রটি খুঁজে পেলেন না , ববং নিজেই যেন সংহতিব সম্ভাবনায় হস্তক্ষেপ কবলেন। এমন নয় যে সত্তাব প্রাগুক্ত পথসন্ধান সম্পর্কে দুলাল সচেতন নন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাঠকৃতি হয়ে বইল নিবলম্ব। যদি একে ভাবি তাঁব সময় সংকেত তাহলেও বেশ কিছু প্রতি প্রশ্ন উঠে আসে। অবশ্য এই নিবিখে 'অগ্নিসূত্র' যে নিবিড়তব পাঠেব দাবিদাব, এতে সংশয় নেই।

'ছন্নবাস' উপন্যাস সম্পর্কে জানানো হয়েছে ''সহজ মানুষেব জীবনেও লুকিয়ে থাকে চোবাবালি। সুস্বাস্থ্যেব অধিকাবী যুবকেব বক্তেও সংক্রমণ।'' কিন্তু ৫৪ পৃষ্ঠাব এই ছোট্ট উপন্যাসে যেন সমস্ত অর্থেই অগ্নিসূত্রেব বিপবীত মেরু বচিত হলো। যতটুকু ব্যাপক পবিসব ছিল প্রথম উপন্যাসে, দ্বিতীয় উপন্যাসে তা নেই নীতু ও বিহঙ্গেব জীবন কথায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক পবিসব গুরুত্বপূর্ণ নয়, নাগবিক জীবনেব উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি পবিসবই অম্বিষ্ট। শানিত

জুঁই লালিমা সাবথীদেব সঙ্গে কিছু মাত্র তুলনীয নয নিভি ও বিহঙ্গ কিংবা দূববর্তী সত্তেন। দুলাল অবশ্য নগবাযনেব প্রতিক্রিযা সম্পার্কে সচেতনভাবে নিজস্ব বক্তব্য পেশ কবতে চেযেছেন। নৈবাজ্য পন্থী নয , তবে নেতিব ছাযা পুবোপুবি মুছেও যাযনি। আসলে 'অগ্নিগর্ভ' ও 'ছন্নবাস' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জগতেব কথকতা।

নয়

ত্রিপুবাব উপন্যাস বিশ্ব পবিক্রমা মনে হয আমবা অপব পবিসবেব কথান্যাসেব সূত্রপাত মাত্র দেখছি। সলতে পাকানোব পর্যায শেষ কবে প্রদীপে আলো জ্বালানোব পর্ব শুরু হযেছে। বাইবে থেকে ভেতব পানে দৃষ্টিপাত কবছেন লেখকবা এবাব অন্তর্বিশ্বেব নিবপেক্ষ উন্মোচন শুরু হবে। ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শ, বিশ্বাস ও সংশয দুটি বিপ্রতীপ মেরুকবণেব পালা শেষ কবেছে। এবাব দ্বিবাচনিকতাব প্রক্রিযায পবিশীলিত হবেন ত্রিপুবাব লিখিযেবা। কেননা, এছাডা উপন্যাসেব অনুবিশ্ব গডে উঠতে পাবে না। বাংলা সাহিত্যেব মূল কেন্দ্র থেকে দূববর্তী ভূগোলেব অধিবাসী যাবা, তাদেব আধুনিকতাব বোধ কিংবা বোধহীনতা নিজস্ব ভিত্তিভূমি ও আকল্প দাবি কবছে। এই দাবিব প্রতি মান্যতা দেওযাব লক্ষণ ইতিমধ্যে এ অঞ্চলেব ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে, এবাব উপন্যাসেব পালা। লংতবাই থেকে অগ্নিসূত্রে পৌঁছেছি, এখন অগ্ন্যাধানেব জন্যে প্রতীক্ষা শুধু

রাজমালার ভাষারূপ ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা

অমিতাভ চক্রবর্তী

ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চার ধারায় ঐতিহাসিক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই 'রাজমালা'। অথচ, এর সম্পর্কে পূর্ণতম বিশ্লেষণ আজো অপেক্ষিত। 'রাজমালা'র রচনাকাল এখনও সংশয়াবৃত, এর বক্তা/ রচয়িতা/লিপিকরদের সম্পূর্ণ পরিচয় দূরে থাক, নামগুলিও সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করা যায়নি; এর প্রাচীন পুঁথি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। এমন অবস্থায় এর ভাষারূপের বিচার শুধু ভাষাতাত্ত্বিকের অ্যাকাডেমিক পরিশ্রমমাত্র হবে না, 'রাজমালাকে ঘিরে যেসব সংশয় রয়েছে, তার সমাধানের কিছু সূত্রও এই বিশ্লেষণ থেকে হয়ত ওঠে আসবে— একথা ভেবেই 'রাজমালা'র ভাষারূপ নিয়ে আলোচনার সূচনা।

এই আলোচনায় প্রাথমিকভাবে আমাদের অবলম্বন রমেন্দ্র বর্মণ কর্তৃক একত্র সংকলিত, কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা'। পূর্বোক্ত সমাধানমুখী প্রবণতার ফলেই 'রাজমালা'র ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক রূপবিবরণই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠেনি, আমরা বরং এর ভাষারূপের বিশ্লেষণ থেকে ধরতে চেয়েছি এর চারটি লহরের মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্য/ বৈসাদৃশ্যের সূত্রগুলি।

'রাজমালা'র ভাষারূপ নিয়ে এ-প্রথম ভাবনা নয়, পূর্ববর্তী আলোচকরা প্রায়ই এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এর চারটি লহরের ভাষারূপের সাদৃশ্য যে প্রচুর, তা আমাদের ভিত্তিগ্রন্থের ভূমিকায় রমেন্দ্র বর্মণ স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন। প্রথম এবং চতুর্থ লহর থেকে কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করে রমেন্দ্র বর্মণ মন্তব্য করেছেন। "শ্রীরাজমালার প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষা মূলত এক্ "ক্রিয়াপদাদির রূপ ও প্রয়োগ এবং শব্দ ব্যবহারে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না, বাক্য গঠন প্রণালীও প্রায় একই বলে মনে হয়।" (রমেন্দ্র বর্মণ : ১৪১০, গ) এই সাদৃশ্য স্বাভাবিকও কালীপ্রসন্ন সেন নিজেই দ্বিতীয় লহরের পূর্বভাষ-এ জানিয়েছিলেন যে তিনি মুখ্যত যে পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন তা দুর্গামনি উজির সংশোধিত 'রাজমালা'র পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং দুর্গামণি সমগ্র রাজমালার উপর "হস্তচালনা" করায় এর ভাষারীতিতে অনাকাঙ্খিত সারূপ্য তৈরি হয়েছে। কালীপ্রসন্ন লিখেছেন " (দুর্গামণি) রাজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্তচালনা করায়, ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সমসাময়িক ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই সংশোধন দ্বারা প্রাচীন ভাবের ব্যত্যয় না হইয়া থাকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।" (দ্রঃ রমেন্দ্র বর্মণ : ১৪১০ : দ্বিতীয় লহর : নয়।)

কিন্তু, প্রাচীন ও নবীন আলোচকের মন্তব্যের মধ্যে কিছু স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কালীপ্রসন্নের মতে ভাষা "কিয়ৎ পরিমাণে" দুর্গামণির সমসাময়িক হয়েছে ভাষার "কিছু ব্যতিক্রম" ঘটেছে আর রমেন্দ্র বর্মণের

উক্তিতে প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষা "মূলত এক", দুয়ের ক্রিয়াপদের রূপও শব্দব্যবহারে "বিশেষ কোনো পার্থক্য" নেই, বাক্যগঠন প্রণালীও"প্রায় একই"।

রমেন্দ্র বর্মণের মন্তব্যের ভিন্নতর একটি তাৎপর্যও রয়েছে। প্রথম ও চতুর্থ লহরের ভাষারূপ যদি "মূলত এক"-হয়, তাহলে পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা "রাজমালার বিভিন্ন খন্ড রচিত হওয়ার কথাটিও সংশয়াবৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আমাদের মতে রাখতে হবে আরো কিছু তথ্য। সোমেন্দ্রনাথ বসুর অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে রমেন্দ্র বর্মণ একটি ইঙ্গিতবহ প্রশ্ন তুলেছিলেন। "আমাদের মনে এপ্রশ্নও জাগা স্বাভাবিক রাজমালা যদি বিভিন্ন রাজন্যবর্গের আমলে রচিত হয়ে থাকে সে সব পুঁথির কোন খন্ডই মহারাজার পুঁথি সংগ্রহশালায় নেই কেন? বহু সংখ্যক পুঁথি রাজসংগ্রহে পাওয়া গিয়েছে একথা আমরা জানি। যেমন, রাজরত্নাকর আছে, সংস্কৃত রাজমালা আছে, অথচ কোনো বাংলা রাজমালার পুঁথি রাজসংগ্রহে নেই।" (রমেন্দ্র বর্মণ : ২০০১ : ছ) অস্বস্তি জনক এই তথ্যের সঙ্গে যদি প্রতিটি লহরের ভাষারূপ "মূলত এক"— এই সিদ্ধান্তটিকে যোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই রাজমালার বিভিন্ন লহর আদৌ বিভিন্ন সময়েই রচিত হয়েছিল, না সমগ্র রাজমালা একই সময়ে রচিত হয়েছিল— এ নিয়ে শুধু সংশয় তৈরি হয় না, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রবল হয়ে উঠে। পুঁথি যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই একমাত্র এক্ষেত্রে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তমুখী কিছু সূত্র দিতে পারে।

এই কথা গুলি মনে রেখেই "রাজমালা'র প্রতিটি লহরের ভাষারূপের সামগ্রিক বিশ্লেষণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

<u>ক্রিয়াপদ</u>—

প্রথমলহর— করিছে, ধরি, করে, বলিয়া, কহে, বলয়ে, বলে, ভজিলে, বন্দি, বিরচিব, বসি, জানেন, হইল, বলিছে, কর, কহি, জিনিলেক, দিল, যাচিল, রাখিল, পাইল, করিলেন, কৈল, করিন, দেখিল, পঠিল, হৈল, ঘটিল, দেখি, স্মরি, দিছে, দিয়াছে, ত্যজিয়া, লএ, করএ, জাগিয়ে, পাত্র, করহ, দেখিতেছি, পাঠাবে, সমর্পিল, সাধি, জিজ্ঞাসিল, বলি, হৈলা, বলিছে, পড়ে, অবধানকর, করি, আনিকেল, ধরিয়াছে, কহিল, মারে, পারে, মজিল, বধিল, কাট, মার, সৎকারে, আসিল, জালিল, চলিল, আরম্ভিয়া, কৈল, দিয়া, পাইতেছে, আসে, আনিলেন, হৈয়া, করিয়া, সহে, রাখিয়াছে, ভোগি, পালিব, পড়িলে, ধরে, মৈলে, মরিল, যাইয়া, খাই, পৈরি, করিবাবে, হইছি, চলিলা, পাইলা, খাইছ, পালিলেক, শাসিবেক, কসিয়া, হইবে, হইবেক, করিবা, করিবেক, বাড়ে, থাকে, নালিতে, ছাড়িব, মৈলেহ, কয়িব, শুনে, পূজিবা, করিবে, রহিছে, আলিবা, পাইবা, নির্ম্মিব, গলে, জন্মিবেক, জন্মিল, আসিল, আইসে, দেখে, বুঝিল, বঞ্চিত, ঘুচাইব, কহিছে, ধরাইল, বসাইল, আসে, খায়ে, দেখিল, আরাধিয়া, মিলিল ক্ষমায়ে, শুনিয়া, শিখিল, হইলা, ভাবিল, উপজিল, বৈলা, আইস, বন্দিয়া, দিলে, মিলি, জিনিব, শুনি, উত্তরিল, দিছে, থাকি, পাইসেক, পাইল, শোভে, দিলেক, খাইয়া, প্রকাশিয়া, বাজে, প্রবেশিল, পোছে, জানয়, পালিল, রহিলেক, কয়, জানিয়, জিজ্ঞাসিল, বঞ্চিল, সমপিয়া, রহিছে, পাঠাইছে, প্রণমিয়া, বিরচিয়া, দিয়াছিল, হিংসয়, শুকায়ে, বসিছেন, যাইবা, বসাইল, ছেদিব, তর্পিব, প্রচারিল, পাইলা, আসিব, বঞ্চে, সাজিয়া, জিনিয়া, আসিল, দেখিছে, বিবর্ত্তিয়া করিবারে, যুঝিল, মাগিলেন, লঘিব, গ্রাসিবে, গেলেক, যুঝিবারে।

<u>দ্বিতীয় লহর</u>—

শুইল, রহিল, চর্চ্চিল, পৈরাইয়া, ভাগাইল, বিমর্ষিয়া।

<u>তৃতীয় লহর</u>—

সম্বোধি, বলিল, আজয়ে, কহত, শুনিয়াছি, বলিব, বৈসে, রহে, খনিবারে, সম্বোধিয়া, কহিছে, দিলেক, টোয়ায়, চলিলেক, করিয়া, চলে, দেখিল, যুঝিল, ঘিরিল, আদেশিল, করায়, আছিলেক, রাখিলেন, রহিলেক, বলিলেক, খনিয়াছি, নিব, কহিলেন, বলিনা, নিজুজিল, উৎসর্গিল, কহিল।

চতুর্থ লহর—

আছিল, লিখিছে, করিয়া, উদ্দেশিয়া, বলিছি, জন্মিয়াছি, শুনিয়াছি, উৎসর্গিয়া, করিও, পূজিল, হওএ, পাত্রত, আরম্ভিল, শুনএ, লিখিল, স্থাপিলেক, ভাসাত্রঁ, নাইব।

ভনিতা

প্রথম লহর—

(১) ইতি প্রথমারম্ভে কাত্যায়নীধ্যায় ঃ

(২) ইতি দৈত্যখন্ডে দৈত্যস্বর্গারোহন কথনং।

(৩) ইতি ত্রিলোচনজন্ম কথনং।

(৪) ইতি ত্রিলোচন খন্ডং সমাপ্তং।

(৫) ইতি তৈদাক্ষিণ খন্ডং সমাপ্তং।

(৬) ইতি প্রতীত খন্ডং সমাপ্তং।

(৭) ইতি যুঝার খন্ডং সমাপ্তং।

(৮) ইতি ডাঙ্গর ফা খন্ডং সমাপ্তং।

ইতি রাজমালায়াং শ্রীধর্ম্মমনিক্য জিজ্ঞাসা দুর্লভেন্দ্র চন্তাই বানেশ্বর শুক্রেশ্বর দ্বিজ কথনং সমাপ্তং।

দ্বিতীয় লহর—

(১) ইতি অমরমাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং রণচতুর নারায়ণ কথনং দ্বিতীয় কান্ডং সমাপ্তং।

তৃতীয় লহর—

(১) ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খন্ডে রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তবাগীশ প্রত্যুত্তরং সমাপ্তং।

চতুর্থ লহর —

(১) ইতি রাজখন্ড তত্বে গোবিন্দ মাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং।

(২) ইতি রাজখন্ড তত্বে রাজা রামমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং।

(৩) ইতি রাজখন্ডতত্বে রত্নমহেন্দ্র মাণিক্য রাজকথনং সমাপ্তং।

(৪) ইতি রাজখন্ড তত্বে মুকুন্দমাণিক্য রাজকথনং সমাপ্তং।

(৫) ইতি রাজখন্ড তত্বে ইন্দ্র, জয়, উদয়মাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তং।

(৬) ইতি রাজখন্ড তত্বে বিজয়, লক্ষণ মাণিক্য কথনং সমাপ্তং।

(৭) ইতি রাজখন্ডতত্বে কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব কথনং সমাপ্তং।

(৮) ইতি রাজখন্ডতত্বে কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব কথনং সমাপ্তং।

রামগঙ্গামাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং দুর্গামণি উজীর কথনং চতুর্থ কান্ড সমাপ্তং।

প্রথম লহর —

(১) তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।

সর্ব্বানি তীর্থানি বসতিচ তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গ ।ঃ

(২) অথ পীঠমালা তন্ত্র প্রমাণ শ্লোক ঃ

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।

ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ঃ ।

(৩) অথ শ্লোক ঃ সভাপর্ব্বনি। ত্রিপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমামিত্যে জসম্।

নিজগ্রাহমহা বাহুস্তরসা পৌররেশ্বর ঃ ।।
(৪) অথ প্রমাণং ভীষ্পপর্ব্বণি।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কোশসোজথ বৃহদ্বল:।।
মেঘলৈস্ত্রেপুরৈশ্চৈব বর্ব্বরৈশ্চ সমন্বিত : ।।
(৫) বর্ম্মান্তে তু গতে ভুপে ক্রোধস্যাক্ষো ভবিষ্যতি ।
সমাধ্য গ্রহযুগ্মাব্দং ততোহসৌ ন ভবিষ্যতি।
দ্বিতীয় লহর—
(১) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।
(২) চন্দ্র বংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামামিক্যজ ঃ সুধী' ঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ভুপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভব: ।।
(৩) শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বষে সোম দিলে তিথৌ।
এযোদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।।
(৪) মায়া মুরারে রিয়মম্বিকা যা।
মণ্ডত্য মুখ্যা নিকটং ন কুত্র।।
প্রান্তে ভবান্যা ধ্রুব মাস কেশব : ।
শ্রীধন্য মাণিক্য বিনিশ্চিত স্তিয়ম্।।
(৫) কিং নৈব সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জয়সন্নিবেশা :।
কোদগ্রদুর্গ্রহতরাং খলু চাতকস্য
পৌরন্দরীং তদপি বাঞ্ছতি বারিধারাং।।
(৬) মিত্র দ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে যে বিশ্বাস ঘাতকা।
তে নরা নরকে জান্তি যাবচ্চন্দ্র বিদাকরৌ।।
(৭) ধন্যমণিক্য ভূপালো বহুভির্ভুবি দুল্লভ ঃ।
তৎসুত্যে দেব মালিক্যস্তং সুতো বিজয় স্মৃত ·।।
রাজা রাজশিরো রত্ননিঘৃষ্ট চরণাম্বুজ :।
শ্রীশ্রী বিজয় মাণিক্যে রাজা বাজভিরাজতে।।
তৃতীয় লহর —
(১) দেবে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি: সর্ব্বত্র গীয়তে।।
(২) রাজভবদ্বিষ্ণুপরায়নো বৈ শরদ্ধিমাংশো: কুলসম্ভবশ্চ।
অভেদ ধর্ম্মঃ কিল কল্পবৃক্ষ: কল্যাণমাণিক্য মহী মহেন্দ্র. ।।
চতুর্থ লহর—
(১) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি: সর্ব্বত্র গীয়তে।।

পংক্তি সংখ্যা

প্রথম লহর	দ্বিতীয় লহর	তৃতীয় লহর	চতুর্থ লহর
১৪৫৬	১৮০৪	১৮২৫	১৯৯৪

নঞর্থক বাক্যে নঞর্থক শব্দের অবস্থান

	ক্রিয়ার পূর্বে ঃ	ক্রিয়ার পরে (শতাংশ)
প্রথম লহর —	৫০:০	(১০০:০)
দ্বিতীয় লহর —	৭৪:৪	(৯৪.৮৭:৫:১২)
তৃতীয় লহর —	৫২:২	(৯৬.২৯:৩.৭০)
চতুর্থ লহর —	৮:১	(৮৮.৮৮:১১)

বাক্যে ক্রিয়ার সংস্থান

	শুরুতে :	মধ্যে :	শেষে	শুরুতে : মধ্যে : শেষে (শতাংশ)
প্রথম লহর :	৪৫:	৪১৯ :	২৪১	(৬.৩৮: ৫৯.৪৩: ৩৪.১৮)
দ্বিতীয় লহর :	৪৯:	৪৬৬:	৪০০	(৫.৩৫: ৫০.৯২: ৪৩.৭১)
তৃতীয় লহর :	২৪:	৪৮৮ :	২৩৩	(৩.২২: ৬৫৫০: ৩১: ২৭)
চতুর্থ লহর :	১০:	২৩২:	১৪৬	(২.৫৭: ৫১.৭৯: ৩৭.৬২)

শুরুতে ও শেষে ক্রিয়াযুক্ত পংক্তি

প্রথম লহর :	দ্বিতীয় লহর :	তৃতীয় লহর :	চতুর্থ লহর
২০ :	১৪ :	২ :	২
(১.৩৭:	০.৭৭:	০.১০:	০: ১৬) (শতাংশ)

দুটি ক্রিয়াপদযুক্ত পংক্তি

প্রথম লহর :	দ্বিতীয় লহর :	তৃতীয় লহর :	চতুর্থ লহর
৮৭ :	৫২ :	৩৩ :	১৭
(৫.৯৭:	২.৮৮:	১.৮০:	১.৪২) (শতাংশ)

দুটির বেশি ক্রিয়াপদযুক্ত বাক্য

প্রথম লহর :	দ্বিতীয় লহর :	তৃতীয় লহর :	চতুর্থ লহর
১১ :	৬ :	১১ :	৬
(০.৭৫ :	০.৩৩ :	০.৬০ :	০.১৬) (শতাংশ)

উপসংহার

দুর্গামণি সংশোধিত, কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'রাজমালা'র ভাষারূপের এই বিশ্লেষণ আপাতভাবে চারটি লহরেই প্রায় একই ভাষারীতি অনুসৃতির অনুমানকেই প্রমাণ করে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, সংশোধনের ফলে একাধিক যুগের একাধিক ব্যক্তির ভাষারীতিতে প্রত্যাশিত পার্থক্য পুরোপুরি মুছে যেতে পারে কি ? উত্তর ঃ নঞর্থক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, একই সঙ্গে চোখে পড়ার মতো একটি স্বাতন্ত্র্যকে মনে রাখা প্রয়োজন। লহরগুলিতে ভণিতা/লহরাংশ সমাপ্তিসূচক শ্লোকের ব্যবহার প্রবণতার গুরুতর স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করেছি। একই ব্যক্তির দ্বারা একই কালে লেখা হলে বাক্যগঠনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্যে এধরণের স্বাতন্ত্র্য থাকার কথা নয়। ভণিতা সংযোজনের প্রবণতায় একক লেখকের রচনায় এক ধরণের সমতাই প্রত্যাশিত - ভণিতা কাব্যদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির একটি, এক্ষেত্রে একই কাব্যে একই লেখকের এতটা ব্যবহার পার্থক্য লালন করার কথা নয়। এই পার্থক্য সূত্রটি আমাদের নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে দেয় না। বস্তুত এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিষদ-পুঁথির ভাষারীতি, ত্রিপুরায় রচিত অন্যান্য আখ্যান কাব্যের ভাষারীতির অনুরূপ বিশ্লেষণ একান্ত কাম্য। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে এমন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমরা শুধু কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'রাজমালা'র ভাষারূপের উন্মোচনেই তাই নিজেদের প্রয়াসকে সীমিত রাখলাম; ইশারা রয়ে গেল এব্যাপারে সম্ভাব্য বৃহত্তর গবেষণার সম্ভাবনার।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

যূথিকা বসুভৌমিক

অফুরন্ত অবসর না মিললে ভাবনার ঝুড়িতে নাড়া পড়ে যখন তখন। স্বভাবতই মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় দিন-ক্ষণ ঘটনা মানুষ আরও কত কি। ভোরের আকাশে দিগন্ত বিস্তৃত সূর্যালোকের ঝলকানির মত থেকে চিত্তলোক করে ওঠে ঝলমল, ভাবনার উপাদান হয়ে যায় নবীন, অস্পষ্টতা কাটিয়ে ফুটে ওঠে স্পষ্টতার আলোক। বলতে দ্বিধা নেই প্রকাশ ভঙ্গির ঋজুতা এবং ভাষার দীনতা মনের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল মিলোতে অসমর্থ। তবুও প্রয়াসী হয়েছি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের গুটি কতক ত্রিপুরার প্রাক্তন ছাত্রের আজীবন মেনে চলা আদর্শের ভাবনা-যা আমার ভাবনায় স্বতস্ফূর্ত।

একদা বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম কবি স্বীকৃতির যে অভিনন্দন এসেছিল ত্রিপুরার রাজকুল থেকে, পুত্র-পৌত্র পরম্পরায় তা রূপ নিয়েছিল পারিবারিক সৌহার্দে। আরও যা তা-হল ব্রহ্ম বিদ্যালয় ও আশ্রমের জন্য রাজকীয় আনুকূল্য, বিশ্বভারতীতে অনুদান, বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রের গবেষণা কার্যে আর্থিক সহায়তা দানের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পটভূমিতে কবির ১২৫তম জন্ম জয়ন্তীয় প্রাক মুহূর্তে সুদূর অতীতের অনেক কথা ও কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত বলেই মনে হয়।

ইংরেজী ১৯০৩, কবির ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সূচনা কাল থেকেই রাজানুগ্রহে আশ্রমিক শিক্ষায় দীক্ষিত হতে এ রাজ্য থেকে ছাত্র পাঠানো শুরু হয়েছিল। মদীয় পিতৃদেব সত্যরঞ্জন বসু ছিলেন সে সৌভাগ্যের প্রথম অধিকারী। পিতৃদেবের চিন্তা এবং ভাষায় "সম্ভবত ১৯০৩ সালের মাঝামাঝি। বয়স আমার ৭/৮ বৎসর হইবে। ঠিক হইয়াছে শান্তিনিকেতন বোর্ডিং ইস্কুলে পড়িতে যাইব। শুনিলাম আমার মত ছেলে আরও আছে। বেশ মজার মধ্যে দিন কাটান যাইবে। পাঠশালা বা ইস্কুলের সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় নাই। কাজেই একটা অভিনবতা আমার বালক মনকে পাইয়া বসিল। রওয়ানা হইবার আগের দিন পিতৃদেব আমাকে মহারাজ রাধাকিশোরকে প্রণাম করাইতে নিয়া গেলেন। মনে আছে তিনি সস্নেহে আশীর্বাদ করিলেন। পরে শুনিয়াছি ত্রিপুরা হইতে আমি প্রথম ছাত্র যাইতেছি বলিয়া মহারাজের খুব আনন্দ হইয়াছিল। তখন কে জানিত রাধাকিশোর রবীন্দ্র সম্পর্ক - আর বোর্ডিং ইস্কুলের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগই বা কি!"

এই প্রসঙ্গে জানানো হয়ত অবান্তর নয় যে পিতামহ 'মোক্ষদা কুমার বসু ছিলেন মহারাজ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর ও ব্রজেন্দর কিশোরের গৃহশিক্ষক। যুবরাজ এবং মহারাজ কুমারদের গৃহশিক্ষক নির্বাচনেও কবি

এবং আচার্য বসুর মনোনয়ন স্বীকৃতি পেয়েছিল। "মোক্ষদাবাবুর শিক্ষাদানের রীতি ছিল রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ। বিভিন্ন সদগুণ দ্বারা তিনি শিক্ষার্থী রাজকুমারগণের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা ষাট বছর পরে আজও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।" (রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ঃ তথ্য ক্রমপঞ্জী ১৬৭ পৃঃ)

নানা রাজনৈতিক জটিলায় কবির আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করা হয়নি। বালকের ব্যথিত হৃদয়ে কবির সান্ত্বনা বাণী পত্রে বহন করে এনেছিল যা "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মল ভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই-তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্রে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহির না হউক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর।

শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা: সহিষ্ণু হইয়া সংযত হইয়া পবিত্র হইয়া আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে পরমতম বন্ধন মুক্তি স্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।"

একদিকে 'সত্য দ্রষ্টার গম্ভীর সাবধানী আহ্বান' অন্যদিকে নবনিযুক্ত গৃহশিক্ষকের পথ নির্দেশ মহারাজ কুমারের সারাজীবন পাথেয় স্বরূপ ছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙালী জীবনকে যে নতুন রূপ দিতে চেয়েছিলেন আশ্রম গুরু রবীন্দ্রনাথ আমার পূর্বসুরীদের অন্তরে তার ব্যাপ্তি ছিল বহুদূর বিস্তৃত।

প্রকৃতির কোমল আবেষ্টনে আশ্রমের নিয়মানুবর্তিতায় ঈশ্বরানুভূতির নীরব চিন্তায় সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ পরিপাটি অভ্যাসে জীবনের গতি যে একটি বিশিষ্ট আচরণকে স্মরণ করাচ্ছে। প্রত্যুষে জীবনের সঞ্চিত সংস্কৃত স্তোত্র জীবন সায়াহ্ন কালেও খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠবার আগে বলতে শুনেছি

"লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞ য়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম।
সংসার যাত্রা মনু বর্ত্তরিয়্যে।।

"সর্বংসহা পৃথ্বী-বলে ধরনীর কাছে নাম প্রার্থনা করে মাটিতে পা দেবার সার্থকতা আজ আমার উপলব্ধিতে জাগরুক। সাংসারিক স্রোতে সামান্যতম অপচয় পিতৃদেবকে ব্যথিত করত। সর্বদা তোলা জলে স্নান করতেন তিনি-বালকের আশ্রম জীবনে পরিমিত জলে অবগাহনের অভ্যাস -বৃদ্ধ বয়সেও অপচয় বিষয়ে সচেতন থাকতেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে শাস্তির অভিনব বিধান নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে দেখেছি মাঝে মাঝে। সে সময় আশ্রম বাগান করতে হত। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন বাগান করার সাথী। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতৃদেবের সহপাঠী।

একবার গুরুদেবের উপস্থিতিতে ৭ই পৌষ উৎসব উপলক্ষে আশ্রমের ছেলেদের দিয়ে বিসর্জন নাটক অভিনীত হয়। ধ্রুবর ভূমিকা নিয়েছিলেন বালক সত্যরঞ্জন। পরের দিন তোলা হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক মোহিতবাবু সহ আশ্রম বালকদের ছবি। এমনি সব স্মৃতির আঙ্গিনায় আমরা ছিলাম পিতার একালের সঙ্গী।

শিল্প, সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত সব বিষয়ের গভীরে অনুধাবন করার এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি পিতৃদেবের চরিত্রে। প্রচার বিমুখতা তার সৃষ্ট সাহিত্য রচনাকে করে রেখেছে গৃহবন্দী যা উত্তরাধিকারীদের অক্ষমতাই প্রকাশ করে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দ, আগরতলায় কবির শেষ বারের আগমন কাল। কুঞ্জবন প্রাসাদে বসে আশ্রমপুত্র সত্যরঞ্জনকে যে আশীর্বাণী লিখে দিয়েছিলেন সেই ভাবধারার আদর্শ থেকে স্মরণকালে তাঁকে বিস্মৃত হতে দেখিনি আপশোষ রয়ে গেছে ঠিক যতটা জানা বা জেনে নেওয়া দরকার ছিল পিতৃদেবকে বা তাঁর কাছ থেকে, জ্ঞান এবং বুদ্ধির স্বল্পতায় তার কোনটাই সম্ভব হয়নি। আমার এ অক্ষমতা সুধী মহলে অমার্জনীয়।

তবুও স্মৃতির দোলায় সময়ে সময়ে মন হয়ে থাকে ভরপুর। ইংরেজী ১৯৬৪ থেকে '৬৬ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবনের আবাসিক ছাত্রী হিসেবে শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন তখন আমার স্থানীয় অভিভাবক। স্বভাবতই দেখাসাক্ষাতে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান তাঁকে চিন্তিত করে তুলত। ফলে বৈকালিক ভ্রমণে বেড়িয়ে হোস্টেল চত্বরে এসে জেনে যেতেন আমাদের কুশল সংবাদ। এই সুবাদে হোস্টেল সুপার সাগরদীঘির কাছ থেকে আগাম ছুটি মঞ্জুর হয়ে থাকত সাপ্তাহিক ছুটির দিন বুধবারে কাকীমার হাতে রান্না করা সু স্বাদু খাবার আস্বাদনের। যদিও তুলনামূলক ভাবে খেতাম এত স্বল্প যে পরবর্তী সময়েও 'নিখাকী' সম্বোধনে কাকীমার স্নেহ সিঞ্চিত ধমক খেয়েছি। তাদের এই সহচর্যের স্নেহাশীষ ঘরের ভাবনায় আমাকে দুর্বল করত না।

পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সালে, বিদ্যাভবনেই গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলাম। শিশুপুত্র ইন্দ্রনীল সে সময়ে আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনবাসী। আনন্দ পাঠশালার শিক্ষায় নাচ-গান-খেলাধূলায় সে তখন মত্ত বিভোর। অন্যদিকে ধীরেন ভাইয়া ও আম্মার স্নেহাদর এখনও তাকে শান্তিনিকেতন মুখী করে রেখেছে।

গবেষণার কাজে প্রয়োজন বোধে নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও তাঁর অবন পল্লীর বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে জেনে নিতাম গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তুর নানা দিক। প্রতিটি সাক্ষাতেই উপলব্ধি করেছি তাঁর শিল্প রুচি ও ভাবনার সঙ্গে সংমিশ্রিত সাহিত্যবোধের দ্যোতনা পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর যে পত্র বিনিময় চলত তার পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের সাহিত্য রুচি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন পিতৃদেব সম্পর্কে তিনি বলেন, "পত্রে সাংসারিক বিষয়ে সংবাদ থাকলেও মনে সবচাইতে আনন্দ পেতাম যেখানে আর্টের সাহিত্যের, প্রকৃতি সৌন্দর্যের কথা থাকতো।" পিতৃদেব মন্তব্য করেছিলেন, "ওর লেখা পত্রগুলি সাহিত্য পর্যায়ের। শিল্পী চোখের বর্ণনায় ভাষা ঝরঝরে, সাবলীল। সেদিন ও শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষণের যে লিপি চিত্র পাঠিয়েছিল তা সাহিত্য রসপুষ্ট কবি মনের উক্তি বললে বেশী বলা হবে না।"

রং তুলির জগতে আজীবনখ্যাত শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ আমার চেতনায় রবীন্দ্র ভাবাদর্শে প্রাণবন্ত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। পিতৃদেবের সঙ্গে সখ্যতার নিবিড় বন্ধনের ফলরূপী স্নেহাশীষ উত্তরাধিকারী আমরা ভাইবোন পেয়ে চলেছি আশৈশব কবির স্নেহ সান্নিধ্য লাভে মধুময় জীবনের ঘটনা স্মরণ করে আনন্দ পেতে দেখেছি বয়োবৃদ্ধ শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণকে। সংযত সীমিত শব্দে কথা বলার ভঙ্গিটি তাঁর চমৎকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক জীর্ণতা তাঁর মনের সজীবতাকে এখনও পঙ্গু করে দেয়নি। '৮৫ র ডিসেম্বরেও তাঁর সাক্ষাতে অনুভব করেছি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে শিক্ষিত গুরুচরণে নিবেদিত একটি মনের অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা যা একালের মাদৃশ জনের গ্রহনীয়।

শৈশব কাল থেকেই অভ্যস্ত হয়েছি নববর্ষ এবং বিজয়া দশমীতে পিতৃদেবকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে বহু জনের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। শিল্পী শৈলেশ দেববর্মণ এবং গিরিজা নাথ চক্রবর্তী ছিলেন এঁদের অন্যতম। মহারাণী তুলসীবতী স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে অতি পরিচিত এই দুটি সহজ সরল ভালো মানুষকে পেলাম

আঁকা এবং গানের মাস্টারমশাই হিসেবে। মনে পড়ে উভয়ের পোষাকী মিল ছিল ধুতি পাঞ্জাবী অথবা সার্টে। শিল্পীর মাথায় থাকত বাহারী টুপি, গায়ক মাস্টার-মশাই এর মুখের তুলনায় গোঁফ জোড়াটি ছিল কিছু বড়। শান্ত-ধীর ছন্দে কথা বলা ছিল গিরিজাবাবুর অভ্যেস। হাতে তাল রেখে খোলা গলায় গান শেখানোর পদ্ধতিটি একনো ভুলিনি। গানের ফাঁকে ফাঁকে আশ্রমজীবনের নানা পাঠ গ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় গানের প্রতি ছাত্রীদের আগ্রহ জন্মাবার চেষ্টা করতেন। কর্মজীবনে সঙ্গীতকে আশ্রয় করে অর্থনৈতিক সুরাহায় নিয়োজিত থাকলেও কাব্য এবং সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন গিরিজাবাবু। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত তার কাব্যগ্রন্থ 'বীণা'।

স্বল্পভাষী, কোমল অন্তরের শিল্প-শিক্ষক শৈলেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গ লাভে আমরা আনন্দ পেতাম। প্রায়ই দেখতাম পিতৃদেবের কাছে এসে নানা শিল্পপ্রকৃতির আলোচনায় মগ্ন হতে বয়োজেষ্ঠের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। নিজের শিল্পকলা প্রকাশে কখনই তাঁকে ব্যস্ত হতে দেখিনি। উপরন্তু এ বিষয়ে সংযমী বাকভঙ্গি তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বাড়ীর বাইরে যত্রতত্র দেখা সাক্ষাতে সদা হাস্যময় শিল্পী মানুষটি বন্ধুরূপী শিক্ষকের আচরণ-একালের শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্লভ। গুরুদেবের আশ্রমিক শিক্ষা, শিল্পকলা গুরু নন্দলালের সহচর্য শৈলেশ মাস্টার মশাইর মদ্যে সহজাত বৈশিষ্ট্য রূপে প্রকাশ পেত।

ইংরেজী ১৯১০, ত্রিপুরা (এ কালের বাংলাদেশ অন্তর্গত) থেকে আরও যে একটি বালক শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি 'অনাথ বন্ধু চৌধুরী। আশ্রম জীবনের দুর্লভ শিক্ষা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল। কর্মজীবনে আরক্ষা দপ্তরে যুক্ত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে যে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জেনেছি। শারীরিক বৈশিষ্টে রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও অন্তরটি ছিল বড় কোমল পিতৃদেবের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব রূপ পেয়েছিল সখ্যতায় - তবে কালের দ্রুত পট পরিবর্তনে, পিতৃদেব এবং অনাথ কাকু উভয়ের তিরোধানে আমরা উত্তর সুরীরা একালে সে যোগসূত্রে বজায় রেখে চলতে পারছিনা। যদিও ছোট্ট এই আগরতলা শহরে দুটি বাড়ীর দূরত্ব মাত্র এক থেকে দেড় কিলোমিটার। নেতাজী সুভাষ রোডে 'শ্রীধর নিবাস' ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই মানুষটির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন সূত্রে সখ্যতা গড়েছিল সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের।

ইংরেজি ১৯৫৫ সাল, ত্রিপুরার সাহিত্যিক মহলের 'সাহিত্য বাসর' সভার দ্বাদশবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা অনুষ্ঠিত হোত তৎকালীন উপদেষ্টা শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে। আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি মহাশয় আগরতলা শহরে অবস্থানকালীন ঠিকানা ছিল 'শ্রীধর নিবাস।' প্রায় দিন পনেরো ছিলেন। স্বভাবতই আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সঙ্গে। বাড়ীতেও গল্প আসর জমে উঠেছিল সে কদিন।

জেনে হয়ত আমার মতই অবাক হবেন সবাই যে দপ্তর খ্যাত ডি. এস. পি. অনাথবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের বিকৃত ঘটনাই পরে সাহিত্যিক তারাসংকরের হাতে রূপ পেয়েছিল ছায়াছবি খ্যাত গ্রন্থ 'সপ্তপদীতে'। গ্রন্থের ভূমিকায় গল্প সংগ্রহ এবং বন্ধুত্বের স্বীকৃতি উল্লেখে আগ্রহ প্রকাশ হয়েছিল সাহিত্যিকের তরফে। প্রচার বিমুখ অনাথ কাকু এতে নারাজ ছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ছায়ায় চরিত্র গঠনের যে সুযোগ এঁরা পেয়েছিলেন তা স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে কৃতার্থ হবার বাসনা প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরে চিরকাল জাগরূক ছিল। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদজন প্রত্যেকেই আশ্রম জীবনের যে স্মৃতি চারণ করেছেন - তখন এঁদের সবারই পরিণত মনের বিকাশ

ঘটেছে। বার্ধক্যের ধূসরতায় তা অস্পষ্ট বা মলিন হয়ে যায়নি। উপলব্ধির জগৎ বহুদূর বিস্তৃত।

[স্বল্প সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার মধ্যে এই লেখা সমাপ্ত করতে হয়েছে। ফলে লেখা থেকে বাদ পড়ে গেছে পরিচিতি আরও কজন। সুযোগে তাঁদের স্মৃতি তুলে ধরার আশা রাখছি।]

আদিবাসী ইতিহাস অনুসন্ধানের কিছু দিক

মহাদেব চক্রবর্তী

বর্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি : (এক) ভৌগলিক, নরতত্ত্ব, ভাষাগত গোষ্ঠী, জীবিকা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি উপজাতি মানচিত্র তৈরির প্রয়াস, (দুই) 'ট্রাইব' উপজাতি' এবং সাম্প্রতিক 'ইন্ডিজেনাস শব্দগুলির ব্যঞ্জনা ও বিতর্ক, (তিন) আদিবাসী ইতিহাসেব উপাদান এবং মৌখিক ইতিহাস প্রসঙ্গ ও গবেষকদের কিছু অসুবিধা।

অনেক বছর আগে স্যার আরথার কীথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Antiquity of Man গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা **ভারতের দিকেই** আশাব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে। কীথ **এর এই উক্তির পর অনুসন্ধান** যে কিছু হয়নি তা নয়, কিন্তু মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু কিছু আদিবাসী সমাজে কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থান-এর জন্য পূর্বকালের অনেক কিছু আজও খুঁজে বের করা সম্ভব এবং নানা কারণে আদিবাসী ইতিহাস রচনার কাজটা আজ খুবই জরুরি।

।। এক ।।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমীক্ষা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ আদিবাসীর বর্তমান বাসস্থান এশিয়া ও আফ্রিকায়। আসলে, আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান। 'ভারতের নৃ-বিদ্যা সর্বেক্ষণ-এর 'ভারতের আদিবাসী' প্রকল্পে তফসিলভুক্ত উপজাতিদের ৪৬১ টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, অর্থাৎ জনগণনা অনুযায়ী আজ যদি দেশের জনসংখ্যা ১০০ কোটির বেশি হয় তাহ'লে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮ কোটির কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। শুধুমাত্র নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের উপর নির্ভর করেই এই জনগোষ্ঠীর কিছু পরিচয় আমরা পাই। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে।" ভৌগলিকভাবে ৬ টি :

(১) উত্তর পূর্বাঞ্চল— স্বাধীনতার সময় এই অঞ্চলে বিশাল আসাম ছাড়া দুটি রাজন্য শাসিত রাজ্যও ছিল— মণিপুর ও ত্রিপুরা। সমগ্র ভারতের তথাকথিত 'মূলস্রোত' থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ

শাসকরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে 'বহির্ভূত এলাকা' 'আংশিক ভাবে বহির্ভূত এলাকা', 'সীমান্ত এলাকা', ! 'নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী' বা 'নেফা' ইত্যাদিতে চিহ্নিত করেছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামকে কেটে চারটি উপজাতি রাজ্যের জন্ম হল নাগাল্যান্ড (১৯৬৩), মেঘালয় (১৯৭২), মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ (১৯৮৭)। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সাথে সংযোগবাহী এই উত্তর পূর্বাঞ্চল একটি ক্ষুদ্রকায় ভারত যেখানে ৭৫ টি বড় জনগোষ্ঠী এবং ৪০০ র উপর স্থানিক ভাষা আছে এখানেই গারো, নাগা, মিজো ত্রিপুরী, বিয়াং, মিসমি, কুকী প্রভৃতি উপজাতির বাসস্থান তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাব বর্তমান।

(৩) হিমালয় অঞ্চল অর্থাৎ সিকিম, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি বাংলা এবং উত্তরবঙ্গের কিছুটা যেখানে গোন্দ, হো, ওরাও, মুন্ডা, সাওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বাস, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাদের অধিকাংশতেই 'প্রোটো- অস্ট্রালয়েড' বা আদি অস্ট্রালদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

(৪) পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে কর্কোরিয়া, সেহারিয়া, কোলঘা, ওয়ারলি ইত্যাদির মধ্যে ভীলরা গুরুত্বপূর্ণ এবং আদি-অস্ট্রালদের সাথে সম্পর্কিত ।

(৫) দক্ষিণাঞ্চলে চারটি রাজ্যে চেঞ্চু, গদবা, কোন্দম, কে ট্রনাইকন, ইরুল, কুরুবা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বিচারে ভূমধ্যসাগরীয়, নেগ্রিটো, ককেশীয়, আদি- অস্ট্রাল প্রভৃতি নানা নরজাতির প্রভাব আছে। নরতত্ত্বের বিচারে নীলগিরি পর্বতের টোডা দের মত এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের গায়ে কোনও বিশেষ জাতির ছাপ আজও দেওয়া সম্ভব হয়নি।

(৬) দ্বীপাঞ্চল অর্থাৎ আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপে যেসব আদিবাসীর আবাসস্থল যেমন জারোয়া, ওংগি, সেন্টিনেলি, জুয়াহ ইত্যাদি, যাদের মধ্যে নেগ্রিটো সহ অন্যান্য প্রভাব বর্তমান।

যেমন ভৌগিক ও নৃতত্ত্বের বিচারে উপজাতি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়, ঠিক তেমনি ভাষাগত ভাবেও বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর— যেমন ইন্দো ইউরোপীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, তিব্বতী চীনা ইত্যাদি প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়

জীবিকার ভিত্তিতে ভারতীয় উপজাতিকে নির্মলকুমার বসু পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন

(ক) খাদ্য-সংগ্রহকারী ও শিকারী যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, (খ) স্থান পরিবর্তনকারী বা ভ্রাম্যমান কৃষক বা জুমিয়া, (গ) লাঙ্গল ভিত্তিক স্থায়ী কৃষক, (ঘ) মেষপালক, কারিগর, কৃষি শ্রমিক, (ঙ) বাগিচা ও শিল্প শ্রমিক। বিভিন্ন উপজাতির অর্থনৈতিক অবস্থান বিভিন্ন রকমের।

ধর্মীয় আঙ্গিকে animism বা সর্বপ্রাণবাদ ছিল উপজাতিদের ধর্ম। পরবর্তী সময়ে হিন্দুয়ানি বা সংস্কৃতায়নের এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়।

উপজাতিদের মধ্যে একটা ছোট অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । আবার লাক্ষাদ্বীপ, হিমাচল প্রদেশ কিংবা উত্তর- পশ্চিমের কিছু অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের উপজাতি মানচিত্রে নানা রং এর ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র ছবিটি উপস্থিত করা যায়। ১৯৯১ এর জনগণনায় সমগ্র ভারতে উপজাতির সংখ্যা ছিল ৬.৭৮ কোটি । এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশেই সবচেয়ে বেশি --১ কোটি ৫৪ লক্ষ। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব ভারতের তথাকথিত 'সাত বোনের' রাজ্য এবং সাথে যদি সিকিমকেও যুক্ত করা হয় তাহলে মোট উপজাতির সংখ্যা ১ কোটি ও হয় না, অথচ এখানে ৪টি পুরোপুরি উপজাতি রাজ্য আছে এবং এই উত্তর পূর্বাঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি উপজাতি উত্তেজনা। ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষেই এই উত্তেজনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান সম্ভব, অথচ এই দিকটি আজও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত দৃষ্টিতে নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্যাটিকে দেখলে এবং নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,

মনোবিদ্যা সহ অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য নিয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনায় কাজে হাত দিলে হয়তো বা ভারত ইতিহাসের অপূর্ণতা কিছুটা মিটতে পারে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৭৫টি উপজাতি গোষ্ঠী আজও 'প্রিমিটিভ' বা আদিম হিসাবে চিহ্নিত। প্রাক্ কৃষি বা পুরোপুরিই জুম - ভিত্তিক অর্থনীতি, অত্যন্ত নিম্নহার সাক্ষরতা, ক্রমহ্রাসমান বা নিশ্চল জনসংখ্যা ইত্যাদির নিরিখেই এই আদিমতা নির্ধারণের রীতি আছে। হয়তো বা উপজাতি উন্নয়নের নানা প্রকল্প আছে, ১৯৯৯ - এর অক্টোবরে কেন্দ্রীয় স্তরে আলাদাভাবে একটি উপজাতি মন্ত্রকও গঠিত হয়েছে সমগ্র দেশে ১৪ টি ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে কিন্তু উপজাতি ইতিহাস রচনায় আগ্রহী গবেষক তেমন নেই। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির নানা সীমাবদ্ধতা থাকে। ইতিহাসেও এক সময় অনেক অনুশাসন মানতে হত অন্যান্য বিদ্যা থেকে ইতিহাস অনেকটা মুক্ত। আর. জি. কলিংউড, পি. গার্ডিনার, ই. এইচ. কার বা মার্ক ব্লক প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত গণ্ডী আজ কিছুটা হলেও শিথিল হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে ঃ এই সবের ফলে ইতিহাস অভীষ্ট হয়, তাহলে তা হবে কেন। উপজাতি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগকে যথাযথভাবে আলাদা করা নানা কারণে কঠিন, সেজন্য ইতিহাসের সব যুগ সম্পর্কেই কিছুটা ধারণা থাকতে হবে। আসলে, আমাদের তথাকথিত আধুনিক জীবন ও সমাজের মধ্যেও কত প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা লুকিয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পাই। চিরায়ত ও আধুনিকতার সম্পর্কে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইতিমধ্যে কত আলোচনা হয়েছে। আসলে, সমগ্র ভারত ইতিহাসে এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তরণের পর্যায়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এক জটিল বিষয়বস্তু।[৩] এটা যদি সামগ্রিক ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্য হয়, আদিবাসী ইতিহাসের ক্ষেত্রে দারুণভাবে সত্য।

।। দুই ।।

ট্রাইব, উপজাতি, ইন্ডিজেনাস ইত্যাদি শব্দ নিয়ে বিতর্ক

ইংরেজী 'ট্রাইব' শব্দটি ভারতের জনগনণায় কি অর্থে ব্রিটিশরা ব্যবহার করেছিলেন সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। ১৮৮১ তে 'ফরেস্ট ট্রাইব' কথাটি দিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯০১ এবং ১৯১১ - র' আদমশুমারিতে এই জনগোষ্ঠীকে animist হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯২১ - এ 'হিল্' কথাটি যুক্ত করে 'হিল্ এ্যাণ্ড ফরেস্ট ট্রাইব' নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ এর লোকগণনায় 'প্রিমিটিভ ট্রাইব' শব্দটি ব্যবহার কার হয়েছিল। ১৯৩৫ - এর ভারত শাসন আইনে 'ব্যাক্ওয়ার্ড ট্রাইব' এবং ১৯৪১ - এর জনগণনায় শুধুমাত্র 'ট্রাইব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবিধানে 'সিলিউলড্ ট্রাইব' শব্দটি স্থান পায়। সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধান সভায় জয়পাল সিংহ 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অন্যদিকে সভাপতি বি. আর আম্বেদকর -এর বক্তব্য ছিল যে, আইনের দৃষ্টিতে 'সিলিউলড্ ট্রাইব' শব্দটি অনেক বেশি বলিষ্ঠ। সংবিধান সভার এই বিতর্ক[৪] নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ।

'ট্রাইব' শব্দের পাশিপাশি 'স্যাভেজ', 'বারবারিক', 'জঙ্গলী' এ্যাবঅরিনিজাল সহ নানা ধরণের অবমাননাকর শব্দ ব্রিটিশ যুগে ব্যবহৃত হত। এর থেকেই শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্দাজ করা যায়। 'ট্রাইব' শব্দটি একটি ঔপনিবেশিক অবদান হলেও ভারতে সরকারিভাবে কিন্তু এই শব্দটির সংজ্ঞা আজও দেওয়া হয়নি। নানা জনে নানা সময়ে 'ট্রাইব'- এর কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে শুধু অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। কিন্তু ঐসব বৈশিষ্ট আবার সকল 'ট্রাইব' - এর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এরই জন্য কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে, তত্ত্বগত ভাবে আজকের পৃথিবীতে 'ট্রাইব' ধারণাটি অচল যদিও রাজনৈতিকভাবে এটিকে ব্যবহার করা হয়।[৫] বিমলা চরণ ল তাঁর 'ট্রাইবস্ ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' (পুনা, ১৯৪৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তথাকথিত

অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত শবর, নিষাদ, কিরাতদের মত তথাকথিত আর্যগোষ্ঠীভুক্ত কুরু বা পাঞ্চাল রাও আজকের অভিধায় 'ট্রাইব' ছিল। কি প্রাচীন কি মধ্যযুগের ভারতে, আজকে যাদের 'ট্রাইব' বলা হয়, সেই ভীল, কোল, মীণা, ভূমিজ, মুণ্ডা, গোন্দ, বিনঝল, চুটিয়া, কাছাড়ী, খাসী চেরো, ত্রিপুরা, ডিমাস বা কোচদের নিজস্ব রাজ্য ও রাজতন্ত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। 'ট্রাইব' চরিত্র নিরূপণের অন্যতম মাপকাঠি হলো অসংযোগ, বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় চারদশক আগে বি. কে. রায়বর্মণ তার 'ব্রিজ এ্যাণ্ড বাফার' মডেল[৬] দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন 'ট্রাইব'- এর অবস্থান নির্ণয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন সীমান্তবর্তী নেফার মিরি জনগোষ্ঠী একদিকে অবর ট্রাইব এবং অন্যদিকে অহম রাজাদের মধ্যে কিভাবে সেতুবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছিল, কিংবা কুকীরা কিভাবে দু'দিকে দুই প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী— একদিকে নাগা এবং অন্যদিকে মণিপুরের মৈতেয়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক 'বাফার' - এর ভূমিকা পালন করেছিল। এ রকম আরও কত উদাহরণ এবং সবই অতীত থেকে।

অশিক্ষা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিরোধিতা ইত্যাদিও 'ট্রাইব' চরিত্র স্থিরীকরণে একটা ভূমিকা পালন করে। ১৯৯১ - এর জনগণনায় দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে ৫২% মানুষ সাক্ষর, সেখানে ট্রাইব্যালদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩০%এও পৌছায়নি। আবার অন্যদিকে সাক্ষরতার প্রশ্নে আর একটি ট্রাইব্যাল রাজ্য মিজোরাম সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী। এক সময়, সমগ্র ট্রাইব্যাল সমাজকে স্থির, অচঞ্চল, গতিহীন হিসাবে চিত্রিত করা হ'ত, কিন্তু এটি যে সর্বত্র সমানভাবে সত্য নয় তা নানাভাবে প্রমাণ করা যায়। সমাজের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনের গতি অব্যাহত তাকে সঠিকভাবে সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারলে এই ইতিহাস রচনার উদ্যোগ সার্থক হতে পারে।

ঔপনিবেশিক লেখকরা প্রথম দিকে 'ট্রাইব' ও 'কাস্ট' বা জাত-পাত বা বর্ণবিভিন্ন ব্যবস্থাকে প্রায় সমপর্যায় ভুক্ত করতেন। ই. থার্স্টনের বিখ্যাত বইটির নাম ছিল 'কাস্ট এ্যান্ড ট্রাইবস্ ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া'। যাই হোক্ পরবর্তী সময়ে তাঁরা ভিন্নরকম মূল্যায়ন করেছেন। আজকের প্রেক্ষিতে এইসব মূল্যায়নের যথার্থতা কতটুকু ছিল তাও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

'ট্রাইব্যাল' শব্দের বাংলা হিসাবে 'উপজাতি' প্রতিশব্দটি চালু আছে। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 'উপজাতি' শব্দটির প্রতি কিছু আপত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঢাকায় ১৯৯৭ - এ জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক - এর রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিরা উপজাতি শব্দটি প্রত্যাখান করেন, কারণ ওই শব্দটি অবমাননাকর। তাঁরা বলেন এই শব্দ আদিবাসীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করে। সরকার বৈষম্যমূলকভাবে শব্দটি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। .....'উপজাতি' যার অর্থ অপূর্ণাঙ্গ জাতি বা উনজাতি অথবা পূর্ণ জাতি হিসাবে যাদের এখানো বিকাশ ঘটে নি। এই ধরণের বৈষম্যের রাজনৈতিক ফলাফল খুবই মারাত্মক। কারণ এর ফলে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি থেকে উন্নততর অবস্থানে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৭] প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সরকারি জরিপে ২৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা জপির অনুযায়ী উপজাতি জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৩। 'উপজাতি' শব্দটি সত্যিই অকীর্তিকর, অমর্যাদা বা অপমানসূচক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে একটা জনগোষ্ঠীর চেতনায় যখন আঘাত এসেছে, তখন বিকল্প শব্দের অনুসন্ধান করলে ক্ষতি কি। উপজাতি ইতিহাস রচনার সময় এই শব্দ চয়নের দিকটির প্রতি আমাদের অবশ্যই সাবধানী হতে হবে।

যে শব্দটির প্রতি ঝোঁক বা আকর্ষণ ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি 'ইন্ডিজেনাস পিউপিল'। মানবাধিকার ইত্যাদির প্রশ্নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মঞ্চে শব্দটি ব্যবহার করে আসছে।

১৯৮৮ তে ক্যাপ্টেন কুক - এর অস্ট্রেলিয়া অভিযানের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, কিংবা ১৯৯২ -

এ কলম্বাস এর আমেরিকা 'আবিষ্কার' এর ৫০০ বছর সম্পূরণ উপলক্ষে পশ্চাত্য দেশে যে জাঁকজমক পূর্ণ উৎসবের আয়োজন চলছিল - সেই সময় 'ইন্ডিজেনাস পিউপিল' এর প্রশ্নটি আবার সামনে আসে। কলম্বাস বা রুকবা এক পক্ষের দৃষ্টিতে দুঃসাহসিক নাবিক হলেও, 'ইন্ডিজেনাস' দের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবতার দুষমণ ছাড়া কিছু নয়। এইসব পূর্তি উৎসবের অর্থ হল 'ইন্ডিজেনাস' দের গণহত্যা করা কিংবা মায়া আজটেক ইনকা সভ্যতাকে ধ্বংস করার কাহিনীকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা মাত্র। তথাকথিত 'আবিষ্কার' এর কাহিনীর দাপটে স্থানীয় আদিবাসীদের কাহিনী ধুলায় — মাটিতে চাপা পড়ে গেছে এই রকম একটা উত্তেজনায় মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘ থেকে ১৯৯৩ সালটাকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস ইয়ার' হিসাবে পালনের ডাক এল 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে দেশীয়, দেশজ, জনজাতি, আদিবাসী, আদি জনজাতি স্বজাতিক ইত্যাদি - সেটি ঠিক নির্ধারিত হয় নি, তবে শব্দটি ঐভাবে অবিকৃত রাখাই কেউ কেউ পছন্দ করেন। যেমন ত্রিপুরায় উপজাতি সংগঠনগুলি নামকরণ ছিল - 'ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ' (আজো ও আছে), 'ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি' ইত্যাদি। কিন্তু ইদানিং বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়ার ঝোক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে 'ইন্ডিজেনাস পিউপিলস্ ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (আই পি এফ টি.) নামে একটি রাজনৈতিক দলেরও জন্ম হয়েছে এবং প্রায় রাতারাতি। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ' (টি টি এ ডি সি) - এর ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু ত্রিপুরাই নয়, অন্যত্র 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি উপজাতি - মননে গভীরভাবে দাগ কেটেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকেও সমর্থন আসছে। একসময় 'ট্রাইব্যাল ওয়ার্ল্ড, কে Fourth world বা 'চতুর্থ ভুবন' বা First Nation বা 'প্রথম জাতি' ইত্যাদি মন ভোলানো নামে চিত্রায়িত করা হত, এখন 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে, কারণ এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। এই 'ইন্ডিজেনাস' শব্দের মধ্যে কি 'ভূমিপুত্র'র বীজ ছদ্মভাবে লুকিয়ে নেই?

ভারতের মাটিতে 'ইন্ডিজেনাস্' তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করার প্রধান অসুবিধে হল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে আদিবাসী - নিধনের যে কাহিনী সত্য, ভারতে তা সত্য নয় তাছাড়া জাতি গঠনের প্রশ্নে ভারতের কাহিনী ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই স্বতন্ত্র। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল, 'টাইম এ্যান্ড স্পেস্' অর্থাৎ সময় এবং স্থান। কে কত পুরুষ কোন্ জায়গায় থাকলে 'ইন্ডিজেনাস্' হতে পারে না? উপজাতি মানেই কি 'ইন্ডিজেনাস্'? এক অঞ্চলের 'ইন্ডিজেনাস্' বলে গণ্য নাও হতে পারে। ত্রিপুরাতে ১৯টি তফসিল ভুক্ত উপজাতির মধ্যে ১১টি গোষ্ঠীই বহিরাগত। শুধু ১১টি কেন, প্রতিটি উপজাতি ইতিহাসেরই প্রথম অধ্যায়ের নাম 'মাইগ্রেশন' বা প্রচরণ বা পরিব্রাজন। একদিকে মাইগ্রেশন, অন্যদিকে 'অবিজিন্যাল ইনহ্যাবিন্ট' - পরস্পর বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী ছাড়াও সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা, লোধা সহ চল্লিশ - বিয়াল্লিটি উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে কে এই রাজ্যে 'ইন্ডিজেনাস্' কে আগন্তুক? - সুতরাং প্রশ্নটি জটিল। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইন্ডিজেনাস পপুলেশন' — এর কাছে ভারত সরকারের বিবৃতটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"It will be appreciated that in an ancient racial melting-pot like India, no sociologist, historian or anthropologist are in a position to say with any degree of certainty that the scheduled tribes are the only indigenous populations Further, there is no certainty as to who displaced whom and which of the races in India are today decendants of the conquered or the Conqueror"[৭]

।। তিন ।।

উপাদান সহ অন্য কিছু প্রশ্ন

উপজাতি বা আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় উপাদানের প্রশ্নটি অনেক সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে। পর্যটকদের বিবরণে বা পুরনো লিখিত উপাদানে মাঝে মাঝে কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যায়। মহাফেজখানাও তেমন সাহায্যে আসে না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই আদিবাসীর সম্পর্কে লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক লেখকদের চোখে, ভাষা যেমন পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদরেখা আনে, তেমনি লেখা বা লিপি অসভ্য ও সভ্যের মধ্যে পৃথকত্ব সূচিত করে। আসলে, অধিকাংশ আদিবাসীর নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু লিপি নেই। তাদের কথা অন্যরা যেভাবে লিখে গেছেন সেইভাবেই তারা এতদিন পরিচিত। এই প্রচলিত পরিচয়কে নতুন এবং ভিন্নভাবে সাজানোর উদ্যোগ ইদানীং উপজাতি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন অতীতে অবমূল্যায়ন হয়েছে, তেমনি আবার বর্তমানে অতিমূল্যায়ন বা 'ট্রাইব্যালিজিম' বা উপজাতিসর্বস্বতা বা সবকিছু গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দুটি পরস্পরবিরোধী এবং বিপরীতমুখী স্রোতের মাঝেদাঁড়িয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আদিবাসী ইতিহাস ছিল, কিন্তু আজও ঠিক লেখা হয় নি। তাদের 'history less' বা ইতিহাসবিহীন বলা মোটেই যথার্থ নয়। লেখা হয়নি বলে ইতিহাস, ছিল না বলার অর্থ তথাকথিত 'আবিষ্কার' হয়নি বলে সেখানে মানুষ ছিল না। মহারাষ্ট্রের ওরলি'দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ডেভিড হার্ডিমান মন্তব্য করেছেন :

"The fact that they practised so many different methods of cultivation, that they are known to have migrated from one area to another, and that they were in some cases a regionally dominant power- all indicate that their history was every bit as full and complex as that of the rulers whose deeds fill medieval ballads and chronicles." [১]

প্রচলিত উপাদানের যখন এতই অভাব, তখন Oral history বা মৌখিক ইতিহাসের শরণাপন্ন আমাদের হতেই হবে। মৌখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটি ইতিহাস পদবাচ্য নয় — এই রকম মন্তব্যের সাথে অনেকে একমত পোষণ করবেন না। উপজাতি জীবন ও সমাজকে দূর থেকে চোখে দেখেই ঔপনিবেশিক যুগে ডাব্লু রবিনসন, জন বাটলার, বি. এইচ. হডসন, এ. ক্যাম্পবেল, ই. টি. ডাল্টন এইচ, এইচ. রিজেলে, জে. এইচ হাটন. জে. সেক্সপীয়র, এন. ই. পেরী. এ. প্লেফেয়ার সহ আরও কত সাহেব তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই আমাদের অনেকের অনেক কিছু ধারণা, অথচ সবই ছিল মৌখিক উপাদান। অন্যদিকে পোলিশ, নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোস্কি-র 'participant observation' মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে ভেরিয়ার এলউইন-এর মত গবেষকরা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়ে গেলেন যাদের জন্য কাজ করেছেন তাদেরই মধ্যে থেকে, তাদেরই একজন হয়ে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উপজাতি প্রশ্নে প্রথমে এলউইন - এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভেরিয়ার এলউইন - এর চিন্তা নিয়ে হয়তো অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কোনও 'শৌখিন মজদুরী' ছিল না, আসলে 'participant observation' মডেলে আরামকেদারা বুদ্ধিজীবীদের স্থান নেই। এই মডেল অনুসরণ করলে এবং উপজাত ভাষা আয়ত্ব করলে শ্রুতি -স্মৃতি থেকে ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান পাওয়া যায়, সেটি লোককথা, লোকসাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ছাড়া সহ কত কি হতে পারে। সাবলটার্ণ বা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতারা নানা কারণে একধারে প্রশংসিত এবং সমালোচিত। সাবলটার্ন ইতিহাসবিদদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না করলেও এটা

স্বীকার করতেই হবে যে, ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান তাঁরা ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে মৌখিক ইতিহাসের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য নিম্নবর্গের এই গবেষকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের প্রশ্নে তেমন আগ্রহ দেখান নি। আমরা অনেক সময় তথ্যের অপ্রতুলতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে থাকি। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা কি যথার্থ যে, ইতিহাস রচনার জন্য আমাদের সব প্রয়োজনীয় তথ্য ঔপনিবেশিক প্রভুরা সাজিয়ে দিয়ে যাবেন ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত আধুনিকোত্তর তিন জন নারীবাদী ঐতিহাসিক। [১০] সম্প্রতি Telling the Truth about History গ্রন্থে মৌখিক ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদানের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই নারীবাদীদের মূল বক্তব্যের সাথে একমত না হলেও তাঁদের নির্দেশিত উপাদানের দিকে নজর দিলে ক্ষতি কি। আসলে, মৌখিক ইতিহাসের মূল কথা সমীক্ষা এবং সেটি সবকিছুর অবশ্য সাথে সাথে আর একটি কথাও বলতে হবে, আজকে আর ভেরিয়ার এলউন-এর সেই যুগ নেই। উপজাতি অঞ্চলে কোনও অ-উপজাতি গবেষকের পক্ষে সমীক্ষা করা, বিশেষত উত্তর পূর্ব ভারতে, খুবই দুরুহ কাজ। অ-উপজাতি মননের এই ভাবনা স্বাধীনোত্তর ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক, যেটি অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে সাঁওতাল - বিদ্রোহের সময়ও দেখা গিয়েছিল। সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এইসব বহিরাগতকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় — যেমন মিজোরামে 'ভাই', মেঘালয়ে 'উধকরা', মণিপুরে 'মায়াং' বোড়ো - ভূমিতে 'হাসা' ইত্যাদি। সুতরাং উপজাতি ইতিহাস রচনার জন্য 'participant obsrvation' মুখে সহজ হলেও কাজে কিন্তু কঠিন। অনেক গবেষক লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। ব্যাক্তিগতভাবে প্রায় চারদশক উত্তরপূর্বাঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও আমি আজও বহিরাগত। অবশ্য এজন্য আমরা চুপচাপ বসে নেই, আমাদের 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্ট্রি এসোসিয়েশনে' (নীহা) বা 'ত্রিপুরা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি' - এর মঞ্চ থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং ইদানীং বহু উপজাতি গবেষক আমাদের অনেক প্রকল্পের শরিক হয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন।

উপজাতি জগৎ এক বিস্ময়ের জগৎ — জীবনে কত ছন্দ ! হয়তো বা শহুরে দৃষ্টিতে সবকিছু উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আজকের 'সভ্য' পৃথিবীতে শুধু পরিবেশবিদই নন, সকলেই এক বাক্যে জুম-চাষকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেন। পাহাড় পুড়িয়ে ছাই এর উপর ফসল ফলাবার এই আদিম পদ্ধতি আজও উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ দেশের কিছু জায়গায় টিকে আছে। জুম আবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত — 'আদি-আরিক', 'টেকংগলু', 'পদু' 'হুকনিসমাং' সহ আরো কত নাম। কিন্তু পাহাড়ে উপজাতি অঞ্চলে গেলেই বোঝা যায় জুম শুধু একটি অর্থনীতিরই নাম নয়, এটি একটি সংস্কৃতিরও নাম। জুম নাচ, জুম গান, জুম বাদ্য থেকে শুরু করে প্রেম, বিবাহ, লোককথা, দেব-দেবী সবই জুম কেন্দ্রিক। উপজাতি সংস্কৃতির ইতিহাসে জুমের আছে এক অনবদ্য ভূমিকা। সহ মর্মিতার সাথে সমগ্র বিষয়টি চিন্তায় না আনলে উপজাতি ইতিহাস রচনার উদ্যোগটাই ব্যর্থ হয়ে যায় আজকের এই জটিল - কঠিন পৃথিবীতে একদিকে উপজাতি জীবনের সারল্য, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং অন্যদিকে আধুনিকতার স্পর্শ, আত্ম পরিচয়ের প্রশ্ন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আওয়াজ, উগ্রপন্থা ইত্যাদি সমাজ জীবনেও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরই জন্য বলছিলাম, উপজাতি জীবনের বৈচিত্র ও প্রাণ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই বিস্ময়ের কথা গ্রীণব্লাট তাঁর 'মারভেলাস্ পসেসান্স্ দ্য ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে অন্য এক প্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে এইরকম মন্তব্য করেছেন "....the experieence of wonder continually reminds us that our grasp of the world is incomplete" ঘুরে ফিরে সেই রবীন্দ্রনাথেরই কথা "বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। আসলে, ইতিহাসই পারে একটা সামগ্রিক ছবি আঁকতে। নৃ-বিদ্যা বা সমাজতত্ত্ব বিদ্যায় উপজাতি জীবন -চর্চা হয়তো আছে, কিন্তু নানা কারণে সেটি সীমাবদ্ধতা এবং কেউ কেউ এইসব বিদ্যাকে 'whiteman's Science' বলে মন্তব্য করেন। বিখ্যাত নৃবিদ্যা বিশারদ টি. এন. মদন স্বীকার করেছেন যে, ইতিহাসের উপর নির্ভর না করে প্রকৃতি ও জীব বিজ্ঞানের

উপর প্রথমদিকে নির্ভর করে তিনি ভুল করেছিলেন এবং সেটি তিনি পরে উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তাঁর ভাষায় "....... found social history and literature richer sources of inspiration in my anthropological work than the natural or biological science."[১২]

ভারত ইতিহাসে এই জনগোষ্ঠী, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় - এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৩ জন' নামেই পরিচিত ছিল এবং প্রথমদিকে নদীরপাড়ে ও সতমলেই স্থানান্তর শুরু হয়। ক্রমে সময়ের সাথে সাথে ঐতিহাসিক নানা কারণে এদের স্থানান্তর শুরু হয় এবং বনে জঙ্গলে, দূরে পাহাড়ে এবং সীমান্তে অর্থাৎ 'আটবিক রাজ্য', মহাকাণ্ডার' বা 'প্রত্যন্তদেশ' অঞ্চলে এই 'জন'রা তাদের বাসভূমি তৈরী করে। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যযুগে 'হীন-জানি', কিংবা সমাজতত্ত্ববিদ জি. এস ঘুড়ী'র ভাষায় 'backward Hindus', অর্থাৎ হিন্দু সমাজের আঙ্গিনায় হয়তো বা তারা ছিল যদিও তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। নিজেদের আলাদা পরিচিতি এই আদিবাসীরা যুগে যুগে রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ শাসকরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। ইসলাম যেহেতু মূলত নগর কেন্দ্রিক, এজন্য মধ্যযুগেও নবাব বাদশাহ'রা এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন। 'frictionless', কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য সর্বত্র প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এই জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কও ভিন্ন রূপ নেয়। প্রাক্ - গান্ধী যুগের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রশ্নে কোন আগ্রহ দেখায়নি, ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। আজকের উপজাতি পরিচয় সত্তা, উপজাতি উত্তেজনা বিচ্ছিন্নবাদী চিন্তা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটটি আমাদের মনে রাখতেই হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নানা প্রশ্ন নিয়ে জাতীয় আলোচনা - চক্র স্বাধীন ভারতে প্রথম এই কলকাতা শহরেই হয়েছিল ১৯৬৬ (৩-৬ ডিসেম্বর) এবং রথীন মিত্র ও বরুণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত একটি বই ও প্রকাশিত হয়েছিল (A Common perspecitive for North-East India) ১৯৬৭ সালে। গবেষকদের কাছ থেকে স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রত্যাশা বিরাট।

(পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ এর অষ্টাদশ সম্মেলনে আধুনিক ভারত ইতিহাস বিভাগের সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশ)

সূত্র নির্দেশ ঃ-

১. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, ট্রাইব্যাল, ট্রান্সফরমেশন ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড, নতুন দিল্লী, ১৯৯২, পৃ viii- x

২. এন. কে বসু, ট্রাইব্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া, এন. বি. টি., নতুন দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ৪-৫।

৩. "The transition from primitiveness to modernity in India is often abrupt and generally ungraded"– Moonis Raza et. al "Tribal population", Occasional paper No. 5 1977, Centre for the Study of Regional Development, JNU, New Delhi.

৪. (ক) এইচ. এস. সাক্সেনা, সেফ্‌গার্ডস্ ফর সিডিউলড্ কাস্টস্ এ্যাণ্ড ট্রাইবস্ — এ্যান এক্সপ্লোরেশন অব দ্য কন্‌স্টিটিউন্ট এ্যাসেম্বলী ডিবেটস্, উপ্পল পাবলিশিং হাউস, নতুন দিল্লী ১৯৮১।

(খ) কনস্টিটিউন্ট এ্যাসেম্বলী, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ৭ম খণ্ড, ১৯৪৯।

৫. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, তদেব, পৃঃ ৫৩।

৬. বি. কে রায়বর্মণ, 'স্ট্রাক্‌চার অব ব্রিজ এ্যান্ড বাফার কমিউনিটিস্ ইন দ্য বর্ডার এরিয়াস্ ম্যান ইন ইন্ডিয়া ৪৬ খণ্ড, সংখ্যা ২, ১৯৬৬, পৃঃ ১০৩-০৭।

৭. ফিলিপ গাইন সম্পাদিত, 'রিপোর্ট জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক, ডিসেম্বর ১৮-২০,১৯৯৭, ঢাকা, পৃঃ - ৪-৫।

৮. সি. এল. ইমচেন, 'দ্য ইনডিজেনাস আদার ইন ইন্ডিয়া', এম. কে রাহা ও এ. কে. ঘোষ সম্পাদিত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, দ্য ইউম্যান ইন্টারফেস্ জ্ঞান পাবলিসিং, নতুন দিল্লী ১৯৯৮ পৃঃ ২০৩ -০৪।

৯. উদ্ধৃতি 'ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' মুম্বাই, ৩৫ খণ্ড, ১৮ নং, ২৯ এপ্রিল ৫মে ২০০০, পৃঃ ১৫২৩।

১০. জয়েস এ্যাপেলবি, লিন হান্ট, মার্গারেট জ্যাকব, টেলিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট হিস্ট্রি, নিউইয়র্ক, ১৯৯৪।

১১. এস. গ্রীনব্যাট, মারভেলাস্ পসেসান্স্ দ্য ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড, চিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, চিকাগো ১৯৯১ পৃঃ ২৫।

১২. মীণাক্ষী থাপার সম্পাদিত, এ্যানথ্রোপলজিক্যাল জর্নিস ঃ রিফ্লেকসনস্ অন ফিল্ড ওয়ার্ক, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নতুন দিল্লী ১৯৯৮, পৃঃ ১৫৯-৬০।

১৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রারম্ভিক ভাষণ, কে. এস. সিং সম্পাদিত, দ্য ট্রাইব্যাল সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৮৬ , পৃঃ ৩-২৪।

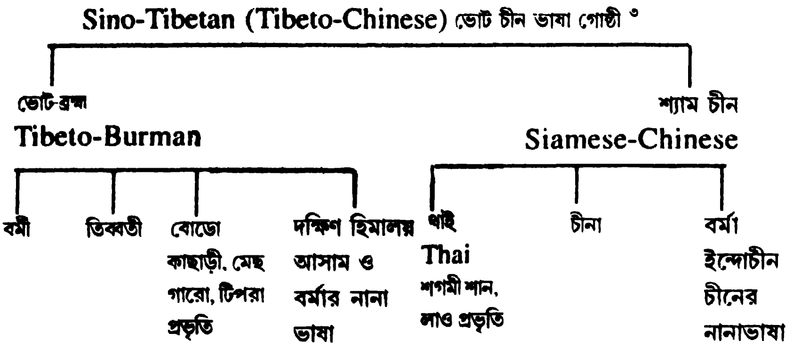
ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা ঃ রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বিচার

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী

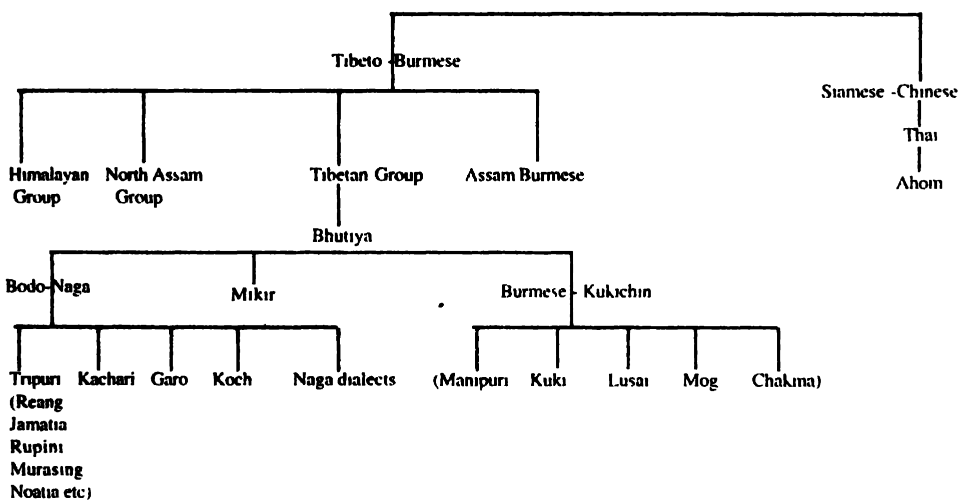
ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাগুলোর পারস্পরিক রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বিচারের আগে কিছু প্রাক্ কথন এসেই যায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গল প্রজাতির তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগুলো সম্পর্কে দুনিয়ার ভাষাবেত্তাদের অনন্ত কৌতূহলের জোয়ার এখনো বিদ্যমান। সেই কৌতূহলের ভাঁটা নেই; কেমন যেন এক ক্ষুধিত পাষাণ সুলভ আকর্ষণ ভাষাবিদ্‌দের এই সম্মোহিত গিরিকন্দরে টেনে নিয়ে আসে ভাষা গবেষণার আবেগময়তায়। তাই তিব্বত - বর্মীয় ভাষা- ভূগোলের এই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত ভাষাগবেষক H. A Gleason, মোহাবিষ্ট হয়ে বলছেন ঃ This area is linguistically one of the most diversified in the world, and it is, as yet, very difficult at get a clear picture of the interrelationship of the numerous languages and dialects, Garo, Bodo, the Naga languages, and the Kuki-Chin language belong to this branch.[১]

গ্লীসন সাহেবের এই মন্তব্য মোহমুগ্ধভাবে আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে অনাদি কালের কিরাত ভাষাভূমিতে গবেষণার কাজে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ওই একই মোহে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গল প্রজাতির লোকদের সমাজ সংস্কৃতির অমর গাথা লিখে গেছেন তাঁর কিরাত জন কৃতি পুস্তকে। তিনিই আবার কিরাত-প্রজাতিদের বোড়ো গোষ্ঠীর হিমালয়ের পাদদেশে ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অরণ্যভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আগমন ও বসতি স্থাপনের বার্তা দিয়েছেন এইভাবে ঃ The Bodo section of the Tibeto - Burman branch of the Tibeto - Chinese people (Bodo, Mec, kachari Rabha, Garo, Tripura) came to Assam and East Bengal, and were spread all over East and North Bengal, The time of the Tibeto - Burman incursion and settlement in Assam and East Bengal is not known, but it could not have been long before the begining of the Christiain era, at the earliest".[২]

এই যে তিব্বত বর্মীয় উপ-ভাষাবংশের বোডো শাখার ভাষাগুলো যীশুখৃষ্টের জন্মের কিছু আগে শাখা-প্রশাখার পেখম বিস্তার করে কিরাতভূমিতে আশ্রয় নিলো, এখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটা বংশপীঠিকা মারফত জানতে পারলে পাঠকদের সুবিধে হয়। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার সে কাজটাও করে দিয়েছেন আমাদেরকে ভোট-চীন-ভাষা- গোষ্ঠীর উৎসে গিয়ে। আর, সেটি হলো এমনই ঃ



ভাষাচার্যকৃত ভোট চীনীয় ভাষা বংশের অঙ্কুরিত ভাষাগুলোর যে বংশপীঠিকা আমরা পাচ্ছি, তার সঙ্গে যদি আমরা বিশিষ্ট ভাষাবিদ C.R. Goswami কৃত ভোট চীনীয় ভাষা বংশের বংশপীঠিকার তুলনামূলক আলোচনা করি, তাহলে আমরা আরো কিছু সমৃদ্ধ তথ্য পেতে পারি এইভাবে ঃ [৪]



সি. আর. গোস্বামী কৃত চীন-তিব্বতীয় ভাষাবংশ পীঠিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি বোডো শাখার সঙ্গে নাগা ভাষার শাখাযুক্ত হয়ে বোড়ো -নাগা শাখা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সুনীতি বাবু ভোট চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর যে বংশপীঠিকা প্রণয়ন করেছেন, সেখানে নাগা শাখার উল্লেখ নেই। অথচ বোডো শাখার ভাষাগুলোর সঙ্গে নাগা শাখার ভাষাগুলোর পারস্পরিক অনেক মিল আমাদের চোখে পড়ে। আমি ককবরকের সঙ্গে চাঙনাগা, আঙ্গামী ও ছেমা নাগা ভাষার অনেক শব্দ সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি।

এখন আসছে বোডো বা বোডো নাগা শাখার সহোদরা ভাষাগুলোর প্রসঙ্গ। আসলে এই শাখার ভাষার সংখ্যা কত, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ সম্পর্কে স্যর গ্রীয়ার্সন তাঁর সম্পাদিত মহাগ্রন্থ Lingusistic

Survey of India - যাতে বলেছেন : The Bara group, Then Comprises the language Spoken by the Bara-fisa (i e the Mech and Kacharis) and the cognate languages spoken by the other tribes shown in the following table

True Bara (Kachari and Mech)

Rabha

Lalung

Dima-Sa (Hills Kachari)

Garo (or Mande)

Tripura

Chutiya-to this list must be added one more name, Moran this was the language of a tribe now completely Hinduised living in Sibsagar and lakhimpur[৭]

গ্রীয়াসন সাহেবের তথ্য থেকে তাহলে আমরা দুটো বিপরীত ধারার মন্তব্য পাচ্ছি। তিনি বোড়ো (Bodo/Bara-fisa), কাছাড়ী ও মেচ ভাষাকে সত্যিকারের বোড়ো শাখার ভাষা বলছেন এবং রাভা, লালুঙ, দিমাছা, গারো, তিপ্রা (ত্রিপুরী), চুতিয়া ও মোরান ভাষাকে বোড়ো শাখার সহোদরা ভাষা বলেছেন। তাহলে কি আমরা বোড়ো শাখা ও তার সহোদরা শাখা এমন দু ভাগে বৃহত্তর বোড়ো শাখাকে ভাগ করতে পারি?

এখন আবার আমরা শরণাপন্ন হই ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের। তিনি বোড়ো শাখা বলতে বোঝাচ্ছেন "Dialects of the Bodo Group Bodo (Bara) or Kachari (also Known as koc, Mec and Rabha, Garo and Dimasa, as well as Mrung or Tripura" [৮] এই ভাষাগুলোকে। অর্থাৎ তাঁর মতে বোড়ো শাখার সহোদরা ভাষাগুলো হলো : বোড়ো (বরা), কাছাড়ী, কোচ, মেচ, গারো, দিমাছা, মুরুঙ বা তিপ্রা (ত্রিপুরী অধুনা ককবরক)।

এবার যদি আমরা এই দু' পণ্ডিতের তিব্বত-বর্মীয় উপ-ভাষাবংশের বোড়ো শাখার সহোদরা ভাষাগুলো মিলাই, তাহলে দেখবো সুনীতি বাবুর তালিকায় লালুঙ, চুতিয়া ও মোরান— বোড়ো শাখার এই তিনটি সহোদরা ভাষা স্থান পায়নি— যেগুলো বিদ্যমান আছে গ্রীয়ার্সন সাহেবের তালিকায়। আশ্চর্যের বিষয়, দুই ভাষাচার্যের তালিকায় বোড়ো শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহোদরা ভাষা 'হাজঙ' স্থান পায়নি কেন? তাহলে কী তাঁদের কাছে 'হাজঙ' তিব্বত বর্মীয় উপ ভাষাবংশের কোনো স্বতন্ত্র শাখার ভাষা? বিষয়টি গবেষণা সাপেক্ষ।

এই সময় বোড়ো শাখার 'গারো' ভাষা সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। আর, সেটি হলো সত্যিকারের বোড়ো শাখার সহোদরা ভাষাগুলোর সঙ্গে 'গারো' ভাষার সম্পর্ক একটু দূরবর্তী বলে আমার মনে হয়, বোড়ো ভাষার একটি প্রাচীন রূপ ছিলো, যাকে আমরা প্রত্ন বোড়ো বলতে পারি এবং এই 'প্রত্ন-বোড়ো' ও 'গারো' দুই সহোদরা ভাষা। ককবরক ভাষার সঙ্গে গারো ভাষার সম্পর্ক যে বেশ দূরবর্তী তার উল্লেখ করেছেন আমার পূজনীয় অধ্যাপক ড: সুহাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ',[৯] পুস্তকে। কাজেই, গারো ভাষাকে ককবরকও তার অন্যান্য সহোদরা ভাষাগুলোর সঙ্গে এক পঙক্তিতে স্থান দেওয়া কতটা সমীচীন, তা গবেষণার বিষয়।

তাহলে এখন আমাদের ককবরক ও তার সহোদরা ভাষাসমূহের একটি সারণি দেওয়া যেতে পারে। আমার নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে তা দেওয়া গেলো নিম্নভাবে :

প্রত্ন-বোডো

বোডো (আধুনিক)	দিমাছা	কোচ	মেচ	চুতিয়া	রাভা	লালুঙ	মোরান	হাজঙ	ককবরক (ত্রিপুরী)

এবং দূরবর্তী সহোদরা ভাষা 'গারো'।

দুই

এখন আমাদের ককবরক ও তার সহোদারা ভাষাসমূহের রূপতাত্ত্বিক (Morphological) সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে । কোনো ভাষার রূপতত্ত্ব (Morphology) বলতে বোঝায় সেই ভাষার শব্দ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, বাক্য ও বাক্যগত বিভিন্ন প্রকারের পদ (Sentence, Parts of Speech) অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অব্যয়; কাল, সমাস, শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিন্যাস (Semantic classification of words) অনুসর্গ, সংখ্যাবাচক শব্দ বা বিশেষণ (Numerals & classifiers) ইত্যাদি। কাজেই আমার মতো আদার ব্যাপারী গবেষকের পক্ষে রূপতত্ত্বের সব দিক আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ককবরকের সহোদরা ভাষাগুলোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও এখনোপর্যন্ত খুঁটিনাটি ভাবে হয়নি। গ্রীয়ার্সন, এন্ডারসন, হান্টার, ... এন্ডেল প্রমুখ তিব্বত বর্মীয় ভাষার গবেষক বোডো শাখার সহোদরা ভাষা গুলোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশদভাবে করে যান নি। আধুনিক গবেষকরা সে-কাজে হাত দিলেও খুব বেশি দূর এগোতে পারছেন না ভাষাগবেষণার নানান আঙ্গিকের ওপর বিশেষ দখল না থাকায়। আর আমিও বোধহয় ওই একই পথের পথিক। তাই আমি রূপতত্ত্বের সর্বদিকে না গিয়ে বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করবো। যাতে করে পাঠকবর্গ ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য কিছুটা বুঝতে পারেন। আবার সব সহোদরা ভাষাগুলোর Common feature নাও পাওয়া যেতে পারে। আমি এ ক্ষেত্রে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেবের Lingnistic survey of India 'য় বর্ণিত বোডো শাখার ভাষাগুলোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে প্রামাণ্য রূপ ধরে নিয়ে ককবরক ভাষার সঙ্গে মেলাতে সচেষ্ট হবো এবং যতদূর সম্ভব আলাদা করে ককবরকও তার সহোদরা ভাষা সমূহের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করবো। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি বিশদ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো ককবরক ও তার নিকটতর সহোদরা ভাষা বোডোর মধ্যে। তাও আবার রূপতত্ত্বের সব দিক নিয়ে আলোচনা করা এ যাত্রায় হবে না। আর কেবল মাত্র ককবরকের সঙ্গে সহোদরা মোরান ভাষার শব্দ সাদৃশ্য দেখাবো।

ককবরক ও বোডো [১]

এক ঃ প্রাণিবাচক বিশেষ্য

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
বরক	মানছি	মানুষ
মুছুক	মছৌ	গোরু
চিবুক	জিবৌ	সাপ
মুফুক	মফৌ	গোসাপ

মূছা	ম’ছা	বাঘ
মূখুরা	ম’খ্রা	বানর
মূছুই	মৈ	হরিণ
আ	না	মাছ
তক	দাও	পাখি
তকলা	দাওলা	বড়মোরগ
তকথু	দাওথু	ঘুঘুপাখি
মান্দার	মান্দাপ	কাঠবিড়ালী
করাই	গরাই	ঘোড়া
মায়ূঙ	মৈদের	হাতি
ছুইমা	চৈমা	মাদি কুকুর

দুই ঃ বস্তুবাক বিশেষ্য ঃ

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
নবার	বার	বাতাস
হাচুক	হাজ’	পাহাড়
রুঙ	দুরুঙ	নৌকো
নুখুঙ	উকুম	ঘরের ছাঁদ
তুইখর	দুইকর	কুয়া, কূপ
খি	খি	মল, গু
মাইরুঙ	মাইরঙ	চাউল
খুতুঙ	খুদুই	সুতো
বুখা	বিখা	হৃদয়

তিন ঃ বিশেষণ পদ ঃ

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
কুতুঙ	গুদুঙ	গরম
কুফুঙ	গুফুঙ	মোটা
কহই	গহই	কৃষ

কেরাম	গাহাম	শীর্ণ
কৃখুই	গখুই	টক,অম্ল
কৃথাঙ	গৃথাঙ	কাঁচা
কৃতাল	গুদান	নতুন
কুচুক	গূজৌ	উঁচু
কাহাম	গাহাম	ভালো
কুমুন	গুমুন	পাকা

চার ঃ সর্বনাম ঃ

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
আঙ	আঙ	আমি
ব	বি	সে
নুঙ	ন'ঙ	তুমি
চুঙ	জঙ(জঙ-চুর)	আমরা
নরগ	ন'ঙ চুর	তোমরা
বরগ	বি চুর	তাহারা
আনি	**আঙনি**	আমার
নিনি	ন'ঙনি	তোমার
চিনি	**জ'ঙনি**	আমাদের
নরগনি	নঙ-চুরনি	তোমাদের
বরগনি	বি-চুরনি	তাদের

পাঁচ ঃ ক্রিয়াপদ (মূল ধাতু) ঃ

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
চা	জা	[illegible]
চুম	জুম	গায়ে জড়ানো
চুঙ	জুঙ	আপনা থেকে জ্বলা
কুমা	গুমা	হারানো
কাই	গাই	পোতা,রোপন করা
কাছা	গ'জাও	উপরে ওঠা

কাপ	গাব	কাঁদা
ক্রা	গা	উঠা
ফাই	ফাই/ফই	আসা
থাঙ	থাঙ/তাঙ	যাওযা
পাই	বাই	কেনা
থূই	থৈ	মবা
নুক	মন	পাকা
ফাল	ফান	বিক্রয করা
কাঙ	গাঙ	পিপাসা পাওয়া
তঙ	দঙ	থাকা
পাপ	বাপ	লবণাক্ত হওযা
বাম	বাম	কোলে করা

ছয ঃ সংখ্যাবাচক শব্দ ঃ

ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ ঃ
ছা	চে	এক
নূই	নৈ/নে	দুই
থাম	থাম	তিন
বৃব্রাই	ব্রৈই/ব্রূই	চাব
বা	বা	পাঁচ
দক	দ	ছয
ছিনি	ছিনি	সাত
চাব	জাত (Zat)	আট
চুকু	স্কো (Skho)	নয
চি	[illegible]	দশ

সাত ঃ কাবক বিভক্তি ঃ

বিভক্তি	ককবরক চিহ্ন (termination)	বোডোতে চিহ্ন বাঙলা অর্থ
প্রথমা	শূন্য চিহ্ন	আ,য়া,য়, বা, অ (?) ---
দ্বিতীয়া	ন	খো (Kho) খৌ(Khau)বে
তৃতীয়া	বাই	জঙ (zang) দ্বারা, দিয়ে

চতুর্থী	ন	নু (nu) কে
পঞ্চমী	নি/ছাই/ছুলাই	নি-ফ্রাই(ni-frai) থেকে, হইতে
ষষ্ঠী	নি	নি/হা (ni/ha) র /এর
সপ্তমী	অ/থানি	নি-আউ (ni-ai/au) অ/তে

এখন ফলিতবাবে মনুষ্য বাচক ককবরক 'বরক' (মানুষ) এবং বোডো 'মানছুই' (মানুষ) কারক বিভক্তির চিহ্ন সহোযোগে তুলনামূলকভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ

	ককবরক	বোডো	বাঙলা অর্থ
প্রথমা	বরক	মানছুই	মানুষ
দ্বিতীয়া	বরক-ন	মানছুই-খো	মানুষকে
তৃতীয়া	বরক-বাই	মানছুই-জঙ	মানুষ
চতুর্থী	বরক-ন	মানছুই-নু	মানুষকে
পঞ্চমী	বরক-নি বরকনি-ছাই	মানছুই-নিফ্রাই	মানুষকে
ষষ্ঠী	বরক-নি বরকনি-ছাই	মানছুই-নিফ্রাই	মানুষকে
সপ্তমী	বরক-অ/বরক-থানি	মানছুই-নি আউ/মানছুই-আউ	মনুষ্যতে

আট ঃ ককবরক এ বোডো ভাষায় কালের ব্যবহার ঃ

ককবরক ভাষায় কাল (tense)- এর ব্যবহার বেশ জটিল। অনেকসময় বর্তমান কাল ও অতীত কালের মধ্যে পার্থক্য করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। অনেক সময় বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার সমার্থক হয়ে যায়। কালের ব্যবহারে এমন অসঙ্গতি থাকলে ভাষাবিদেরা ধরে নেন যে কালগুলোর পৃথক-করণের প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এমন অবস্থায় (tense) কে (tense)- না বলে ভাষাবিজ্ঞানে 'aspect ও tense বলা হয়। এই ভাষায় কালের ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক হতে এখনও অনেক কাল লাগবে। ককবরকের কালের ব্যবহারের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'personal termination' এ পার্থক্য নেই আর্য শাখার ভারতীয় ভাষাগুলোর মতো অর্থাৎ সব পুরুষে আলাদা আলাদা কালবাচক চিহ্ন (tense indicator) নেই ককবরকে। এই ভাষায় কালের ব্যবহারে সব পুরুষেই একই কালবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । যেমন ঃ

বাঙলা	ককবরক
আমি খা-ই	আঙ চা-অ
তুমি খা-ও	নুঙ চা-অ
সে খা-য়	ব চা-অ

দেখা যাচ্ছে বাঙলা 'খা' (খাওয়া) ক্রিয়ার পরে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের প্রত্যয় .... ব্যবহৃত হচ্ছে যথাক্রমেই, ও এবং য়। অন্যদিকে ককবরকরে ক্ষেত্রে উত্তম-মধ্যম - প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে 'চা' (খাওয়া) ক্রিয়াপদের পরে একই 'অ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ্রিয়ার্সন সাহেব 'Bara, Standard' - এর কালবিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে ক্রিয়ার কালবাচক প্রত্যয়

(tense indicator) গুলো আলাদা আলাদা ভাবে না দেখিয়ে বাক্যের মধ্যে তার ব্যবহার দেখিয়েছেন। কালবাচক প্রত্যয় গুলোর ব্যবহার স্বাধীন ভাবে দেখালে আমাদের মতো অপর ব্যাপারী গবেষকদের পক্ষে সুবিধেই হতো। এখন 'ককবরক' ও 'বোড়ো' ভাষার কালবাচক চিহ্নগুলো দেখানো যাক পাশাপাশি রেখে ঃ

ককবরক	বোড়ো
বর্তমানকাল অ(উপভাষাগত পার্থক্য ও আছে)	উ (u)
অতীতকাল খা (Phonetic environment) এর জন্যে 'কা' ও হয়)	বাই
ভবিষ্যৎ কাল আনু/গানু (উপভাষাগত পার্থক্য ও আছে)	গান

এখন ফলিতভাবে উভয় ভাষার কালবাচক চিহ্নগুলোর প্রয়োগ দেখানো যাক। ককবরক ভাষায় দেখা হলো 'নুক' এবং বোড়ো ভাষায় 'নু'। এখন 'নুক' ও 'নু' এর সঙ্গে কালবাচক প্রত্যয়গুলো যুক্ত করলে এমনটি হবে

ককবরক	বোড়ো	বাঙলা অর্থ
আঙ নুক-অ (আঙ নুগ')	আঙ নু-উ	আমি দেখি
আঙ নুক-খা	আঙ নু-বাই	আমি দেখেছিলাম
আঙ নুক-আনু/গানু	আঙ নু-গান	আমি দেখবো

এখন আমি গ্রীয়ার্সন সাহেব বোড়ো (Bara, Standared) ভাষার কালবাচক বিষয়টি এবং তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের কালসূচক ব্যবহার সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে তার নিজের ভাষায় তুলে ধরছি * ঃ

"As in other Bodo languages, verbs don't change for number or person, both on which are indicated by the subject. The only sign of inflexion is that the letter is inserted between a root ending in a vowel and a Termination commencing with one. Thus, thang-U, go but nu-i-u, See, present tense. The following is the formation of hte various tenses :-

Present ang nu-i-u, I see, first person also ang nuni.

Pres det ..... dang, I am Seeing

Imperfect " " dang man, I was Seeing

Past " " bai, I saw

Pluperf " " nai, or nu-dang -man I have Seen I saw a long time ago. Sometimes naise is used. As nu-nai se, I see narrative). Se is the same as sui. lower down, and has a completive force.

Future " " gan, I shall see

Future immediate " " si gan or nu-nu-sui, I shall see soon Imperative " " See nu-thang, let him see.

Sobjunctive " " nu-ba or nu-bia, If I see or had seen Infinitive. nu-nu, to see.

. Participles, nu-ni seeing nu-na-sui, having seen (termination sometines n-ai-nui, as lai-nai-nui, having come. Nui is sometimes written noi, as in the first specimen)

Nu-nai, seen

Nu-ni, while seeing

Agent. Nu-gna or nu-nai, a seen.

পণ্ডিত প্রবর গ্রীয়ার্সন সাহেব বোড়ো ভাষার কালের যে ব্যবহার দেখিয়েছেন, ককবরক ভাষার সঙ্গে তার

অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। তবু আমি তারপর তাঁর কালের ব্যবহারের সঙ্গে ... সীমিত বিদ্যায় ককবরকের সঙ্গে তার তুলনা করবো ঃ-

প্রথমে একটি জিনিষ চোখে পড়ছে, গ্রীয়ার্সন সাহেব ক্রিয়া ও কালসূচক প্রত্যয়ের মাঝখানে - এই অব্যয় সদৃশ যে ক্ষুদ্র অংশ (Particle) টি ব্যবহার করেছেন। তার ব্যবহার ককবরকের Present tense ও আছে তবে বর্তমানেকালের কালসূচক অ - প্রত্যয়ের সঙ্গে আগে ও মূল ক্রিয়াপদের পরে এটি (i) ব্যবহার করলে বাক্যের অর্থ কিছুটা পাল্টে যায়। কিন্তু তিনি এই ব্যবহারে সেই পার্থক্য দেখান নি। আমার মতো অতি নিম্নমানের ভাষাগবেষকের মনে হয়েছে অব্যয় সদৃশ - এর ব্যাপারে বাক্যের অর্থের যে পার্থক্য হয়, তা গ্রীয়ার্সন সাহেব ঠিকমতো ধরতে পারে নি (পাঠক, গ্রীয়ার্সন সাহেবের ভুল ধরার ধৃষ্ঠতা আমার নেই, তাঁর চরণে আমার শতকোটি প্রণাম)

Present tense আলোচনা করতে গিতে তিনি লিখেছেন ang nu-i-u, I see আসলে এটির অর্থ হবে আমি গিয়ে দেখি। আর আমি দেখি বোড়ো ভাষায় হবে, ang nu-u। কারণ U হলো বর্তমানকাল নির্দেশক প্রত্যয়। আর nu এবং U এর মাঝখানে - এই particle টি এলে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় আমি গিয়ে দেখি। ককবরক ভাষায়ও এই এর ব্যবহার আছে এবং তা ক্রিয়ার কালের স্থানান্তরিত অবস্থা বোঝায়। যেমন ঃ

বর্তমান কাল ঃ আঙ চা-অ আমি খাই

" ঃ আঙ চা-ই অ আমি গিয়ে খাই

অতীতকাল ঃ আঙ চা-খা আমি খেয়েছিলাম

" ঃ ব চা-ই-খা সে গিয়ে খেয়েছিলো

অনুজ্ঞাবোধক ঃ নুঙ মাই চা-ই-দি তুমি গিয়ে ভাত খাও

এবার গ্রীয়ার্সনকৃত বোড়ো ভাষার অন্যান্য tense এর সঙ্গে ককবরক ভাষায় tense এর সাদৃশ্য দেখা যাক ঃ

Present def বলতে গ্রীয়ার্সন যা বুঝিয়েছেন আসলে ককবরকে তা হলো Present Continious tense। যেমন

ককবরক	বোড়ো	বাঙলা অর্থ
আঙ নুগুই (নুক -উই) তঙগ (তঙ-অ)	আঙনু-দঙ (ang-nu-dang)	আমি দেখছি।

ককবরক তঙ বোড়োতে হয়েছে দঙ। এই তঙ-বা-দঙ ঘটমান বর্তমান কালের চিহ্ন।

Past tense : ককবরকে Past tense indicator হলো খা আথবা -কা। অন্যদিকে বোড়োতে বাই (bai) ইতিপূর্বে এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

Future tense : Future tense এ বোড়োতে গ্রীয়ার্সন সাহেব কালসূচক শুধুমাত্র গান (gan) এই প্রত্যয়টি পেয়েছেন। ককবরকে gan সদৃশ 'আনু' ছাড়াও 'নাই' বলে ভবিষ্যৎ কালসূচক একটি প্রত্যয় আছে

যেমন ঃ আঙন থু আনু অথবা আঙ থু-নাই —আমি শোবো।

Future immediate : গ্রীয়ার্সন সাহেব বোড়ো ভাষার Future immediate বলে একটি tense এর সন্ধান পেয়েছেন। অথবা বলা ভালো, ক্রিয়ার গতি বিশ্লেষণ করে তিনি এমনতর নামকরণ করেছেন। এবং তিনি বোড়ো ভাষায় তার উদাহরণ দিয়েছেন, ang nu-si-gan or nu-nu-sui, I shallsee soon আমরা যদি immediate future tense এক ধাবমান ভবিষ্যৎ কাল বলি এবং ক্রিয়ার সেই গতির নৈকট্য বোঝাতে 'শীঘ্র' এই ক্রিয়ার বিশেষণ পদটি ব্যবহার করি তাহলে ককবরকের ক্ষেত্রে তা হবে ছুক অথবা চক আর বোড়োতে

হবে ছি (Si) অথবা ছুই (Sui)। গ্রীয়ার্সন সাহেব বোড়ো ভাষায় Future immediate tense এর উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

ang nu-si-gadn অথবা ang nu-nu-sui - I shall see soon ককবরক ভাষায় তাহলে আঙ নুক ছক আন্ (আঙ নুক ছগান্) আমি শীঘ্র দেখবো।

ককবরক ভাষায় ছক - এই adverbial suffix টি কখনও কখনও ধ্বনি পরিবর্তনের কারণের জন্যে চক এ রূপান্তরিত হয়ে যায়, যেমন ঃ

চা চক দি — খেতে শুরু কর। এবং

হিন চক দি — হাঁটতে শুরু কর

Imperative অনুজ্ঞাবোধক বা imperative এর উদাহরণ গ্রিয়ার্সন সাহেব দিয়েছেন এই ভাবে ঃ anu nu, see, nu-thang, let him see এক্ষেত্রে বোড়ো ভাষার সঙ্গে ককবরকের বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রিয়ার্সন nu-thang অর্থ বলছে .. দেখুক। তিনি বাক্যের প্রথমে কর্তা সে'র ব্যবহার করেন নি। বোড়োতে সে বা প্রতিশব্দ বি। কাজেই বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হলে লিখতে হবে বি নু থাঙ (Bi-nu-thang) সে দেখুক বা তিনি দেখুন। আর ককবরক ভাষায় এটি হবে, ব নুক থুন (Bo-nuk-thwn) – সে দেখুক বা তিনি দেখুন। ককবরক ও বোড়োতে বাক্য দুটি পাশাপাশি রাখলে এমন দেখায়।

ককবরক ঃ ব নুক থুন — সে দেখুক।

বোড়ো ঃ বি নু থাঙ — সে দেখুক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বোড়ো ভাষায় প্রথম পুরুষে অনুজ্ঞা বোধক প্রত্যয় হলো 'থাঙ' এবং ককবরকে 'থুন'।

এখানে একটা কথা থেকে যাচ্ছে, বোড়ো ভাষায় মধ্যম পুরুষে অনুজ্ঞাসূচক প্রত্যয় কি তা গ্রীয়ার্সন দেখান নি। ককবরক ভাষায় এই প্রত্যয়টি হলো দি। যেমন নুঙ থাঙ-দি —তুমি যাও আপনি যান।

Subjunctive ঃ গ্রীয়ার্সন বোড়োভাষায় Subjunctive বা সংযোজক ক্রিয়া তার প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখিয়েছেন এই ভাবে ঃ

ang nu -ba or bia, if I see or had seen ককবরক ভাষার সঙ্গে বোড়ো ভাষার সংযোজ ক্রিয়ার উদাহরণ পাশাপাশি রাখলে এমনটি দেখায় ঃ

ককবরক ঃ আঙ নুক -ব্লা -- আমি দেখি তো।

বোড়ো ঃ আঙনু -ব্লা —যদি আমি দেখি বা দেখে থাকতাম।

কিন্তু এক্ষেত্রে বোড়ো ভাষা ও ককবরকের মধ্যে অর্থের তারতম্য ঘটেছে। ককবরক ভাষায় 'ব্লা' সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'তো' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব থাঙ - ব্লা - সে যায় তো।

নুঙ চাখা ব্লা —তুমি খেয়েছো তো।

আঙ হামজাক - ব্লা —আমি ভালোবাসি তো।

Infinitive ঃ সাধারণতঃ পুরুষ বা বচন ব্যতিরেকে ক্রিয়া ভাব প্রকাশক প্রত্যয়কে infinitne বলা হয়। যেমন খেতে to eat যেতে to go করতে to do ইত্যাদি। ককবরক ভাষায় infinitive আছে দুটি না এবং নানি। যেমন চা -না অথবা চা-নানি —খেতে, পাইনা অথবা পাই-নানি কিনতে থাঙ না অথবা নানি যেতে ইত্যাদি। ফলিতভাবে এর উদাহরণ দিলে এমনটি দাঁড়ায় ঃ

নুঙ মাই চা-না ফাইদি অথবা মাই চা -নানি ফাইদি —তুমি খেতে এসো।

আঙ আ পাই না থাঙনাই অথবা আ পাই-নানি থাঙ নাই —আমি মাছ কিনতে যাবো।

ব থাঙ - না ছুইয়া অথবা ব থাঙ -নানি ছুইয়া — সে যেতে চায় না।

বোডো ভাষায় গ্রীয়ার্সন nu শুধুমাত্র একটি infinitive এর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু ফলিতভাবে বাক্যে প্রয়োগ করে দেখান নি। তাহলে ককবরক infinitive হলো 'না' এবং 'নানি'।

বোডোভাষায় infinitive হলো নু।

এই infinitive এর বিষয়টি যেভাবে লেখা হলো তা অনেকটা অস্বচ্ছ থাকছে বলে ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের শরণাপন্ন হওয়া যাক। তিনি infinitive কে Gerundial Infinitive বলেছেন এবং তার বাঙলা অর্থ করেছেন উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া' এবং এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন. "ধাতুর উত্তর 'ইতে' (চলতি ভাষায় তে) প্রত্যয় যোগ করিয়া. উদ্দেশ্য বা নিমিত্তবাচক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, যথা —আমি তোমাকে দেখিতে (= দেখিবার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত) আসিয়াছি, সে টাকা উপায় করিতে চায়; মশা মারিতে কামান পাতা; নিতে তার বাধে না, কিন্তু কাকেও কিছু দিতেই তার সর্বনাশ : মেয়ে নাহিতে ও জল আনিতে নদীতে যায়" ইত্যাদি। [১৩] সুনীতি বাবুর উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া'র সজ্ঞার সঙ্গে ককবরকের না প্রত্যয়টির বেশ মিল আছে। ককবরকের না এবং নানি এই দুটি jerundial infinitine এর ভেতর অর্থের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। না প্রত্যয়টি যেখানে খেতে, যেতে, শুতে ইত্যাদি বুঝতে ব্যবহৃত হয়। সেখানে নানি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় খাওয়ার উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত বোঝাতে । যেমন ঃ

আঙ মাই চা -না ফাইঅ —আমি ভাত খেতে এসেছি।

আঙ মাই চা -নানি ফাইঅ —আমি ভাত খাবার উদ্দেশ্য এসেছি।

ব থু-না ফাই-কা — সে শুতে এসেছে।

ব থু-নানি ফাই -কা — সে শোবার নিমিত্ত এসেছে।

কিন্তু এহ বাহ্য, ককবরকে 'নানি' এই অসমাপিকা প্রত্যয়টির চরিত্র খুবই জটিল। বক্তারা বাক্য শেষ না করে 'আঙ তাবুক মাই চা-নানি —আমি এখন ভাত খাবার জন্যে, আঙ তাবুক তুকু -নানি আমি এখন স্নান করবার জন্য —সমাপিকা অর্থেই এমন ভাব প্রকাশ করে থাকে। অথচ ব্যাকরণগতভাবে বাক্যটি মাঝখানে থেমে থাকে। তাই আমার মনে হয়েছে, 'নানি' ক্রিয়ার এই অসমাপিকা প্রত্যয়টি অনেকটা ভবিষ্যৎ কাল বোধক ভাব প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ,

আঙ তাবুক মাই চা-নানি অর্থঃ আমি এখন ভাত খাবো,

আঙ তাবুক তুকু - নানি অর্থঃ আমি এখন স্নান করবো।

কাজেই ককবরকের 'নানি' এই অসমপিকা প্রত্যয়টি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণাগার প্রয়োজন । অন্যদিকে বোডো ভাষার ব্যাকরণগত জ্ঞান আমার একান্তই সীমিত বলে গ্রীয়ার্সন সাহেব ক্রিয়ার অসমাপিকা প্রত্যয়টির যে ব্যবহার দেখিয়েছেন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে।

Participles : বোডো ভাষায় participles আলোচনা করার গিয়ে স্যার গ্রীয়ার্সন nu-ni, seeing এবং ব nu-na having seen এই অর্থ করেছেন। Seeing যদি Gerund হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে বোডো nu-ni ককবরকে হবে nuk-ui(nu-gui) আর যদি verbal noun হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ককবরকে হবে। nukmung অথবা nuk-ma অর্থ দেখা, দেখন (আঞ্চলিক) অন্যদিকে having seen বোডোতে হয়েছে nu-na-nui । এর সঙ্গে ককবরকের Pattern ঠিক মিলছে না । ককবরকে এটির দু'রকম ব্যবহার আছে। প্রথমটি ক্রিয়াপদের পরে উই প্রত্যয় ব্যবহার করে। যেমন দেখিয়ে (seeing) নুক -উই (নুগুই) এবং দ্বিতীয়টি

ক্রিযাব পবে মানি প্রত্যয় ব্যবহাব কবে। যেমন নুক মানি having seen। Participles আলোচনা কবতে গিয়ে গ্রীযার্সন বোডো nu-nai এব অর্থ কবেছেন Seen অর্থাৎ দৃষ্ট। ককববক এটি হবে nukjak। এই আলোচনায তিনি বোডো nu-ni ব অর্থ কবেছেন while seenig অর্থাৎ দেখায় বা দর্শন কালে ককববকে এটি হবে nuk-phuru।

Agent বা ক্রিযাব ধাবক ব্যবহাব কবতে দিযে গ্রীযার্সন সাহেব দুটি শব্দ ব্যবহাব কবেছেন ঃ ব nu-gra or nu-nai seer বোডো এই শব্দ দুটিব মধ্যে দ্বিতীযটিব সঙ্গে ককববকেব মিল আছে। বোডো nunai হবে ককবরকে nuk-nai যে দেখে। এখানে দেখা যাচ্ছে উভয ভাষাতেই ক্রিযাব বিশেষণ বাচক nai প্রত্যযটি একই। কিন্তু প্রথম nu-gra ব সঙ্গে ককববকেব ব্যবহাবিক মিল হচ্ছে না। গ্রাযার্সন সাহেব ব bu-gra (bu-ba-gra) অর্থ মালিক। যেমন nok-bu-gra (নক বুগ্রা) - বাডিব মালিক। কিন্তু এই bu-ba-gra বা gra কখনোই ক্রিয়াপদেব পবে বসে কর্ত্তাব রূপ পবিগ্রহ কবে না। কাজেই বোডো ভাষায় nu (দেখা) এই ক্রিযাব পবে gra প্রত্যয় ব্যবহৃত হযে nu-gra রূপ পবিগবহ কবে কর্ত্তাব মতো ব্যবহৃত হচ্ছে, যা কখনোই ককববকেব পক্ষে সম্ভব নয। ককববকে nuk-gra দেখাব মালিক এমন ব্যবহাব দেখা যায না। এই ভাষায gra এই প্রত্যয়টি adverbial suffix এব মতো ব্যবহৃত হয ক্রিযাব পবে। যেমন,

Cha-gra-di তাডাতাডি খাও।

Chha-gra-di তাডাতাডি বলো।

him-gra-di তাডাতাডি হাঁটো।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বোডো ও ককববক এই সহোদবা দুটি ভাষায gra- ব ব্যবহাব এক নয।

ককববক ও বোডো ভাষাব মধ্যে রূপতাত্ত্বিক যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাব সব দিক যে আলোচনা কবা এখানে সম্ভব হলো না। এটি একটি দুরূহ কাজ। ককববকেব ৯টি সহোদবা ভাষাব তুলনামূলক রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কবা সময় সাপেক্ষ ব্যাপাব। প্রত্ন-বোডো শাখাব ১০টি সহোদবা ভাষাব পূর্ণাঙ্গ রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গ্রীযার্সন ১৯০৩ সালে তাঁব Linguistic survery of India সংকলন ও সম্পাদনা কবেন। এই ৯৯ বছবেব মধ্যে ককববকেব সহোদবা ভাষাগুলোাব মধ্যে বিস্তব ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonological), রূপতত্ত্বগত (morphological) এবং বাক্যবিন্যাশগত (Syntactical) পবিবর্তন সাধিত হযেছে। কাজেই গ্রীযার্সন ও তাব সহযোগী ভাষাবিদদেব বইযেব সাহায্যে এই বিশ্লেষণ স্বযং সম্পূর্ণ হবে না। এই কাজ কবতে হলে ককববকেব জীবন্ত সহোদবা ভাষাগুলো জন পদে গিযে Descriptive Linguistics এব আঙ্গিকে তা কবতে হবে এবং তাব জন্যে চাই সময, অর্থ ও শ্রম। সবকাবেব অর্থনানুকূল্য ছাডা এই হিমালয সদৃশ ভাষাতাত্ত্বিক কাজ অধবাই থেকে যাবে।

এখন আমি ককববকেব সঙ্গে তাব সহোদবা ভাষা মোবান (Moran'') – এব রূপতাত্ত্বিক শব্দ সাদৃশ্য তুলে ধববো যেটুকু গ্রীযার্সনেব মহাগ্রন্থে পেয়েছি। তাব আগে স্যাব গ্রীযার্সন এই ভাষা সম্পর্কে যা বলেছেন তা তুলে ধবছি, "This language has not been reported by anyone as existing in British India, but the following notice conecerning it is quoted torm page 160 of Mr Gait's Report on the Census of Assam for 1981, in order to complete the survey of the Bodo group - One Bodo torm of speech has escapie notice at the present census and also in 1881, the Morans of Sibsagar and Lakhimpur have a tribal tongue of their own It is fast disappearing and owing probable to their desire to rank as Ahoms, was not entered as a language in single in stance in the census schedule It is evidently very closely allied to kachari (althouth the morans are said to deny all conections with that people) as will be seen from the kachari

equivalents, which I have added of the following list of Moran words collected by Lieutenant Gurdon -" (আমি নিম্নলিখিত list এর সঙ্গে Kachari র পাশে ককবরকের শব্দ সাদৃশ্য লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি — বর্তমান নিবন্ধক)

English	Moran	Kachari	Kokborak
Water	di	dui	twi
Salt	Sim	Sankhi	Som
Paddy	Mai	Mai	Mai
Rice	mairum	mairang	mairung
cookedrice	miyam	mikham	mai/maikumun
Flesh	mohan	bidot	han
Sun	San	San	Sal
Moon	dan	dan	tal
stars	hatarai	hatorkhi	athukiri
Heaven	dausa	akhrangsa	-
Rain	Makuhang	nakha	Watwi
Tree	Senfang	bangfang	buphang
Clothes	hingka	hi	ri
Head	Khero	Khara	khorok
Body	han	madam	bwsak
Teeth	hatia	hathai	buwa
Hand	hapka	akhai	yak
Foot	happatola	atteng	yakung,yathek
Male	hiwa	hoa	Chwla
Female	hani	hing/han	bwrwi, hik (bihik)

ওপরের সারণি বোঝা যায়, ককবরক ও তার সহোদরা ভাষা 'মোরান' এর সম্পর্কে কতো ঘনিষ্ঠ ।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. H. A. Gleason - An Introduciton to Descriptive Linguistics Revised edition, Oxford and IBH Co. page 468

২ Suniti Kumar Chatterji - The origin and Develoment of the Bengali Language Vol One, Rupa and Co. page 69

৩. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় —বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ৯৯

৪. C.R. Goswami- 'The Languages of Tripura' Publisied in 'A common Perspective for North -East India' with general introduction by Pannalal Dasgupta page 16

৫. G. A. Grierson Linguistic Survery Of India Vol III Tibeto Burman Family part II, The Bara or Bodo group page 16

৬. Suniti kumar Chatterji - The origin and Development of the Bengali linguage, Vol one Rupa and Co. page 3.

৭. ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় — 'ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ', দি ইনস্টিটিউট অফ ল্যাংগুজেজ এ্যান্ড এ্যাপ্লায়েড লিংগুইসটিকস্ কলিকাতা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭২ পৃষ্ঠা ১-৪

৮. কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী —'ককবরক ভাষা ও সাহিত্য', অক্ষর পাবলিকেশনাস, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, বই মেলা ২০০১ কৃষ্ণনগর আগরতলা ত্রিপুরা।

৯. G. A Grieson Linguistic Survery of India, Vol III Tibeto-Burman Family part II, Bara skeleton Grammar, page- 17

১০. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় — ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃষ্ঠা ৩১২ প্রকাশক রূপা এ্যান্ড কোম্পানী কলিকাতা।

১১. G.A. Grieson Linguistic Survey of India Vol III Tibeto-Burman Language Family.

যুগে যুগে গোমতী

করবী দেববর্মা

মানব সভ্যতার সঙ্গে নদনদীর সম্পর্ক হচ্ছে। বৈদিকযুগে আর্যগণ সরস্বতী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। সরস্বতীর তীরে .. যাগযজ্ঞ স্তব প্রাথ৪না অনুষ্ঠিত হত। কালক্রমে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত এই সরস্বতী নদীই .. সরস্বতীতে পরিণত হন। প্রাচীন .. তাই প্রচলিত সরস্বতী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের সভ্যতাও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে সিন্ধুনদ বা গঙ্গানদীব বিশেষ ভূমিকা পাওয়া গেছে। এই নদ নদীগুলির তীর ভূমিতেই গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ, বন্দর, ধর্মও জ্ঞানের ... পাঠসমূহ। এ ছাড়াও ছোটখাট প্রত্যেকটি নদনদীই আমাদের জীবনে অপরিহার্য ... করে আছে।

ত্রিপুরার ইতহাসে ও জাতীয় জীবনে .. গোমতীও তমনি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। নানা ঐতিহ্য ও স্মৃতি বিজড়িত .. ত্রিপুরাবাসীর সবিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ . . বিস্মৃত প্রায় কোন অনাদি অতীত কাল থেকে ...। নির্জন শৈলমালায় নিবিড় আরণকে বিশেষ অপূর্ব নিসর্গ সৌন্দর্য শোভিত সদিংখণ্ড .... ও আঠারমুড়ার মাঝখানে কমলাখা ... তার উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বেড়িয়েছে . ও শর্মা দুটি বড় বড় ছড়া, এরা মিলেছে ...। সেই সম্মিলিত জলধারা আরো ... স্রোতস্বতীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে নিম্নগামী হবার সময় সাতটি ধাপে সাতটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। এই সপ্ত প্রপাতই ডুম্বুর নামে প্রসিদ্ধ।

ডুম্বুর প্রপাতের শুভ্র ফনরাশি থেকেই গোমতীর জন্ম। এর প্রপাতের রমণীয় সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে। মহাদেবের হাতের ডম্বরু আকৃতি বলেই নাকি এর নাম হয়েছে 'ডম্বুর' জলপ্রপাত।

প্রপাতের সর্বোচ্চ স্তরে যে কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম 'রাণী কুণ্ড', চতুর্থ কুণ্ডকে বলা হয় 'কাছুয়া কুণ্ড'। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলা দেবীর নামনুসরণেও কুণ্ড রয়েছে 'কমলা কুণ্ড'। এখানে ত্রিপুরাধিপতিগণ রাজপরিবার নিয়ে অসতেন পূণ্যস্নানে। সম্মানিত রাজমহিষী অর্থাৎ বিবাহিত্তা পত্নীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্নান কুণ্ডকেউ বলা হত রাণী কুণ্ড। অবিবাহিতা বা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রাচারে গৃহীতা কাছুয়া বা কাচ্ছাদের স্নানের কুণ্ডকে বলা হতো কাদুয়া কুণ্ড।

এই সপ্ত প্রপাতকে পরপর সাতটি কুণ্ডের জন্য সাত ডম্বুর বা সাততালাও বলে। ক্রমনিম্ন সাতটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ধাপের মধ্য দিয়ে রজতকান্তি উচ্ছল বারিরাশি বয়ে চলেছে। তীর্থমুখের এখান থেকেই স্রোতধারার

নাম হয়েছে গোমতী। আবহমান কালে থেকে পৌষালী সংক্রান্তিতে দলে দলে পার্বত্য নরনারী এখানে আসে পূণ্যোৎসবের মেলায়। নানা স্থান থেকে আসে তীর্থযাত্রী দল সাধু, সন্ত, ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ, নারী, শিশু। এখানে জন্ম হয়েছিল বলে বিজয় মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল ডুম্বুর ফা।

তীর্থমুখ থেকে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে গোমতী এসেছে অমরপুর এলাকায়। ষোড়শ শতাব্দীতে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজধানী অধিকতর সুরক্ষিত করার সঙ্কল্পে অমরমাণিক্য এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি রাজ্য লাভের পূর্বে ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি তাই বড়মুড়ার মত দুর্লঙ্ঘ্য। পর্বতের আড়ালে নূতন রাজধানী স্থাপন করেলন যাতে রাঙামাটি (উদয়পুর) আক্রান্ত হলে এখানে এসে বিপদে আশ্রয় নেয়া যায়। নূতন রাজধানী স্থাপিত হলেও স্থায়ী রাজপাট অবশ্য কোনদিনই অন্যত্রে স্থানান্তরিত হয়নি।

অমরপুর শহর থেকে পশ্চিম বাহিনী হয়ে গোমতী এসেছে উদয়পুরে। পথে পথে ছিল গঙ্গানগর, দেবদ্বার চৌহাটিয়া। গোমতীর তীরে ধনে-জনে পরিপূর্ণ ছিল রাজধানী রাঙামাটি (উদয়পুর)। প্রাচীন রাজদুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে গোমতীর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে। অপর পারে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত -বিজিত মগ ও ত্রিপুরা জাতির বাসভূমি। দুইতীরে শাল, সেগুন, ছাতিম, গামাই, বাঁশ, অমলকী, কুমারিয়া বৃক্ষের সমারোহ। তার সংলগ্ন জমিগুলিতে সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধান, কার্পাস, তিল, সরিষা, আখ, আদা, কচু, কাউন ইত্যাদির চাষ হয়ে আসছে।

রত্নমাণিক্যের আমলে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে গোমতীর দক্ষিণতীরে বসতো হাট - নাম ছিল রাজহাট। ব্যাপারীরা পশরা সাজিয়ে আসতো তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ, জায়ফল, বস্ত্র, নুন, চিনি, বাতাসা ইত্যাদিতে। গোমতীর তীরে পূর্ব পশ্চিমে ছিল লম্বা একটি রাজপথ সে পথের ধারে ছিল সেই সমৃদ্ধ বন্দর যেখানে আমদানী হতো তামা, পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবন, তৈল, ঘৃত রপ্তানী হতো ধান, চাউল, ডাল, সরিষা, তামাক পাতা ইত্যাদি। সমস্ত বাংলাদেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী এখানে বস্ত্র ও বনজ জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করতো। প্রত্যহ প্রভাত থেকে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত সেস্থান কল কোলাহল পূর্ণ থাকতো।

রাস্তার উত্তরে দিকে গোমতীর তীরে অভিজাত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের বাসগৃহ ছিল। যুবরাজ দুর্জয় সিংহের বাসগৃহের চতুর্দিকে ছিল নির্মিত গড়। ত্রিপুরা ও বাঙালী অভিজাত ব্যক্তি গণের এহ বাসগৃহগুলি তাল বেল নারিকেল বৃক্ষ দিতে সুশোভিত ছিল।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ছাড়াও ধর্মীয় আচার আচরণ পালনেও গোমতীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। আদিবাসীগণ নানা পূজা করতে গামতীর তীরে এসে। এখনও সেই সব পূজা প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

কামদেব বা মদন দেবের পূজা উপলক্ষ্যে গোমতীর বুকে মোট খেলা হতে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষায় ত্রয়োদশী তিথিতে মদন পূজা অধিবাস হতো। মহারাজা তখন সম্মনানুস প্রত্যেককে উপহার বিতরণ করতেন রঙিন রঙিন গাগড়ী রঙীন পুটকা, রঙীন দোপাট্টা। গৃহ নির্মান করে কামদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়ে বড় বড় নাড়ু দের হতো। পূজা শেষে এসে কামদেব প্রণাম করে সোনার নল দিয়ে কামদেবের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন। রাজ ও অন্যান্য গণ্যমান্যেরা দিতেন রূপার নলে। তারপর অন্যান্য সকলে কামদেবের দেহে জল ছিটানির পর বাইরে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের গায়ে জল ছিটাতেন। সুগায়কেরা মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন করতেন। সকলেই সেদিন রাজপ্রদত্ত উপহার বস্ত্র ধারণ করতেন।

পরদিন সকলে দরবার গৃহে সমবেত হতেন। ইহা বিশেষ ভাবে সজ্জিত হতেন বিচিত্র আবরণে নানা আভরণে গুজরাটী সোনালী তসরের জামা, সোনালী বুটিদার ইজার, সোনালী গোছপেছ। সোনালী কারুকরা জিরা, মাথার পাগরীতে মুক্তা ও পান্নায় গাঁথা দুর্পেচা মালা, কানে মুক্তা, গলায় হীরা খচিত কণ্ঠাভরণ তাতে মুক্তার মালা, দশ আঙ্গুলে দশটী হীরা ও অন্যান্য পাথর খচিত আংটি, কোমরে খচিত কোমরবন্ধ।

রাজবাহন হস্তীটিকেও সজ্জিত করা হতো সিঁদুরে, কজ্জলে হাওদায় থাকতো স্বর্ণ রৌপ্য মনি মুক্তা খচিত সিংহাসন, উপরে সোনার ঝালির দেয়া বনাতের আচ্ছাদন। হাতীর পিঠে ঝোলানো হত বহুমূল্য স্বর্ণ খচিত বস্ত্রবরণ। রাজার সম্মুখে থাকতো চন্দ্রবান বা শিবের ত্রিশূলধারী পদাতিক, পার্শ্বে হস্তী পৃষ্টে চামর ব্যজনরত এক সেবক অপর পাশে ঢাল তরোয়াল সজ্জিত অন্য এক সেবক রাজার সম্মুখে ও পিছনে থাকতো পদাতিক ও অশ্বারোহী নিশানধারীগণ। নাকারা বাজক হস্তীপৃষ্ঠে বাদ্য বাজাতে বাজাতে যেতেন। ঢাল তরোয়াল বন্দুকধারী শত শথ সৈন্য ও সোনা রূপার লাঠি হাতে গুরু জটদার রাজানুসরণ করে গোমতীর তীরে এসে উপস্থিত হতেন। আমোদ দেখার জন্য হাজার হাজার জনসাধারণ গোমতীর তীরে ভীড় করতো। গোমতীর জলে হস্তীপৃষ্ঠে রাজা বসে থাকতেন - যুবরাজ ও অন্যান্যরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধ ভাবে গোমতীতে দাঁড়াতেন। তারপর সুরু হতো খেলা। চামড়ার মোটের (সম্ভবত: ভিস্তিজাতীয় পিচকারি) সাহায্যে পবস্পর পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন। এভাবে খেলার পর সপরিসদবর্গ রাজা অমর সাগরেও কখনো যেতেন আবার সেখানেও জলক্রীড়া চলতো। তারপর মদনদেবের পূজার প্রসাদ রাজাদেশে সকলের মধ্যে বিতড়িত হতো।

বড়ঠাকুর ঘনশ্যাম রত্নমাণিক্যকে রাজাচ্যুত করে রাজা হবার জন্য মুরাদবেগ নামে এক মোঘল (ত্রিপুব রাজ কর্ম্মচারী) ও মামুদ স্বদি নামক তদানীন্তন ঢাকার উচ্চ মোঘল রাজ কর্ম্মচারী মীর মুরাদের ভাগিনেয়েব সাহায্যে এক চক্রান্ত গড়ে তুললেন। হাতী ধরার অছিলায় তিনি রাজধানী থেকে বেড়িয়ে লোকবল বৃদ্ধি কবে ফিরে এসে গোমতীর তীরে তাঁবু ফেলে রইলেন। কৌশলে যুবরাজ ও সেনাপতিকে এনে বন্দী করে রাখলেন। গোমতী অতিক্রম করে বড় ঠাকুর ঘনশ্যাম এ পারে এসে রাজাকে বন্দী করলেন এবং মহেন্দ্র মাণিক্য নাম দিয়ে সিংহাসনে বসলেন। কিছুকাল পরে তিনি রত্নমাণিক্যকে বধ করে নিষ্কন্টক হতে চাইলেন।

রত্নমাণিক্যের মহিষীগণ গোমতীর তীরে মুক্তিঘাটে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন। মহেন্দ্রমাণিক্য বহু ঘটা করে রত্মমাণিক্যের শ্রাদ্ধাদি করালেন স্বয়ং। রাজবধ পাপ স্খালনের জন্য ডম্বরুতীর্থে স্নান ও দান দক্ষিণা করলেন।

ইতিহাসের উথান পতনের শুধু নীরব দর্শক নয় জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় গোমতী আপন কর্ত্তব্যটুকু যেন সক্রিয় ভাবে পালন করে গেছে।

ধন্য মাণিক্যের চট্টগ্রাম জয়ের ও সেখান থেকে মোগল সৈন্য বিতাড়নের জের হিসেবে সুসজ্জিত মোগল সৈন্যদল এলে ত্রিপুরা আক্রমনে। নৌকাযোগে গোমতীর বক্ষ বেয়ে। মেহেরকুল বা বর্ত্তমান কুমিল্লায় এসে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে এরা ছাওনী স্থাপন করলো।

কিন্তু সেনাপতি গোড়াই মল্লিক বহু চেষ্টা করেও চণ্ডীগড় (সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর ও কাঁকড়াবনের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন ত্রিপুর দুর্গ, ইহা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। মহারাজা বীরবিক্রমের রাজ্যকালে তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সেন, যখন সোনামুড়া বিভাগেরবিভাগীয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন এই পাহাড়ে মৃত্তিকা গর্ভে প্রাচীন তোপ উদ্ধার করেন। গড়ের-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ইষ্টকাদির থেকেও প্রাচীন সেনা নিবাসেব প্রমাণ মিলে) জয় করতে পারলেন না। ত্রিপুর সৈন্যদলের এক খোজার মন্ত্রণাযায়ী সোনামুড়ার নীচু ভাটিতে গোমতী-বাঁধ ভেঙ্গে দেয়া হলো হোসেন শাহার সৈন্যদল জলোচ্ছাসে বিপর্যস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলো।

অপমানিত পাঠান এলো দ্বিগুণ রণসজ্জায় দুর্মদ অভিযানে। হোসেন শাহার সেনাপতি হৈতান খাঁ, কর খাঁ এবার এলো সরাইলের পথে কেল্লাগড় বা বর্ত্তমান কসবা হয়ে। জয় করে নিলো জামির খাঁ (বর্ত্তমান বাগমা) দুর্গ, গাড়ের অধিনায়ক খঙ্গরায় অল্প সৈন্য সহ প্রাণপন যুদ্ধ করেও জয়লাভ করতে পারলেন না - পশ্চাদপরসরণ

করে চলে এলেন ছঘরিয়া (চড়িলাম) দুর্গে । হৈতান খাঁ অমিত বিক্রমে জয় করে নিলেন সে দুর্গও । দুর্গ রক্ষক গগন খাঁ পাঠান আক্রমণের প্রবল বন্যায় চলে এলেন রাঙামাটিতে (বর্তমান উদয়পুর) বিজয়ী হৈতান ডোমঘাটির পথে তৈকতনে শিবির স্থাপন করে রইলেন নতুন আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় ।

স্থানীয় অধিবাসীরা গোমতীর জলে এক প্রকার বিষলতা থেঁতলে রস ঢেলে মৎস্যাদি শিকার করে থাকে। শত্রু ধ্বংসের জন্য এখন সে রস গোমতীর জলে দেয়া হলো । সে জল পান করে কয়েকজন মৃত্যু বরণ করায় হৈতান খাঁ মাত্র দুই প্রহরে জল পানের জন্য একটি দীঘি খনন করলেন । অদ্যাবধি সেই দীঘি "তোকদীঘি" বা "তুড়ুক দীঘি" নামে প্রসিদ্ধ । রাজা সৈন্য সামন্ত সহ আরো উজানে পাহাড়ের আশ্রয় নিলেন । ছনগাঙ নামে একটি নদী গোমতীতে এসে মিলেছে - ধন্যমাণিক্য সে নদীর উজান বাঁকে গড় করে রইলেন ।

ছনগাঙ তৈকাতান দেবদ্বারের কয়েক বাঁক উজানে গোমতী তীরস্থ মাছিছড়া নামক স্থানে পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ আছে দশভুজাদেবী মূর্ত্তি যাকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না বলে ত্রিপুরীদের বিশ্বাস । এবারও গোমতীতে উজান বাঁকে বাঁধ দেওয়া হলো । এর ফলে নদীতে ... পড়ায় গৌড় সৈন্য চরদেশে তাবু ফেলে রইলো সাতদিন পরে অসংখ্য ভেল নির্মাণ করে তাতে তিনটি পুতুল মূর্ত্তি রেখে তাদের প্রত্যেকটি হাতে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে অকস্মাৎ বাঁধ ভেঙ্গে দেয়া হলো । সৈন্য উদ্দাম জলধারা গিয়ে পড়ত । হতচকিও সুপ্তোত্থিত গৌড় সৈন্য দলের উপরে নিদ্রাজড়িমা নেত্রে তারা দেখতে পেল সেই .. দৃশ্য - প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পরপর সহস্র ভাসমান নৌকার মশাল হস্তে অগণিত ত্রিপুর সৈন্য.. কত পাঠান সৈন্য গেল ভেসে, যুদ্ধাস্ত্র রইল পড়ে । তীরভূমি দিয়েও ত্রিপুর সৈন্য আক্রমণ করলো, এদের পশ্চাদ দেশের অরণ্যে করলো অগ্নি সংযোগ । দিশাহারা মোগল সৈন্য এই প্রলয় যুদ্ধে হলো সম্পূর্ণ পরাজিত । হৈতান খাঁ, করা খাঁ গেলেন অশ্বরোহণে পালিয়ে । ত্রিপুর সৈন্য ছিনিয়ে নিলো হোসেন শাহেব কামান অদ্যাবধি তা শোভাপাচ্ছে আগরতলার কামান চৌমুহণীতে ।

এ সকল নাটকের একক নায়িকা গোমতী । এই রাঙামাটিতে ঘটে গেছে কত চমকপ্রদ ঘটনা সকলেরই সাক্ষী গোমতী । পিতার প্রতি অভিমানে গোমতীর বুকে মরণ বরণ করেছেন ধন্যমাণিক্য কন্যা রাজকুমারী ফুলকুমারী । তার বাড়ীর সীমানায় গণিত হচ্ছিল ধনিসাগর বা ধন্যসাগর রাজা দেশে আপত্তি জানিয়ে জামাতা বিদ্রোহ জানালেন । স্বয়ং গিয়ে বসে রইলেন মাটি ফেলার জায়গায় । অনুরোধ উপরোধেও কর্ণপাত না করায় রাজার উপরেই জেদবশত: মরণ ডেকে আনলেন এদরোখা রাজ জামাতা ।

নি:সন্তান ফুলকুমারী অনুযোগ জানিয়ে গেলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতার কাছে 'তুমি পৃথিবী থেকে আমার নাম মুছে ফেলে দিলে' তাই অনুতপ্ত পিতা কন্যাকে কথা দিলেন তোমার নাম চিরস্থায়ী করে যাব । তাই উদয়পুরে ফুলকুমারী মৌজা, ফুলকুমারী ছড়া, ফুলকুমারী ঘাট ।

গোমতীর বক্ষবেয়ে নৌকাযোগে প্রমোদ বিহারে চলেছিলেন মহারাজ দেবমাণিক্য পথে কুচুয়া ছড়া নদীতীরে দেখলেন এক সুন্দরী যুবতী টঙে বসে চুল শুকোচ্ছেন । পরিচয় নিয়ে জানলেন তারই এক সেনাপতি হাজরার কন্যা । সৌন্দর্যে বিমোহিত রাজা সে কন্যাকে গান্ধর্ব বিবাহ করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন । হাজরা তখন চট্টগ্রামে ত্রিপুরার পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ রত । সে কন্যাকে ভোগ করলেন তিনি কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে রাজ অন্ত:পুরে মহিষীর মর্য্যাদায় নিলেন না । এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান রমাদাসই পরে ত্রিপুরার সিংহাসন আসীন হন অমর মাণিক্য নামে । ষোল বৎসর পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে কাটালেন রামদাস। পরে ভ্রাতা বিজয় মাণিক্য তাকে নিয়ে এলেন রাজগৃহে রাজবংশধরের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় করলেন শিক্ষিত।

গোমতীর তীরে লক্ষ্মাপুরেই বনবাস দেওয়া হয়েছিল বিজয় মাণিক্যের মহিষী লক্ষ্মী দেবীকে । লক্ষ্মী দেবীর পিতা রাজ ক্ষমতা গ্রাসী সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ ও তৎভ্রাতা দুর্লভনারায়ণের অত্যাচারে জর্জরিত

বিজয় মাণিক্য বড় ভায়রা ভাই মাধবের সাহায্যে শশুরকে হত্যা করালেন । এই চক্রান্ত জানতে পেয়ে ক্রুদ্ধা রাজ মহিষী লক্ষ্মীদেবী কৌশলে রাজ অনুপস্থিতে রাজাঙ্গুরীয় প্রেরণ করে মাধবকে স্বামীর দেয়া নির্ব্বাসন তাকে নিতে হলো ।

রাঙামাটির নাম হলো উদয়পুর সেই বিশ্বাসঘাতক জামাতা হত্যা সেনাপতি গোপীপ্রসাদ তথা উদয় মাণিক্যের নামে । নিতান্ত অনুগত ও অনুরক্ত জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে হত্যা করালেন গোপী প্রসাদ । তার রাজ্যকালে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, পাঠান সৈন্য যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করলো ।

উদয় মাণিক্যের পর তৎপুত্র জয়মাণিক্য রাজা হলেন । সে এক ব্যর্থতার ইতিহাস । ক্ষমতার যুদ্ধে অন্যান্য সেনাপতিগণকে হটিয়ে অমর মাণিক্য রাজা হলেন । এরই আমলে ত্রিপুরায় সুখ সমৃদ্ধির বাজ্যপাট বিস্তৃতিতর হলো ।

অমর মাণিক্যের পুত্র রাজবধ মাণিক্য ছিলেন পরম ভক্তিমান গভীর বৈষ্ণব । গোমতীর তীরে তিনি স্থাপন করেছিলেন এক বিষ্ণু মন্দির । দান ধ্যান কীর্ত্তনে তার দিন অতিবাহিত হতো । একদা বৃদ্ধ ভাববিহ্বল রাজা বিষ্ণু মন্দির প্রদক্ষিণ কালে গোমতীর জলে নিমজ্জিত হয়ে অমর শান্তি লাভ করলেন ।

কল্যাণ মাণিক্যের পুত্র গোবিন্দ মাণিক্য গোমতীর দুই তীরে সুচারু রূপে বাঁধ দিলেন যাতে প্রজাকুলের শস্য সম্পদাদি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ না হতে পারে ।

প্রাচীনকালে গঙ্গাপূজার সময় গোমতী বক্ষে নর বলিও হতো । সাধারণত: শত্রু পক্ষেব ধৃত ব্যক্তিদ্বয় দু'জনকে বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হতো ।

বৎসরের অন্যান্য সময়ে বা শীতকালে গোমতীর ময়মানা, বিশীর্না রূপ দেখলে মনে হয়না এত নদীব বর্ষাসমাগমে ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে দুকুল ভাসিয়া দেয় । মাঝে মাঝে গোমতীব বন্যায় উদয়পুব, সোনামুড়া মহকুমায় ধান, রবি শস্যাদি ও গৃপালিত পশু ইত্যাদির প্রচুব ক্ষতি হয়ে থাকে ।

গত বর্ষাতেও এই মহকুমাগুলিতে গোমতীর প্রবল জলোচ্ছাসে এক সর্বনাশা বন্যা হয়ে ধনজনও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে ।

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের মহকুমাগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধাই হয়ে গোমতী পারাপার হওয়া । একটী মাত্র মারবোট যান বাহনাদি পারাপার করা হয়ে থাকে । লোক পারাপারের জন্য অবশ্য ছোট ফেরী নৌকা রয়েছে । প্রতিদিনই বহু সংখ্যক লোক গোমতী পারাপার করে এবং ফলস্বরূপ বর্ষাকালে ও .. অন্যান্য সময়েও লোকবাহী ফেরী নৌকা উলটে গিয়ে বিপদ ডেকে আনে । গাড়ী পারাপার করতেও প্রচুর সময় ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় । মাঝে মাঝে চড় পড়ে মারবোট আটকে যায় তখন মাঝিদের অমানুষিক পরিশ্রম করে নৌকা ঠেলতে হয় ।

অবশ্য এই আদিম ব্যবস্থায় শীঘ্রই অবসান হয়ে যাচ্ছে । গ্যানন এণ্ড ডাঙ্কারলিঙ্ক কোম্পানীর তত্বাবধানে এক বিরাট ব্রীজ তৈরী হয়ে গেছে । আনুষ্ঠানকভাবে ব্রীজে এখনে গাড়ী চলাচল সুরু হয়ান, তবে শীগগীরই হবে বহু লোকের দু:খ কষ্টের অবসান করে ঐতিহ্যময়ী গোমতী আধনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে চলেছে । এখন আর দিনের পর দিন পন্যবাহী ট্রাক সারি সারি অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না । রুগ্ন শিশু, বৃদ্ধ যাত্রীদের ঘর্মাক্ত কলেরবে আচ্ছানহীন নদীতীরে রৌদ্র বৃষ্টিতে দগ্ধমুক্ত হতে হবে না । আগামী দিনের যাত্রীর এসব অভিজ্ঞতা জানবেন । না হুস্ করে এক নিমেষে চলে যাবেন গন্তব্য স্থানে ।

সকল গৌরব, সকল স্মৃতি, সকল বেদনা বহন করে গোমতী ধরে চলেছে অমরপুর, রাঙামাটী, চণ্ডীগড়, সাভার মুড়াগড় (সোনামুড়া হয়ে মেঘনার বিশাল বারিরাশির উদ্দেশ্যে ।

কল্যাণদায়িনী গোমতী অতীত কালের মতই বর্ত্তমানেও ত্রিপুরাকে রক্ষা করবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা-শত্রুর হাত থেকে । গোমতী জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে ডুম্বুরে গড়ে উঠেছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র । গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে । এখন প্রায় ১০০০ লোক সেখানে কাজ করে যাচ্ছে । বর্ত্তমানে কর্মীদেব আবাসগৃহ, বিদ্যালয় গৃহ, হাসপাতাল, মাল মজুত করার গুদাম এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা তৈরী হচ্ছে ।

নূতন বাজার ও গোমুখের দুই মাইল উজানের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ চলছে । রাইমা বাজারের চতুঃস্পার্শে জলাধার নির্ম্মাণের জন্য পরিদর্শন কার্য (survey work) আরম্ভ করা হয়েছে ।

এই প্রকল্পের প্রধান কার্যসূচী হচ্ছে - উপরে ২৬০ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটী বাঁধ, ও প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫০ কিউসেক জল অপসারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮০০০ ফিট লম্বা একটি পাওয়ার চ্যানেল যেটি গোমুখের ভাটিতে তীর্থমুখ কুণ্ডের কাছে অবস্থিত পাওয়ার হাউস পর্যন্ত পৌঁছাবে ।

এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তিনটি ইউনিটে মোট ১৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে । প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পাধীন গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ নতুনভাবে গড়ে ওঠা ত্রিপুরার অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের নিরিখ । রুদ্র-ডম্বুরুর গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে উতরোল গোমতীর প্রলয় নাচনকে আজ সমেত তালে বন্দী করার জন্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ভৈরবী এলোকেশী আজ বন্দী হবে । আর তার সংহত পাগল ঝোরার জলের পুঞ্জীতশক্তিতে সৃষ্টি হবে বিদ্যুৎ, জ্বলবে আলো, গড়বে শিল্প, আর পূণ্যতোয়ার জল বাঁধের আধুনিক কমণ্ডলু থেকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে রচনা করা হবে লক্ষ্মীর বেদী - শ্যাম শস্পের অঙ্গন । কসলের মাঠে নামবে শস্যেব বন্যা - ধানের পাটের তিলের ।

আর ! আগামী দিনের কোন এক প্রভাতে গোমতী তীরের কোন গ্রামের প্রান্তে মাঠের মধ্য দিয়ে মায়েরা যখন চলতে চলতে হাসবে আর শস্যের চারারা মৃদু বাতাসে নাচতে থাকবে, তখন কি কারো একবারও মনে পরবে এই সেই গোমতী ! যার উৎস রয়েছে অতীতের গর্ভে, যার বক্ষে নিয়ত প্রবাহিত কালের রেখা, উপকুলের পরতে পরতে যুগ ও জীবনের বিধৃত ইতিহাস ! উত্থানের পতনেব, ধর্মের আর কর্মের আলেখ্য ?

ত্রিপুরার সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ একটি সমীক্ষা

জগৎজ্যোতি রায়

আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞানেব স্তবে উন্নীত হয় নি বলেই জাতি বা জাতি গোষ্ঠী সমাজ ঐতিহাসিক তথ্য বিচার বিজ্ঞান সম্মত করে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানেব মাঝখানে একটা বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ দুয়েব সমন্বব হচ্ছে না। তাই তো নানা বং এর প্রলেপ দিয়ে বচিত যে ইতিহাস আমরা এতকাল পড়েছি তার অনেক রঙ আজ সামাজিক গতিব তবঙ্গে ধুয়ে মুছে মাটি হয়ে গেছে। বাহ্যিক ঔজ্জল্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাবণ কেবল তাবিখ ও তথ্যেব সমারোহে সামাজিক ইতিহাসেব সমীক্ষা চালালে ঐতিহাসিক তথ্য বিচার বিজ্ঞান সম্মত হবেই বা কেন।

উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীব ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সমাজ বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিব দরুন নিঃসন্দেহ জটিল হয়েছে। সমাজ অর্থনীতির বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জাতি সত্ত্বাগুলির পূর্ণ প্রকাশেব প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা এমন এক জটিল রূপ নিয়েছে বা আজকের তথ্যবিচারে সমাজ বিজ্ঞানীদের মীমাংসাব কোন নির্দিষ্ট সূত্র আবিস্কার সম্ভব হয় নি। সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর সমাজ জীবনে সমতল অধিবাসীদের সমাজ অর্থনীতিব ও সংস্কৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রনের ফলে উদ্ভূত মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সঠিক বিশ্লেষণ আজকের সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে নিঃসন্দেহে একটা গুরু দায়িত্ব হিসাবে বর্তেছে। আজকে লক্ষ্য কবছি উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অস্থিবতা। শুরুতে ঐ জাতি গোষ্ঠী তাদেব নিজস্ব জাতি সত্ত্বা বিকাশের চেষ্টায় জাতীয় আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েও বিপথে চালিত হয়েছে। এরও আগে অতি প্রাচীনকালে আদিবাসীদের জাতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ সংগ্রাম (Resistance struggle) গড়ে তুলে ছিল। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আবার এও দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার কাছে হার মেনে নিজেদের স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে চঞ্চুস (Chenchus) নামে একটি আদিবাসী জাতি তেলেগু সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক কৌশম্বী দেখিয়েছেন যে কিভাবে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার (লাঙ্গলের চাষ পদ্ধতি) কাছে আদিবাসী সমাজ জীবনে বিপর্যয় ঘটে।

"Most primitive of all, the Chenchus have lost their original language and now speak a form of Telugu, the language of the peasants who furnish the productive enviroments. In other words. all such study proves that private societies are heavily affected by contact with those whose means of production are more efficient."

চঞ্চুস্ জাতি উন্নত উৎপাদিকা শক্তির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী করতে অক্ষম হয়েছিল বলেই তাদের নিজস্ব জাতি সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি আজকে লুপ্ত হয়ে গেছে। নাগা ও মিজো জাতি এ ধরনের প্রকট জাতিগত আগ্রাসনের সম্মুখীন হতে হয় নি। অর্থাৎ নাগাভূমি বা মিজোভূমিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমতলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নি এবং তাদের নিজস্ব প্রতিরোধ সংগ্রামের মুখে সমতলের অধিবাসীদের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বর্তমানে নাগা রাজ্যে বুর্জোয়া শিক্ষা সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রভাবে একটা বিশেষ শ্রেণী গড়ে উঠেছে যাদের চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপরিতল। অধ্যাপক কৌশম্বী নাগারাজ্য সম্পর্কে বলেছেন "The immediate porblem of Nagaland lies in that some Nagas have acquired a modern bourgeois education while the bulk of their fellows refused to become passive substance of helpess peasants that characterises India past and present. The Naga demand for a separate State (just granted)or complete in dependence was based on the remnants of Tribal unity that come from the (former) absence of plough agriculture and bourgeoies property holdings ; and upon a long tradition of armed resistances to the enchroachment of food producing society". সুতরাং উপরের মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে নাগা ও মিজোদের বেলায় একটা নব্য মধ্যবিত্ত তৈরী হয়েছে বুর্জোয়া সংস্কৃতি শিক্ষার আলোকে। এবং এরা (মেঘালয়ের জয়ন্তীয়ারাও) সমতলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের ঐতিহ্যের বলে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার নিমিত্তে আলাদা রাজ্যের দাবী নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের প্রয়াস চালিয়েছিল। যদিও পরিণামে এদের জাতীয় আন্দোলন জাতিসত্তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় নি। মিজোদের মাউ তাং আন্দোলনের শুরু থেকে MNF গঠন পর্যন্ত আন্দোলনের স্তর জাতীয় আন্দোলন বলেই ইতিহাসে স্বীকৃত। যাক্ এ আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। বস্তুত স্বাধীনোত্তর ভারতে নাগা মিজো খাসী সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগতভাবে বিকাশ লাভ করে নি। সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতি অসমভাবে বিকাশ লাভ করেছে অর্থাৎ নিজস্ব প্রয়োজন বা তাগিদ থেকে গড়ে ওঠে নি। সেই বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে বাহ্যিক চাপে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এ ধরনের Extraneous development আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সামন্তরাজার অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তার বর্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশে) কুমিল্লার কিছু অঞ্চল এ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেকালের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল নিতান্ত অচল অটল স্থিতিশীল যার ফলে তদানীন্তন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক কথায় Social mobility বা সামাজিক গতিশীলতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। সমাজ বিজ্ঞানের আক্ষরিক নিয়মে সেটা অসম্ভব হলেও এ অবস্থা মধ্যযুগের গোটা ভারতবর্ষেই পরিলক্ষিত ছিল। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে "আত্মনির্ভরশীলতা" আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা। ফলে গ্রাম সমাজগুলির সমাজ অর্থনীতির স্তরগুলি খুব মন্থর গতিতে উত্তরণ করত এবং কোনো কোনো অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। মার্কস তার ক্যাপিটাল গ্রন্থে ভারতীয় তথা এশিয়াটিক সমাজের এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"একই ধরনের সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্য সমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই এক ঘেয়ে সরলতাই হল এশিয়াটিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভেঙ্গে গেলেও এই গ্রাম্য সমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই একঘেয়ে সরলতাই হল এশিয়াটিক রাজ্য ও রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে এশিয়াটিক সমাজের নিশ্চলতা ও স্থিরতার বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।"

প্রাচ্য সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূলে হল ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বহীনতা। এ প্রসঙ্গে মার্কস্ এঙ্গেলসকে লিখেছেন, "The basic form of all phenomena in the east is to be found in the fact that no private property to land existed. This is the real key even to the oriental heaven" (Selute Correspondence, Marx Engles of 67)[3] – এর উত্তর এঙ্গেলস্‌ও লিখলেন, ..The absence of property in land is indeed the key to the whole of the east (Ibid)[4] –

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রাচ্য সমাজের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকদিন পর্যন্ত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। বাঙালীদের আগমনের আগে ত্রিপুরার আদিম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি এতই প্রকট ছিল যে শুধুমাত্র "ব্যক্তিত্বহীনতাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না তৎসহ আদিম সমাজের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এই আদিম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থরগতিতে একটা স্তরে এসে শিথিল হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ ব্যাপক বাঙালী অনুপ্রবেশের পরে ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বত্বপ্রথার এক ভীষণ উৎকট রূপ দেখা দেয়। সমাজ অর্থনীতির এই অদ্ভুত ক্রমবিকাশ ক্রমে এক জটিল রূপ ধারণ করে। আদিম সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কোন গতিশীলতা ছিল না অর্থাৎ উত্তরণের কোন পথ ছিল না। যার ফলে অতি সহজে ত্রিপুরার আদিবাসিরা লাঙ্গলের উন্নত চাষ পদ্ধতির কাছে হার মেনে নিয়েছে। পার্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসিরা প্রধানত রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া, কাইপেং, মলসম, মগ, চাকমা ও দেববর্মা ইত্যাদি গোষ্ঠীর সমষ্টি। এদেরকে গোষ্ঠী বলা হল এই জন্য যে এদের জাতি বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কিনা জানা যায় নি। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫ লক্ষের কিছু কম। সমানুপাতিক হারে লোক সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তেমন লক্ষণীয় নয় এবং যেহেতু জমির উপর এখনও "গোষ্ঠীস্বত্ব" ব্যবস্থা বর্তমান এবং লোক সংখ্যার আধিক্যের অভাব হেতু জমির উপর জন সংখ্যার চাপ মোটেই পরিলক্ষিত নয়। এরা জুম পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করে বলে ঢালু পাহাড়ী জমি বা terrace চাষের একমাত্র উপযোগী বলে বেছে নেয়। আর সমতল জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকে। একই জমিতে বার বার জুম চাষের অনুপযোগী বলে ভিন্ন ভিন্ন জমিতে ছুটে যেতে হয়। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে আদিবাসী গোষ্ঠীরা বসবাস করে ও এক একটি গোষ্ঠীর অধীনে এরকম একটি ব্যাপক অঞ্চল থাকে যেখানে গোষ্ঠীর সবাই যৌথভাবে চাষ আবাদ করে ফলে জমির উপর কোন ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয় না। সমাজ জীবনেও প্রধানরা প্রথাগত আচার অনুশাসনের সাহায্যে গোষ্ঠী সমাজ পরিচালনা করে এবং এতে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠার কোন সুযোগ থাকে না। গোষ্ঠী প্রধানরা কোন অবস্থাতেই শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় না। খুব স্বাভাবিক কারণেই গোষ্ঠী প্রধানরা আদিবাসীদের দৃষ্টিতে শ্রেণীশত্রু হিসাব চিহ্নিত হয় না। সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানগুলি উৎপাদনের ন্যায় সর্বসাধারণের সমানাধিকারে থাকে। তাছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে কোন শ্রম বিভাগ না থাকার দরুন কোন জটিল শ্রেণীবিন্যাসের সৃষ্টি হয়নি। এঁদের মাঝে পেশাগত কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। যেমন কামার কুমার তাঁতি, জেলে, নাপিত ইত্যাদি। পেশাগত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি এবং সামাজিক প্রয়োজন তেমন দেখা দেয়নি। তাই শ্রমদক্ষতার নিতান্ত অভাব ছিল বলেই উন্নত জাতির দ্বারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে আদিবাসীরা। ইতিহাসের আগেকার যুগগুলিতে প্রায় সবত্রই সমাজের মধ্যে একটা অত্যন্ত জটিল স্তর বিন্যাস নানাবিধ পদমর্যাদার স্তর ভেদ দেখা যেতো। যেমন প্রাচীন রোমের প্যাট্রিসিয়ান, নাইট, প্রিবিয়ান, ক্রীতদাস অর্ধদাস, সামন্তপ্রভু গিল্ডভুক্ত কারিগর, শিক্ষানবীশ এই সব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উপশ্রেণী।[5] পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে আমরা নমঃশূদ্র জলচর, মুচি, কুলীন ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সামাজিক উপশ্রেণী দেখেছি। সুতরাং আদিম সামন্ত সমাজে আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ না থাকার দরুন এবং পেশাগত শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির দরুন ঐ সমস্ত উপশ্রেণীগুলির কোনকালেই উন্মেষ ঘটতে পারে নি। এককথায় অর্থনীতির সরলভাষায় শ্রেণীহীন বলেই উপশ্রেণীর বিকাশ ঘটে নি। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সমতল বাঙ্গালীদের ব্যাপক আগমনের ফলে আদিবাসী সমাজে কিছুমাত্রায় শ্রেণী বিভাজনের

সৃষ্টি হয়েছে এবং এ জাতীয় চেতনাব বিকাশ লাভ কবেছে। নানাবিধ ভূমিসংস্কাব আইন, সবকাব কর্তৃক নানা প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণেব অাইন, ব্যক্তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা, নয়া ভূমি ব্যবস্থাব প্রবর্তন ইত্যাদি সমুদয় কাবণগুলিই এব জন্যে দাযী। লাঙ্গলেব কৃষকেবা শেষ কর্পদকটুকু দিয়ে হলেও নানাবিধ খাসজমি দখল কবেছে এবং এইভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে ত্রিপুবাব গ্রাম গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত কৃষক শ্রেণীব উন্মেষ ঘটতে থাকে। এটাই হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসেব প্রথম সোপান এবং সামাজিক ইতিহাসেব গতিশীলতাব বেগ সৃষ্টি কবে। এব শুরু ত্রিশেব দশকেব শুরুতে।

উপনিবেশ ভাবতবর্ষে ত্রিপুবাব বাজা স্বাধীন ছিলেন এব, বাজ্যেব অর্থনৈতিক স্বকীয়তা দীর্ঘদিন বজায ছিল। গোঁড়া হিন্দু বাজাবা খ্রীস্টান মিশনাবীদেব বাজ্যে প্রবেশাধিকাব দেন নি। ফলে উত্তবপূর্ব ভাবতেব অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলেব ন্যায ত্রিপুবায খ্রীস্টান মিশনাবীদেব প্রভাব একেবাবেই ছিলো না। একথা অনস্বীকার্য যে মিশনাবীদেব অনুপ্রবেশ হয নি বলেই ত্রিপুবাব আদিবাসীদেব তুলনায সমার্জিত (without Western sophistication) বযে গেছে। তদানীন্তন বাজাবা অনুন্নত কৃষি অর্থনীতিব উন্নতি কল্পেই বঙ্গদেশ থেকে আগত উন্নত লাঙ্গলেব চাষকে স্বাগত জানিয়েছেন। এবং বাঙ্গালীদেব আদিবাসী সমাজেব উপব আধিপত্য বিস্তাবেব প্রশস্ত সুযোগ কবে দিয়েছেন। ত্রিপুবাব মহাবাজাবা এই উন্নত চাষী সম্প্রদাযকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ স্থাযী নাগবিকেব মর্যাদা দেন এবং বিনিময়ে এদেব আনুগত্য ও সাহচর্যে বাজ্যে অপেক্ষাকৃত একটা উন্নত কৃষি ব্যবস্থা কাযেম কবতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকটা যেমন আসামেব বৃটিশ চা বোপণকাবীবা (tea planters) পূর্ববঙ্গ থেকে ধনী কৃষক সম্প্রদাযকে আহবান কবে সমতল জমিব উপব জমিদাবী সামন্ত প্রথা কাযেম কবে। কিন্তু ত্রিপুবাব ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয নি। অর্থাৎ ত্রিপুবায সামন্ততন্ত্রেব পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয নি। যদিও চুল-চেবা বিচাব কবলে গোটা বঙ্গদেশেই সামন্ততন্ত্রেব classical development ঘটে নি। ত্রিপুবা পূর্ববঙ্গেব সমাজ অর্থনীতিব প্রভাবে সবিশেষ প্রভাবান্বিত। পূর্ববঙ্গেব ইতিহাস পর্যালোচনা কবলে দেখা যাবে যে গ্রামবাংলাব সামন্ত অর্থনীতি ইউবোপেব প্রচলিত সামন্ত অর্থনীতিব ন্যায বিকশিত নয। আগেই বলেছি বাংলায গ্রাম সমাজ আত্মনির্ভবশীল ও স্বযংসম্পূর্ণ। আধুনিক উৎপাদনে কলাকৌশল ও যান্ত্রিক প্রভাবেব অভাব হেতু সামন্ততন্ত্র এমন এক জটিল স্তবে নেমে এসেছিল যাব জন্য শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক কাঠামোব দ্বাবা সম্পূর্ণ নিযন্ত্রিত হয নি। মধ্যযুগেব সামাজিক শ্রেণী বিচাবেব সবপ্রধান মানদন্ড ছিল বংশ গোবব বা বক্তেব সম্পর্ক। বংশানুক্রমে শ্রেণী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত। সমাজেব কুলীন পবিবাব দবিদ্র হলেও শ্রেণী মর্যাদাব উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতো। শ্রেণী, কাবিগব শ্রেণী এমন কি অবস্থাসম্পন্ন ছেলে বা কৃষক ধন সম্পত্তিব দিক দিযে উচ্চশ্রেণী হওযাব যোগ্যতা লাভ কবলেও তাঁদেব সেই মর্যাদা দেওযা হত না। বংশ ও বক্ত সম্পর্কেব অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে মধ্যযুগেব সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস সীমাবদ্ধ ছিল। তাই আভ্যন্তবীণ ন্যায কাঠামোও সেকালেব অর্থনীতিব কাঠামোব অচল ও স্থিতিশীল ছিল। যাব জন্য সামন্তবাদেব বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পাবেনি। আজকেব দিনে এব আধা সামন্ততান্ত্রিক চেহাবা একটা উৎকট কদর্য রূপ পবিগ্রহ কবেছে। ভৌগোলিক দিক দিযে ত্রিপুবা বাজ্য পূর্ববঙ্গেব অন্তর্ভুক্ত না হলেও এব সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ববঙ্গেব আশ্রযে লালিত হযেছে। পূর্ববঙ্গেব মধ্যযুগীয শ্রেণী বিন্যাস ত্রিপুবায বর্তমানেও বিদ্যমান ত্রিপুবাব মৌল সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সামন্ততন্ত্রেব সঙ্গে বাংলাব আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাব এক উদ্ভুত সংমিশ্রণেব ফলে। আগেই বলেছি আদিম সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায কোন অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজন হয নি অর্থাৎ সমতলেব ন্যায মধ্য কৃষক, ধনী কৃষক ও গবীব কৃষক বা ভূমিহীন ক্ষেতমজুব ইত্যাদি শ্রেণীব উদ্ভব হয নি। এদিকে বাঙ্গালীব ব্যাপক অনুপ্রবেশ ফলে বংশ গৌবব বা বক্ত সম্পর্কেব ভিত্তিতে গড়ে ফলে বংশ গৌবব বা বক্ত সম্পর্কেব ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বাজ্যেব সমাজ কাঠামোব ভিৎ তৈবী হতে লাগল। বংশ গৌবব বা রক্ত সম্পর্কেব আভিজাত্যকে আশ্রয কবে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তবা ত্রিপুবাব উচ্চ শ্রেণীব মর্যাদায প্রতিষ্ঠিত

হ্তে লাগল। এমন কি কেউ কেউ কর্পদক শূন্য অবস্থায় এসেও কেবলমাত্র কৌলীন্যে আভিজাত্যকে একমাত্র পুঁজি করে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। এরা নিতান্ত ভাগ্যবান।

১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ 'জমা কায়েম তুষারী' নামে এক ভূমি বন্দোবস্ত চালু করেন যার ভিত্তিতে ১৭৯৩ সালে বৃটিশ শাসকরা ১০ বছরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে এশিয়াটিক সামন্তবাদ ধ্বংস করে দেয়।[৬] এতে উদ্ভব হয় নতুন এক জমিদার শ্রেণীর। এবং প্রতিষ্ঠা হয় ভূমির উপর স্থায়ী ব্যক্তি স্বত্বের। এই ভাবেই ক্লাসিকেল সামন্তবাদের কাঠামো তৈরী হয়। বৃটিশের এই নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে শিকার হয়েছে অগণিত কৃষক কারণ উৎপন্নের ১০ ভাগ রাজস্ব হিসারে জমিদারদের কাছ থেকে বৃটিশ আদায় করে নিত আর এক ভাগ থাকত জমিদারদের প্রাপ্য। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব যথা সময়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের সঙ্গে জমিদারদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। প্রজামঙ্গল বা জমির উন্নতির জন্য দায়িত্ব জমিদারদের বা রাজস্ব আদায়কারী কন্ট্রাক্টরদের। কিন্তু দেখা গেল জমিদাররা রাজস্ব আদায় ছাড়া বা ইচ্ছামত জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করা বা ক্ষুদ্র মালিক তৈরী করা ছাড়া আর কোন হিতকর কাজে দায়ী রইলেন না। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে[7] ৫০ জন মধ্যস্বত্বভোগীর উল্লেখ পাওয়া গেছে কেবলমাত্র একটি জেলার ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্বের অস্ত বেড়েছে এবং বৃটিশের হাতে প্রকৃত মূলধন তৈরী হয়েছে। আর অপর দিকে ব্যভিচারী অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর বা ক্ষুদ্রে জমির মালিকদের অত্যাচারে ও নির্যাতনে বহু সংখ্যক কৃষক ও কৃষিমজুর জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। ইংলণ্ডে এইভাবে যারা উৎখাত হয়েছে এরা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গদেশের তথা গোটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ উৎখাত কৃষকশ্রেণী শহরের কল কারখানায় সর্বস্বান্ত মজুর শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি। কারণ সংখ্যানুপাতে আমাদের দেশে কল কারখানা গড়ে উঠে নি এবং মজুরের চাহিদা থাকে নি। চা বাগিচা ইত্যাদি শিল্প সংগঠনে অত্যন্ত সস্তা দরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজুর তৎকালে পাওয়া যেত। সুতরাং আমাদের দেশের উৎখাত কৃষকের একটা ব্যাপক অংশ ভবঘুরে, ভিখারী ও চোর ডাকাতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তৎকালে দেশে ভবঘুরে, ভিখারীও চোর-ডাকাতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য।

"They were turned enmassé into beggars, robbers, vagabonds, partly from inclination, in most cases from stress of circumstances".[৮]

বাংলাদেশে বিশেষ করে কুমিল্লা (তৎকালের টিপারা) শ্রীহট্ট নোয়াখালী জেলা থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাবুকে উৎখাত কৃষকেরা ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক ভবঘুরে অলস কৃষক ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক ভবঘুরে অলস কৃষক ত্রিপুরা রাজার শাসনাধীনে সামন্ত শ্রেণীর 'টাউট' -এ রূপান্তরিত হয় এবং নানাবিধ ছলা কৌশলের গুণে নিরীহ আদিবাসীদের এলাকায় অসৎ ব্যবসার ফাঁদে পেতেছিল। উৎখাত কৃষকদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষকরা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিশ্রমী বলেই ত্রিপুরার সমতল জমির ব্যাপক অংশ এদের চাষের আওতায় ছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগের পর হিন্দুরা এদের জমি বিনিময় সূত্রে লাভ করে। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক আদিবাসীদের তাদের ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে ত্রিপুরার ইতিহাস আরেকটু কলঙ্কিত করেছে। এ ইতিহাস একেবারে বিরল নয়। ১৯৪৭ সালের হিন্দুদের ব্যাপক অভিযান ত্রিপুরার সামাজিক ইতিহাসকে যেমন গতিশীল করেছে তেমনি নব্যসামন্তবাদের সঙ্গে আদিম সামন্তবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণে ত্রিপুরার মহাজনী, এ জোতদারী ব্যবস্থা চালু হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রাজারা আদিবাসীদের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি। অথচ এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে চাষের উন্নতির জন্য

আদিবাসীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত "উন্নত" রিয়াং সম্প্রদায় বেশ কয়েকবার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং তাদের দাবী ও আবেদন রাজা প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে রিয়াং গোষ্ঠীর মাঝে আদিম বৈশিষ্ট্য গুলি (Primitive Tribal Character) সবচেয়ে প্রকটভাবে বিদ্যমান কারণ দীর্ঘকাল এরাই নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নানাবিধ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং পরিণামে টিকতে না পেরে সুদূর অন্ধকারের কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

তৎকালীন নিরীহ আদিবাসীরা রাজাকে "ঈশ্বর" বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করত। এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রাজার কুশাসন বা অত্যাচারকে মেনে নিত। দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম দারিদ্র, প্রশাসনিক অবিচার, রাজকর্মচারীদের নির্মম উৎপীড়ন সব মিলিয়ে আদিবাসী সাধারণের জীবন ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে পড়লে চল্লিশের দশকে একবার আদিবাসী রিয়াংদের খরা ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধে। ইতিহাসে "রিয়াং বিদ্রোহ" নামে খ্যাত এই অধ্যায়টির সঠিক মূল্যায়ন এখনও করা হয়নি বলে এর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এর আগে রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল বাঙালী ভদ্রলোকের চেষ্টায় শহরে "ত্রিপুরা জনমঙ্গল" সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হয় যাতে আদিবাসী সাধারণের মনে কোনরূপ হিংসা বিদ্বেষ দানা বাঁধবে না পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরায় বাঙালী আদিবাসী সম্পর্ক যে খুব একটা প্রীতিকর ছিল তা নয়। খুব স্বাভাবিক কারণেই উন্নাসিক বাঙালীরা যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন তাতে আদিবাসীদের উপর একটা অবজ্ঞা চিরকালই প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজা রাজনৈতিক শঠতার আশ্রয় নিয়ে আদিবাসীদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রজামঙ্গল আইন প্রণয়ন করেন এবং এই আইনের বলে গ্রাম পর্যায়ে একটা কমিটি গঠন করে প্রতাপশালী ভদ্রলোক মহাজন এবং অবস্থাসম্পন্ন 'টাউট' দের হাতে গ্রামের সামন্তশাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার দ্বারাই রাজা গ্রাম পর্যায়ে শ্রেণীশোষণের ভিৎ এবং ইমারতগুলো গড়ে তুললেন। অধিকাংশ "ভদ্রলোক বাঙালী" অর্থাৎ কুলীন ধনী কৃষক রাজার এই নীতি ধর্মের প্রতি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করলেন আর এই সুযোগে প্রশস্ত করে নিলেন নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার পথ। ঐ সমস্ত কুলীন ভদ্রলোকেরা রাজার প্রদত্ত "চৌধুরী বা রায় উপাধিতে ভূষিত হওয়ার বিনিময়ে প্রত্যেকটি আইন ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানালেন এবং রাজাকে তুষ্ট করলেন। রাজাদের বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা তার স্বজাতি প্রীতির উর্ধে ছিল। প্রশাসনিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আধা-শিক্ষিত বাঙালীরাই কালক্রমে 'বনগাঁর শেয়ালরাজা বুদ্ধিতে কাশ্মীরি গাধার বেহদ্দ - বিদ্যার মূর্তিমান মা। বারোইয়ারী খেম্টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত।' (হুতোম প্যাঁচার নক্সা —কালীপ্রসন্ন সিংহ)। চাক্‌লা রোশনাবাদে রাজার জমিদারী থাকার কালে এই আত্মীয়তার মেলবন্ধন আরো সুদৃঢ় ছিল। এরা উৎকোচ লোভী, দুনীর্তিগ্রস্ত, এবং অপদার্থ কর্মচারী। অপর দিকে ব্যাপক কৃষকের একটি অংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী ও দক্ষ কৃষকদের চেষ্টায় ত্রিপুরার সমতল জমিক কৃষির উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল। কারণ এরা হিন্দুদের তুলনায় কম অলস অথচ দক্ষ কৃষি শ্রমিক। দেশভাগের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ দাঙ্গা তাড়িত হয়ে হিন্দু কৃষকেরা এ রাজ্যে এসেই একদিকে যেমন আদিবাসী অঞ্চলে জমি দখল করে অপরদিকে মুসলমানদের কর্ষিত জমি সস্তায় ক্রয় করে অথবা সম্পত্তি বিনিময় করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ঠিক সেই সময়েই আদিবাসীদের বিপর্যয় আরো ঘনীভূত হয়। এ প্রসঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক Frontier (dt. 12/11/77 -এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে ঃ "A Section of Bengalees belonging to the propertied gently migrated from the erstwhile East pakistan to Tripura and settled down in the early fifties exchanging lands with their Muslim Counterparts and then started grabbing khas lands not owned by private individuals. The Tribal people, worn down by the relentless struggles of the past against feudal exploitation could not stand up to the renewed onslaught."[৭]

ছোট ব্যবসায়ী যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা ভাবে নি এদের একটা অংশ শ্রীহট্ট, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে নুন, শুটকী গুড় ও নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য নিয়ে আদিবাসী জনপদে চুটিয়ে ব্যবসা চালাতো। ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীরা এক কদর্য অসম ব্যবসার মাধ্যমে প্রধানতঃ তুলা, পাট ও ধান নিয়ে যেতো। আদিবাসীদের সরলতার সুযোগে ওজনে ঠকাতো। অনেক সময় নানা শঠতার আশ্রয় নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ দামে দ্রব্য সামগ্রী কেড়ে নিয়ে যেতো। ঐ সমস্ত চতুর ব্যবসায়ীদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হত নিরীহ জমাতিয়া ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায়।

বর্তমানে আদিবাসীদের সুদূর বস্তি অঞ্চলে বাঙালী অসৎ ব্যবসায়ী ও কনট্রাকটররা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধাবে ব্যস্ত। এমন কি জুমচাষের আগে দাদন দেওয়া এবং চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার মত জঘন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত এমন সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টান্ত ও অনেক। আদিবাসী রমনীর ইজ্জৎ লুটে নেওয়া এবং এদের নিয়ে কাব্য করার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আদিবাসীদের প্রতি প্রায় বাঙ্গালীরাই উন্নাসিক মানসিকতা পোষণ করে থাকে বলে আদিবাসীদের বশ্যতা দাবী করে। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই অসৎ ব্যবসায়ীরা নানাবিধ উৎপীড়ন চালিয়ে আজ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন অনেক যারা শুরুতে হয় মোটর ড্রাইভার নয়ত গ্রাম্য টাউট হয়ে আদিবাসী জনপদে জীবিকা নির্বাহ করত। এরা আজকে টাকা বা সম্পদের অধিকারী হয়ে সমাজের স্তম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং এদের আগমন আদিবাসীদের সভ্য করেছে এ ধরণের সম্পর্ক ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ ইতিহাসের পট অনেক পাল্টে গেছে।

মধ্যবিত্ত অর্থনীতি ও সম্ভোগবাদ ঃ

দীর্ঘকাল ইউনিয়ন টেরিটরি থাকার পর ত্রিপুরা ১৯৭২ সালে পুর্ণরাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করাটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ কিছুকাল আগেও এ রাজ্যটি একটি জেলা হিসাবে ছিল এবং এর আয়তন ভারতের যে কোন রাজ্যের একটি ছোট জেলা অপেক্ষা অনেক কম। ভারতের অন্যান্য বিকাশশীল রাজ্যগুলোর সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলেও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে এ রাজ্য সর্বভারতীয় ধারায় অন্তর্ভূক্তির মর্যাদা লাভ করে। আদিকাল থেকেই ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বর্তমানেও এ রাজ্যের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিব সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক বলতে গেলে প্রায় অক্ষুন্নই রয়েছে। অর্থনীতিগত ভাবে এ রাজ্য ব্যাপক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান কলেবর বর্তমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিগ্রহ করেছে। কম হলেও ২১ লক্ষ জন সংখ্যার এই ছোট্ট রাজ্যটির উন্নয়ন ও প্রগতির চিত্র সারা ভারতের তুলনায় কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ রাজ্যের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে বর্তমানে এ রাজ্যটি মধ্যবিত্ত অর্থনীতির গতি ধারায় প্রবহমান এবং গোটা অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা। এ বছর (১৯৮১-৮২) পর্যন্ত এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় ঋণের বোঝা মোট ০.৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি ত্রিপুরাবাসীর মাথা পিছু ঋণের বোঝা হচ্ছে প্রায় ২৫০ টাকা। সাধারণভাবে বলতে গেলে এ রাজ্যের আয় বনজ সম্পদ থেকে যা আসে তা ব্যয়ের তুলনায় অবশ্যই অতি সামান্য। মোট বাৎসরিক আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা।

এ রাজ্যে ভারী ও মাঝারী কোন শিল্পকারখানা নেই। হালে পাটের কল বসেছিল, কাঁচা মালের অভাবে তাও প্রায় অচল অবস্থায় কারখানা চলছে। প্রতি বছর ঘাটতি দেখানো হচ্ছে। সরকারী উদ্যোগে পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে। তাও নাকি লোকসান দিয়ে চালাতে হচ্ছে। রেল নেই। একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোটর পরিবহণের উপর নির্ভরশীল। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মোটর

গাড়ীর উপর নির্ভরশীল। তাই মোটর গাড়ীর মেরামতির ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার সংখ্যা অনেক। গোটা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের একটা উল্লেখযোগ অংশ মোটর কর্মী বা ড্রাইভার ইত্যাদি। শহরে বা আধা শহরে রিক্সা চালক বা মোটর কর্মীর জীবিকা নির্বাহ করে প্রায় অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ। আগে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু কল্যাণ বা পুনর্বাসনের জন্য প্রচুর টাকা এ রাজ্যে ছড়িয়েছিল তার একটা সিংহভাগ হস্তগত হয়েছে টাউট কনট্রাকটর এবং এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের দ্বারা। তবে এটা ঠিক যে ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তু এ রাজ্যে পুর্নবাসন হয়েছে। কর্ষণযোগ্য জমি সবাইকে বিতরণ না করলেও অধিকাংশ উদ্বাস্তু ক্ষুদ্র শিল্পে অথবা খাস জমির দখলস্বত্ব নিয়ে নানাবিধ জীবিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

রাজ্যে মোট ৫৪টি চা বাগিচার মধ্যে দু'একখানা বাগিচা ছাড়া বাকী সবটাই জরাগ্রস্ত ও জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং চা শিল্পেরও কোন ভবিষ্যত আছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। হাজার হাজার একর জমি চা বাগিচার আওতায় যা ছিল তা আজকে আখ ও অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার মত পুঁজিপতি জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব আদৌ হয় নি। ষাটের দশক পর্যন্ত এ রাজ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য (Indigenours products) বাজারে বন্দরে দেখা যেতো। কিন্তু আজ আর ঐ সমস্ত উৎপাদন কোথাও চোখে দেখা যায় না। এর পেছনের কারণ একটিই যে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর একচেটিয়ে পুঁজির উৎপাদন স্থানীয় উৎপাদনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয় না। এটা হচ্ছে সাধারণ সমাজ বিকাশের নিয়ম। ত্রিপুরা বা অন্যান্য অঞ্চলে সমাজ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচলিত নিয়ম খাটে না। ত্রিপুরায় তাঁত বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। পূর্ববঙ্গের সুনিপুণ তাঁতী, কুমার, কামার ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল বটে কিন্তু ইতিহাসের নিয়মে এরাও আজ ধ্বংসের মুখে। তাঁত বস্ত্রের যেমন চাহিদা নেই, কুমারের হাঁড়ি পাতিলের ব্যবহারও একেবারেই লোপ পেয়েছে। কারণ মফতলাল - জিয়াজির উন্নত বস্ত্র বা ক্রাউন কোম্পানীর এলুমিনিয়াম বা নেসলস্ কোম্পানীর গুঁড়া দুধ ইত্যাদি স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে দখল করবে এ আর তেমন আশ্চর্যের কি ? ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে শিশুকে আজ গোয়ালের দুধ না খাইয়ে কোম্পানীর লেবেল আঁটা গুঁড়া দুধ খাওয়ানো অনেক সুবিধাজনক। আজ ত্রিপুরায় গণ্ড গ্রামে বস্তিতেও এ ধরনের একচেটিয়ে পুঁজির উৎপাদনে ছেয়ে গেছে। গরীব আদিবাসী যখন কাঁধে করে কার্পাস তুলা বাজারে সস্তায় মহাজনের কাছে বিক্রি করে দুটো টাকা হাতে পায়, ফেরার পথে মনোহারী দোকান থেকে এক বোতল Thums-up কিনে খেয়ে চেখে দেখে। একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদন এতকাল ত্রিপুরার বাজার দখল করার পথে যে প্রধান অন্তরায় ছিল আজকে যান ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আনুকূল্যে এই সমুদয় বিষয়গুলি আমাদের চোখে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলেই ধরা দিয়েছে। ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তই হচ্ছে এই পরিবর্তনের মূল উৎস।

সমাজ জীবনের বিকাশে অদ্ভুত অনড়তা। কিন্তু আজকে যান ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আনুকূল্যে এই সমুদয় বিষয়গুলি আমাদের চোখে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলেই ধরা দিয়েছে। ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তই হচ্ছে এই পরিবর্তনের মূল উৎস।

গোটা ভারতবর্ষের ৮০ ভাগ কৃষিজীবী আর ২০ ভাগ শহর বা শহরাঞ্চলে নানাবিধ পেশায় বা শ্রমে নিয়োজিত। গ্রামের ৮০ জনের মধ্যে সাধারণ পরিসংখ্যান দেখা গেছে ৫ জন জমিদার ভূস্বামী, ৫ জন ধনী কৃষক, ৯.৮০ জন মধ্য কৃষক আর বাদ বাকী ৬০.২০ জন গরীব কৃষক শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণী বিভাজন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ব্যাতক্রম। ত্রিপুরায় একটা অসম শ্রেণী বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এর কারণগুলো গোড়াতেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরায় মূলতঃ মধ্য কৃষক অর্থনীতির (Middle peasant economy) দ্বারা প্রভাবিত। জমিদার ভূস্বামী নেই, ধনী কৃষক দু'একজন আছে বটে তবে মূলতঃ ব্যাপক সংখ্যক মধ্য কৃষক গরীব কৃষকের প্রাধান্যই হচ্ছে ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতির মূল। জমিদারী শোষণের তীব্রতা নেই বটে কিন্তু আধাসামন্ত

সমাজের তীব্র শোষণ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে ব্যাপক জনগণকে। ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইনের বলে কিছু সংখ্যক ধনী কৃষকের উদ্ভব হয়েছে। মূলতঃ মধ্য কৃষকের উৎপাদনই হচ্ছে অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ঠিক অনুরূপভাবে শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগের চেয়ে বেশি। তার প্রধান কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম ও শহর এই দুয়ের মাঝে কোন বিভেদ রেখা টানা বড় কঠিন। এরও কারণ হচ্ছে এ রাজ্যে কোন শহরায়ন (Urbanisation) ঘটে নি। পরিকল্পনা মতো এবং স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা শহর গড়ে উঠেনি। অর্থাৎ শহর গড়ে ওঠার প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো এখানে অনুপস্থিত। গ্রাম্য ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় তথাকথিত শহরে আশ্রয় পেয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে শহরবাসীদের ২০ ভাগের মধ্যে ৮.৮৩ ভাগই হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত, ৮.৮৭ প্রলেটারিয়েট আর বাদ বাকী লুম্পেন ভিখারী ইত্যাদি। ত্রিপুরার বেলায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা নিতান্ত নগন্য। এমন কি প্রলেটারিয়েট বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে ত্রিপুরার প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারার সংখ্যা একেবারেই নেই বললে চলে। কারণ proletarisation বা মজুরায়নের জন্য যে শিল্প পুঁজির বিকাশ হওয়ার দরকার তা এখানে আদৌ হয় নি। আগরতলা বা আশেপাশে শহরাঞ্চলে যে সংখ্যক শ্রমিক বা মজুর দেখতে পাওয়া যাবে তাদের অধিকাংশ একটু না একটু জমির সঙ্গে সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। রিক্সা চালক বা ইটভাটার মজুর বা গৃহস্থালি কামলা, ঝি, চাকর বা ইত্যাদি শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় নি। কিছু সংখ্যক বাউগুলে ঝি চাকর রয়েছে যাদের ঘর-বাড়ী বা জমির সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক নেই। এদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। প্রত্যক্ষ ভাবে জমির মালিক এমন সংখ্যা হয়ত খুবই নগণ্য কিন্তু জমির সঙ্গে সম্পর্ক বা গ্রাম্য সামন্ত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সংখ্যা দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকলেও পুরোপুরি ভাবে এরা শ্রমিক চরিত্র পরিগ্রহ করে না। প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারা শ্রেণীর যে অন্তত জঙ্গী বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে তা এদের মধ্যে বিদ্যমান নয়। এদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক উৎপত্তি হচ্ছে কৃষিজীবন। সুতরাং চরিত্রগত ভাবে এরা সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত নয়।

রাজ্যের মোট জন সংখ্যার শতকরা ৩.৭ সরকারী আধা সরকারী কর্মচারী। বিগত ১০ বছর আগে এই সংখ্যা অর্ধেক ছিল। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ছোট বা মাঝারি দোকান বা অন্যান্য ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। ২০ বছর আগেও দোকান ব্যবসায়ী বা অন্যান্য ব্যবসায়ী জীবিকাতে জড়িত লোকের সংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার অর্থাৎ মোট সংখ্যার ৩.৭%। এদের বেতনভাতা ও অন্যান্য যাবতীয় খাতে রাজ্য সরকারকে মোট ব্যয়ের ৩৮% ব্যয় করতে হচ্ছে।[11] বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ বা সাহায্যের নামে অর্থ এ রাজ্যের অর্থভাণ্ডারে জমা হচ্ছে তার বিপুল অংশ ব্যয় হচ্ছে অনুৎপাদিত ক্ষেত্রে। রাজ্যের সর্বাধিক ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে এরপর পুলিশ জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের ভারতবর্ষের অন্যান্যও রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমানুপাতিক হারে অনেক বেশি এবং প্রায় সবকটি শিক্ষায়নতই সরকারের দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও সমান দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা এই দুইটি বিভাগে যে সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী নিয়োজিত আছে তা সমগ্র রাজ্যের মোট কর্মচারীদের ৪৭ শতাংশ। সুতরাং শিক্ষা বিভাগে ব্যয় সর্বাধিক হবেই। মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সংখ্যা বিগত ৫ বছরে বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ব্যয়ের ৩৮ শতাংশ টাকা মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের হাত দিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে বলে এর একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাজ্যের গোটা অর্থনীতেতে পড়ছে। যে বিপুল অর্থ এই শ্রেণীর হাতে আসছে তার অধিকাংশ ব্যয় হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের নিমিত্ত। মধ্যবিত্ত কর্মচারী মানেই সম্ভোগবাদী শ্রেণী যাঁরা উৎপাদনে জড়িত না হয়ে উৎপাদনের সিংহভাগ ভোগ করেন। আজকের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত রয়েছে সেই মধ্যবিত্ত কর্মচারী অল্পসংখ্যক ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাঝে। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সম্ভোগবাদীদের ভোগের প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমারি মনোহারী দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত দোকান পাটের ব্যবসা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে রাজ্যের প্রায় সবকটা শহরে। মূলতঃ একচেটিয়ে পুঁজির উৎপাদনে বিপুল

সম্ভার ভোগবাদীদের (Consunierist) প্রলুব্ধ করছে। একদিকে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান টাকার যোগান বৃদ্ধি আয়াসপ্রিয় সান্তোগাবাদী মধ্যবিত্তের কলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে একচেটিয়ে উৎপাদনের চাহিদা বাড়ছে।

বিগত বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় কোটি কোটি টাকা (অন্যূন ২৫০ কোটি টাকা) উদ্বাস্তু জনকল্যাণের খাতে বরাদ্দ হয়েছিল সেই বিপুল অর্থ রাজ্যের অনেক সৌভাগ্যবান ঠিকাদার কন্ট্রাক্টর কালো ব্যবসায়ীদের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দিয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আধুনিক পণ্য সামগ্রীর দোকান গড়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্তের বা নিম্নবিত্তের হাতে ঐ বিপুল অর্থের একটা অংশ সমাগম হলে পরে মূলতঃ ভোগবিলাস ব্যসনেই ব্যয়িত হচ্ছে অধিকাংশ অর্থ আর নতুবা ছন বাঁশের ঘর দালান কোঠায় পরিণত হওয়া এবং ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে টাকা নিয়োজিত হয় নি। এ রাজ্যে ব্যাঙ্কের ব্যবসা বেড়েছে তবে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার এসে দাঁড়িয়েছে আছে। আগে এ রাজ্যে মাত্র তিনটি ব্যাঙ্ক ব্যবসা ক্ষেত্রে লগ্নি করত, আজকে ১০টি রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখা এ রাজ্যের রাজধানীতে দাঁড়িয়েছে আছে এবং বিভিন্ন খাতে, সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। ব্যাঙ্কগুলি মোট আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ৪১ কোটির উর্ধ্বে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয় যে আমানতের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তত পরিমাণ ব্যাঙ্ক ব্যবসাখাতে লগ্নি করতে পারছে না। শিল্প কারখানা নেই বলে বৃহৎ ব্যবসা গড়ছে না। দোকানপাটের ব্যবসা ছাড়া আর তো কোন উৎপাদনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। যার খাতে বৃহৎ ঋণ (Long Term Credit facility) দেওয়া সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক পুঁজির প্রসার এ রাজ্যে সম্ভব না হওয়ার কারণ কেবলমাত্র শিল্পায়ণের অভাব বললেই যথেষ্ট নয় এর পেছনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, ত্রিপুরার অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা তাঁদের বংশগত বাণিজ্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে পুঁজির প্রসার নেই।

অষ্টাদশ শতকের শেষে পূর্ববঙ্গের নব্য ধনিকরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রধানত জমিদারী কিনতে ব্যয় করতেন। ১৭৯৩ সালের ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ধনিক শ্রেণীর প্রধান ঝোঁক জমিদারী প্রথার লাভের দিকে। Karl Marx তার বিখ্যাত Notes on Indian History গ্রন্থে বলেছেন, Greater part of the province's Landholdings fell rapidly into the hands of few city capitalists who had spare Capital and rapidly invested it in land".[12] কিন্তু ত্রিপুরার যে কয়জন নব্য ধনিক পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন এবা কেউই এ ধরনের জমিদারী প্রসারের জন্য পুঁজি জমিতে বিনিয়োগ করেন নি। এবং কিছু পরিমাণ জমি কিনে রাজ্যে এদের নাগরিকত্ব নিশ্চিন্ত করেছেন। যতদূর সম্ভব ধনী ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় সঞ্চিত পুঁজি আটকে রেখেছেন। ভূসম্পত্তি উপর নানাবিধ আইন (Land celing) প্রবর্তনের ফলে আজ আর এ সুবিধাটুকুও নেই। সুতরাং ধনিকদের হাতের উদ্ধৃত টাকা বড় বড় একচেটিয়ে পুঁজির মালিকদের হাতে ব্যাঙ্কের মারফত চলে যেতে বাধ্য। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসা এ রাজ্যে তার মৌল উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করতে পারছে ঠিকই —যেমন কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ দানের মধ্যে দিয়ে মধ্য কৃষকের ও ধনী কৃষকের কলেবর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ পরোক্ষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে sovietisation এর মাধ্যমে জোতদারী ও মহাজনী প্রথার প্রাবল্যের বিলুপ্তি ঘটানো এবং গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার এক শ্রেণীর "নব্য কুলাক" তৈরী করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আধা-সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের সহাবস্থান কিছুকাল স্থায়ীকরণ। অনুরূপভাবে শহর ও শহরতলী অঞ্চলে মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধিতে "সম্ভোগবাদের মাত্রা বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। টি-ভি ফ্রিজ, স্কুটার, মোটর বাইক, ছোট ব্যবসা কন্ট্রাক্টারি, গাড়ী ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক ঋণের অবাধ সুবিধা মধ্যশ্রেণী ও নিম্নবিত্তশালীকে প্রায়শই প্রলুব্ধ করছে। সুতরাং কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে বা শহরে এদু'য়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আজকে আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করছি।

চাকুরী বা নানাবিধ কর্মসংস্থানের উপায় চাপ সৃষ্টি করার জন্য সরকারী অর্থ উৎপাদনী সংগঠনে বিনিয়োগ করার কোনা সুবিধা না থাকার দরুণ সরকার সর্বোপবি অনুৎপত্তি ক্ষেত্রে ঢালাও ভাবে বিনিয়োগ করছেন। যেমন শিক্ষায়তন গড়ে বা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রসার ঘটিয়ে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী বাহিনী নিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছেন। বর্তমান সরকার বিগত চার বছরে মোট ৩০ শতাংশ চাকুরী সংস্থান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে সরকারী অর্থভাণ্ডারে অধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকারকে Reserve Bank এর উপর এখনও কোন Over-Draft করতে হয়নি।

অনেকের মতে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সাধারণের হাতে প্রচুর অর্থ সমাগমের ফলে রাজ্যে টাকাব যোগান এবং বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে রাজ্যের গরীব সাধারণ উপকৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন কুটির শিল্পে এবং কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে সাহায্য করছে। এ ধারণা মোটেই সঙ্গত নয়। তার একমাত্র কারণ, মধ্যবিত্ত কর্মচারী সাধারণ হাতের টাকা সাধারণ ভাবে জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে যত ব্যয় করবে বেশি। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে জীবন ধারণেব প্রয়োজনে ব্যয় না বাড়িয়ে অতিরিক্ত টাকা অন্যান্য ভোগ বিলাসে ব্যয় করার ঝোঁক বেশি মাত্রায় দেখা গেছে। ত্রিপুরার বিলাস বহুল জীবন যাপন করার সুযোগ নেই বটে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের বিচিত্র স্বাদ ও অভ্যাস রপ্ত করার প্রবণতা আজকাল মধ্যবিত্তদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। শহরায়ন বা শিল্পায়ন এ দু'য়ের অভাবে রাজ্যের সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে গড়ে উঠেছে এতে মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে কোন বিচিত্র ভোগ বিলাসের সুযোগ নেই বা বড় বড় শহরে বা নগরে দেখা যায়। সুতরাং সেদিক থেকে এ রাজ্যের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের সামনে বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের (Finished food) সমাহার ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। আদিকালের খাদ্যাভ্যাসগুলি কিছু কিছু পাল্টে গেছে। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার ৩/৪ বার ডাল ভাত খাওযার অভ্যাস পাল্টে বিভিন্ন স্নেক্স জাতীয় খাদ্য বা টিন ফুড ইত্যাদির প্রচলন লক্ষণীয়। তবে সর্বোপরি মধ্যবিত্তরা ভারী খাদ্যের উপর নির্ভরশীল বেশি। প্রথাগত খাদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায় নি। বস্তুত জীবন ধারণেব মানোন্নয়ন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই একচেটিয়ে পুঁজির ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অধিকতর ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। এতে রাজ্যের জন সাধারণেব সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। যেহেতু গোটা রাজ্যে মধ্যবিত্ত অর্থনীতির (Petty-bourgeois economy) দ্বারা পরিচালিত, সেই হেতু কিছুটা প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের উপর পড়বে এ আর তেমন আশ্চর্যের কী!

আজকে আদিবাসী সমাজেও একটা অদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে এবং এই নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীই আদিবাসী অঞ্চলের গোটা অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। রাজধানী শহরে দেববর্মণ সমাজের মধ্যবিত্ত চরিত্র পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে। আচারও রীতিনীতিতে এরা বাঙালী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির দ্বারা চালিত। চরিত্রগত দিক দিয়ে বাঙালীর তুলনায় অধিকতর অলস হলেও বর্তমানে নানাবিধ আইনগত সুবিধা লাভের দরুন এরা চাকুরী বা বিভিন্ন জীবিকার প্রশ্নে সুবিধাভোগী। আদিবাসীদের মধ্যে একদিকে যেমন নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে বিপরীতে গরীব আদিবাসী নিজস্ব ভিটেমাটি ছেড়ে নিতান্ত জীবিকার তাগিদে ছুটে এসেছে শহরে ; জীবিকা নিয়েছে হয় দিনমজুরের নয়ত রিক্সা চালকের যদিও শ্রমদক্ষতায় দিক দিয়ে বাঙালী শ্রমিকের তুলনায় এরা নিম্নমানের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ এরা হেরে যাচ্ছে, প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে আদিবাসীদের শ্রমদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী করে তোলার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ না থাকার দরুন সরকারী সমবায় সমিতির মাধ্যমে ল্যাম্পস্ -প্যাক্স এর মৌল উদ্দেশগুলো সার্থক হচ্ছে না। সরকার স্বল্প পরিমাণে ভোগ্য ঋণের (Consumption Loan) ব্যবস্থা করলেও আদিবাসী সাধারনের ক্রয়ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং নব্যমধ্যবিত্ত আদিবাসীদের মধ্যেই এ সমস্ত ভোগ্যপণ্যের যোগান সীমাবদ্ধ রয়েছে। খুবই নগণ্য সংখ্যক ধনী অবস্থাপন্ন আদিবাসী সর্দার উচ্চশ্রেণীর স্তম্ভে অধিষ্ঠিত আছে। তবে সর্বোপরি এদের শ্রেণীবিন্যাস সমতলের

ন্যায় ততখানি সুদৃঢ় নয়। এই নতুন শ্রেণীরূপায়ণ নিঃসন্দেহে সামাজিক ইতিহাসে এক নব যুগ সৃষ্টি করেছে বা আগেকার সামাজিক অনড়তাকে ভেঙ্গে সচল রূপ দিয়েছে। এই গতিশীলতার প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে টাকা এবং একচেটিয়ে পুঁজির প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে টাকা এবং একচেটিয়ে পুজির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু এদের হাতে এই টাকার কোনো বিনিয়োগ ক্ষমতা নেই, কেবল তা সৃষ্টি করতে পারে উত্তরোত্তর ভোগ আর লালসার প্রবৃত্তি। এই টাকার গতিতরঙ্গে নব্যমধ্যবিত্ত ভোগবাদের দিকে ছুটে যাবে। এদের ধ্বংস নেই, আছে বৃদ্ধি। খরায়, বন্যায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় ও মহামারীতে এদের ক্ষয় নেই। বস্তুজগতের সম্ভোগবাদের মধ্যেই এদের চিরন্তন স্থিতি। এই তরঙ্গলীলা আজ সারা ভারতেই বিদ্যমান। কেবল আদিবাসী অধ্যুষিত ত্রিপুরায় এক অপূর্ব বৈচিত্র্যের সমাজ গড়েছে। আদিম সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বাংলার আধা-সামন্ততান্ত্রিক (Uneven Composition) এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আর সৃষ্ট হয়েছে এক অদ্ভুত সমাজ অর্থনীতির। এর কারণ প্রকাশ লক্ষ্য করেছি সাংস্কৃতিক জীবনেও। কোট প্যান্ট টাই পরিহিত মধ্যবিত্ত শিক্ষক বা কেরানীর বা অফিসারের গলায় বা হাতে লুকানো মাদুলী বা কবচ্ তেমন আশ্চর্যের না হলেও আদিম অনার্যদেবীর বন্দনার মন্ত্র (পদ্মপুরাণ) ইত্যাদি এম্‌প্লিফায়ারের সাহায্যে প্রচার আমাদের বিস্মিত করে। একদিকে আদিম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি মধ্য ও নিম্নবিত্তের প্রগাঢ় আস্থা অপর দিকে বিদেশের বিকৃত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রতি উৎকট লালসা, এ দুইই সমাজজীবনে এক প্রকট ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং আজ এই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে সামাজিক সচলতা যার দুর্বার গতি সমাজ অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করবে। এই বিপ্লবী গতিশীলতার জন্ম লুকিয়ে আছে এই ভঙ্গুর সমাজের গর্ভে।

1. D.D. Kosambi – The Culture and Civilisation of Ancient India
2. Ibid.
3. Marx-Engels- Selected Correspondence.
4. Ibid.
5. Marx-Engels - Communist Manifesto, 1848
6. Journal Asiatic society, 1875.
7. Simon Commission Report Vol. 1.
8. Karl Marx - Capital, Vol 1.
9. Frontier, dt. 12th Nov. 1977.
10. বিনয় ঘোষ — বাংলার নবজাগরণ
11. Finance Account, 1980-81.
12. Karl-Marx - Notes on Indian History.

সমসের গাজী ঃ ত্রিপুরার মোগল আনুগত্যের নজরানা

ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য মোগল সম্রাটকে হস্তি-কর দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সুপ্রাচীন স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট করেছিলেন। তার পূর্বে আর কোন ত্রিপুর নৃপতি এরূপ নির্লজ্জ আচরণ করে ত্রিপুর কুলে কলিমা লেপন করেন নি।[১] বস্তুতঃ তাঁর আমল থেকেই ত্রিপুর রাজনীতির মূলধারা পরিবর্তিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তরবারীর মুখে জীবন বিসর্জনের সনাতন রীতির পরিবর্তে মোগল তোষণ নীতি গৃহীত হল। শুরু হল মোগলদের তোষামোদ করা। ফলে সেনাবাহিনীতে দুর্বলতা দেখা দিল। যেখানে মাথা বিক্রী হয়ে গেছে সেখানে মথা বাঁচাবার জন্য তরবারী শাণিত রাখাব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছল। তরবারীর ব্যবহার একবার ভুলে গেলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। গোবিন্দ দেবের বংশধরদের ইতিহাস এক নির্লজ্জ খোসামুদির ইতিহাস কেননা খোসামোদে পারদর্শী উত্তর ত্রিপুর নায়কগণ আর তরবাবী বের করার সুযোগ পান নি। ক্রমে ত্রিপুরার রাজশক্তি সামান্য মোগলভৃত্যে পরিণত হয়েছে। শ্রীরাজমালা সম্পাদক রাজানুগত্যে মুগ্ধ তবুও মোহিত সম্পাদক লিখেছেন —"তিনি কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমনগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ত্রিপুরার পক্ষে জনৈক প্রতিভূ (hostage) রাখিবার ব্যবস্থা হয় .... নবাব দরবারে রক্ষিত প্রতিনিধিকে তুল বলা হইত। উক্ত তুল প্রথা অনেককাল পর্যন্ত চলিয়াছিল এবং এই প্রথা রাজ্যের পক্ষে এক গুরুতর অনিষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[২] সম্পাদক মহাশয় গুরুতর অনিষ্ট বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন জানিনা কিন্তু এর চেয়ে অনিষ্টকর রাষ্ট্রের পক্ষে আর কি হতে পাবে ? যে শাসক হস্তিকর দিত, আপন আত্মীয়দের জিম্বা রূপে নবাব দরবারে জমা রাখত, সে শাসক আর যাই হউক স্বাধীন শাসক বলে বিবেচিত হতে পারেন না এবং তার শাসিত ভূখণ্ড রাষ্ট্র নয়, রাজ্য এবং তাও করদরাজ্য নামে অভিহিত হতে পারে।

গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য দ্বারিকা ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে পাঠালেন 'তুলের' কাজ করতে। দ্বারিকা গোবিন্দ মাণিক্যের অপর পুত্র দুর্গাঠাকুরের পুত্র। দ্বারিকা মুর্শিদাবাদে বসবাস এবং নবাব সান্নিধ্যের সুযোগ কাজে লাগালেন। প্রথম দিকে নবাব কিঞ্চিৎ সন্দিহান হলেও পরে অবশ্য বিশেষ দূত পাঠিয়ে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন। রামদেবকে নবাব আর বিরক্ত করেন নি। রামদেবের মৃত্যুর পর তার আঠার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রত্নদেব পাঁচ বছরের বালক মাত্র। অপর তিনজন যথাক্রমে ঘনশ্যাম, দুর্যোধন ও চন্দ্রমণি ব্যতীত বাকী সকলেই বলিভীম নারায়ণের হস্তে নিহত হয়েছিল।[৩] বলিভীম নারায়ণ রাম মাণিক্যের শ্যালক

এবং রত্নদেবের মাতুল। রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। "শ্যালককে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করা জগতের ইতিহাসে একটি নূতন দৃষ্টান্ত বটে।" [৪] বলিভীমের সহায়তায় রত্নদেব ত্রিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। নবাবের সম্মতি নিশ্চয়ই মিলেছিল কারণ হস্তিকর এবং 'তুল' পরিবর্তনেই তা প্রমাণিত হচ্ছে। এবারে রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকা ঠাকুরকে তুল রূপে মুর্শিদাবাদে পাঠান হল। ইতিমধ্যে বলিভীম নরায়ণের পতন ঘটে কারণ "তিনি মোগল শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। এজন্য ঢাকার শাসনকর্তা প্রেরণ করেন।" [৫] যে সব ত্রিপুর হাত জোর করে নতমস্তকে মোগল শাসকের মনোরঞ্জনে সাফল্য লাভ করেছিল তাদের অগ্রদূত দ্বারিকা ঠাকুর নবাবের প্রীতিলাভ করলেন। একদল মোগল সৈন্য সহ দ্বারিকা ঠাকুর ত্রিপুরা অভিযান করলেন এবং রত্নমাণিক্যকে বিতাড়িত করে নিজেই নরেন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এবারে শুরা হল উল্টো তৈলমর্দ্দনের পালা। রামমাণিক্য কর্তৃক নিযুক্ত অপর যুবরাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের পুত্র চম্পক রায়। সে সময়ে চম্পক রায় চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। চম্পক রায় রত্নদেবের হিতাকাঙ্খী। তিনি দ্রুত ঢাকা পৌছে অপর যুবরাজ দুর্যোধন সহ নবাব সকাশে নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। যথোপযুক্ত কাঞ্চন মূল্যে নবাবী বাহিনী সংগ্রহ করে চম্পকরায় ত্রিপুরা অভিযান করেন। নরেন্দ্র মাণিক্য পরাস্ত হলেন, তাকে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হল এবং রত্নদেবকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। রাজা রত্নদেব কৈলাশ চন্দ্রের মতে ১০৯৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। রাজা নাবালক বিধায় চম্পকরায়, গৌরীচরণ প্রভৃতি যুবরাজগণ প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করতেন। কিন্তু কি যে অমূল্য স্বাধীনতা ত্রিপুরগণ মুসলমান শাসকদের নজরানা দিয়েছিলেন সে স্বাধীনতা হীনতায় নিজেদের মধ্যে লোভ ও কলহের ফলে বার বার ত্রিপুরার মাটি রক্তাপ্লুত হচ্ছিল। রত্নদেব নিজ ভ্রাতা ঠাকুর ঘনশ্যামকে নবাব দরবারে 'তুল' রেখেছিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর রত্নদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইতিমধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে চম্পক রায় নিহত হয়েছেন। বালক রাজা একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী সুহৃদ হারালেন। ঘনশ্যামকে মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরিয়ে আনা হল এবং বড় ঠাকুর করা হল দুর্যোধন ঠাকুরকে যুবরাজ এবং চন্দ্রমণি ঠাকুরকে 'তুল' পদে নিযুক্ত করা হল।

রত্নমাণিক্য মোগল পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন বলে কৈলাশচন্দ্র মত প্রকাশ করেছেন। [৬] মেজর স্টুয়ার্ট লিখেছেন — The Rajahs of Tippearh Cooch Behar and Assam, whose Countries, although they had been over run by the Mohammedan arms, had never been perfectly subdued, and who, therefore, continuted to spread the umbrella of independence and to stamp the coins in their own names, were so impressed with the idea of power and abilities of Mahamod cooly Khan, that they forwarded to him valuable presents consisting of elephants wrought lunwrought ivory, musk, amber and various other articles in token of their submission, in return for which the Nawab sent them Khilats or honorary dresses by the receipt and putting on of which they acknowledged his superiority. This in change of presents and complements became an annual custom during the whole time of his Government without in thier party attending to recede from or advance beyond the implied line of conduct." [৭] কৈলাসচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উক্ত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র উদ্ধৃতির দেখা যায় নবাবের খিলাত বিতরণ বা রাজাদের হস্তিদন্তের তৈরী সামগ্রী উপহার প্রেরণ বার্ষিক রেওয়াজে পরিবর্তিত হলেও ঐসব দ্রব্য পাঠান হত "in token of their Submission" অর্থাৎ বশ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ। উপরন্তু রাজমালার স্বীকৃতি রয়েছে 'তুল' পাঠানর। একবার নয়, রত্নদেব দুবার 'তুল' পরিবর্তন করেছিলেন। 'তুল' ব্যাপারটিই রাজ প্রতিনিধির জিম্মী স্বরূপ নবাব সকাশে বাস যার কোন কূটনৈতিক

নিরাপত্তা ছিল না। এ প্রসঙ্গটি মুকুন্দ মাণিক্যের প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হয়। কাজেই স্বীয় নামে মুদ্রা প্রকাশ করে ছত্র ধারণ করে সিংহাসনে বসলেও রত্নমাণিক্য মোগলের অধীনতা ছিন্ন করে পুনরায় সার্বভৌম স্বাধীন ত্রিপুর নরপতি হয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্রের এই মতবাদ সর্বান্তকরণে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

অপর দিকে ত্রিপুরা বুরঞ্জীর সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে অহোমরাজ স্বর্ণদেব রুদ্রসিংহ পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দু রাষ্ট্রগুলিকে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে একজোট করার প্রয়াসে ১৭১০ খৃঃ রত্ন কন্দলী ও অর্জুন দাস নামক দুই দূত ত্রিপুরাতে পাঠান। দূতদ্বয় রত্নদেব কর্তৃক গৃহীত ও সমাদৃত হন এবং রাজা রত্নদেব মোগলের বিরুদ্ধে জোটের পক্ষে মত প্রকাশ করে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়লঙ্কার ও উদয়নারায়ন নামক দুই দূতকে অহোম রাজ সভাতে পাঠান। কিন্তু দূতদ্বয় পৌঁছে পত্রবিনিময় ও উদ্যোগের সর্তাবলী স্থির হবার পূর্বেই রাজা স্বর্ণদেব মৃত্যু মুখে পতিত হন।[৮] ১৭১২ খৃষ্টাব্দে কুমার ঘনশ্যাম মুরাদবেগ নামক জনৈক মোগলের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে অর্থদ্বারা আক্রমণ করিয়া ও রাজাকে বধ করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন।"[৯] রত্নদেবকে গলাচেপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়।[১০] ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে এই কলঙ্কজনক ভ্রাতৃহত্যার বিবরণ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা দূতদ্বয় পুনরায় এসে অহোমের নূতন রাজার পত্র মহেন্দ্র মাণিক্যকে সমপর্ণ করেছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে রত্নদেব মনে মনে মোগল অধীনতা ছিন্ন করার প্রয়াসী হয়ে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা করার সুযোগ পান নি। এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে আসাও খুব বেশী অসঙ্গত হবে না যে মহেন্দ্র মাণিক্যকে সাহায্য করার পেছনে বাংলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা প্রয়াসী রত্নদেবকে ক্ষমতাচ্যুত করা। যেভাবেই হউক রত্নদেবের উদ্দেশ্য নবাব সরকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মুদ্রা সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করার পর ভ্রাতৃঘাতী মহেন্দ্র মাণিক্য মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং যুবরাজ দুর্যোধন ধর্মমাণিক্য (২য়) নাম গ্রহণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন (১৭১৪ খৃঃ মুদ্রা সাক্ষ্য)। ধর্মমাণিক্য ভ্রাতা চন্দ্রমাণিক্যকে যৌবরাজ্য প্রদান করেন এবং সম্ভবত জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুর গঙ্গাধরকে তুলরূপে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। আমাদের বিবেচনা মতে ২য় ধর্মমাণিক্য সার্বভৌম স্বাধীন নরপতি ছিলেন না। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে 'তুল' পাঠিয়ে মোগল অধীনতা স্বীকার করেন নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ কর প্রদান করে অধীনস্থ রাজার কর্তব্য সমাপন করেছিলেন।[১১] গোবিন্দ মাণিক্যের প্রদেয় কর সাড়ে পাঁচ হস্তি তাঁর পৌত্রের কালে তিপান্নতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এত হাতি তো আর ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। কাজেই নবাব সরকারের কর বাকী পড়তে থাকে। কর রীতিমত না দিলে কোন প্রভুর মুখে হাসি থাকে? কাজেই হুকুমনামা এল কর পাঠাবার 'তুল'কে ভয় দেখান হল, না পাঠালে কি করা হবে। 'তুল' প্রাণভয়ে চিৎকার করল চিঠি মারফৎ।[১২]

নবাব সরকারের কর সময়ে শোধ না করলে একটি মাত্রই পাল্টা ব্যবস্থা ছিল সেকালে, রাজ্য আক্রমণ লুটপাট এবং যথেচ্ছ অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন। এর মধ্যে যদি রাজ্যলোভী অন্য ব্যক্তি জালে পড়ে তাহলে প্রজা সাময়িক ভাবে বেঁচে যেত। এ ক্ষেত্রেও রাজ্যলোভীর অভাব হল না। অথবা বলা যেতে পারে সুযোগের সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত ছত্রমাণিক্যের পৌত্র জগৎরাম ঠাকুর। তাঁর পিতাকে কাদবার জমিদারী দিয়ে গোবিন্দমাণিক্য বহু পূর্বেই উত্তর পুরুষের পথ নিষ্কন্টক করেছিলেন। সেই জনাবাসী ত্রিপুর বংশধর সাক্ষাৎ কাঁটা হয়ে দেখা দিলেন ধর্মমাণিক্যের ভালে। তিনি নবাব সরকারে দরখাস্ত করলেন ত্রিপুরার সিংহাসন পেলে বাকী কর দিতে প্রস্তুত। নবাব সৈন্য সামন্ত দিলেন, জগৎরাম এগিয়ে এলেন ত্রিপুরার দিকে কিন্তু ত্রিপুর বাহিনীর হস্তে পরাস্ত হয়ে ঢাকাতে ফিরে গেলেন। নবাব খুব বিরক্ত হলেন এবং ফৌজের সর্দারকে ত্রিপুরা অভিযানে পাঠালেন। এক ভাগ ফৌজ গোমতী নদী পথে এবং অপর ভাগ নুরনগর পথে এসে ত্রিপুরার প্রবেশ করল এবং পরাজিত ধর্মমাণিক্য বনে আশ্রয় নিলেন। এই হচ্ছে শ্রী রাজমালার বর্ণনা।[১৩]

ব্যাপারটা কিন্তু শ্রীরাজমালার বর্ণনামত এত সোজা সরল ছিল বলে মনে করা যাচ্ছে না। অন্যান্য সাক্ষ্য অবশ্যই বিষয়টির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জগতরাম ঠাকুরের মিত্র ছিলেন বলদাখাল তথা বরদাখাতের জমিদার আঁকা সাদেক। তাঁকে প্রতাপাসরের জমিদার রূপে আখ্যাত করা হয়েছে। জগৎরাম এবং আঁকাসাদেক ত্রিপুরা জয়াভিলাষী হয়ে ঢাকার নায়েব মীরহাবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মীরহাবিবের কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাবে। মীরহাবিব ত্রিপুরা জয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনিব ঢাকার নায়েব নাজিম ২য় মুর্শিদকুলি খাঁকে আশ্বস্ত করেন। লাভালাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে মুর্শিদকুলি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নবাব সুজাউদ্দিনের সম্মতি আদায় করেন। মোগল বাহিনী জগৎরামের কল্যাণে সোজা পথে এত দ্রুত ত্রিপুরাতে অভিযান চালাল যে ২য় ধর্মমাণিক্য তৈরী হবার সুযোগও পেলেন না। পার্বত্য পথে চলাচলের রাস্তা জগৎরাম অবগত ছিলেন, সে পথেই তিনি মোগল বাহিনী ত্রিপুরার বুকে চালান করেছিলেন। জগৎরাম "guided Mir Habib's troops by the proper routes so that they advanced suddenly into the heart of the Kingdom near the capital, Absolutely unprepared for such an attack, the Raja fled into the nighbouring Hills, where upon the fort of Chandigarh, which had been his residence, was stormed by the invaders and whole of his Kingdom fell under the latters control It was given to the Rajas nephew, Aqua Sadiq was apointed its faujdar and Mir Habid went back to Dacca with a rich booty and many elephants When Murshid quli- II informed Sujauddin of the conquest on Tippearah and sent him a large share of the plunder, the latter changed its name to Roshnabad" [১৪] কৈলাসচন্দ্রের মতে এই ঘটনা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ঘটে। [১৫] কিন্তু আজাদ অল-হুসাইনির 'নৌবহর-ই মুরশিদ কুলি খানি নামক পাণ্ডুলিপির মতে এই যুদ্ধ এবং ত্রিপুরা বিজয় ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই পাণ্ডুলিপির মতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জয়ন্তিয়া নামক তিনটি অংশ (sector) থেকে আক্রমণ করা হয়। মীর হাবিব নিজে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। ত্রিপুরা রাজ প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ধর্মমাণিক্য বন্দী হলেন এবং তাঁকে ঢাকাতে প্রেরণ করা হল। [১৬]

রাজমালার বর্ণনামতে ঢাকার কোন এক নবাবের সঙ্গে ধন দিয়ে মিটমাট করে নিলেও সেই নবাব কসবা নগরে সৈন্য পাঠালেন। ত্রিপুর সেনানী রণভীম নারায়ণ আট মাস যুদ্ধ করে মোগল বাহিনী আটকে রেখেছিলেন। বিরক্ত হয়ে নবাব সৈন্য পশ্চাৎ অপসারণ করেছিলেন। [১৭] পরে কাদবার জমিদার জগৎরাম নবাবের সাহায্যে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং এবারেও জগৎরাম জয়লাভ করতে পারলেন না। ধর্মমাণিক্যের হাতে পরাস্ত হয়ে লজ্জিত হলেন। [১৮] ইতিমধ্যে ঢাকাতে পট পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নবাব এলেন, যথারীতি ধন দিয়ে তাকে তুষ্ট করা হল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যলোভী নবাব এতে গললেন না, শুরু হল ত্রিপুরা আক্রমণ। আবার প্রাচীর করে বহুদিন যুদ্ধ করা হল। অবশেষে রাজা যুদ্ধ ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে উপস্থিত হলেন। [১৯] সেখানে গঙ্গাস্নান করে গর্ভপাপ দূর করে নবাবের কৃপায় পুনরায় পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য যে রাজমালাতে ২য় ধর্মমাণিক্যের পরাজয়, পলায়ন ও বন্দীত্ব প্রভৃতি ঘটনা চেপে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরাজমালাতে সব ঘটনার উল্লেখ করলেও রাজার বন্দী হবার ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

যাই হউক ধর্মমাণিক্য বন্দী হউন বা না হউন মোগল বাহিনী উদয়পুর দখল করে যথেচ্ছ লুটপাট করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করে। রাজকীয় হস্তিবাহিনী মোগলদের দখলে যায়। মীর হাবিব ধনরত্ন নিয়ে ঢাকাতে ফিরে গেলেন। ভাগ বাটোয়ারা করে প্রভু দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁকে খুশি করে কিছু ধনরত্ন দিলেন এবং বেশ ভালো রকমের ভাগ পাঠালেন নবা সুজাউদ্দিনের নিকট। আঁকা সাদিক ত্রিপুরার ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। ত্রিপুরার ধনরত্ন পেয়ে খুশি হয়ে নবাব সুজাউদ্দিন সমতল ত্রিপুরার নাম রাখলেন চাকলে রোশনাবাদ। জগৎরামকে

সমতল ত্রিপুরার রাজা বলে ঘোষণা করা হল।[২০] জগৎ মাণিক্যের রক্ষা করার জন্য কুমিল্লাতে একদল মোগল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। বর্তমানের জনপদ মোগলটুলী সম্ভবতঃ যেসব মোগলদেব আবাস স্থান ছিল।

২য় ধর্মমাণিক্য রাজ্যহারা এবং লাঞ্ছিত হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হন বা গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তৎকালীন জগৎ শেঠের সঙ্গে তাব বন্ধুত্ব হয় এবং জগৎ শেঠের সহায়তার বাজা নবাব দরবারে আপন অবস্থা স্তাপন করার সুযোগ পান। নবাব সুজাউদ্দিন প্রসন্ন হয়ে রাজা ধর্মমাণিক্যকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বাজস্বের বিনিময়ে চাকলা রোশনাবাদেব জমিদারী অর্পণ কবার জন্য ঢাকাব নায়েব নাজীমকে নির্দেশ দেন। চাকলা রোশনাবাদেব কর স্বীকাব কবাব ফলে ত্রিপুরার বাজা চাকলাতে যোগন প্রজা বলে গণ্য হলেন। কিন্তু পার্বত্য রাজ্যে তার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হল না যদি হস্তিকর এবং তুল প্রথার জন্য তাকে কিছুতেই স্বাধীন সার্বভৌম বাজা বলে স্বীকার করেন নি। বরঞ্চ পশ্চিমী সার্বভৌমত্বের ধারণায় অভিষিক্ত Stuart সাহেব এই ঘটনাকে ত্রিপুরাব স্বাধীনতা বিলুপ্তি বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[২১] ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ২য় ধর্মমাণিক্য পরলোক গমন করেন।

২য় ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে অপর ভাই যুবরাজ চন্দ্রমণি ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন, নাম নেন মুকুন্দ মাণিক্য। কৈলাস চন্দ্রের মতে তার রাজত্বকাল সম্পাদকীয় মন্তব্যে ১৭২৯-১৭৩১ খৃঃ পর্যন্ত দেখান হয়েছে।[২২] মুকুন্দমাণিক্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে তুল পাঠালেন এবং ধর্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুরকে যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নবাব সরকারে প্রদেয় হস্তিকর নিয়ে পুনরায় বিবাদের সূচনা হয়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হাতি খেদাতে পাড়ছে না। কাজেই নবাবের প্রাপ্য কর বাকী পড়তে লাগল। নবাব দরবারে তুল মহাশয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেন আর তুল মহাশয় প্রাণ বাঁচাতে ঘন ঘন তাগাদা পাঠান পিতাকে।[২৩] অবশেষে কর আদায় করার জন্য রোশনাবাদের ফৌজদার হাজী মুনসুম সসৈন্যে উদয়পুরে ঘাঁটি গাড়লেন। ত্রিপুরার মান বিপর্যস্ত, কিন্তু হাতির সন্ধান নেই। গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের বংশধর সুবা রুদ্রমণি ঠাকুর হাতী ধরার কাজে নিযুক্ত। উদয়পুরে ফৌজদারের উপস্থিতিতে তিনি বড়ই অপমানিত বোধ করলেন। তিনি মতাই থেকে রাজাকে লিখলেন যে খেদাতে হাতি পড়ছেনা। এবং রাজা আজ্ঞা দিলে ফৌজদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন। রাজা পড়লেন বড়ই সংকটে কারণ পাঁচকড়ি রয়েছেন মুর্শিদাবাদে, সুবাকে অনুমতি দিলে পুত্রের ধড়ে মুণ্ড থাকবে না। তাই তাঁর মুখে শুনি— 'রাজা কহে পাঁচকুড়ি নবাব নিকট। ফৌজদার খেদাইলে হইবে সংকট।''[২৪] রাজার উক্তিই প্রমাণ করছে যে 'তুল' রাজনৈতিক পদ নয়, জিম্মা মাত্র, তাঁর কোন কূটনৈতিক নিরাপত্তা ছিল না। যে দেশের শাসকের কূটনৈতিক দূত নিরাপত্তা পায়না, সাধারণ জিম্মির মত ব্যবহার পায়, সে দেশের রাজার সার্বভৌমসত্ত্বা নেই বলেই বিবেচনা করতে হবে। গোবিন্দ মাণিক্যের কৃতকর্ম তাঁর বংশ ধর মুকুন্দদেব পুত্র বিয়োগ সম্ভাবনায় যেরূপ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন; রাজানুরক্ত, রাজমালাকার বা ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সেরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। পারলে গোবিন্দ মাণিক্যের হস্তিকর ও তুল প্রথার পরে আর ত্রিপুর পতিদের স্বাধীন সার্বভৌম রাজা বলে লিখতেন না। যাই হউক উভয় সংকটে পড়ে মুকুন্দ দেব নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করা মানসে রুদ্রমণিকে আগুনে ঠেলেদিলেন। রুদ্রমণির পত্র তিনি ফৌজদারের হাতে তুলে দিলেন। অতিনিন্দনীয় রাজার এই আচরণ, সেবককে জহল্লাদের হাতে সমর্পণ। ফল পেলেন হাতেনাতে। ফৌজদার রাজাকে বিশ্বাস করলেন না, দ্রুত আক্রমণ করে রাজাকে বন্দী কবা হল, আটকে রাখা হল কারাগারে, সঙ্গে গেলেন যুবরাজ গঙ্গাধর ও পুত্র কৃষ্ণমণি। রুদ্রমণি সংবাদ পাওয়া মাত্রই উদয়পুর ঘিরে ফেললেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, অপমানে মুহ্যমান রাজা কারাগারে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন। এই ঘটনা ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের যদিও কৈলাসচন্দ্র ১৭৩৭-৩৮ সালের সম্ভাবনাও প্রকাশ করেছেন।

সামরিক জনতার সহায়তার সুবা রুদ্রমণি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন। নাম নিলেন জয়মাণিক্য। যুবরাজ গঙ্গাধর ও রাজপুত্র কৃষ্ণমণি সহ মুকুন্দ মাণিক্যের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ

ঢাকা পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে তুল পাঁচকড়ি নবাবের অনুমতিক্রমে মুর্শিদাবাদে থেকে দেশে ফিরছিলেন। পথে কৃষ্ণমণির পত্রে পিতার মৃত্যু সংবাদ ও ত্রিপুরার গতি হাত ছাড়া হবার খবর পেয়ে পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে যান এবং নবাবকে সমস্ত বিষয় অবগত করান। নবাব পাঁচকড়ির নামে ফরমান জারী করলেন এবং পাঁচকড়ি দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্যকে দূর করে উদয়পুর দখল করেন এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এবারে ষোল কলা পূর্ণ হল,"হতভাগা পাঁচকড়ি রাজ্য লোভে নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরার প্রকৃত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।"[২৫] ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ যেন কর দিলেও সামন্ত হয় না, অধীনস্থ প্রজা হয়না ভিক্ষী পাঠালেও সম্মান নষ্ট হয়নি কেবলমাত্র কাগজে কলমের ফরমান মাথায় চাপনই স্বাধীনতা বিলুপ্তির একমাত্র লক্ষণ।

জয় মাণিক্য উদয়পুর ত্যাগ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার মতাই নামক স্থানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে স্বতন্ত্রভাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা শাসন করতে লাগলেন। এবারে শুরু হল দুই ত্রিপুরের লড়াই, এক রাজ্যের দুই নরপতির আত্মঘাতী সংগ্রাম। যুদ্ধে ইন্দ্রমাণিক্য সুবিধা করতে পারলেন না, বারংবার পরাস্ত হয়ে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। "কিয়ৎকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের অনুরোধে নবাব সৈন্য ত্রিপুরার আগমন করিয়া জয়মাণিক্যের ধৃত করিয়া নিয়াছিল।"[২৬] দুই রাজার যুদ্ধে নবাবের হস্তী কর বাকী পড়ে গেল। নবাব সরকার ইন্দ্র মাণিক্যের প্রতি বিরূপ হলেন কৈলাসচন্দ্রের মতে জয়মাণিক্য নায়েব নাজীমকে ভাল পরিমাণে উৎকোচ প্রদান করে স্ববশে আনলেন। নায়েব নাজীম ইন্দ্র মাণিক্যকে ঢাকাতে কয়েদ করলেন। এই সুযোগে জয়মাণিক্য পুনরায় সমগ্র ত্রিপুরা দখল করে নিলেন।[২৭] শ্রীরাজমালা জানাচ্ছে দুই রাজার বিবাদে হাতী না পেয়ে নবাব সরকার প্রতি হাতীর মূল্য এক হাজার টাকা ধার্য্য করলেন। এই ডামা ডোলে ধর্মমাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর ইন্দ্রমাণিক্যের দেনা শোধ করবেন প্রতিশ্রুতি দিলে নবাব তাঁকে ত্রিপুরার রাজ-সনন্দ দিলেন। নামাকরণ হল দ্বিতীয় উদয়মাণিক্য।[২৮] এবারে রাজা হলেন তিনজন, শুরু হল তিন ত্রিপুরের লীলা।

কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন জয় মাণিক্য ঢাকা নিবাসী জগৎ মাণিক্যের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তির সর্ত হচ্ছে যদি জগৎ মাণিক্য ঢাকার শাসনকর্তাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করে জয়মাণিক্যের নামে সনন্দ বের করতে পারেন তাহলে জয়মাণিক্য জগৎ মাণিক্যের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ পদে নিয়োগ করবেন। ষড়যন্ত্র জাল ফেলা হল, নগদ অর্থে বশীভূত নায়েব নাজিম জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার প্রকৃত রাজা স্বীকার করে সনন্দ দান করলেন। জয়মাণিক্য ক্ষমতায় ফিরে এলেন এবং বাহুবলে সমগ্র ত্রিপুর দখল করে উদয় মাণিক্যকে দূর করে নরহরিকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করলেন।[২৯]

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে শাসক বদল হয়েছে ফলে ঢাকাতেও নতুন নায়েব নাজীম নিযুক্ত হয়েছে। নায়েব নাজীমের সহকারী হোসেন কুলি-খাঁর সঙ্গে বন্দী ইন্দ্রমাণিক্যের ভাব জমে উঠেছে। হোসেন কুলির পরামর্শে ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার অবস্থা বর্ণনা করে সুবিচার প্রার্থনা করলেন। নবাব নিশ্চয়ই এই জটিল অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন কেননা পত্রপাঠ নবাব হোসেন কুলিখাঁকে নির্দেশ দিলেন ত্রিপুরা অভিযান করে ইন্দ্রমাণিক্যকে ত্রিপুরার গদীতে বসাতে। নবাবী অভিযান শুরু হল, জয়মাণিক্য পরাস্ত হলেন। ধৃত জয়মাণিক্যকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হল। ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করলেন। ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদে 'তুল' পাঠালেন। কিছুদিন পর 'তুল' মারফৎ ইন্দ্রমাণিক্য খবর পেলেন যে জয়মাণিক্য পুনরায় ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। এবারের মুরুব্বী হাজী হুসেন নবাবের অতি প্রিয় পাত্র। কাল বিলম্ব না করে ইন্দ্রমাণিক্য দ্রুত মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং সেখানে অবস্থান কালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। জয়মাণিক্যের সাধ পূর্ণ হল, নবাব তাকেই ত্রিপুরার রাজা স্বীকার করে সনন্দ দান করলেন। জয়মাণিক্য রাজা হলেন কিন্তু এবারে প্রতিদ্বন্দ্বী পেলেন ঠাকুর বিজয়মাণিক্য (তৃতীয়) নাম নিয়ে সিংহাসন দখল করেন। শ্রী রাজমালার মতে বার্ষিক মাত্র ১২০০০ টাকা করের বিনিময়ে নবাব

বিজয় মাণিক্যকে ত্রিপুরার ওয়াদাদার নিযুক্ত করেন, রাজা নয়।[৩০] কিন্তু কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন "মহারাজার বিজয়মাণিক্য নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ হইতে ৬ই জুলুসের ১০ই জিহিজা তারিখে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন ... ...ইন্দ্রমাণিক্যের ন্যায় তিনিও নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।"[৩১] ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, কৃষ্ণমণি ঠাকুর প্রভৃতি ত্রিপুর বংশধর নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে এরূপ পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকার ফলে এবং স্বাধীনতা বিসর্জ্জনকারী ত্রিপুরদের নবাব সৈন্যের উপর নির্ভরতার ফলে প্রাচীন ত্রিপুর বংশ এতই জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যে তাদের বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য সামান্য ঝড়ে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। এই ঝটিকায় অগ্রদূত হলেন আলোচ্য সমসের গাজী। বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে সমসের পরবর্তী ত্রিপুর সন্তানকে ত্রিপুরার সিংহাসন লাভে বঞ্চিত করে। মন্দভাগ্য ত্রিপুর পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেও বহু শতাব্দীর অর্জিত মান বাঁচাতে পারেন নি।

পাদটীকা

১) সেন কালী প্রসন্ন ঃ (সম্পা) ঃ শ্রী রাজমালা, চতুর্থ লহর, (অপ্রকাশিত), পৃঃ ১১।
গোবিন্দ মাণিক্য পূর্বে রাজা ত্রিপুরার।
কেহ নৃপ নাহি দিচ্ছে কর বাদশার।।"

২) তদেব, পৃঃ ৬৭

৩) তদেব, পৃঃ ১৯ঃ "রামমাণিক্যরাজা অতি পূণ্যবান।
তান পুত্র অষ্টাদশ ছিল বিদ্যমান।।
প্রধানস্ত রাজ পুত্র ছিল কতজন।
বলিভীম যুবরাজে করে সংহারণ।।

৪) কৈলাসচন্দ্র ঃ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড
পৃঃ ১০৮ (বর্ণমালা সংস্করণ)।

৫) শ্রী রাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃঃ ১৪০-১৪১।

৬) কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১০৯।

৭) Stuart : History of Bengal, Calcutta 1903, pp 421-22.

৮) Dr. N. K. Basu : Assam in the Ahom Age, Cal 1970 pp 132-33.
Bhyan S. K. : Tripura Buranjee p. 11-12 (Introduction)

৯) শ্রীরাজমালা ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪১।

১০) তদেব, পৃঃ ২৪ ঃ কতদিন পরে নৃপের আদেশ পাইয়া।
দূতে মারে রত্নমাণিক্য গলাতে চাপিয়া।

১১) শ্রীরাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৭
কর দিত হস্তি খেদা করিয়া উৎপন্ন।
বৎসরেতে হস্তীকর নিয়ম তিপান্ন।"

১২) তদেব, পৃঃ ২৯ ঃ "সদরের হস্তীকর বাকী হইল যখন।।

মুর্ত্তদাবাদ রাজ উকীল ছিল একজন।।
পুণঃ পুণঃ পত্র লিখে হস্তী পাঠাইতে।
রাজকর মহারাজে পাঠাইতে ত্বরিতে।।"

১৩) তদেব, পৃঃ ২৮, ২৯ ইত্যাদি।

১৪) Sarkar J. N. : History of Bangal, Middle Age, page 426.

১৫) কৈলাস চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৪ (১ম খণ্ড)

১৬) তদেব পৃঃ ২১৯ (১ম খণ্ড), Bengal : past and present by J. N. Sarkar P.P. 14

১৭) ত্রিপুরা সরকার, রাজমালা, পৃঃ ৮৬ ঃ
জিনিবারে না পারিয়া মনে ক্ষেমাকরি
আপনার সমুঝ উঠাইল অধিকারী।"

১৮) তদেব, পৃঃ ৮৭ ঃ জগৎ রাজে রার্য্য হেতু বহু জ্রেষ্টা কৈল।
না পাইল রার্য্য সেই অপমান পাইল।।

১৯) তদেব, পৃঃ ৮৭ঃ "বহুদিন যুদ্ধ করি ক্ষোমা করি মন।
নবাব সাক্ষাতে জাইয়া মিলিল রাজন।"

২০) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১১৫

২১) stuart : History of Bengal, p. 267.

২২) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ৪৯

২৩) শ্রীরাজ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৩
"হুজুরের কর হস্তি বহু বাকী পড়ে।
মহশুল পাচকড়ি ঠাকুর উপরে।।"

২৪) তদেব ঃ পৃঃ ৩৪

২৫) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২১-১২২

২৬) শ্রীরাজ, ৪র্থ লহর, পৃঃ ১৪৩

২৭) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২২

২৮) শ্রীরাজ ঃ পৃঃ ৩৯

২৯) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২৩

৩০) শ্রী রাজমালা পৃঃ

৩১) কৈলাসচন্দ্র ঃ পৃঃ ১২৪

ত্রিপুরার হস্তশিল্প ঃ মিশ্র সংস্কৃতির অপূর্ব প্রকাশ

সুবিমল রায়

ত্রিপুরার কারুশিল্প, অর্থাৎ বাঁশ বেত ও কাঠের তৈরী সামগ্রী সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছে। এ শুধু কথার কথা নয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্বলিত বাঁশ, বেত আর কাঠের নানা ধরণেব পণ্য সামগ্রী এখন বিদেশে যাচ্ছে এবং দেশের যাচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন সহরে হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। আগরতলায় কারুশিল্প পণ্য সামগ্রী বিক্রীর বেসরকারী দোকান গত কয়েক বছরে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বাশায় ক্রেতার ভীড় লেগেই আছে। শিল্প দপ্তর এবং ত্রিপুরা তাঁত ও হস্ত শিল্প উন্নয়ন নিগম সারা বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনী ও মেলায় যে মণ্ডপ খুলছে, তাতেও ক্রেতার ও দর্শকের ভীড় হয়, দিল্লীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতি বছরই ত্রিপুরা মণ্ডপে ভীড় সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ ত্রিপুরার হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে।

ত্রিপুরার হস্তশিল্প পণ্য শিল্প রসিকের্ মনে বিস্ময় জাগায় প্রধানতঃ তার সূক্ষ্ম কাজের জন্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাঁশ জন্মায় এবং এই বাঁশকে কেন্দ্র করে ঐসব অঞ্চলে হস্ত শিল্পও গড়ে উঠেছে। আসাম, কেরালা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের নিজস্ব বাঁশ ও বেতের হস্তশিল্প রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার হস্ত শিল্পীরা যে নির্মাণ কুশলতা এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের স্বাক্ষর রাখেন তাদের শিল্প কর্মে, তা এক কথায় অনন্য। ত্রিপুরার শিল্পীদের উন্নত কল্পনাশক্তি এবং নির্মাণ কুশলতা তাদের শিল্পকর্মে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয় এবং সেটা হয় বলেই শিল্প রসিকরা বাঁশ ও বেতের কাজের পণ্যসামগ্রীর ভীড় থেকে ত্রিপুরার পণ্যসামগ্রীকে সহজে চিনে নিতে পারেন। এরা ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কাজ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।

১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা প্রথম যোগদান করেছিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায়। ত্রিপুরা মণ্ডপটি তৈরী করা হয়েছিল ত্রিপুরার হস্তশিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে। ছোট মণ্ডপ। অথচ লক্ষ লক্ষ দর্শক ভেঙ্গে পড়েছিল ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কাজ দেখার জন্য। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো বটেই, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিবও মণ্ডপটি দেখতে এসেছিলেন। মণ্ডপে এবং যাবার সময় একটি রুম ডিভাইডার কিনে নিয়ে যান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ঘুরে ঘুরে মণ্ডপটি দেখে ত্রিপুরার শিল্পীদের শিল্প দক্ষতার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি স্বেচ্ছায় এসে ঘুরে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার মণ্ডপ। প্রশংসা করেছিলেন ত্রিপুরার হস্তশিল্পীদের কুশলতার।

গত প্রায় দুই দশক ধরে ত্রিপুরা বাঁশ ও বেতের হস্ত শিল্প পণ্য ভারতের বিভিন্ন সহরে অগণিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। কলকাতা বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর হায়দরাবাদ, দিল্লী কানপুর লক্ষ্মৌ, গৌহাটি, ভুবনেশ্বর, আমেদাবাদ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ত্রিপুরার হস্তশিল্প অগণিত শিল্পরসিকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোতে দর্শকরা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মণ্ডপে ঢোকার চেষ্টা করেছেন।

এ সবই প্রমাণ করে ত্রিপুরার বাঁশ বেতের হস্তশিল্প পণ্য অগণিত শিল্পরসিকের কাছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে প্রায় হাজার তিনেক কারুশিল্পী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্পসম্ভার তৈরীতে নিয়োজিত। এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কেন না, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত সরকারী শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়মিত হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে কারুশিল্পী তৈরী করা হচ্ছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বহু হস্তশিল্পী কাজ শিখেছেন। এইসব শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে প্রধানতঃ দু'টো শ্রেণী রয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়েন যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তশিল্পের নির্মাণকৌশল শিখছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন সেই সব শিল্পী যারা উচ্চতর পর্যায়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এদেরই কেউ কেউ নিজেদের স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে মাষ্টার ক্র্যাফ্‌টস ম্যানে' আত্মপ্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার এদের স্বীকৃতি জানান পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে। এদের সম্বর্দ্ধিত করেন বিশেষ অনুষ্ঠানে মাধ্যমে।

একটু পিছিয়ে তাকানো যাক। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও ত্রিপুরার কারুশিল্প বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে নি। স্থানীয় উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করেন অরণ্যবেষ্টিত উঁচু টিলার গ্রামগুলোতে। নিরুপদ্রব, নিস্তরঙ্গ জীবনধারা ওদের। শান্ত জীবনের পারিবপার্শ্বিকতায় গাছ-গাছালি বাঁশ কাঠ। প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা খুবই সামান্য। প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য থেকে নিজেরাই তৈরী করে নেন ওদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী। ভার বয়ে নেবার খাড়া ধূম পানের হুঁকো শস্য সঞ্চিত করে রাখার পাত্র, অলঙ্কার রাখার বাক্স, সঙ্গীতের সহায়ক যন্ত্র গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিচিত্র সৃষ্টিধর্মী কাজ যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্তি। এদের সেই নিজস্ব ঐতিহ্য অনাদি কাল থেকে বহমান তাদেরই নিভৃত গ্রামগুলোতে। ঐ হস্তশিল্পের চমক নেই, কিন্তু ঋজুতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে। অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামে যে সাবলীল দৃঢ়তা তাদের হস্ত শিল্পেও যেন সেই প্রাণশক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরার নিজস্ব হস্তশিল্প বলতে বস্তুতঃ উপজাতি জনগোষ্ঠীর হস্ত শিল্পকেই চিহ্নিত করতে হয়। সেই হস্তশিল্প এখনো আছে তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্যিক হস্তশিল্পের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেনি। ধীরে ধীরে একটু পরিবর্তিত হয়ে যুগের চাহিদার সাথে তাল রেখে মূল ধারায় এসে মিশছে।

ত্রিপুরার হস্তশিল্পের বিশেষ করে বাঁশ বেতের কাজের যে মূল ধারাটি বর্তমানে বহমান তার আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ নয়। বৃটিশ শাসিত বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল। বিধ্বস্ত হয়ে চল্লিশের দশকে অনেক বাঙালী পরিবার আশ্রয় নিলেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার দিকে উদ্বাস্তুর স্রোত অব্যাহত ছিল পুরো সেই প্রবাহ উত্তাল হয়ে ওঠে। মূলতঃ ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর বিভাজন প্রায় বিপরীত অনুপাতে পর্য্যবসিত হয়। ছিন্নমূল অসংখ্য উদ্বাস্তুদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নটি রাষ্ট্রের কাছে প্রধান হয়ে ওঠার সরকার তাদের পুনর্বাসনের দিকেই প্রথম নজর দেন। এদেরই জীবিকার ভিত্তি রচনার জন্য গড়ে তুলতে থাকেন বৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্র। যে যে ধরণের কাজ জানেন তাকে স্বাধীনভাবে সে কাজ করার সুযোগ দেবার প্রচেষ্টা চলে। আবার যে কাজ শিখলে রোজগার হতে পারে, সেই কাজে কিছু কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও হয়। গড়ে উঠে, গুটিকতক শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র। ঐ সব কেন্দ্রে হস্তশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা ছিল।

হস্তশিল্পের পরিধি বিরাট ও ব্যাপক। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী বাংলা মুল্লুকে থেকে চলে আসার সময় বিচিত্র ধরনেব হস্তশিল্পের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেই এসেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত কাঁচামাল ও পবিবেশের অভাবে ত্রিপুরায় হস্তশিল্পের সব ধারাই বেগবান হয়নি। কিছু কিছু ধারা শীর্ণতর হতে হতে এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। বাঁশ এবং বেত বাংলা মুলুকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। এবং ত্রিপুরায়ও এর ঘাটতি নেই। কাজেই দুই জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে বাঁশ ও বেতের হস্তশিল্পই ধীরে ধীরে পুষ্টি লাভ করেছে। উপজাতি বাঙালী এবং মণিপুরী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের পটভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরার বর্তমান বাঁশ, বেত এবং কাঠের হস্তশিল্প। একে এখন আঞ্চলিক মিশ্র সংস্কৃতির এক সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশ বলেই চিহ্নিত করা চলে।

যে কোন শিল্পকেই বাণিজ্যিক সফলতার লক্ষ্যে দুর্গম দুস্তর পথে হাঁটতে গিয়ে কোন শক্তিশালী পৃষ্টপোষকের হাত ধরতে হয়। কথাগুলো হস্তশিল্পের মতো শিল্পের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে প্রযোজ্য। কেন না হস্ত শিল্পীরা প্রধানত গ্রামের দুর্বলতার শ্রেণীর অংশ। ওদের দক্ষতা থাকে, কল্পনাশক্তি থাকে কাজ করার প্রেরণা থাকে, কিন্তু থাকে না যথেষ্ট পুঁজি। বাণিজ্যিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে পুঁজির গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সামন্ত যুগে দেশের হস্তশিল্পীরা পৃষ্টপোষকতা পেয়েছেন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এবং সীমাবদ্ধ পরিসরে। এতে সামগ্রিকভাবে শিল্প এবং শিল্পী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কতটা বেঁচেছে সেটা গবেষণার বিষয়। এখন রাষ্ট্রশক্তি শিল্পের সামগ্রিক সমস্যাও সঙ্কটকে বুঝবার চেষ্টা করেন। ফলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপক ও অর্থবহ। শিল্পের পুঁজির একটা বিরাট অংশ সরকার থেকেই দেওয়া হয, পণ্য বিপণনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়, দক্ষ হস্তশিল্পী গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ত্রিপুরার বাঁশও বেতের কাজের অগ্রগতির পেছনে ত্রিপুরা সরকারের উপরোক্ত প্রয়াসগুলো অব্যাহত ছিল প্রায় তিন দশক। প্রধানতঃ উদ্বাস্তুদের জীবিকার সংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে যে উদ্যোগের সূচনা তা ক্রমে ক্রমে একটি বলিষ্ঠ শিল্পধারায়, ত্রিপুরার মিশ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট প্রকরণে এবং বৈশিষ্টে, পুষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে হস্তশিল্পের কর্মকাণ্ডে সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও উদ্যোগটা আসছে মূলত অগণিত হস্তশিল্পের তরফ থেকেই। নূতন নূতন নক্সা উদ্ভাবন করছেন হস্তশিল্পীরা এবং সেগুলো অনুপম সৌন্দর্যে গড়ে তুলছেন এরাই। বাজারে বর্তমানে ত্রিপুরাব বাঁশ ও বেতের কাজের যে বিচিত্র পণ্য সামগ্রী চোখে পড়ে তার অনেকগুলোই ত্রিপুরাই খ্যাত অখ্যাত হস্তশিল্পীরা উদ্ভাবন করেছেন এবং নির্মাণ করেছেন।

আঞ্চলিক হস্তশিল্পের গতিপ্রকৃতি এবং সাফল্য অসাফল্যের শেষ কথা যদিও নির্ধারণ করেন ঐ অঞ্চলের অগণিত হস্তশিল্পীরাই, তবু কিছু কিছু ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। ত্রিপুরারও সেটা ঘটেছে। রাজপরিবারের সাথে শান্তিনিকেতনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ঘটেছিল। প্রয়াত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছিলেন এবং সেখানকার হস্তশিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় আগরতলায় "শিল্পাশ্রম" স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে সি. টি. টি. আই - সেখানেই ছিল শিল্পাশ্রম। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় লোকদের নানা ধরনের হস্তশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্ভবত ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায়ই কুমারী কমলপ্রভা দেবী হস্তশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও পরবর্তীকালে তাঁর বাসভবনে হস্তশিল্প চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আজকের জনপ্রিয় বহু বাঁশ ও বেতের পণ্যের নক্সা তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক থেকে আগরতলায় অন্তত তিনটি প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এগুলোর নাম, শিল্প শিক্ষায়তন (শিল্পদপ্তর পরিচালিত), নক্সা সম্প্রসারণ কেন্দ্র (শিল্পদপ্তর) এবং হস্তশিল্পের শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (শিক্ষা দপ্তর পরিচালিত)। বর্তমানে বাজারে যে সব পণ পাওয়া যায় তার অধিকাংশেরই নক্সা এবং নির্মাণ কৌশল শিল্পীদের হাতে তুলে দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো। শ্রীবিনয় নন্দীর পরিচালনায় সি, টি, টি, আই এক সময়

ত্রিপুরার একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছিল। শ্রীনন্দী ত্রিপুরার হস্তশিল্পকে ত্রিপুরার বাইরে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের বহু হস্তশিল্পী শ্রীনন্দীর কাছে প্রেরণা পেয়েছেন উৎসাহ পেয়েছেন এবং তাঁরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। দিন কয়েক আগে ত্রিপুরা তাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের হস্তশিল্প শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ঘরে বসেছিলাম। অনেক হস্তশিল্পী এসেছেন তাদের নানা রকম নয়ন শোভন পণ্য সামগ্রী নিয়ে। নিগমে সেগুলো বিক্রি করে দাম নিয়ে যাবেন। হস্তশিল্পের কেউ কেউ উপজাতি অংশের। একজন বাঙালী শিল্পী নিয়ে এসেছেন উপজাতিদের পণ্য খাড়া। নিপুণ হাতে স্পর্শ লেগে আছে পণ্যে। নিখুঁত পরিপাট্য। একজন উপজাতি নিয়ে এসেছেন কিছু ঝুড়ি এবং একটি বেতের তৈরী প্রমাণ মাপের হারিক্যান। ঝুড়িগুলো মানের দিক থেকে উন্নত, কিন্তু হারিক্যানটায় তার পরিশ্রমের স্পর্শ থাকলেও সেটি নিখুঁত হয় নি। নিগমের মান নির্ধারক কর্মী জিনিসটি বিক্রি হবে না ভেবে রাখতে অস্বীকৃত হলেন। শিল্পী একটু বিচলিত হলেন। আমি তাকে ডাকলাম। কিছু খবরা খবর নিলাম। হ্যারিক্যানটি তৈরী করার পরিকল্পনা তিনি নিজেই নিয়েছেন। তবে প্রথম উদ্যোগ বলে সবদিক থেকে নিখুঁত করতে পারেননি। কথাটা তিনি স্বীকার করার মতো আর্থিক সামর্থ তার নেই। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি নিগমের কর্মীকে অনুরোধ করলাম এটি নিয়ে নিতে কেননা তিনি নিগমের নির্দেশ মতো খুঁতগুলো সারিয়ে দেবেন।

জাতি উপজাতির মিলিত প্রয়াসে এভাবেই প্রতিদিন ত্রিপুরার হস্তশিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—গুণে মানে, এবং বৈচিত্র্যে।

ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিত্য ঃ সেকাল ও একাল

রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ

মণিপুরীগণ ত্রিপুরায় আছেন দুশ বছরের ও বেশি সময় ধরে। আর ত্রিপুরার লেখকের প্রথম মণিপুরী বই বেরিয়েছে যাকে আমরা সৃজনশীল সাহিত্য বলতে পারি, ১৯৫৫ সালে, যখন কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহের মর্ত্ত্যগী পারিজাত লৈরাং' নামে একটি বই প্রকাশ পায়। এর আগেই অবশ্য আরও কয়েকটি বই বেরিয়েছিল যে গুলিতে মণিপুরী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বা যার উপজীব্য মণিপুরী ভাষা, যেমন মণিপুরী ও কুকী ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়', লেখ ব্রজগোপাল সিংহ (কৈলাশহর ১৯১৬), মৈতৈ লোন', লেখক সেই কেথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহ (খোয়াই, ১৯৩৯) এই দুইটি বই এর উদ্দেশ্যই মণিপুরী ভাষা শেখানো, এবং তা মূলতঃ বাঙলা ভাষা ভাষীদের জন্যই লেখা। মনে হয় এই বইগুলির চাহিদা ছিল। কারণ একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে, মহারাজদের আমলে, অমনিপুরীভাষী সরকারী কর্মচারীদের কয়েকটি চাকুরীতে মণিপুরী ভাষায় পারদর্শিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। এগুলি থেকে বোঝা যায় মণিপুরী ভাষার পেছনে তখনকার দিনে যথেষ্ট সরকারী আনুকূল্য ছিল।

আর সে পৃষ্ঠভূমিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল ১৯৪৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'খোঙ্জেল' নামে একটি নামে একটি মণিপুরী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। রাজকুমার মাধবজিৎ সিংহ ছিলেন এর সম্পাদক। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু একহিসেবে এটিকে ত্রিপুরায় মণিপুরী ভাষায় লেখা লেখির যুগান্তর সৃষ্টিকারী বলা যেতে পারে। এতে অনেকে মণিপুরীতে লিখতেন, এবং অনেককে এটি লেখার সাহস ও জুগিয়েছিল। ত্রিপুরাতে বসে মণিপুরীতে লেখা যায় এবং সে লেখা প্রকাশ করার জন্য একটি পত্রিকাও আছে ; কিছু কিছু পাঠকও সেটা পড়ে, এই ভাবনাগুলি সেই পত্রিকার লেখকদের নিশ্চয়ই উৎসাহ জুগিয়েছিল, বিশেষ করে যখন সেই পত্রিকার সম্পাদক থেকে শুরু করে লেখকদের অনেকেই কেউই মণিপুরী মাধ্যমে পড়াশুনা করেননি। এবং মণিপুরী থেকে প্রকাশিত বই ও পত্রিকা তখন খুব বেশি পরিমানে পাওয়া যেত না এবং সেগুলি পড়ার রেওয়াজ ও ততটা গড়ে উঠেনি। তাঁদের মাতৃভাষা এবং বাড়ীঘরের ব্যবহারের ভাষা মণিপুরী শুধুমাত্র এই ছিল মণিপুরী চর্চার তাঁদের সম্বল। এবং তা নিয়েই তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন মণিপুরীতে লিখতে।

উপরে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত এই রাজ্যের লেখকের প্রথম মণিপুরী বই হিসাবে পারিজাত লৈরাং এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি নাটকের বই। যদিও বইটির উদ্দেশ্য, লেখকের মত, তার মেয়ে ও তাদের বন্ধুদের জন্য একটি নাটক রচনা —বইটিতে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা ও মন্তব্য করা হয়েছে যার সঙ্গে

আজকের দিনের অনেক ভাবনা চিন্তার মিল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো সেই চিন্তা ভাবনাগুলি অনেকটা বিপ্লবাত্মক মনে হতে পারে। কিছু নমুনা ঃ -

গুরুজী ঃ দেহ ও মন পরিপক্ক হবার আগে বিয়ের ফল ভাল হয়না।

সাহেব ঃ জাত হচ্ছে বাইরের ব্যাপার। ধর্ম হচ্ছে অন্তরের। ভগবান কখনও বলেনি, তুমি ছোট জাতের তুমি আমার কাছে আসবে না। তোমার মত হয়তো গলায় মালা পরে না। চন্দন লাগায় না। কিন্তু তাতে কি কেউ তার ইষ্ট দেবতাকে মনে প্রাণে ভজন করতে পারেন ?

যুবক ঃ বুঝলাম জাত যাবার মত নয়। ধর্মও নষ্ট হবার মত নয়।

সাহেব ঃ চাঁদ সূর্য কি জাত ধর্ম বিচার করে আলো দেয় ? ন্যায় অন্যায় বলে কিছুই নেই। একদেশে যেটা ন্যায়, সেটাই অন্যদেশে অন্যায়। কপালে যা থাকবে তাই হবে বলে যারা কপালের উপর সব কিছু ছেড়ে দেয় তারাই সেই সব দুর্বলরাই নীতি নীতি বলে চেঁচামেচি করে। তারই ফলে এই পৃথিবীতে সমান নীতি বলে কিছুই নেই।

....

সাহেব ঃ সমাজ ব্যাপারটাই আমাদের তৈরী। সেই সমাজ ব্যবস্থা দরকার যুগের দাবীর সঙ্গে মিলিয়ে আমরা ভাঙ্গব, গড়ে তুলব।

(অনুবাদ প্রবন্ধ কারের)

এইভাবে দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক থেকে ত্রিপুরার প্রথম মণিপুরী সাহিত্যকর্মটি একেবারেই প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে আসরে এসে নামে। এর পর প্রায় দীর্ঘ বিশ বছব একেবারে নীরবরতা। ১৯৭৭ এর আগে ত্রিপুরার মণিপুরীয় লেখকদের আর কোন বই প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু এরমধ্যে একটি খুব সুদূর প্রভাবী ঘটনা ঘটে গেছে। সেটি হচ্ছে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মরূপ নামে একটি মণিপুরী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এটি ঘটে রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের প্রয়াসে। প্রথমে কিছুদিন এর সম্পাদক ছিলেন ময়েংবম নীলমণি সিংহ। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ নিজে। পত্রিকাটি এখন সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ প্রয়াত হয়েছেন। এখন এর সম্পাদক তার পুত্র রাজকুমার কল্যাণজিৎ সিংহ। ত্রিপুরার মণিপুরীভাষী একটি অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পত্রিকাটির এই দীর্ঘ অস্তিত্বও একটি আশ্চর্য ঘটনা। সেই হিসেবে প্রয়াত রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের ত্রিপুরায় মণিপুরী লেখক ও পাঠক সৃষ্টির প্রয়াস ও তার পেছনে মরূপ পত্রিকার অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আত্ম নিয়োগের সংবর্ধনা জানিয়েছে। এখন ত্রিপুরায় বেশ কিছু মণিপুরী বই প্রকাশিত হয়েছে। অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির পেছনে রাজকুমার কমলজিৎ একটি খুব শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর বহু লেখা মরূপ ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় জীবন যাত্রার বিষয়ে মরূপ ও তার বার্ষিক শারদীয় সংখ্যা 'শরৎ কী ঈচেল' পত্রিকায় লেখা তার প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হলে সেটি একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় 'হঙোই নিঙোল লৌনম্বী'। লেখক গুরুময়ুম রাজেশ্বর শর্মা। এটি একটি কাব্যের বই। মহাভারতের একটি কৌতুকাবহ কাহিনী এর বিষয়বস্তু। এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কাহিনীর শুরু।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। একটি পুকুর। তার তীরে প্রস্তর নির্মিত এক প্রাসাদ। পুকুরের জলে তার ছায়া। ....যেন প্রচণ্ড রোদের তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় প্রসাদটি । কিন্তু পায়ে হেঁটে নামতে পারেনা পুকুরে।

পুকুরের জলে তাই পাঠিয়েছে নিজের ছায়া। নিজে থাকে তীরে দাঁড়িয়ে । চোখ বুঁজে। গরম থেকে বাঁচার প্রয়াসে।

(অনুবাদ প্রবন্ধকারের)

সেই প্রাসাদে থাকেন ব্যাঙদের রাজা আয়ু। তাঁর মেয়ে শোভনা। অতি সুন্দরী, কিন্তু জেদী। বহু প্রেমিক পুরুষকে নাকানি চুবানি খাইয়েছে ইতিমধ্যে। অনেকের দীর্ঘশ্বাসের কারণ সে। শেষ পর্যন্ত এই অতি কূটকুশলী জেদী কন্যা মহারাজ পরীক্ষিতের প্রেম ও প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে কিভাবে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হল তারই কাহিনী নিয়ে এই কাব্য।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এই লেখকেরই একটি ছোট, গল্পের সঙ্কলন, 'প্রেম লৈরাংগী নাচোম অমা'। যার অর্থ একগুচ্ছ প্রেম পুষ্প। বই এর গল্পগুলি মহাভারত এবং কিছু পৌরোনিক কাহিনী থেকে নেওয়া। ১৯৯৬তে প্রকাশিত হয়েছে 'লাইনিংবী মাধবী' নামে তাঁর আর একটি কাব্য আশী বছরের উপর বয়সী এই লেখক এখনও লিখে যাচ্ছেন ত্রিপুরা সরকার ১৯৯৩ তে তাঁকে তার সাহিত্যকৃতির জন্য সম্মানিত করেছেন। সেই বছরেই ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিত্যে পরিষদ তাকে কবিশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। আর ১৯৯৫ সালে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাকে কাব্যভূষণ উপাধি দেয়। গুরুময়ুম রাজেশ্বর শর্মা একজন স্বভাব কবি; উপমা, অলংকার, ছন্দ তাঁর অনায়াস সাধ্য। লোক, সংগীতি, চারণগীতি ইত্যাদির একটি প্রবাহমান ঐতিহ্য - এখনও মণিপুরীদের মধ্যে রয়ে গেছে। রয়ে গেছে 'ওয়ারি হায়বা' নামে বাংলা মহাভারত, রামায়ণ, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদির পাঠ এবং শ্রোতাদের সামনে তার তাৎক্ষণিক মণিপুরী অনুবাদের একধবণের কথকতার ধারা। আসরে একজন সুর ছন্দ দিয়ে মূল গ্রন্থটি পাঠ করে যান। আব একজন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি মণিপুরীতে অনুবাদ করে যান। আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ট্রান্স লিটারেশন। মণিপুরী ইডিয়াম ও ভাবধারায় সেগুলিব প্রকাশ। রাজেশ্বর শর্মার রচনায় সেই কথকতা নূতন রূপ পেয়েছে লিখিত মাধ্যমেব উপযোগী হয়ে।

কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহের 'ইমাগী যৌগন' নামে আর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬তে তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁকেও মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ইম্ফল ১৯৭৫ সনে 'সাহিত্যভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯৬২ সালে তিনি শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন।

কৈথেল্লাকপম চন্দ্রকুমার সিংহ, রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ এবং গুরুময়ুম রাজেশ্বর শর্মাকে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তিনজন গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান।

১৯৭৯ তে শুরু হয় 'ত্রিপুরা চে' নামে একটি পাক্ষিকের প্রকাশ। এটি প্রকাশ করেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার, সম্পাদক কার্তিক সিংহ। বর্তমানে এটি মাসিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদক এস বীরমঙ্গল সিংহ। এই সময়ের আশে পাশে শুরু হয় আরও কয়েকটি মণিপুরী সাময়িক পত্রেব প্রকাশ। সে গুলির কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। আর কয়েকটি অনিয়মিত হলেও এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৮৪তে প্রকাশিত হয়, 'লমজেল' নামে প্রকাশিত হয় মণিপুরী সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন, ত্রিপুরার পক্ষ থেকে 'শরী' নামে আর একটি ত্রৈমাসিকের। সম্পাদক বীরমঙ্গল সিংহ। চিত্রাঙ্গদা নামে মহিলাদের ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল, যার সম্পাদক ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরা প্রকাশ করে 'তম্বেল লৈরাং' নামে একটি সাময়িকী। সম্পাদক এন, নিরঞ্জন দত্ত। খোয়াই থেকে প্রকাশিত হয় 'হৈণ্ডাল' নামে পত্রিকার । সম্পাদক সৈলৈবম খেলামোহন সেন।

এই পত্র পত্রিকাগুলির প্রকাশ ও প্রচার ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিত্য রচনা ও প্রচারের একটি খুব উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। একটি ব্যাপারও ত্রিপুরায় মণিপুরী সাহিত্য রচনা ও চর্চার পেছনে উৎসাহ জুগিয়েছে;

সেটি হচ্ছে বাজ্য সরকার আয়োজিত আগরতলা বইমেলা'। এই মেলা উপলক্ষ্য করে সব সময়ই কিছু না কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে সরকারী আনুকূল্যে মেলায় স্টল পাওয়া গেছে। পাঠক, গ্রাহক, বিপনন এসবের সুবিধা হচ্ছে তাতে।

ত্রিপুরার মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ও রাজ্যে মণিপুরী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ এর দশকে প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই এই সংস্থাটি সাহিত্য সম্মেলন করে। 'তখেল লৈবাং' নামে তার মুখপত্র প্রকাশ করে। বাংলা ও মণিপুরী বই প্রকাশ করে, বইমেলায় মণিপুরী বই এর ভাণ্ডার তোলে ধরে, একটি ছোটখাটো লাইব্রেরী গড়ে তোলে লেখক এবং পাঠকদের উৎসাহিত করে যাচ্ছে। মণিপুরী সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন নামে আর একটি সংস্থাও এক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করেছে। এছাড়াও ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন ত্রিপুরা রাজ্য সাহিত্য সম্মেলন ও উত্তর পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলন ও এ রাজ্যে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার উৎসাহ জুগিয়েছে।

১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ এর বছর গুলিতে বেশ কিছু মণিপুরী বই এরাজ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে আছে হাওইবম রবীন্দ্র সিংহের কবিতার বই 'নুংশী খুদোল' (১৯৮২) এবং 'থমোই' (১৯৮৪), এন হিরন্ময় সিংহের লানমী অমগী নুংশী শৈরেং (১৯৮৬) এটিও কবিতার বই। এল, ইবোমচা সিংহের মকথররা আবীর (১৯৮৭) যা একটি গল্প সঙ্কলন। আর আছে অনোবা যুগকী অর্নোবা ইশৈ' (১৯৮৯) এটি তিনজন কবি হাওইবম রবীন্দ্র সিংহ, নোংশাতাবম নিরঞ্জন দত্ত ও ওয়াংখেম বীরমঙ্গল সিংহের কবিতার সঙ্কলন, যার সম্পাদনা করেছেন ময়েংবম রাম গোপাল সিংহ। 'তখেল ঙম্বা' নামে প্রাচীন মণিপুরীতে লেখা ত্রিপুরা এবং মণিপুর যুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক বিবরণের অনুবাদও এই সময় প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছেন, রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ। ১৯৯২তে মণিপুরী ভাষা শেখুন নামে মণিপুরী ভাষা শিক্ষার একটি বই ও প্রকাশিত হয়েছে। রচয়িতা ওয়াংখেম বীরমঙ্গল সিংহ। ১৯৯৪ তে প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার মণিপুরী কবিদের একটি কবিতা সঙ্কলনঃ 'কিরাত লৈপাকতা ঐখোই'। সম্পাদক ওয়াংখেম বীরমঙ্গল । ১৯৯৫ তে প্রকাশিত হয়েছে একগুচ্ছ বিভিন্ন ধরণের মণিপুরী লেখা যার মধ্যে আছে 'সনা পেতু পিবাইনো' যা একটি অনুছড়া সঙ্কলন রচয়িতা ওয়াংখেম বীরমঙ্গল সিংহ। 'চৎসি পুরী কোইকসি' নামে একটি ভ্রমন কাহিনী, লেখক এল বীরমঙ্গল সিংহ। প্রসঙ্গত এটি ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এখন পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনীর একমাত্র বই। ১৯৯৬ তে প্রকাশিত হয় 'ঈহেরিক্লবা ঈপোম' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন। রচয়িতা এল কুমার সিন্হা । ১৯৯৭ তে প্রকাশিত হয়, হোল্লু কন্না হিনাওদো' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন যার লেখক হচ্ছেন কৈনৌ আলাউদ্দিন খান, আর 'থামমদা মঙাল' নামে একটি নাটক যার লেখক হচ্ছেন এল কুমার সিংহ। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় হংলক্কনু ওযাহং অদো'। লেখিকা সরোক খাইবম তাম্ভিনী। এখন পর্যন্ত এটিই ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত ত্রিপুরারই একটি মহিলার কবিতার সঙ্কলন । কবি হিসেবে গাম্ভিনী ইতিমধ্যেই তার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কবিতা শুধু রাজ্যের বাইরের নয়, বিদেশে বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় ও স্থান পেয়েছে। তার কবিতার অনুবাদ ইংরাজিতে প্রকাশিত ভুবনেশ্বরের সাহিত্য অকাডেমি পত্রিকায় ও প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে যে সব বই এর নাম করা হল, আর যে সব লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পুস্তকের আকারে গ্রথিত না হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে , সেগুলির মধ্যে কবিতায় সংখ্যাই বেশি। বাংলা অনুবাদে সেগুলির কিছু কিছু আংশিক নমুনা এখানে দেওয়া হল। বিনা মন্তব্যে কারণ এই কবিদের সম্পর্কে স্থির মন্তব্যে আসার সময় এখনও হয়নি, এইগুলি নেওয়া হয়েছে কবিদের প্রকাশিত বইগুলি থেকে। অনুবাদ প্রবন্ধকারের।

গেয়ে জীবনের জয়গান। হাতে নিয়ে বিরাট মশাল চলবে চেষ্টা নিরন্তর। আমাদের কাজ হল শুরু।

(যেল হৈ — ভোর, হাওইবম রবীন্দ্র সিংহ)

এই প্রত্যাশা, নতুন দিনের আলো আরও অনেকের লেখায় ধ্বনিত হচ্ছে। আর একটি নমুনা ঃ

তারপর একদিন এই এই রক্তের দাগ যাবে মুছে। তোমার আমার রক্তে তা যাবে ধুয়ে। তখন হয়তো খুঁজে দেখা যেতে পারে। ভালবাসার সরোবরে। যেখানে অনেক পদ্ম তখনও থেকে যাবে ফুটে (লাম্মী অমগী নুংশী শৈরেং — এক সৈনিকের ভালবাসার গান, এন, হিরন্ময় সিংহ)

কিন্তু প্রত্যাশা যেমন আছে, হতাশা ও আছে। বিংশ শতাব্দীর ছোট হয়ে আসা পৃথিবী বেড়ে গেছে আজ আবার। এখানে কেউ আর কারও ডাক শুনবে পায় না। বাড়ী থেকে বাড়ী অনেক দূর। (শোত্তিগী খোংগাও শান্তির পদক্ষেপ, এন নিরঞ্জন দত্ত)

যুবক যুবতী আজ হিপি হিপিনী/থাবল চোংবা ছেড়ে। আজ একশ চুয়াল্লিশ ধারার ভেতর/হাতে হাত ধরে ব্যস্ত ডিস্কো ড্যান্সে (শাবী শানৌ - যুবক যুবতী, ওয়াংখেম বীরমঙ্গল)

মণিপুরের ঐতিহ্যময় লোকনৃত্য যাতে যুবক যুবতীদের বসন্তের চন্দ্রালোকিত রজনীতে হাত ধরাধরি করে নাচে।

ইদানীং যাঁরা লিখছেন তাঁরাও আরও সচেতন হয়ে উঠেছেন তাঁদের চারিদিকের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে।

সন্ধ্যার মাঙ্গলিক আরতি। ভোর বেলার আজানের ধ্বনি/বন্ধ করতে পারে নি বি, ডি, আর ও বি, এস, এফ/ সজোরে চেঁচিয়ে উঠে নিমাই, /.....আব্দুল তুমি কি শুনতে পাচ্ছ/তুমি আমার বন্ধু। (আব্দুল তুমি কী শুনতে পাচ্ছে/এল, কুমার।

নবযুগের নব চেতনা নিয়ে গড়ে তুলি নতুন সমাজ, উঠো জাগো তরুন দল (নহারোল, - তরুন দল, কৈনৌ আলাদ্দিন খান)

নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চারিত আর একজন কবি বলছেন ঃ

বিবাহ দাসীত্ব নহে, পতির গৃহে বধুর সম্রাজ্ঞীর.... অধিকার।

...... বিশ্বাস করো/মাথায় হাত রেখে আমাকে আজ কেউ আশীর্ব্বাদ করে বলে না — সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ...... ভব তবু আমি সম্রাজ্ঞী হব .....।

যারা নীতি মালাকে অনুসরণ করতে করতে। নীতিমালার মধ্যেই ডুবে মরেছে তাদের জন্য / ..... আমি তাদের জন্যই সম্রাজ্ঞী হব।

(এ লৈঙাকপী ওইগনী — আমি সম্রাজ্ঞী হব
সোরোকখাইবম গম্ভিনী)

ত্রিপুরায় এখনও কোন মণিপুরী উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। আজ পর্যন্ত মাত্র একজন লেখকের একটি মৌলিক ছোটগল্পের সঙ্কলন বেরিয়েছে। বইটির নাম 'মকথরব আবীর'। এর লেখক হচ্ছেন এল, ইবোমচা সিংহ। অবশ্য এটি এল বীরমঙ্গল সিংহের ছদ্মনাম। কিছু কিছু গল্পে লেখক মণিপুরী সমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারণা ও রীতি নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সমাজ সংস্কারক বা নীতি বাগীশ হিসেবে লেখক কোন সমাধান বাতলাতে চাননি যা অনেক দূর্বল লেখক প্রায়শ করে থাকেন। বিভিন্ন বয়সের চরিত্র তার গল্পে এসে হাজির হয়েছে। এদের কেউ লটারী ফেরি করে। কো অপারেটিভের নাম করে টাকা মেরে টি. ভি. কিনে নিজের জন্যে। এমন পুরোহিত আছেন যিনি দক্ষিণার জন্য তার অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের কাঠিন্য বাড়ান বা কমান। যে ছোটগল্পটির নামে বইটির নাম সেই মকথরবা আবীর বা বাংলায় যাকে বলা যায়

ফিকে হয়ে আসা আবীব'— নামেব গল্পটিব বিষযবস্তু হচ্ছে এক দবিদ্র কৃষকেব দুশ্চিন্তা । পবেব দিন হোলি। দলেব পব দল আসবে ভিক্ষে চাইতে। এই সমাজেব প্রচলিত ধবন। কিন্তু ঘবে নেই ভিক্ষে দেওযাব মত কিছুই নেই। শেষ সমাধান যে অল্প চালটুকু আছে তাতে দুটো ছেলে ও বৃদ্ধা মাযেব এক বেলাব ভাতেব ব্যবস্থা বেখে নিজে উপোস কবে ভিক্ষেব ব্যবস্থা কবতে হবে। হোলি যে।

ভ্রমণ কাহিনী এখনও প্রকাশিত হযেছে মাত্র একটি পুবী ভ্রমণ নিযে। 'চৎসি পুবী কোইকসি' এটিবও লেখক এল বীবমঙ্গল সিংহ। লিখেছেন অবশ্য সেই এল, ইবোমচা ছদ্ম নামেই।

ত্রিপুবায মণিপুবীতে লেখাব প্রচেষ্টা ক্রমেই বেডে উঠছে। যে সব লেখকেব লেখাব কথা এখানে আলোচিত হল সেগুলি তাদেব বই এব আকাবে প্রকাশিত লেখাকে ভিত্তি কবে। এবা ছাডাও আবও অনেক লেখক আছেন, যাদেব লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায ছডিযে আছে। তাদেব মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তিব নাম এখানে উল্লেখ কবা হল।

প্রবন্ধকাব ঃ মযেংবম বামগোপাল সিংহ, বাজকুমাব জীতেন্দ্রজিৎ সিংহ, মুতুম চিত্র সিংহ, এন, দিলীপ সিংহ, বাজকুমাব তরুন জিৎ সিংহ, পাঙনবম প্রবীব কুমাব সিংহ, মযেংবম নীলমণি সিংহ।

ছোটগল্পকাব ঃ লাংগোলজম কুমাব সিংহ, মযেংবম নীলমণি সিংহ, এন অসিত দত্ত, মাযথম গোপেশ্বব সিংহ, সৈলৈবম খেলামোহন, হাওইবম কর্মজিৎ সিংহ, শবৎ কবিতা ঃ তখেল ঙমবম দেবেন্দ্র সিংহ, হীবেন্দ্র চীঙাখোম, এস উত্তম সিংহ, এন প্রেমানন্দ সিংহ, মাইবম মৃণাল সিংহ, খোইস্নাম মঙ্গল সিংহ বাজকুমাবী অঞ্জনা সিংহ, মাধবী, থাংজম বথীন্দ্র।

এদেব লেখায বিশেষ কবে, কবিতাগুলিতে আজকেব দিনেব বিভিন্ন সমস্যা ফুটে উঠেছে। যাব মধ্যে কিছু সমস্যা বিশ্বজনীন। যা সব মানুষেবই থাকে, মূল্যবোধেব অবক্ষয, হিংসা, ড্রাগ, নেশা, আধুনিক মানুষেব একাকীত্ব বোধ, বিপন্নতা ইত্যাদি। এগুলিব অনেকই এখনকাব লেখকেব লেখায ফুটে উঠেছে। আব আছে বিশেষ কিছু সমস্যা যা বিশেষ কবে স্থানীয মণিপুবীদেব। সংখ্যাব স্বল্পতা, লেখাপডা, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকবী বাকবিব ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ভাষা ও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে অস্তিত্বেব বিপন্নতা বোধ ইত্যাদি। কোন বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীব এই বোধগুলিব প্রতিফলন দেখা যায অনেক আঞ্চলিক সাহিত্যেই। এগুলি স্থানিক বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য বিশ্বজনীন বটে, তবে স্থানিক ও বটে। অনেক সময স্থানিক বৈশিষ্ট্যেব উত্তবণ ঘটে বিশ্বজনীনতায। অনেক সার্থক সাহিত্য কীর্তিতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায। ত্রিপুবাব মণিপুবী বচনায এখন এই স্থানিক বৈশিষ্ট্য চোখে পবতে শুরু কবেছে। হযতো এব পবিপূর্ণ আকৃতি প্রাপ্তিব জন্য আমাদেব আবও কিছু সময অপেক্ষা কবতে হবে।

তবে সাহিত্য আলোচনাব ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই। লেখাব ব্যাপাবটি একান্তই লেখক আব পাঠকেব মধ্যে বোঝা বুঝিব ব্যাপাব। সমালোচক সেখানে বাইবেব মানুষ। পাঠক লেখককে গ্রহণ কবেন আপন বস বোধেব তাগিদে। আবাব অনেক ক্ষেত্রে সমযেব ধাবায। সমলোচকেব পবামর্শে নয।

ত্রিপুরী নারীর ভূষণ

বিজয়কুমার দেববর্মণ

গহনা বা অলঙ্কার অতি প্রাচীনকাল থেকেই নারীসমাজ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগেও আমরা গহণা বা অলঙ্কার প্রচলনের নিদর্শন পাই। ঐ সময় বিভিন্ন- প্রকার পাথর, পোড়ামাটি, ব্রোঞ্জ এবং শঙ্খের গহণা তৈরী হতো। তন্মধ্যে শঙ্খ ও পোড়ামাটির তৈরী গহণাই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ-নির্মিত ছোট্ট মালাও পাওয়া যেত।

ত্রিপুরার উপজাতি নারীসমাজেও নানাপ্রকার গহণার প্রচলন দেখা যায়। ওদের কতগুলি গহনা প্রাচীনকাল তথা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। ত্রিপুরী নারীদের গহনা সমূহের নাম হলো —ঢেড়ি, তৈয়া, হাঁসুলি, বালি, কাঠিছড়া (কণ্ঠি), নোলক, খাড়ু, কলি, পায়জেব, ইয়ামিতাম, (আঙটি), চুড়ি, সাত-লহরী, পাঁচ-লহরী, রামকলার মালা, বিভিন্ন পাথরের তৈরী মালা ইত্যাদি। তন্মধ্যে ঢেড়ি, তৈয়া এবং কাঠি, পুমদুম ছড়া, আর সাত-লহরী, পাঁচ-লহরী হলো গলার গহনা। কাসর বা বালা, চুড়ি ও ইয়ামিতাম হলো হাতের গহণা। কলি, বালি, নোলক হলো নাকের গহণা। এবং পায়ের গহণার নাম খাড়ু এবং পায়জেব। এসব অলঙ্কার সাধারণতঃ রৌপ্য নির্মিত হয়। অবস্থাপন্ন ঘরের রমণীগণ স্বর্ণালঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। তবে রূপার তৈরী অলঙ্কারই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরী রমণীগণ কাঁচের চুড়ি ব্যবহার করতে শিখে। তবে ধাতব অলঙ্কারাদি অপেক্ষা প্রকৃতিজাত সুগন্ধযুক্ত ফুল ও সুন্দর পত্র-পল্লবাদি দ্বারা কৃত্রিম অলঙ্কার তৈরী করে ব্যবহার করতে ত্রিপুরী রমণীগণ অধিকতর ভালবাসে। এরা রাম-কলার বীজ দ্বারা একপ্রকার মালা তৈরী করে ব্যবহার করে থাকে। এদের কতগুলি গহণার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ-

ঢেঁড়ি ঃ- ঢেঁড়ি কানের একপ্রকার অলঙ্কাব। এব অপর নাম ঝুমকা। এই গহণার দু'টি অংশ আছে। উপরের অংশ ও নীচের অংশ। উপরের অংশ কানের লতিকায় কলুপের সাহায্যে লাগানো থাকে। এর নীচে ছোট আংটায় সাহায্যে ঝুমকা আটকে দেওয়া হয়। ঢেঁড়ির উপরের অংশ গোল এবং আকারে রূপার টাকার চেয়েও বড়। পুরো লতিকাটাই বেশ জায়গা জুড়ে থাকে। তবে গোলাকার হলেও মুখের দিকে (বাইরের দিকে নয়) গোলাকার অংশটুকু সামান্য বেরিয়ে থাকে অর্থাৎ চোয়ালের উপরিভাগে কানের পার্শ্বস্থ গোলাকার অংশ থেকে বেরিয়ে আসা অংশটুকু আটভাবে লেগে থাকে। তবে গোলাকার অংশ থেকে বেরিয়ে আসা চাপা জায়গাটুকুর

পরিসর নিতান্তই কম। ঐ অংশটা সামান্য বাইরের দিকে বেরিয়ে আবার গোলাকার হয়ে যায়। গোলাকার অংশের মধ্যভাগ সামান্য উঁচু এবং ক্রমনিম্ন। মাঝখানে উঁচু জায়গাটিতে একটি বড় পাথর লাগানো থাকে এবং চারদিকে ছোট ছোট নানা রঙের পাথর বসানো থাকে।

নীচের অংশটুকুতে থাকে পাথরখচিত দু'টি পাতা। পাতা দু'টি ঝুলানো থাকে। এর নীচেই থাকে ঝুমকা। ঝুমকাটি দেখতে অনেকটা নারিকেলের অর্দ্ধাংশের মতো। ছড়ানো দিকটা নিম্নমুখী। ঐ ঝুমকার উপরেও নানা বর্ণের ছোট ছোট পাথর বসানো থাকে। এবং নীচে ঝালর দেওয়া হয়। ঝুমকার মধ্যভাগের উপরের দিকে আংটার সাহায্যে একটি লম্বা মত পাথর ঝুলানো থাকে। ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে এই পাথরটি এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

কাসর ঃ- কাসর বা বালা দেখতে অনেকটা বর্ত্তমান কালের বাউটির মতো। এটা হাতের গহণা। আকৃতিতে দু' আঙ্গুলের মতো চওড়া। বাউটির মধ্যাংশ যেমন একটু উঁচু থাকে কাসরের ও মধ্যভাগে সামান্য উঁচু হয়ে পাশের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে যায়। ফলে বালা যেমন দেখতে গোল এবং মসৃণ কাসর দেখতে তেমন নয়। কাসর অনেকটা চেপ্টা মতো এবং মধ্যভাগ উঁচু থাকে। বাউটির ভিতর ভাগ ফাঁপা। কাসরের তেমন নয়। এর ফাঁপা অংশটুকু ভরাট থাকে।

বালি ঃ- বালি হলো নাকের গহণা। দুই ছিদ্রের মধ্যবর্ত্তী নাকের ভেতরের নরম মাংসল অংশ ছিদ্র করে এই গহণা পরা হয়। এটা নাক এবং উপর ওষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী ফাকা স্থানটিতে ঝুলানো থাকে। বালির নিম্নভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। উপরের দিকটা রিঙের মতো গোল এবং সোনার তৈরী সরু বাঁকা তার লাগানো থাকে। এই জিনিষটা অনেকটা কানের রিং-এর ন্যায় দেখতে। অর্দ্ধচন্দ্রের একদিকে থাকে একটি ছোট আংটা । যথাস্থানের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে সরু তারটি ঐ আংটায় আটকে দেওয়া হয়।

তৈয়া ঃ- এটা কানের উপরিভাগের গহণা। দেখতে অনেকটা করবী ফুলের মতো। ত্রিপুরী রমণীগণ শুধু কানের লতিকাই ছিদ্র করে না। উপরে অংশটুকুও ছিদ্র করে কেশ-সংলগ্নে এই গহণা ব্যবহার করে থাকে। তৈয়াকে দুই অংশে বিভক্ত করা চলে। একটি গোলাকার অংশ অপরটি লম্বা অংশ। গোলাকার অংশটুকু নীচের দিকে অর্থাৎ কানের ভিতরের দিকে থাকে। আব লম্বা অংশটি উপরের দিকে অর্থাৎ কেশ-সংলগ্ন থাকে। গোলাকার অংশটি অনেকটা কানপাশের মতো গোল। মধ্যভাগটি একটু উঁচু। আযতনে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা বা সিকির চেয়ে সামান্য বড়। গোলাকার অংশটুকু কানের গর্ত্তের একটু উপরে লাগানো হয়। এই কানপাশার ন্যায় গোল অংশের ঠিক উপরিভাগে ফাঁপা ক্ষুদ্র গোল একটি কাঠি থাকে। সেই গোল কাঠিটাই কানের উপরিভাগের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঢুকানো হয়। উপরের অংশটা দেখতে অনেকটা হবিতকির মতো। আকারে খুব ক্ষুদ্র এবং লম্বা। উপর-নীচ উভয় দিকই সরু। মধ্যভাগই একটু মোটা। গায়ে কামরাঙ্গার ন্যায় শির কাটা থাকে। সেটা কারুকার্য খচিত। সম্পূর্ণ অংশটুকুর উপরিভাগে ছোট ছোট মালা লাগানো হয়। নীচের দিকে সরু কাঠির গায়ে প্যাঁচ কাটা থাকে। এই প্যাঁচ এর অংশটুকু কানের উপরিভাগে সামান্য গুটানো নরম জায়গাব মধ্যে ঢুকিয়ে নীচে কানাপাশার ন্যায় অংশের উপরিভাগের ফাঁপা নলে সংযোজনে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এই ফাঁপা নলে মতো অংশের ভিতর দিকেও প্যাঁচ কাটা থাকে। এর সাহায্যেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গহণার দু'টি অংশকে একত্রিত করা হয়। এই সংযোজনের ফলে গহণার বর্হিভাগ কানের উপরিভাগে হেলানো অবস্থায় সোজা থাকে। পারিবারিক অবস্থা বা স্ব-স্ব সাধ্যানুযায়ী ত্রিপুরী রমনীগণ সোনা বা রূপার নানা বর্ণের পাথর খচিত তৈয়া পরে থাকে। তৈয়া সাধারণতঃ দেড় থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা হয়।

এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরী রমণীগণ আরেক প্রকার গহণা পরে থাকে। এর নাম ওয়াখুম। এটা কর্ণলতিকার গহণা। ত্রিপুরী ভাষায় 'ওয়াখুম' শব্দের অর্থ হলো বাঁশের ফুল। বাঁশের ফুলের মতো দেখতে বলে ত্রিপুরীগণ

এই গহণাকে ওয়াখুম বলে থাকে। ওয়াখুম সোনা এবং রূপা দুই ধাতুতেই তৈরী হয়। এটা ত্রিপুরী রমনীকুলের অতি প্রিয় গহণা।

স্না-রেম্বী ছড়া ঃ- ছড়া বলতে সাধারণতঃ মালা বুঝায। আমরা মালা বলি ত্রিপুরীভাষায় তাকে ছড়া বলা হয়। স্না-রেম্বী ছড়াকে সংক্ষেপে রেম্বী ছড়া বলা হয়ে থাকে। হয়তো বলার বা উচ্চারণের সুবিধার্থে এই গহণার এরূপ নাম হয়েছে। রেম্বী ছড়া হলো কতগুলো ছোটো ছোটো গুটিকা বা মালার (bead) সমষ্টি। অনেকগুলো গুটিকা বা (bead) মালাকে একত্র করে মালাব আকারে সূতায় গাঁথা হয়ে থাকে। এই ছড়ার মালাগুলো দেখতে সিকির মতো। তবে সিকির ন্যায় চ্যাপ্টা নয়। অনেকটা বোতামের মতো উঁচু । তার উপরে সোনা বা রূপার কারুকার্য খচিত পাত আটকানো থাকে। মালাগুলি ঔষধের বড়ির ন্যায় পুরু। ঐ সোনা বা রূপার পাতের নিম্নাংশ চাঁচ দ্বারা ভরাট থাকে। সেই জন্যই মালাগুলোকে উঁচু এবং ভারী দেখায়। অবস্থা অনুসারে অনেকে সোনার কিংবা সোনা ও পাথর বসানো রেম্বী ছড়া ব্যবহার করে থাকে। পাথর বসানো রেম্বী ছড়ায় সাধারণতঃ দু-রঙের পাথরের প্রয়োজন হয়। গোলাকার টেবলেটেব মধ্যভাগে একটি ছোট পাথর থাকে এবং তার চারপাশের লাল-সবুজ অথবা রঙ পাশাপাশি অথবা একের পর এক সাজানো হয়। টেবলেটের উপরিভাগে ছোট রিং বা আংটা লাগানো থাকে। এর মধ্যে সূতা ঢুকিয়ে মালা বা ছড়া তৈরী হয়। দুটো টেবলেটের মধ্যে সামান্য দূরত্ব থাকে। এই দূরত্বের ফাঁকা অংশ পূরণের জন্য ছোট ছোট প্রবাল বা পাথরের মালা বা গুটিকা (bead) ব্যবহার করা হয়। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগেও এই রকম ঐ রকম পাথরের (carnelian) অনেক গুটিকা বা মালা (bead) পাওয়া গিয়েছে। স্না-রেম্বী ছড়া মূলতঃ মণিপুরীদের গহণা। ত্রিপুরী রমণীগণ পরে এই গহণা ব্যবহার করতে শেখে। পুমদুম ছড়াও তাই।

কলি ও নোলক ঃ- আগেই ত্রিপুরীদের নাকের গহণার আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরীদের আরও দুটী নাকের গহণা আছে। সেগুলি হলো কলি ও নোলক। কলি এবং নোলককে এক কথায় সর্বভারতীয় গহণাব পর্যায়ে ফেলা চলে। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেব রমণীদেরই কলি পরতে দেখা যায়। বাংলায় কলিকে বলা হয় নাকফুল। নাকের উপরে বাঁদ দিকের পাতা ছিদ্র করে এই গহণা পরা হয়। ছোট একটি সোনা বা রূপার তৈরী শক্ত তারে দেড় প্যাঁচ দেওয়া থাকে। এর উপরে স্থান কবে পাথর বসানো হয়। অনেক সময় আবার শুধু সোনা বা রূপা দিয়েই তৈরী করা হয়। পাথরের বদলে সেখানে নক্সা করা হয়ে থাকে। ঐ দেড় প্যাঁচের তারটি নাকের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারটি নাকের অভ্যন্তরে থেকে যায়। উপরের নক্সা বা পাথরটি নাকের পাতায় বসানো থাকে। ফলে শুধু নক্সা বা পাথরই দেখা যায়। সরু তারটি আর দেখা যায় না।

নোলক প্রায় অনেকটি বালির মতোই দেখতে। এই গহণা রিং-এর ন্যায় সরু গোলাকার হয়। এবং রিং এর সরু তারে মালার আকারে ছোট ছোট পাথর আটকানো হয়। বালির মতোই নাকের ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মাংসল অংশ ছিদ্র- করে এই গহণা পরা হয় ; এবং উপর ওষ্ঠের উপরাংশে অর্থাৎ নাকের ঠিক নীচের জায়গায় ঝুলানো থাকে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এবং কাশ্মীরি রমনীদের মধ্যে নোলক ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া নাগা রমণীগণ ও নোলক ব্যবহার করে থাকে।

খাড়ু ঃ- খাড়ু হলো পায়ের গহণা। দেখতে অনেকটা হাতের গহণা অনন্তের মতো। এই গহণার মধ্যভাগ সামান্য মোটা । তারপর ক্রমশঃ সরু হয়ে দু'দিকের প্রান্তদেশে মিশে যায়। খাড়ুর মাথা দুটি বালা বা কাসরের ন্যায় একত্রে মিশে যায় না। কিংবা অনন্ত বগা কাসরের ন্যায় একত্রে মিশে যায় না। কিংবা অনন্ত বা বালার মতো মকর-মুখও থাকে না। প্রান্তদেশ গোল বলের ন্যায় আটকানো। সম্পূর্ণ খাড়ুটাই ফাঁপা হয়। ফলে একটির সাথে অপরটি স্পর্শ হলেই টুং-টাং আওয়াজ হয়। বালার ন্যায় গোলাকার অংশ দিয়ে পা ঢুকিয়ে এই

গহণা পরা হয়। খাড়ুকে পায়ের বালাও বলা যেতে পারে। খাড়ুতে লতাপাতা ফুল ইত্যাদি খচিত নানাপ্রকার নক্সা দেখা যায়।

কাঁঠিছড়া ঃ- কাঁঠিছড়া হলো এক ধরনের গলার মালা। সোজা কথায় ত্রিপুরীগণ এই গহণাকে কাঁঠি বলে থাকে। রেম্বা ছড়া যেমন কতগুলো ছোট ছোট গুটিকা বা মালার (bead) সমষ্টি কাঁঠিছড়াও তেমনি সুতায় গাঁথা কতগুলি মালার সমষ্টি। কাঁঠিগুলি দেখতে বড় মুক্তোর গুটিকার চেয়ে সামান্য বড়। তবে মুক্তার গুটিকা যেমন মসৃণ হয় কাঁঠি ঠিক তেমন নয়। কাঁঠির গায়ে রকামরাঙ্গার ন্যায় শির কাটা থাকে। কিন্তু কামরাঙ্গার মতো লম্বাটে ধরণের হয় না। এটি সাধারণতঃ গোলাকার হয়। অনেকগুলি কাঁঠি একত্রে পরস্পর পাশাপাশি গেঁথে মালা তৈরী করা হয়ে থাকে। অনেকে কাঁঠির নমুনা বা আকৃতি বিভিন্ন রকমের (ছোট বড়) করে থাকেন। কেউ কেউ সবগুলি সমানই ভালবাসেন। কেউ কেউ মালার ঠিক মধ্যের কাঠিটি বড় করে থাকেন। কেউ কেউ সবগুলি সমানই বড় করে ক্রমশঃ দু'দিকের কাঁঠিগুলি ছোট করে আনেন। এতে মালার মধ্যভাগ একটু মোটা হয়ে দু'পাশ ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। কাঁঠিগুলির ভেতরের অংশ ভরাট থাকে। খুব অল্প সোনায় এই গহণা তৈরী করা চলে। চাঁচ বা ভরাটের মধ্যবর্ত্তী অংশ ছিদ্র করে সূতা প্রবেশ করানো অসুবিধা বলে ছিদ্রের অংশে খুব সরু একটি ফাঁপা কাঠি আটকানো হয়। তার মধ্য দিয়ে মালা বা ছড়া তৈরীর জন্য সূতা ঢুকানো হয়ে থাকে। ত্রিপুরী রমনীগণ রামকলার বীজ দিয়েও একরকম মালা তৈরী করে পরে থাকে। সূতা দ্বারাই এই মালা গাঁথা হয়।

এই সকল গহণা ত্রিপুরী সমাজে পূজা পার্বণ, বিবাহ-উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানকালে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বিবাহকালীন সময়েই অত্যধিক ব্যবহৃত হয়। টিকলি নামে আরেকটি গহণা ত্রিপুরী নারীর মাথার ভূষণ। ত্রিপুরী নারীকুল অত্যন্ত বিলাস প্রবন এবং অঙ্গসজ্জা এই সমাজের রমনীদের বিলাসিতার এক প্রধান অঙ্গ। ত্রিপুরী রমনীগণ খোঁপায় ও কানে সুগন্ধযুক্ত ফুল পরতে খুবই ভালবাসে।

ত্রিপুরা চলচ্চিত্রের কথা

বিমল সিনহা

বিজ্ঞানের অগ্রগতির রথের চাকা দ্রুত গতিতে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে। বিজ্ঞানের এই দুর্বার গতি মানব সভ্যতার দিকবিদিক ব্যপ্ত করে তুলেছে ঝড়ো হাওয়া। পুরাণো মন্থর জীবনধারাতে সহিসের চাবুক মারা ঘোড়ার মতো গতি সঞ্চালিত হচ্ছে। অনিবার্যভাবেই শিল্প, নাটক, সাহিত্য, প্রভৃতির উপর বেগবান বিজ্ঞান তুলেছে সৃষ্টির নতুন নতুন লহর। চলচ্চিত্রের আবিস্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। সংস্কৃতিকে দৃঢ়ভাবে মূর্ত্তিমান করে বাঁচিয়ে রাখা, ক্ষণিকের সুখ দুঃখ, বেদনা, আশা নিরাশা, অভিমান প্রতিটা অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র এক বলিষ্ঠ মাধ্যম।

এই বলিষ্ঠ মাধ্যমের প্রয়োগের প্রভাব সহজে কেউ আটকে রাখতে পারে নি। দুর্গম, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সব বাধা ডিঙিয়ে ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যেও আসতে চেয়েছে। এরই ইতিহাস বড় ধূসর, আগোছালো, তবু কিছু চলচ্চিত্রের আবছা আবছা পদচিহ্ন রয়ে গেছে।

খুব সম্ভবত ১৯৩২ থেকে ১৯৬৩ সাল। ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ওরফে লালু কর্তা ছোট একটি মুভি ক্যামেরা নিয়ে চলাফেরা করতেন। মহারাজা ইউরোপ ভ্রমণে যখন লালু কর্তা সঙ্গে ছিলেন বেবীপ্যাথি ক্যামেরা নিয়ে। মুসোলিনির সঙ্গে ইটালীতে মহারাজের সাক্ষাৎকার বা জার্মানীতে হিটলারের সঙ্গে মহারাজের করমর্দন এই সবই ছিল ছবির বিষয় বস্তু।

এই চলচ্চিত্রের প্রথম ফসল রাজবাড়ীর অন্দরমহলের লোকজন ছাড়া বাইরের কেউ দেখেনি। ওই বেবীপ্যাথি ক্যামেরাতে ছবি নড়াচড়া করলেও শব্দ ছিল না। তবু ওই বোবা ছবি প্রদর্শনেই বিস্ময় আর অপার রহস্যের অবতারণা করে। কেউ কেউ বলে ওই ক্যামেরা নিয়ে মহারাজ বীরবিক্রমের বিয়ের ছবি মধ্য প্রদেশের খেলারামপুরে তোলা হয়েছে। ওই চলচ্চিত্র রাজবাড়ীর চার দেয়াল থেকে বাইরে বেরোবার হুকুম পায়নি। সাধারণের মধ্যে ত্রিপুরার প্রথম ক্যামেরাম্যান খুব সম্ভবত সুখীলাল দে। সুখীলালবাবু রাজবাড়ীর মূর্তি গড়তেন, তৈলচিত্র আঁকতেন। সুখীলালবাবুর সৃষ্টির অমরকীর্তি এখনো রাজবাড়ীতে দু'একটা আছে। সুখীলালবাবু গেলেন বরোদায় ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ বাড়াতে ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালে। সেখানেই তিনি ক্যামেরার কাজও শিখেন।

গর্জ এণ্ড ভেকার নামক জার্মান কোম্পানীর বিরাট ক্যামেরা নিয়ে কাজ আরম্ভ। বিরাট কালো চাদরে ক্যামেরা ঢেকে ডার্ক স্লাইড সরিয়ে তোলা ছবি। এরই মধ্যে বিচিত্র মুহূর্তের বিচিত্র অনুভূতিকে ধরে ছবিতে ব্যক্ত করার নিরলস প্রয়াস। পরবর্তীকালে সুখীলালবাবু সরকারী প্রচার দপ্তরে ক্যামেরাম্যান হিসাবে যোগ দেন। সুখীবাবুর হাতেই কাজ শিখেন শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। যাকে পেইন্টার বলে লোকে চিনতো। রাজবাড়ীর বিয়ের ছবি, মিছিলের তারই হাতে আঁকা, এখনো জীবন্তের মতো কথা কয়।

পণ্ডিত নেহেরু ত্রিপুরায় যখন আসেন ১৯৫২ সালে, সঙ্গে ছিলেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ক্যামেরাম্যান শম্ভু সাহা ও যুগান্তরের তারক দাস সুখীলালবাবু প্রচণ্ড দুঃসাহস নিয়ে নেহেরুর প্রথম ত্রিপুরা ভ্রমণ নিয়ে চলচ্চিত্রে ছবি তোলেন। সেই ছবির অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানা যায়নি।

সুখীবাবুর হাতেই কাজ শিখে ছবি তুলতে আরম্ভ করেন প্রবীর দেব। চলচ্চিত্রের ক্যামেরার কাজ কোলকাতায় ভাল। কৈশোরেই কলেজের পাঠ শেষ করে ছুটে যান কোলকাতায় ১৯৪৭ সালে। মিনার্ভা— থিয়েটারের মালিক সতীশ সরকার তখন নামকরা সিনেমা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ওরা তাকে নিরুৎসাহিত করেন। তবু জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান প্রবীরবাবু। কখনো বিড়ি পাতা ফেরী করে কখনো বিড়ির দোকানে কাজ নিয়ে কোন রকম বাঁচার চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে ক্যামেরার কাজ রপ্ত করেন। নেশাকে পেশা করে ফিরে এলেন আগরতলায় ১৯৪৮ সালে। রূপায়নী স্টুডিও দিয়ে সূচনা। রাজবাড়ী থেকে 16 M M special kodak Brownic ক্যামেরা মাত্র সম্বল। ৫০ ফুটের রীল ভরা ক্যাসেট নিয়ে তখন কত পরীক্ষা নিরীক্ষা। ছবি তখন ডেভোলাপ হলো কলকাতায় বা বম্বেতে।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার হলিউড থেকে এলেন বিখ্যাত প্রডিউসার ডিরেক্টর ডানগান সাহেব। "দি বিগ হান্ট বই এর শুটিং করতে। এসে খুঁজে বের করলেন প্রবীরবাবুকে। নাগীছড়াতে দাঁতাল হাতী ছাড়াই রাজবাড়ীর সহায়তায় সংগঠিত করে ছবি তোলা হলো। সেই ছবির সংগে জুড়ে দেয়া হয় আফ্রিকার গহন বনে তোলা ছবিও।

১৯৫৯ সালে বার্মার রাষ্ট্রদূত উ-লা আউং আগরতলায়। বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বুদ্ধমন্দিরে ত্রিপিটক দান করার অনুষ্ঠান। প্রবীরবাবু ইনা ওই 16 M M ক্যামেরা নিয়েই তুললেন এই ছবি।

ওই বছর মানে ১৯৫৯ সালেই ডম্বুর কন্যা নামে এক কাহিনী চিত্র শুরু হয়। ছবির ভাষা ককবরক ও বাংলা। উপাখ্যান শুরু এক ভাগ্য বিড়ম্বিত বাঙালী ছেলে পূর্ব পাকিস্থান থেকে এসে সমাজশিক্ষা দপ্তরে চাকরী পায়। কাজে যোগদান করে উপজাতি গ্রামে। ভালোবাসে ফেলে এক উপজাতি মেয়েকে। সামজিক সংঘর্ষ, মিলন, বিরহ ব্যাথার দুই সম্প্রদায়ের কাহিনী। জাতীয় সংহতির উপর গুরুত্ব দেওয়া। নায়ক হলেন কলকাতার রূপেন ভৌমিক, নায়িকা ইরা বানার্জী। উপজাতি নায়িকা পেলেও অভিনয় ফুটাতে পারেনি। শুধুমাত্র অর্থের অভাবে ডম্বুর কন্যা অর্ধ সমাপ্ত থেকে গেলো, কোনদিন মুক্তি পেলো না।

এই ছবির মুক্তির জন্যই প্রবীরবাবু সরকারি সাহায্য চাইতে গেলেন ১৯৬০ সালে চিয়া কমিশনার শান্তি প্রিয় মুখশ্রীর কাছে। ডম্বুর কন্যার জন্য টাকা মঞ্জুর হলো না। মঞ্জুর হলো ত্রিপুরার উন্নয়ণমূলক কাজে ডকুমেন্টারী ছবি ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্টের। তৈরী হলো ত্রিপুরা সংবাদ নামে প্রচার দপ্তরের সিরিয়েল ছবি। সবই ডকুমেন্টারী।

অন্যদিকে ১৯৫৬ থেকে শুরু করে ১৯৬২ সালে এক নীরব কোডাক ক্যামারা নিয়ে কাজে হাত দেন রবীন সেন। বর্তমান সেন এণ্ড সেন স্টুডিওর মালিক! উনার বাবা প্রফুল্ল সেনও ক্যামারা ম্যান ছিলেন মধ্য প্রদেশ বলরাম পুরে মুভি ক্যামারা নিয়ে মহারাজার বিয়েতে ছবি তোলেন। সেই হিসেবে রবীনবাবুর বংশানুক্রমিক ছবি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। সুইসমেড পেলেইর্ড বোলেক্স ক্যামেরা দিয়ে তুলেন "সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত-পর্যন্ত আদিবাসী জীবনের কলতান। সেনসর হয় ২৭/৯/৬৭ সালে, ছবি ছিল এক রীলের।

উনিই হাতে নেন স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসবের ছবি। তবু ছবির তুলনায় ট্রাইবেল জীবনের উপর তোলা ছবি ওই সীমাবদ্ধতার মধ্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এই ছবির নাম The Tales of Tribal Life of Tripura. ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কিতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সিনেমাটোগ্রাফার সম্মেলন আগষ্ট মাসে ছবি প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম ত্রিপুরার চিত্রশিল্পী রবীন সেন এতে যোগ দেন। বিস্মৃতির খামে ঢাকা এই ঘটনা কোনদিন আবার খুলে দেখা হবে কিনা কে জানে। রবীনবাবু তারপর হাত দেন, সূর্যগ্রহণ, অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ডকুমেন্টারী ছবিতে। জিমনাস্টিকের উপর ছবি করেন মহারাজার পার্সোনেল সেক্রেটারী সত্যেন বসুর ছেলে রুনু বসু। উনার বিখ্যাত ছবির মধ্যে অন্যতম BSF mock fight.

তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিং, সুখময় সেন ওদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো কয়েকটি ডকুমেন্টারী ছবি হয় যার উদ্দেশ্য মূলত সরকারী কাজ কর্মের প্রচার অভিযান। এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর ত্রিপুরায় আগমন নিয়ে রবীন সেন কয়েকটি ছবি করেন। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ যুদ্ধ ঘোষণা ১৯৭১ সালে এক স্মরণীয় ঘটনা।

বিভূতি রায় কোলকাতা থেকে এলেন বন দপ্তরের উপর "মুখর বনানী" ছবি তোলেন। রঙীন ছবি। দুই রিলে তোলা। 35 M M ক্যামেরায় তোলা। সত্যিই মুখর বনানী ত্রিপুরা ছবির জগৎকে অনেক মুখর করেছে।

অনেকে হারিয়ে গেলেও রবীনবাবু এখনও এই চলচ্চিত্রকে ত্রিপুরায় ঢঙে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত। উনার Victory of People ১৯৭৮ ইং সালে রঙীন ছবি। দুস্প্রাপ্য জনগণের জাগরনের উত্তাল ঢেউ এর কয়েকটি ছন্দে ছন্দায়িত। নায়ক নায়িকা ত্রিপুরার চেনা অচেনা জাতি উপজাতি মহান জনগন। এই ছবিতে ফুটে অবিচার অনাচার থেকে জনগনের মুক্তির আশায় উজ্জ্বল এক জঠর যন্ত্রনা।

প্রথম বামফ্রন্ট আমলে এলেন মৃণাল সেন। ছবির নাম ত্রিপুরা প্রসঙ্গ। নবজাগরণের এক পটভূমি ক্যামেরায় আনার চেষ্টায়। কোথাও স্মৃতি রোমন্থনের ঢঙে। কখনো গেরিলা যুদ্ধে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উপজাতি রোষের বিস্ফোরণে। তবু ছবিটা বিতর্কিত। কারো ভালো লাগে। কারো লাগেনা।

এই সময়েই ধর্মনগরে অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য মেঘালয়ে খাসিয়া ভাষায় ছবি করেন। নাম মানিক রাইতং। খুব সম্ভবত আঞ্চলিক ভাষার ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হৃদ রোগে এই ছবির নির্মাতা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন। সম্ভাবনাপূর্ণ এক চিত্র জগতের ব্যক্তিত্ব এমনিতেই ঝড়ে পড়ে অকালে।

এরই পাশে ত্রিপুরায় প্রথম কাহিনী চিত্র লংতরাই। আমার একটি রিয়াং জীবনের উপর ভিত্তি করা উপন্যাস। নির্দেশক ছিলেন দীপক ভট্টাচার্য্য। কোন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়নি। এখনো হাজারো দর্শক ভীড় করে। ভাল খারাপ বিবেচনার দায়িত্ব দর্শকদের। নর্থ ইষ্টানের ফিল্মের এক দুঃসাহসিক উদ্যোগ বলা চলে।

লংতরাই ছবির পর দেবাশীষ সাহা কঠোর শ্রম করে রূপান্তর ছবি বের করেন। রাজ্যের শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা করা এর একটি উদ্দেশ্য। কলা কুশলতার দিকে একটু কমবেশ থাকলেও ত্রিপুরার মাটিতে তৈরী ছবি। আলাদা একটা ঘরোয়া টানের মধুময় তাড়না আছে।

পরবর্তী ছবি লাংমনি হাদুক নন্দলাল দেববর্মার পৃষ্ঠপোষকতায় বলা যায়, পরোক্ষ প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সৃষ্ট ছবি। যদিও কলাকুশলী কয়জন বাইরে থেকে আনতে হয়েছে। তবু ককবরক ভাষীদের মধ্যে দ্বিতীয় আধুনিক ছবি।

এখন বিক্ষিপ্ত ভাবে চলেছে চলচ্চিত্র শিল্পে বিকাশের নতুন নতুন সংযোজন। যেমন ছবি Tele ব্যাধি। নারায়ণ পাটারী নির্দেশিত ছবির টেকনিক্যাল ক্রটী থাকলেও অনেকখানি আকর্ষণীয়। বিদ্যুৎ সিংহের Tele

film নুং শিপি। প্রথম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় ছবি। গ্রামে গ্রামে অনাদরে অবহেলা চলছে। ককবরক ভাষায় আরেকটি Tele film করেন চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং। এই ছবি অনেক ছবির চেয়ে জীবন্ত এবং নানাদিক নিয়ে সমৃদ্ধ নাম খরাং।

বর্তমানে মরনজয়ী ত্রিপুরা শ্যামল বানার্জীর ছবি। বলা যায় বিরাট আলোড়ন তুলেছে। নতুন শুটিং হবো হবো করছে আরোও অনেক ছবি- নোঙর, আতঙ্ক, জীবন এক অভিনয় ইত্যাদি।

এই ছোট রাজ্যে সীমাবদ্ধ উপকরণ, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি। তবুও চলেছে চলবে বলিষ্ঠ মাধ্যম চলচ্চিত্রকে নিয়ে নিরন্তর চর্চা। কখনো সফল, কখনো বিফল। এই নিয়েই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে চলচ্চিত্র বিকাশের ধারার এক নতুন দিগন্তের ইতিহাস।

চিত্রশিল্প ও ত্রিপুরা

গোপেন্দু ভূষণ চৌধুরী

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিল্পী তাঁর শিল্প রচনা কবেন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাব ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রেরণীয় শিল্পসৃষ্টি করতেন। তখন ও বিশেষ কারও দ্বারা প্রভাবিত পবিচালিত হবাব প্রশ্ন আসে নি। মুক্ত মানুষ যখন সুসংবদ্ধভাবে সমাজবদ্ধ হল — মাতৃতান্ত্রিক থেকে জরুর প্রতি যখন অধিকাব বোধ জন্মাল তখন আদিম সমাজ তাব ভারসাম্য হাবাল; ফলশ্রুতি রূপে এল ধনবৈষম্য। সমাজেব সমতলভূমিকে এই ধন বৈষম্য বহুতলে বিভক্ত করে দিল। শিল্পী কোনো উৎক্ষিপ্ত ব্যক্তি নন; তিনি একজন সামাজিক জীব। সমাজের স্তরবিন্যাস তাকে সমভাবে প্রভাবিত করল। তার ব্যক্তি চেতনা, শিল্প চিন্তাকে প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করেছে, পরিচালিত করেছে এই সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস জাত বিত্তকেন্দ্রিকদেব দ্বাবা। কার্যত শিল্প হয়ে পড়ল পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রিক বা পেট্রন কেন্দ্রিক।

ত্রিপুরার শিল্পচর্চার ইতিহাস এই পেট্রন কেন্দ্রিক তারই ইতিহাস। বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে — ত্রিপুরার শিল্পচর্চার পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে শক্তির কেন্দ্র প্রাসাদ থেকে সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ শক্তি দ্বারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্তর্হিত হল।

ত্রিপুরার শিল্পচর্চার পরিমণ্ডলকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে — (১) প্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্প চর্চা (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) (২) একক শিল্পচর্চাব কাল (১৯৪৭ এবং পব থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) (৩) যৌথ শিল্প চর্চার কাল (১৯৬১ সাল থেকে আধুনিকতম কাল) এই কাল বিভাজনগুলি কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে করা হয়নি। আলোচনার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা ঐতিহাসিক কাল থেকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরিচয় পরিবর্ধন হয়েছে দু'টি ভিন্ন উৎস হ'তে — প্রথমটি বৌদ্ধ, ফ্রেস্কো বা ভিত্তি চিত্র, দ্বিতীয়টি মধ্যযুগের মিনিয়েচার পেন্টিংস।

অজন্তাতে গুহার ফ্রেস্কোতে ভারতীয় চিত্রের পূর্ণতা ছাড়াও হয় বলে ধরা চলে। অজন্তাতে ফ্রেস্কো ছাড়াও কিছু টেম্পারার কাজ রয়েছে। মোটামুটি ৫০ খ্রীঃ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী এর কাল। গুপ্তযুগে ভারতীয় ভাস্কর্য বিকাশ লাভ করেছিল। অজন্তার গুহা বিকাশ ও সে সময়। অজন্তার পর বাঘ গুহা। বাঘ গুহার ফ্রেস্কো অজন্তার রীতি অনুসারী। অনুমান অষ্টম-নবম শতক এর কাল। অজন্তার যুগ থেকে আরম্ভ করে আজও পর্যন্ত আমাদের দেশের মন্দির মসজিদ বসতবাটীতে ভিত্তি চিত্র রচিত হয়ে চলেছে।

ত্রিপুরার তেমন কোন ভিত্তি চিত্রের নিদর্শন ছিল বা আছে বলে জানা নেই। অর্বাচীনকালে বর্তমান রাজবাড়ীর পূর্ব দিকে অবস্থিত 'লালদালান'-এর (যা সম্প্রতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে) ভিতরের দিকের ছাদে মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট ইত্যাদি রাশিচক্র নিয়ে কিছু ভাল টেম্পায়ার কাজ ছিল। দালানটি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাও লুপ্ত হয়। এমন ভাবেই হয়ত ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের পুরানো রাজবাড়ীগুলির সঙ্গে তার ভিত্তি চিত্রগুলিও ধ্বংস হয়ে গেছে।

মধ্যযুগের মিনিয়েচার দু'রকমের - রাজপুত ও মুঘল। রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার সমসাময়িক। মুঘলদের উত্থান পতনের সমান্তরাল রেখায় চলেছে মুঘল মিনিয়েচারের উত্থান পতন। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুঘলেরা ভারতে আসে, সপ্তদশ শতকে ক্ষমতার উচ্চশিখরে ওঠে এবং অষ্টাদশ শতকে তাদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ও আকবর পারস্য থেকে মিনিয়েচার পেন্টিংস আনয়ন করেন। পারস্যবাসীরা প্রধান প্রধান রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পারস্যভাষা রাজভাষায় মর্যাদা পায়। হিন্দি ও পারসি ভাষার সংমিশ্রণে উদ্ভূত উর্দু ভাষা যেমন — মুঘলদের দান মুঘল মিনিয়েচার ও তাদের দান। উভয়েই এক সময় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজমালার ১৭৯ তম মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের দরবারে একজন চিত্র শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম এই প্রথম আমরা জানতে পাই। শিল্পীর নাম আলম কারিগর। তিনি মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের একখানি মুঘল মিনিয়েচার ধরণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। চিত্রের মান না হলেও মুঘল মিনিয়েচার চিত্রের করণ কৌশলের নমুনা এই চিত্রে দেখতে পাই।" (ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা, (ত্রিপুরা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫) মুঘল মিনিয়েচার কার্যত অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই উৎকর্ষ হারায়। ১৮৬০ সালে ত্রিপুরা রাজ দরবারে মুঘল চিত্রের প্রচলন থাকলেও ঐতিহাসিক কারণেই তার মান উন্নত হবার কথা নয়।

মুঘল চিত্রের উৎপত্তি মুসলমান মুঘলদের দরবারে। মুঘল চিত্র ব্যক্তি প্রধান, সম্রাট ওমরাহ দরবার এই চিত্রের বিষয়বস্তু। রাজপুত চিত্রের উৎপত্তি হিন্দু রাজপুত রাজা বা জায়গীদারদের পৃষ্ঠপোষকতা হলেও তা ব্যক্তি প্রধান নয়, ইম্‌পারসোনাল, একে অভিজাত লোকশিল্প বলা চলে। রাজপুতানার সমভূমি অঞ্চলে প্রচলিত এই চিত্র কে বলা হয়, 'রাজস্থানী চিত্র' আর হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ী অঞ্চল কুলু কাংড়া অঞ্চলে প্রচলিত চিত্রকে বলা হয় 'পাহাড়ি চিত্র।'

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সেঙ্গ রাজপুতনার রাজাদের অথবা হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। অথচ রাজপুত পেন্টিংস ত্রিপুরার প্রচলিত ছিল বলে এমন কোন নিদর্শনের কথা জানা নেই। ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই রাজপুত চিত্রের কাল।

উনবিংশ শতকে কার্যত ভারতীয় চিত্রকলার কাল শেষ হয়ে এলো। ইংরেজ রাজত্বাধীন ভারতে তখন ইংরেজীয়ানায় দেশ ভরে গেল। ইউরোপীয়দের অনুকরণ করা শ্লাঘার বস্তু হয়ে দাঁড়াল, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ইউরোপীয় তৈল চিত্রের ছবি দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আরম্ভ হয়ে গেল অন্ধানুকরণ। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় তৈলচিত্রে দেশ ভরে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিত্রশৈলীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজা বর্মা। রাজ আমলে ত্রিপুরার স্কুলে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর "ছোটদের রামায়ণ পাঠ্য ছিল। এই বইতে রাজা রবি বর্মার বিখ্যাত তৈলচিত্র 'জটায়ুবধ' এর প্রতিলিপি ছাপা ছিল। ছবির বাস্তবতা বলিষ্ঠ গঠন, বর্ণলেপন বর্তমান প্রতিবেদকের শিশু মনকে দীর্ঘদিন আচ্ছন্ন করেছিল।

ত্রিপুররাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল (১৮৬২-১৮৯৬) ত্রিপুরা রাজ্যের এক গৌরবোজ্জ্বল কাল। রাজ্যশাসন ব্যবস্থাকে তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কার করেন। শিল্প-সঙ্গীত রচনায় তিনি ছিলেন সাবলীল। স্বাভাবিক কারণেই চিত্র শিল্প রচনায় তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণকারী রাজকুমারদের মধ্যে

সমরেন্দ্রচন্দ্র মধ্যপাদে এর বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ জানান তার "টলেডোর দৃশ্য" ছবিতে। তথাপি এই বিদ্রোহের সংগঠিত রূপ নিতে সময় লাগে অনেক দিন। ইংলেশেব শিল্প যোসেফ টার্ণারের (১৭৭৫-১৮৫১) প্রবর্তিত পথে চিত্রশিল্পে Impressionism এর জন্ম নেয় ফরাসী দেশে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যপাদে Photographic representation থেকে শিল্প সরে এলো নতুন প্রকাশ ভঙ্গীতে। এলো আধুনিক চিত্রকলা বা Modern Art- এর পর আধুনিক চিত্রকলার বিকাশের গতি দ্রুত ধাবমান। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। কেবলই Form ভাঙ্গছে। প্রকাশ ভঙ্গী বাদলাচ্ছে। Impressionisom এরপর এল Cubism প্রাথমিক Cubism থেকে এল নানান ধরনের Cubism। রুশ শিল্পী কান্দিনিস্কির (১৮৬৬ -১৯৪৭) শিল্পকর্ম থেকে জন্ম নিল Abstractism বা বিমূর্তবাদ এরপর এলো Surrealism ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকাশ ভঙ্গীর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ দর্শক তাল রাখতে পারল না। শিল্প হয়ে পড়ল তাদের কাছে বহুলাংশে দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতা কেবল মাত্র শিল্প নয় কাব্য চর্চায় ও সমভাবে পরিব্যপ্ত। ঊনবিংশ শতকে ভারতে যাঁরা ইউরোপীয় রীতির ছবি আঁকতেন তারা অনেকে অবনীন্দ্রনাথের নব্যচিত্রান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় প্রথায় তাঁরা তখনো শিল্পচর্চা করতেন নতুন ইউরোপীয় রীতি ও তাদের উজ্জীবিত করলো আধুনিক চিত্রকলাব প্রচলন হল। এই আধুনিক চিত্রকলার প্রধান প্রাণ পুরুষ ছিলেন গগনেন্দ্র নাথ অবনীন্দ্র নন্দলাল। উত্তর কালে এই নব্য ইউরোপীয় চিত্রকলা বা মর্ডান আর্ট প্রায় সলককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক চিত্র শিল্পীরা প্রায় সকলেই মর্ডাণ আর্টিষ্ট।

১৯৬১ সালে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, গৌতম দেববর্মন প্রমুখ চিত্র শিল্পী চিত্র সম্ভার নিয়ে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের Impressionist Cubist ইত্যাদি নানা আখ্যায় আখ্যাদিত করে দারুণ সোরগোল তোলা হয়েছিল।

ত্রিপুরার আধুনিককালের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম বিমল কর। ১৯৬৮-র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত তার "কেশ প্রসাধন" ১৯৭৩ এর ছবি "ছিন্নমূল" ও অন্যছবি "গ্লাম" রং রেখা কম্পোজিসানে অপূর্ব। তার 'গ্লাম' ছবিটি ত্রিপুরা সরকার কিনে ছিলেন, ত্রিপুরার শিল্প জগতের আর এক উজ্জ্বল নাম সুমঙ্গল সেন। তিনি একসময় প্রচুর তরুণ শিল্পীকে উজ্জীবিত করেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রদর্শিত তার টেম্পারার কাজটি চমৎকার। ছবিটি অবনীন্দ্র চিত্র শিল্প অনুসারী ১৯৭৩ সালের প্রদশনীতে উপস্থাপিত প্রশান্ত সেনের ছবি "উদয় প্রতিক্ষা" সাম্প্রতিক কালের একটি স্মরণীয় স্কেচ। সুনীল দাশের মত ঘোড়ার স্কেচ এঁকেছেন প্রশান্ত সেন। এই একই প্রদর্শনীতে কালোসাদায় কালিকলমে করা অসিত পালের ছবির কম্পোজিশান, রেখার টান মনে রাখার মত। অসিত পাল এক সময় আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে দালানের বাইরের দেওয়ালে কিছু মুরাল ছবি এঁকেছিলেন। পরবর্তীকালে নানান পোষ্টারের তলায় তা চাপা পড়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আগরতলা বিমান বন্দরের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আমিনা করের ২ টি মুরালি পেন্টিংস রয়েছে। বিমল দেবের কিছু উল্লেখযোগ্য স্কেচ প্রদর্শনীতে তার সময়ে উপস্থাপিত হয়েছিল যতদূর মনে পড়ে একটি চমৎকার ছবি নিয়ে ত্রিপুরা সরকার পোষ্টারর কাজ করেছিলেন। সত্যেন চক্রবর্তীর কোলাজের ছবি চমৎকার। আদিবাসী রমনীর একটা কোলাজ ছবি স্মৃতিপটে বারবার উঁকি মারে কালীঘাটের অভিজাত উত্তরসুরী যামিনী রায়ের প্রদর্শিত প্রচুর ছবি এঁকেছেন প্রভাত সেন। চিন্তা ফেরম আর টেকনিকের উপর অনেক পরিনিরীক্ষা করেছেন। ১৯৭০ এর উপস্থাপিত পার্থপ্রতিম দেববর্মা ও মহেন্দ্র কুমার দেববর্মার শিল্পচর্চার মনোনিবেশ করেন। বীরচন্দ্রের পুত্র ত্রিপুরাবাজ রাধাকিশোর মাণিক্যেব রাজত্বকালে (১৮৯৭-১৯০৯) শিল্প চর্চার বা তেমন কোনো শিল্পচর্চার কাল নয়। রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর এর রাজত্বকাল (১৯০৯-১৯১৩) প্রাসাদ কেন্দ্রিক শিল্পচর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল কাল। দরবারি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন — অগ্নিকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা সুখলাল দে প্রমুখ ধীরেন্দ্র কিশোর কন্যা কমলপ্রভা সুশিক্ষিত শিল্পী, চারু শিল্পচর্চা অপেক্ষা কারু শিল্প

রচনায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। তৎকালে ইউরোপীয় চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির শশী কুমার হেশ ত্রিপুরায় অল্পসময় দিন ছিলেন। তিনি মহারাজার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। এই পর্যন্ত প্রাসাদ কেন্দ্রিক চিত্রকলা ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুকরণ বা অনুসরণ করে চলছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রমাণে কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণের যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, চিত্র শিল্পের চর্চাকেও তা সমনাভাবে আন্দোলিত করেছিল ইউরোপীয় চিত্রের সস্তা অনুকরণ পরিত্যাগ করে ভারতীয় শিল্পের যে ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করে একটা ডাইমেনশন দিলেন শিল্প গুরু অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫৪)। চিত্রশিল্প জগতের এই নবজাগৃতি Bengal school of painters নামে খ্যাত। যদিচ ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বিস্তৃত রবীন্দ্রনাথ ও তার পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা ও রাজপরিবারের সঙ্গে চারপুরুষ ধরে ঘনিষ্ঠ যেগাযোগ ছিল তত্রাপি শিল্পচর্চার এই নবজাগরণ প্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্পচর্চাকে এই নবজাগরণ প্রাসাদ ছিল কেন্দ্রিক শিল্পচর্চাকে প্রভাবিত করেনি। এই চার পুরুষের মধ্যে কার্যত রাধাকিশোরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গভীরে পৌঁছেছিল। রাধাকিশোরের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের ও সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু রাধাকিশোরের কাল রাজদরবারের শিল্পধারার কাল নয়। রাধাকিশোর পুত্র বীরেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় অনেক দেরীতে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে — যদি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আগে হত তবে তিনি অবনীন্দ্র পদ্ধতিতেই শিল্পচর্চা করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ, তার আগমন এবং বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রভাবে ত্রিপুরাতে মৃদমন্দ হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। মহারণ্যে দেশের শিল্পধারা নবতরঙ্গে আন্দোলিত হওয়ার উৎসাহ দেখা দিল। এই বীরচন্দ্রের আমলেই ত্রিপুরা থেকে ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন, রমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত মজুমদার, শৈলেন দেববর্মন শিল্পচর্চা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় যান ও অবনীন্দ্র চিত্রধারার সঙ্গে পরিচিত হন ও অবগাহন করেন। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার পর এঁরা যখন শিল্পচর্চা শুরু করেন তখন ত্রিপুরার রাজদরবারের কাল শেষ হয়ে এসেছে।

ধীরেনকৃষ্ণের খ্যাতি ছিল ফ্রেস্কো শিল্পী হিসাবে। অথচ ত্রিপুরায় তার কোন ফ্রেস্কো চিত্র আছে বলে জানা নেই। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ আয়োজিত দশম চিত্র প্রদর্শনীতে (১৯৭৩) ধীরেনকৃষ্ণের চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিত্বমূলক নয় এমন দুটি চিত্র শিল্পের উপস্থাপন করা হয়েছিল। "সঙ্গীত চর্চায় গমনরতা দুই নারী" চিত্রটিতে "ফিগারের" দুর্বলতা অতিক্রম করে ডিটেলের কাজ ছিল চমৎকার। "নদীর ঘাটের নৌকা" ছবিটিতে মহারাজ গঞ্জবাজারের পাশের নদীর ঘাটে হাঁড়ি কলসি বোঝাই সার সার নৌকার যাতায়াতের স্মৃতির নষ্টালজিয়াতে আক্রান্ত হতে হয়। শৈলেশ দেববর্মনের চিত্র শিল্পের একটি সংগ্রহ ঐ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে ছিল। এমন এক প্রদর্শনীতে নলিনীকান্তের একটি নিসর্গ চিত্র (land scape) ও একটি প্রতিচ্ছবি (portrait) দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নিসর্গ চিত্রটির ডিটেলের কাজ চমৎকার। তবে প্রতিচ্ছবি অপেক্ষা নিসর্গ চিত্র চিত্রণে তাঁর পারঙ্গমতা বেশী। রাজ আমলে ত্রিপুরার স্কুলে ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত "ছোটদের রাজমালা" পাঠ্য ছিল। এই পুস্তকের মাধ্যমে রাজমালার বিষয়বস্তু নিয়ে রমেন্দ্রনাথ কৃত লীলায়িত রেখাচিত্রগুলি সাধারণ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। রাজমালায় বিষয়বস্তু নিয়ে তার বৃহদাকার কিছু শিল্প নিদর্শন ত্রিপুরার সংগ্রহশালায় রয়েছে। প্রাসাদের কালের শেষের দিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যাঁরা চিত্র অঙ্কন করতেন তাঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র দেববর্মা ও বিমল মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিমল মজুমদারের শিল্পের বিষয় বস্তুর মধ্যে নৈসর্গিক দৃশ্যই বেশী ছিল। সুরেশ চন্দ্রের ফিগার ড্রইং ছিল সুন্দর। আদিবাসী জীবনের উপর তাঁর কিছু ছবি রয়েছে। প্রাসাদের কালের লোকের দিকে শিল্পের বিষয়বস্তু রাজদরবার থেকে সাধারণের জীবন চর্চার দিকে সরে আসতে থাকে। রাজ আমলে স্কুলে ড্রইং শিখার ব্যবস্থা ছিল। তবে তা মনে হয় হেলাফেলার সঙ্গেই করা হত। সাধারণত শেষ

পিরিয়ডে ড্রইং স্যার আসতেন। উমাকান্ত একাডেমিতে আমাদের ড্রইং স্যার হলেন ননীগোপাল রায়। ক্লাসে বা আমাদের খাতায় মাঝে মাঝে তিনি যে নিসর্গ চিত্রের লেখা চিত্র আঁকতেন তাতে আমাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত।

ত্রিপুরার শেষ নৃপতি বীরেন্দ্রকিশোর পুত্র বীরবিক্রমের রাজত্ব কালের (১৯২৩-১৯৪৭) শেষ পদে ১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে অবনীন্দ্র, নন্দলাল, রামকিঙ্কর প্রমুখ ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র সম্ভার নিয়ে রাজপ্রাসাদে এক সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। বিভিন্ন রাজত্বকালে সংগৃহীত চিত্র শিল্পগুলি রাজপ্রাসাদের প্রদর্শনকক্ষে সব সময়ই প্রদর্শিত হত। প্রজাসাধারণ যথাযথ অনুমতি নিয়ে তা দেখতে পেতেন। এই অমূল্য চিত্রাবলীর সংগ্রহ এখন কোথায় কিভাবে আছে জানি না। স্মরণে আছে কৈশোরে একবার পিতার কার্যালয় রাজবাড়ীর নিজ তহবিল অফিসে গিয়েছিলাম। অফিসের মেঝেতে প্রখ্যাত শিল্পী বরদা উকিলের একটি জলরংএর ছবি হেলাফেলায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। হয়ত ছবিটি এভাবে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গেছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় ত্রিপুরার শেষ নৃপতি গত হয়েছেন। এমনভাবে হয়তো আরও অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে, হয়তো কিছু ছবি অল্প দামে ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে গেছে, যদিও অনেক সময় পার হয়ে গেছে তবুও আর দেরী না করে এই অমূল্য শিল্পসম্ভারের পুনরুদ্ধারের একান্ত প্রয়োজন।

একক শিল্পচর্চার কাল

১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের ফলে স্রোতের বেগে ত্রিপুরার উদ্বাস্তু আগমন, ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশীয় রাজ্যের বিলোপ, ১৯৫৭ সালে কাউন্সিলের নির্বাচন পর্যন্ত ত্রিপুরায় গভীর রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকে। শিল্পচর্চার পক্ষে সময়টা মোটেই উপযোগী ছিল না। প্রাসাদের কালের শিল্পীরা যাঁরা ত্রিপুরায়ী স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন তার নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল। তাদের শিল্পচর্চা ছিল নিভৃতে আলয়ে সীমাবদ্ধ। এই সময় ত্রিপুরায় শিল্প শিক্ষক হয়ে আসেন শক্তি হালদার মহাশয়। শ্রীহালদার আদিবাসী জীবন নিয়ে কিছু চিত্র আঁকেন ও ১৯৫৩ সালে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ত্রিপুরা সরকার সেই সময় তার আদিবাসী জীবনের ছবি নিয়ে ক্যালেণ্ডারও করেছিল তবে সে সময় তাকে শিল্পচর্চা অপেক্ষা কারু শিল্পের চর্চায় সময় বেশী বার করতে দেখা গেছে। তার শেষের দিকে নীরদ মজুমদারের প্রভাব প্রবল।

যৌথ শিল্প চর্চায় কাল

রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে এলে ক্রমে শিল্পসাহিত্য চর্চার একটি বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। এরই একটি সংগঠিত রূপ পাওয়া যায় রবীন্দ্র পরিষদ আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীগুলিতে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রকলার Photographic representation ছিল বেশী। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল প্রাচীন গ্রীসে চিত্র শিল্পী জিউক্সের সঙ্গে পারহাসিওসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। জিউল এমন নিখুঁতভাবে আঙুরের ছবি এঁকেছিলেন যে তার লোভে পাখী ছুটে এলো। এমন জীবন্ত ছবির জয় সুনিশ্চিত। এমন সময় পারহাসিওস প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার ছবির পর্দাটি সরিয়ে ছবিটি দেখতে বললেন। জিউস বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। কারণ পর্দাটা ছিল অতিসূক্ষ্ম ছবি "ডালি"তে ভ্যানগগের প্রভাব স্পষ্ট। ঐ একই প্রদর্শনীতে সংঘমিত্রা দত্তের এবস্ট্রাক্ট (Absrract) ছবিটি স্মরণযোগ্য। স্বাতী দেববর্মার "উদয়ন" স্কেচটির দীর্ঘদিন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকবে। মন্ডপ শিল্পে দীপা সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করতে হয়। সুব্রত দে নানান ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করলেও তার কোন রসোত্তীর্ন ছবি প্রতিবেদন দেখায় নি।

স্বপন নন্দী কৃত নামাবলী রুদ্রাক্ষের মালার কম্পোজিসান নিয়ে ফিকেলাল-গৈরিক রং এর একটি ছবি স্মৃতিপটে এখনো উজ্জ্বল। শ্রীনন্দী একজন দক্ষ কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট। ১৯৭৩ সালে ভিবজিয়োর তার ও সংঘমিত্রা দত্তের এক যৌথ প্রদর্শনী করেছিল। তার কিছু বুক কভারও সুন্দর। ত্রিপুরায় কার্যত কর্মাশিয়াল আর্টিস্টের কাজের স্কোপ কম। জাপানী জল রং এর ওয়াশ পদ্ধতির ইঙ্গিতে অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রংএর ওয়াশ নিয়ে যে রং-এর মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন তার যথার্থ প্রতিনিধি হৃষিকেশ দেববর্মা। ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা তার প্রচুর ছবি নানান প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

মানস ভট্টাচার্য, বিজন চক্রবর্তী, শঙ্কর চৌধুরী, বনপ্রভা সিংহ প্রমুখের ছবিও নানান সময় উপস্থাপিত হয়েছে। সব শিল্পীদের নাম উল্লেখ বা তার পর্যালোচনা সম্ভব হল না। ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে একটি শিল্প মহা বিদ্যালয় ও স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজাতিক্রান্ত শিল্পীদের সম্বন্ধে ও আলোচনা করা হলো না। বারান্তরে এ বিষয়ে বিশদ লেখার ইচ্ছা রয়েছে। ব্যক্তিগত চিত্র শিল্পচর্চার বিষয়ে শুধু আলোচনা করা হল লোকশিল্প — পটপটুয়া এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি।

ত্রিপুরায় ষাটের দশকের চিত্র প্রদর্শনীগুলির যে বৈচিত্র্য যে উজ্জ্বল্য যে উচ্চমান ছিল তা যেন ক্রমে নিম্নাভিমুখী। সেই সময়ের শিল্পীরা এখন আর তেমন ভাল ছবি আঁকছেন না, অনেকেই হয়ত তার কারণ। কোন কোন শিল্পী চাকরী সূত্রে এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত যেখানে শিল্পচর্চার সুযোগ কম। শিল্পচর্চা, কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা সর্বপ্রকার সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা কলকাতার মফঃস্বল। কলকাতায় নাম না করতে পারলে আগরতলায় নাম করে কিছু হবে না। মফঃস্বলে কোন ভাল শিল্পচর্চা সম্ভব নয়। সংস্কৃতির জগতে আগরতলায় এই মফঃস্বল চরিত্র ঘোচাতে না পারলে বৃহৎ কিছু করা বা হওয়া মুশকিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

(১) শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত — মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

(২) রঙ ও রূপ — সচ্চিদানন্দ কুমাব

(৩) ত্রিপুরার শিল্পের ইতিবৃত্ত — ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মন (ত্রিপুরা প্রসঙ্গ) পৃ. ৫)

(৪) ত্রিপুরার শিল্পকলা — সলিল কৃষ্ণ দেববর্মা (চারুকলা শিল্পমেলা -৮১পৃ. ৮)

(৫) স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরার চিত্র প্রদর্শনী — রমা প্রসাদ দত্ত (পৃ. ২৫)

(৬) ব্যক্তিগতভাবে মৈত্রী চৌধুরী, মৃণালকর, অনুপ ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরার বন, গাছপালা ও তাদের বৈশিষ্ট্য

নলিনী কান্ত চক্রবর্তী

ভৌগোলিক উদ্ভিজ্জ সংস্থান হিসাবে ত্রিপুরাকে আসাম অঞ্চলের অন্তর্গত মনে করা হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ সংস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই এই বিভাগ করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতীয় উদ্ভিজ্জ জরিপ সংস্থা, বন গবেষণা সংস্থা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক সমীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ভৌগোলিক উদ্ভিজ্জ বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য পূর্বভারত ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগের মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামে রয়েছে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বনভূমি। এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে Terminalia Lagertroemia Careyan Schima Dillenia এবং Toona প্রভৃতি গণভুক্তি বিভিন্ন প্রজাতিব প্রাধান্য। এছাড়া এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল বাঁশ, যাতে এ রাজ্যে ভারতের অন্য কোনও অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরার বনবিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বনভূমির পরিমাণ ৬২৯২ বর্গ কি.। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনের পরিমান ৪০৯৭ বগ কি., যা ভৌগোলিক আয়তনের ৩৯ শতাংশ এর অধিকাংশ রয়েছে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন এলাকায়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বনরাজি। যেমন—

ক. পূর্ব হিমালয়ের নিম্ন শাল অরণ্য : এ রয়েছে প্রধানত উদয়পুর বিভাগের পূর্বাংশে ও দক্ষিণ বনবিভাগে বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট অঞ্চলে। এ অঞ্চলের প্রধান গাছ শাল। এখানকার দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জাতের শাল গাছ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতে নিম্নমানের শাল গাছ দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালে এবং আর্দ্র অঞ্চলে অন্য বিভিন্ন প্রজাতির গাছ দেখা যায়। কোনও কোনও অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডে শালের গর্জনও দেখা যায়। এ অঞ্চলে বাঁশ পাওয়া যায় না।

খ. কাছাড় বৃক্ষমণ্ডলীয় চির সবুজ বনভূমি : রাজ্যর পশ্চিম দক্ষিণ অংশে এবং বিচ্ছিন্নভাবে জম্পুই পাহাড় অঞ্চলে এই বনভূমি দেখা যায়।

গ. আর্দ্র মিশ্র পর্ণমোচী বনভূমি : এই বনভূমি শাল ও গর্জন বনের মাঝে এবং বড়মুড়া, দেবতা মুড়া ও আঠার মুড়া প্রভৃতির পাদদেশে, উদয়পুর ইত্যাদি বনবিভাগের বেশ কিছু স্থানে এই জাতীয় বনভূমি রয়েছে।

ঘ. নিম্ন পাললিক সাভানা বন : প্রধান বনভূমির ঢালু অঞ্চলে এ জাতীয় বন দেখা যায়। অত্যধিক জুম চাষের ফলে প্রাকৃতিক গাছপালা নষ্ট হওয়ায় এ জাতীয় বনের সৃষ্টি হয়েছে।

ঙ. আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য রয়েছে সাব্রুম, বিলোনিয়া, উদয়পুর বিভাগের দক্ষিণাংশ জুড়ে এবং বিলোনিয়া বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে তৃষ্ণা সংরক্ষিত অরণ্যে এবং সাব্রুম বিভাগের তুল তাতারিয়ারি সংরক্ষিত অরণ্যে। এই অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে লতানে গাছ ও ঝোপ ঝাড়ের জন্য অন্য বৃক্ষরাজির আকার ছোট হয়। এখানকার পর্ণমোচী বৃক্ষের সঙ্গে কিছু চির সবুজ বৃক্ষও জন্মায়।

চ. গৌন আর্দ্র বাঁশ বন রয়েছে বিভিন্ন পাহাড়ে নদীর পরিবাহ ক্ষেত্র ও নদীর ধার জুড়ে। এদের মধ্যে কোয়াই, দেও, রাইমা ও সরমা প্রভৃতি নদীর খাতে বিভিন্ন বাঁশ বন (প্রধানত মুলি বাঁশ) রয়েছে। এ সব অঞ্চলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়। অন্য বৃক্ষের মধ্যে এ অঞ্চলে করই, আওয়াল, কুমিরা প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

দেরাদুনের ভারতীয় বন সমীক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরার বনভূমির পরিমাণ ভৌগোলিক আয়তনের ৫২.৬৮ শতাংশ, তবে গভীর বনভূমির (অর্থাৎ ৪০ শতাংশের বেশি বৃক্ষচন্দ্রাতক ঘনত্ব বিশিষ্ট) পরিমাণ ভৌগোলিক সীমার মাত্র ১৭.৩৪ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রিপুরার বর্তমান বনভূমির পরিমাণ ভারতের গড় বনভূমির (১১.৭৩ শতাংশ) পরিমাণ থেকে বেশি হলেও পূর্ব ভারতের গড় বনভূমর (৩৯.৪০ শতাংশ) থেকে কম। বনের পশুপাখি তথা গাছপালা সংরক্ষণের জন্য রাজ্যে সিপাহী জলা, তৃষ্ণা, গোমতী ও রোয়া প্রভৃতি অভয়ারণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যার আয়তন ৬০২ বর্গ কি.।

ত্রিপুরার বনভূমির মধ্যে কঠিন কাঠের বনভূমি রয়েছে ১৭.৪৩ শতাংশ, বাঁশ মিশ্রিত অন্য বনভূমি ৪.১৫ শতাংশ, বাঁশবন ৮.৯৪ শতাংশ, আবাদি বনভূমি ১৯.৬৯ শতাংশ, জুম ভূমি ৯.২৯ শতাংশ — সর্বমোট ৫৯.৫০ শতাংশ, অর্থাৎ রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তন ১০৪৯১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ৬২৯২ বর্গ কি.।

বন ধ্বংসের কারণ :

বন সম্পদে পরিপূর্ণ এই রাজ্যের নাম ব্রিটিশ রাজত্বকালে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা। এই রাজ্যের বনাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে মানুষের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কৃষিকাজ ও অন্যান্য কারণে বনভূমির স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট হয়েছে। বিশেষত গত কয়েক দশকে ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতির পরিবর্তন ও অন্য রাজ্য থেকে আগত লোক সংখ্যার চাপে বাস্তু রীতির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ রাজ্যে অতিরিক্ত লোক-বসতি, জুম চাষ, চারণ ভূমির স্বল্পতা এবং তার ফল স্বরূপ বনাঞ্চলে গো-মহিষাদির উৎপাত প্রভৃতি বন ধ্বংসের প্রধান কারণ। এছাড়া রাজ্য থেকে প্রতিদিন নানাপ্রকার কাঠ, জ্বালানি, বাঁশ ও অন্য বনজ সম্পদ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। বস্তুত এই রাজ্য সন্নিহিত বাংলাদেশের জনসাধারণ, নিত্য প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদের জন্য ত্রিপুরার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। তবে বর্তমান কালের তুলনায় পূর্বে অবস্থাটা অন্য রকম ছিল। তখন লোক সংখ্যার চাপও কম ছিল, আর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সবসময় বনজ সম্পদ পাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। ফলে এখানকার মতো যথেচ্ছ বন ধ্বংস হতো না। যেটুকু বন ধ্বংস হতো নতুন গজানো গাছপালায় সেখানে আবার বনভূমির সৃষ্টি হতো। দেশ বিভাগের পর এই অবস্থাটা বদলে যায়। নিয়মিত যোগানের নিশ্চয়তা না থাকায় কাঠ ইত্যাদির চোরাচালান অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। অথচ খবরের কাগজ খুললে প্রায় প্রতিদিনই বনজ সম্পদ পাচারের বিবরণ পাই। গত দুই দশকে বন ধ্বংসের আরো একটি নতুন কারণ যুক্ত হয়েছে, তা হল উগ্রপন্থী সমস্যা। এর জন্য বনায়ন ও বন সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছেই, তদুপরি উগ্রপন্থীরাও বনজ সম্পদ পাচারে সক্রিয়। আবার উগ্রপন্থী মোকাবিলার নামে অনেক স্থানে বনভূমিও বিনষ্ট হয়েছে।

বনভূমির উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি ঃ

ত্রিপুরা রাজ্যে যতটা বনভূমি রয়েছে তার খুব সামান্য অংশই প্রাকৃতিক বন। অধিকাংশ আবাদি বৃক্ষ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিতে গজানো ঝোপঝাড় বা জুম চাষের ফলে জাত ক্ষয়িষ্ণু বনভূমি। চিরহরিৎ বনভূমি ধ্বংসের পর ঝোপ, ঝড়া, লতা, গুল্ম প্রভৃতির আবির্ভাব হয় এবং এদের মাঝে দেখা যায় কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ। এরকম পরিবর্তিত বনভূমি উদয়পুর, অমরপুর, সোনামুড়া এবং সদর বিভাগে রয়েছে।

কোনও কোনও স্থানে জুম চাষের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিতে বাঁশবনের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে মুলি বাঁশের বনই এ রাজ্যে বেশি। আগে জুম চাষের জন্য রাজ্যে প্রচুর বনভূমি ছিল এবং জুম চাষীর সংখ্যাও ছিল কম। তাই একই জমিতে ঘন ঘন জুম চাষ করতে হতো না, ফলে জুম চাষে নষ্ট হওয়া গাছ-পালা আবার গজিয়ে বনভূমি পুনরুজ্জীবিত হতো। কিন্তু বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ কমায় এবং জুম চাষীর সংখ্যা বাড়ায় একই বনভূমিতে ঘন ঘন জুম চাষ হয়ে থাকে। তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় বনভূমির মাত্র ২০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সেগুন, শাল, গামাই, করই, সোনাল, চামল, জারুল, মেহগিনি, শিমূল ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ। এর মধ্যে ৬৮.৭ শতাংশ রয়েছে সেগুন, ৮.২ শতাংশ শাল এবং অন্যান্য গাছ ২৩.১ শতাংশ। এছাড়া রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি, সিট্রোনেলা প্রভৃতি চাষের আওতায় রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর বনভূমি। রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ বাঁশ। বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। ইদানিং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এই সম্পদের অনেকটা বিনষ্ট হয়ে গেছে। খাদ্য হিসাবে বাঁশের কড়ুল ব্যবহারের ফলে এই সম্পদের অনেকটা বিনষ্ট হয়ে গেছে। খাদ্য হিসাবে বাঁশের কড়ুল ব্যবহার এই সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার অন্য একটি কারণ। রাজ্যে কোনও কাগজ কল না থাকলেও বছরে ৩০.০০০ - ৪০.০০০ মেট্রিক টন বাঁশ এ রাজ্য থেকে আসামের পঞ্চগ্রামে স্থাপিত হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের কারখানায় যায় এবং অদূর ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বনভূমি ছাড়া অন্য গাছপালা ঃ

বনভূমির ছাড়া অন্যত্র রয়েছে বিভিন্ন জাতের গাছপালা। যেমন রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন জলাভূমি, যাদের মধ্যে পুকুর, দিঘি প্রভৃতি জলাশয় প্রায় ৮৮৫৫ হেক্টর, ক্ষুদ্র বাঁধ ৪০৬৮.৬৮ হেক্টর, নদী-নালা প্রভৃতি ৫২৬০ হেক্টর। এই সমস্ত জলাভূমিতে থাকা উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৫০ থেকে বেশি হবে। রাজ্যের নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ সম্বন্ধে কোনও সমীক্ষা এখনও হয়নি, তবে জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যাও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে কম হবে না।

রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ২৭ শতাংশ জমিতে বিভিন্ন কৃষি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈলবীজ, পাট ইত্যাদি। উদ্যান ফসলের মধ্যে আমরা নানাপ্রকার ফল, যেমন আম, কাঁঠাল, কমলা, পেয়ারা, পেপে, অনারস, কুল, কলা এবং নানা প্রকার সবজি, মশলা প্রভৃতি উল্লেখ করতে পারি।

বনজ সম্পদ ঃ

রাজ্যের বনজ সম্পদের পরিমাণ ভারতীয় বন সমীক্ষার ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী নিম্নরূপ —

	আয়তন বর্গ কি. মিটারে	ভৌগোলিক আয়তনের শতাংশ শতাংশ	উৎপাদন প্রতি হেঃ কিউবিক মিটার (গড়)
কঠিন কাঠের বনভূমি	১৮২৯	১৭.৪৩	২৬১৭৮
কঠিন কাঠ ও বাঁশের মিশ্রিত বনভূমি	৮৪৮	৪.৬১	২৯৮৩৯
বাঁশ বন	৯৩৮	৮.৯৪	৯০৭৩৩
আবাদি	২২২১	২১.১৭	২০.৬৯
জুম বনভূমি	৮৪০	৭.৮১	৫৩৩৯

বর্তমানে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ায় উপরিউক্ত তথ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

রাজ্যের বৃক্ষ জাতীয়উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৮০। এর প্রায় ২৫ শতাংশ মূল্যবান দারু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। বাকিরা জ্বালানী হিসাবেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান বৃক্ষদের মধ্যে রয়েছে শিরিষ, সুন্দি, করই, চামল, কুমিরা, গর্জন, রামাডালা, গামাই, জারুল, সিধাজারুল, নাশকেশর, চাঁপা, কণক, শাল, সেগুন, হরিতকী, বহেড়া, তুন, আওয়াল প্রভৃতি।

নিম্নমানের দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে বেল, রঙ্গিরাতা, খাঁঠাল, কদম, জাকি, শিমূল, হিজ্ঞ,, কাঞ্চন, শোনাল, হাড়নাজা, চাল্‌তে, বুনো জলপাই, কাজ্জিকারা, কুরুচি, কেলিকদম, আম, ফুলকদম, কণকচাঁপা, উদাল, জাম, আমড়া, বাজনা প্রভৃতি। প্যাকিং বাক্স চাষের বাক্স, প্লাইউড, দেশলাই প্রভৃতি নানা কাজে তাদের ব্যবহার হয়ে থাকে।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের সংখ্যা ষোল বা তার বেশি। এদের মধ্যে রয়েছে কনককাই, বরাক, কালিবাঁশ, মাকাল, বারি, পারুয়া, মৃত্তিকা, জাই, কেম বাঁশ, আঁচ বাঁশ, নিরেট বাঁশ, রুগাই, কাল্যাই, ডলু, মদি ও বেততধান্য। নানা প্রকার কাজে বিভিন্ন প্রকার বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে।

অন্য বনজ সম্পদের মদ্যে বেত, ছন, ফুলঝাড়ু, বাতা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আসবাব পত্র তৈরি, কাগজের মণ্ড, কার্ড বোর্ড ও অন্যান্য কাজে এদের ব্যবহার রয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার বনৌষধি ত্রিপুরার একটি মূল্যবান বনজ সম্পদ। রাজ্যের বনৌষধি সম্বন্ধীয় কমিটি রাজ্যে পাওয়া যায় এমন ২৬৫ প্রজাতির বনৌষধি চিহ্নিত করেছেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদের বাজারে বেশি চাহিদা থাকায় বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এদের চাষ ও সংরক্ষণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

পশু খাদ্যের উপযোগী বেশ কিছু ঘাস ও অন্য প্রজাতির গাছ এ রাজ্যে রয়েছে। এদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে অনেক সমস্যার সুরাহা হতে পারে। মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সবজি জাতীয় গাছের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ষাট এবং খাদ্যোপযোগী বুনো ফলের সংখ্যা পয়ষট্টি।

বনের উদ্ভিদকুলের বৈশিষ্ট্য ঃ

রাজ্যের উদ্ভিজ্জ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ত্রিপুরার বনাঞ্চলে পাওয়া ৮৬ শতাংশ প্রজাতি ভারতের অন্যত্র বা ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাওয়া যায়। এছাড়া বাকি ১৪ শতাংশ প্রজাতি বিশেষ কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ। ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্রায় ১৬০০ প্রজাতি পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ফার্ণ জাতীয় প্রজাতির সংখ্যা ৭০, নগ্নবীজ উদ্ভিদ ২৩টি প্রজাতি এবং বাকি আবৃত বীজ উদ্ভিদ। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রীর অনুপাত মোটামুটি ১ঃ৪। পার্শ্ববর্তী কিছু রাজ্য সহ ত্রিপুরার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ সংখ্যা নিম্নরূপ —

প্রজাতি সংখ্যা	ত্রিপুরা	মণিপুর	মিজোরাম
দ্বিবীজপত্রী	১১৫৯	১৫৪২	৮৯২
একবীজপত্রী	৩০৩	৪৩৫	৩০৭
মোট আবৃতবীজ উদ্ভিদ	১৪৬২	১৯৭৭	১১৯৯
নগ্নবীজ উদ্ভিদ	১৩	১৫	৬
ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ	৭০	২০০	১৩৪

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান ২১ বছরের পুরানো। বর্তমানে এর হেরফের হতে পারে। অতি সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরার সিপাহী জলা অভয়ারণ্যের উদ্ভিদ সমীক্ষায় বেশ কিছু নতুন প্রজাতি পাওয়া গেছে, এ রাজ্যে যাদের অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না।

রাজ্যে পাওয়া বেশ কিছু প্রজাতি ভারতের উদ্ভিজ্জ সংস্থানে নতুন সংযোজন, অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া এদের ভারতের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ Begonia surculigera kurz. Begoniaceae গোত্রের এই প্রজাতিটি পাওয়া গেছে কৈলাশহরের উনকোটিতে। ভারতের বাইরে মায়ারমারের অকিয়াবে এই গাছ পাওয়া যায়। Colona flagrocarpa (C.blarke ex brandis) Craib, Tiliaceae গোত্রের এই বৃক্ষজাতীয় গাছটি পাওয়া গেছে জম্পুই পাহাড়ে। ভাবতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই গাছ পাওয়া যায়। Ophiorrhiza villosa. Roxb. Rubiaceae গোত্রের বীরুৎ জাতীয় গাছটি পাওয়া গেছে সিপাহী জলা ও কুমারঘাটে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে এই গাছ জন্মায়। এরকম নতুন সংযোজনের তালিকায় ৭টি প্রজাতি রয়েছে।

এছাড়া বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে, যারা ত্রিপুরার বাইরে এই রাজ্য সন্নিহিত মিজোরাম, আসাম, অরুণাচল, পূর্ব হিমালয়, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মায়ারমার প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

প্রজাতি সংখ্যার নিরিখে রাজ্যের উদ্ভিদ কুলের পাঁচটি বড় গোত্র ও তাদের গণ এবং প্রজাতি সংখ্যা নিম্নরূপ —

গোত্র	গণ	প্রজাতি
Papilionaceae	৪৪	৯৬
Poaceae	৪৯	৭৯
Rubiaceae	৩৭	৭৬
Euphorbiaceae	৩১	৬৭
Asteraceae	৩৯	৫৪

গণ সংখ্যার বিচারে Poaceae প্রথম হলেও প্রজাতি সংখ্যার বিচারে এর স্থান দ্বিতীয়, আবার গণ

সংখ্যার বিচারে Papilionaccae দ্বিতীয় হলেও প্রজাতি সংখ্যার বিচারে এর স্থান প্রথম।

দুষ্প্রাপ্য গাছপালা ঃ

আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে বনভূমি বিনাশের ফলে বেশ কিছু প্রজাতির গাছপালা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরো কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির সম্মুখীন গাছপালার তালিকায় প্রায় ৪৫০ প্রজাতির নাম রয়েছে। এরকম দুষ্প্রাপ্য গাছের কয়েকটি প্রজাতি ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায়। যেমন Angiopteris cyecta (ফার্ণ জাতীয় গাছ পাওয়া যায় ডুম্বুর, শিলাছড়ি, দামছড়া ও তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে), Cyathia gigantea (বৃক্ষ ফার্ণ, পাওয়া যায় শিলাছড়িতে), Podocarpus nerifolia (নগ্নবীজ উদ্ভিদ, পাওয়া যায় লালজুরি ও মনু অঞ্চলে), Magnolia pterocarpa (দুলিচাঁপা পাওয়া যায় পানিসাগর, লালজুড়ি, তেলিয়ামুড়া দামছড়া অঞ্চলে), Eleocarpus prunifolia (বুনো জলপাই, পাওয়া যায় জম্পুই পাহাড়ে), এবং Rauvolfia serpentina (সর্পগন্ধা, পাওয়া যায় সদর, ধর্মনগর ও উদয়পুর বিভাগে, তবে বর্তমানে এই গাছটি বেশ দুর্লভ)। এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির উদ্ভিদের যথাযথ ব্যবস্থা দ্বারা সংরক্ষণ প্রয়োজন।

গাছ নামকরণে ককবরক ভাষা ঃ

ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়, ঘোরা কাপ্পায় ও বড়মুড়া পাহাড়ে রামডালা নামে (স্থানীয় অন্য নাম — বান্দর হলা/মনজুং) একটি বৃক্ষ পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম Duabanga grandiflora। এই নামের গণ সূচক শব্দটি নেওয়া হয়েছে ককবরক ভাষা থেকে। পৃথিবীতে এই ভাষা থেকে গাছপালার বৈজ্ঞানিক নামের শব্দ চয়নের এটি একমাত্র উদাহরণ।

জ্বালানি সমস্যা ঃ

জ্বালানি সঙ্কট শুধু এ রাজ্যের নয়, এটা সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। হিসাবে দেখা গেছে সমগ্র পৃথিবীতে বছরে যে গাছ কাটা হয় তার ৫০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় জ্বালানি রূপে। কৃষি বিপ্লব দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান অনেকটা করা গেলেও জ্বালানির যোগান তেমন বাড়েনি। আমাদের ত্রিপুরার জন্য বর্তমানে বাৎসরিক জ্বালানির চাহিদা প্রায় ৮১ লক্ষ মেট্রিক টন, যার অর্থ ৮-১০ হাজার হেক্টর বনভূমির ১০-১৫ বছর বয়সের সব গাছপালা। এই চাহিদার পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়বে। ফলে রাজ্যের অনেক দামি দারু উৎপাদনকারী বৃক্ষ নষ্ট করা হচ্ছে। এতে কেবল মূল্যবান সম্পদই নষ্ট হচ্ছে না, দেশের বাস্তুসংস্থানও নষ্ট হচ্ছে। বন পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখে, এ না থাকলে পৃথিবীর প্রাণরস শুকিয়ে যাবে, থাকবে না নির্মল বাতাস বা সময় মতো বৃষ্টি, বিনষ্ট হবে মাটির উর্বরতা, বাড়বে ভূমিক্ষয়।

আমরা কোনও মন্ত্র বলে বন ক্ষয় রোধ করতে পারব না। তবে বৃক্ষরোপন ও গাছপালা বেড়ে ওঠার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। জ্বালানী সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছ রোপন করা যেতে পারে। স্থানীয় বর্দ্ধনশীল গাছ ছাড়াও আমাদের রাজ্যের আবহাওয়ার অনুরূপ আবহাওয়া জন্মানো এই জাতীয় গাছ অন্য দেশ থেকে এনে লাগানো যেতে পারে। এরূপ গাছের মধ্যে রয়েছে Acaia moransi, Ailanthus altisima, Calliandra calothrys, Casuarina equisetifolia, Derris robusta, Eucalyptus grandis, Muuntingia calabara, Sesbania bispinosa প্রভৃতি। তবে বহিরাগতদের চাষের আগে এরা স্থানীয় পরিবেশে কেমন বাড়ে তা যাচাই করে নেওয়া উচিত।

বিদেশী গাছপালা ঃ

রাজ্যের বিভিন্ন গাছপালার বেশ কিছু প্রজাতির আদি বাসস্থান বিদেশ। হিসেব অনুযায়ী এদের পরিমাণ মোট প্রজাতির প্রায় ১৬ শতাংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, চীন, মায়ানমার, পশ্চিম ভত্রারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, মেক্সিকো, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ থেকে এরা ভারতে এসেছে এবং ক্রমে ত্রিপুরাকে নিজেদের বাসভূমি করে স্থানীয় গাছপালার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাদের বিদেশী বলে চেনাই যায় না।

অনুসন্ধান ঃ

রাজ্যের বিভিন্ন উদ্ভিদকুল থেকে আমরা বনজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, বনৌষধি ইত্যাদি পেয়ে থাকি। তবে উপকারী গাছের প্রজাতির সংখ্যা মোট উদ্ভিদ প্রজাতির তুলনায় খুবই কম। এ চিত্র অবশ্য সমগ্র পৃথিবীর গাছপালার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় দুইলক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতিরক মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় মাত্র ১৫০টির মতো প্রজাতির। বর্তমান বিশ্বে ক্রমবদ্ধ৪মান লোক সংখ্যার দিকে নজর রেখে আমাদের নতুন নতুন সম্ভাবনাময় উদ্ভিদের অনুসন্ধান করতে হবে। এজন্য স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত গাছপালার দিকেও আমাদের নজর দেওয়া উচিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগাছা হিসাবে অবহেলিত বিপুল উদ্ভিদকুলের প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

ত্রিপুরার আগাছা হিসাবে অবহেলিত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের ওপর একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, ২৮৭টি প্রজাতির গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে ১৮১টি প্রজাতি ঔষধি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া বেশ কিছু প্রজাতি মানুষ আপদকালীন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। ঐ সকল আগাছার অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, সবুজ সার উৎপাদন, বালুকা বন্ধন ক্ষমতা, পানীয় উৎপাদন, শিল্পকলার কাঁচামাল, ভূমিক্ষয় রোধ প্রভৃতি গুণ। উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা আপাত অপ্রয়োজনীয় প্রজাতি ও জনসাধারনের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ খুলে দিতে পারে।

সরকারি দায়িত্ব ঃ

রাজ্যের বন সম্পদের বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী সরকারি তরফে উদাসীনতা। এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের শিথিলতা এবং কিছু লোকের সাময়িক লাভের জন্য লোভ বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। অবশ্য আজকাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উগ্রপন্থী উৎপাত। কিন্তু এর ফল ভুগতে হচ্ছে ও হবে সমগ্র দেশবাসীর। ব্যক্তি বিশেষের লোভের পরিণামে দেশের বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

ফলে আমাদের সকলের ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসছে। জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধীয় শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, পরিবেশ সুরক্ষা, তথা গাছপালা রক্ষা শুধু নিজের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রক্ষার বারও তাদের ওপর ন্যাস্ত।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী লোকসংস্কৃতির অঙ্গনেঃ বরণ ডাহানির এলা

অনুকূল সিংহ

উত্তর পূর্ব বারতের সাতবোনের একটি রাজ্য মনিপুর। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি মনিপুরে যুগযুগ ধরে নানা জাতি - উপজাতির বসবাস। এদের কেহ আর্যবংশের কেহ বা মঙ্গোলীয়। এই পার্বত্য রাজ্যের পূর্ব - উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে চীনের পর্বতশ্রেণী। ভারত-বার্মা সীমান্তের মনিময় 'রূপলাবন্য ময়ী রাজ্য মনিপুরকে প্রাচীনকাল থেকে নানা নামে বিভূষিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে পানদের কাছে মনিপুর 'কামে' বার্মিজরা 'কামে' অহোমরা মেঘলী, কাদাড়িরা 'মাগলি' অসমীয়ারা 'মুগলৌ' ত্রিপুরীরা মুগলী নামে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও পুরান গ্রন্থাদিতে দেবান গড়া ও গন্ধর্বের দেশ। সাংখ্যয়ান গৃহ সংগ্রহে সূর্যোদয়ের দেশ, কথাসরিৎসাগরের উদয়াদ্রি বা উদয়াচল। আরো বিভিন্ন গ্রন্থে মহেন্দ্রপুর, রাজগৃহ, বৃক্ষদেশ, মধ্যদেশ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে মনিময় পুরুষ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণকুণ্ড, মনিকুণ্ড বা মনিপুর। দক্ষিণ চীনের জনগণেরা বলে মিউংলাই, মিউং দেশ অর্থাৎ লাই জাতির দেশ। সপ্তদশ শতকে চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভারত ভ্রমনের পর লিখিত সিয়াসু-কি নামক গ্রন্থে মনিপুরকে "ঈশানগুল্লি" নামাকরণ করে পর রাজধানী বিষ্ণুপুর বলে লিপিবদ্ধ করেছন।

প্রাচীন মনিপুরকে গন্ধব্যের দেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক T. C. Huoson তাঁর 'The Methies' গ্রন্থে এই বক্তব্যের সমর্থনে গন্ধর্ব্য বংশাবলীর নাম ধারাবহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের নামগুলোতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যেমন রাজানারায়ণ, ব্রহ্মা, কাশ্যপ, সূর্য্য, সুবর্ণমুনি, চিত্রকেতু, চিত্রধ্বজ, চিত্রবীর, চিত্রসর্ব, চিত্রভানু বা চিত্রবাহন (চিত্রাঙ্গদার পিতা)। তিনি কামরূপের রাজা ভাগদত্তের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ১০০ শতক। মনিপুর ভূমিতে গন্ধর্বের রাজত্ব সম্পর্কে 'মিতে জাগোই' নামক গ্রন্থের লেখক সূরচন্দ্র শর্মা মহোদয় সূচনাতে উল্লেখ করেছেন 'The Land is also known as the Land of Gndharba'. তাই মনিপুরের জনগণ চিরাচরিত ধারায় সঙ্গীত নৃত্যপ্রিয়। তাছাড়াও মনিপুরের ইতিহাসে মহাভারতে প্রভাব বিদ্যমান। পান্ডব রাজকুমারগণ বনবাসকালে মনিপুর প্রবেশ করেন। সেই সময় মনিপুরের রাজা ছিলেন চিত্রবাহম। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিলনা। একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা। পুত্র সন্তান না থাকাতে মহারাজ চিত্রবাহন সিংহাসনের পরবর্তী ও উত্তরাধিকারী হিসাবে কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। রূপেগুণে অতুলনীয়া চিত্রাঙ্গদার দর্শনে বিমোহিত হয়ে ৩য় পান্ডব অর্জুন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অর্জুন মনিপুরে মাত্র এক বৎসরকাল থাকার পর পুনঃ দেশভ্রমনে

বেড়িয়ে পড়েন । সেই সময়ে চিত্রাঙ্গদা গর্ভবতী ছিলেন । পরবর্তীকালে এক সুদর্শন পুত্র সন্তান লাভ করেন । নাম বভ্রুবাহন । পিতৃ পরিচয়ের অপেক্ষায় চিত্রাঙ্গদা সযত্নে পুত্র বভ্রুবাহনকে লালন পালন করতে লাগেন । পান্ডবরা যুদ্ধ জয়ের পর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন । সেই অশ্বমেধের ঘোড়া দেশ ভ্রমন করতে করতে মনিপুরে প্রবেশ করলে বভ্রুবাহন কর্তৃক আটক হয় । তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বাঁধে যুদ্ধে পিতা অর্জুনের পরাজিত ও নিহত হয় । তখন সেই বার্তা চিত্রাঙ্গদার কাছে পৌছালে পরিচয় জানতে পেরে পুত্র বভ্রুবাহনকে পিতৃ হত্যা বলে তিরস্কার করেন এবং নাগকন্যা উলুপীর সাহায্যে পাতাল থেকে মনি এলে ওয় পান্ডবকে পুনর্জীবিত করে তোলে । বভ্রুবাহনের বীরত্বের জন্য তাঁকে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ জানানো হয় । সেখান থেকে স্বর্ণ খচিত বিষ্ণুমূর্ত্তি নিয়ে এসে মনিপুরের বিষ্ণুপুর নামক স্থানে স্থাপন করে রাজ্য শাসন করেন । মনিপুরের মনিপুরীরা তাই নিজেদেরকে বভ্রুবাহনের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আজও গর্ববোধ করে থাকে ।

ঐতিহাসিকদের মতে প্রচীন মনিপুরে পাঁচটি অঞ্চল রাজ্য দিল । মৈরাঙ, খুমল, লুযাং, আঙ্গম ও খাবেল বা ভূমি নামে । এই পাঁচটি অঞ্চল রাজ্যে বসবাসকারী জনগণ ও রাজারা আর্যবংশোদ্ভুত বলে উল্লেখ করেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক E. T. Dalton তাঁর Introduction to Manipur গ্রন্থে পৃষ্ঠা ১০ উল্লেখ করেছেন, The valley was frist occupied by severel tribes. The principal of which are khumal, Luwang, Moirang and Methies by degrees the Methies became dominant and that have was applied to the entire colony. এই সব অঞ্চলে রাজ্যগুলো পরবর্তী সময়ে নিজেদের সত্বা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর মনিপুর রাজ্যের অধীনে চলে যায় । এ নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের কাছে একটি প্রবাদবাক্য বিশেষভাবে প্রচলিত "ধারায় নাম লইলা চাকালয় বলে হমেইলা" 'The invader captured the land the originials entured deep forest."

মনিপুর রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকতাক হ্রদ অবস্থিত । উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ এই হ্রদকে ঘিরে ছিল প্রাচীন খুমল, মৈরাং ও লুয়াং রাজ্য । বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের আদিবাস ভূমি সেই ঐতিহাসিক সভ্যতাকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাঁর 'The Methies' গ্রন্থে বর্ণনা করে গেছেন At Ning thoukhong were resides the piba or head of the Khumal clan. We have in order of precedence the Ningthou. The senápati, Mantui etc. The same officials of the same orderexisted at the village khangabok. মৈরাং লকতাক হ্রদের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত । বর্তমানে ও মনিপুরের ইতিহাসে মৈরাং এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে । খাম্বা - থৈবীর অমর প্রেমগাঁথা বিরহপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত স্থান । রাজকুমার খাম্বা দিল খুমল রাজবংশজাত ও থৈবী মৈরাং রাজকুমারী । তাঁদের প্রেম অক্ষয় অমর । পৃথিবীর শ্রেষ্ট প্রেমকাহিনীর উপাখ্যান লায়লা-মজনু শিরি - দারদাহ ও রোমিও জুলিয়টের মতো মনিপুরের জনগণের কাছে খাম্বা থৈবীর অমর প্রেম গাঁথা নিয়ে উপাখ্যান তৈরী হয়েছে । সেই অমর প্রেমের নিদর্শন হিসাবে তাদের পরিধেয় পোষাকাদি মৈরাঙের গোপন ভাবে পবিত্র এক স্থানে খুক্কায়িত আছে । লুয়াং রাজ্যের রাজধানী তাইখোঙের বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা রাজপাট হারানোর পর পরম পরাক্রম শালী মৈতৈ রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করে মৈতৈ ভাষা লেখা শুরু করে । তাঁদের মৈতৈ ভাষা শিক্ষা ও বলা নিয়ে লোক মুখে অনেক রসাত্মক গল্প ছিল । মৈতৈ জনগোষ্টির লোকেরা তাঁদের ভাষা বলা নিয়ে কৌতুক করে উপহাস করতো । লকতাকের চারপাশের বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের গ্রামগুলো নিংথৌখং, নাচৌ ভাইখং, খুনৌ নুঙুগ্রালাই, কুমফি, ইথিং ঘুসেল ইত্যাদি । তাছাড়া মৈরাঙ বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষ ভাবে আরো মযার্দা পূর্ণ শহুরের খ্যাতি পেয়েছে অন্য আর এক কারণের জন্য । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যরা এখানে উত্তোলন করেন । বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে ফুল চন্দন নিয়ে তাঁদের বরন করেন বলে ঐতিহাসিকরা বিভিন্নগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । লকতাক হ্রদের চারপাশের সমতল অঞ্চলে

বসতি বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের এক ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ধারা ছিল । পরবর্ত্তী মনিপুরের রাজসিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ, বিরামহীন যুদ্ধ রক্তময় ও বার্মিজদের বারবার আক্রমন তাদের জনজীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠে । ভীত্ত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে শান্তি প্রিয় মনিপুরীদের (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ) এক বৃহৎ অংশ মনিপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । তারা সুখ স্বাচ্ছন্দ পূর্ণ এক জীবনের সন্ধানে মাতৃভূমি ত্যাগ করে আসাম (বিশেষতঃ কাছাড়ে), ত্রিপুরা, বার্মা ও বর্তমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহন করে বসতি শুরু করে । সম্ভবতঃ সেই সময় কাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মনিপুরের রাজা কামহৈবা ও বার্মিজ রাজার সিংহ বিষ্ণুর আক্রমণকাল অষ্টাদশ শতকে হয়েছিল । যা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের কাছে "অওয়ার বাগন" বলা হয়ে থাকে । বার্মিজদেরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা 'অওয়া' বলে থাকে । সেই অত্যাচারের কাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করত । পরবর্ত্তীকালে মনিপুরে কিছুটা শান্তির পরিবেশ ফিরে এলে এক ক্ষুদ্র অংশ মাতৃভূমির টানে ফিরে যায় অবশিষ্টরা এই সব রাজ্য সমূহে মনিপুরের স্মৃতি বুকে বেঁধে রেখে স্থায়ী বসতি শুরু করে । মনিপুরের রাজপাট পরিবর্তনের পর শাষক গোষ্টি ভাষাগত আগ্রাসন শুরু করে । বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাম গুলোকে পরিবর্তন ও মূল্যবান প্রাচীন পুঁথিপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয় । তবুও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের হৃদয়ে গাঁথা কিছু লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ থেকে যায় । যার কোন লিখিত রূপ দিল না, হয়তো পুঁথি আকারে থাকলে, তাও হারাতে হতো । এগুলোর মধ্যে অন্যতম "বরন ডাহানির এলা" (বৃষ্টি আহবানের গান) ও মাঙ্গই সবালেলর এলা (মাঙ্গই ইন্দ্রের গান) "এই দুটোর দুটি কথিত কাহিনী আছে যা জনশ্রুতির মাধ্যমে বহুল প্রচলিত ।

"বরন ডাহানির এলা"র কাহিনীটি এইরূপ, প্রাচীন মনিপুরে খুমল ও মৈরাঙ রাজ্য নিয়ে রাজ ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধতো । মৈরাঙ রাজার কাছে খুমল রাজ প্রতিবারেই যুদ্ধে পরাজিত হয় । ফলে খুমলরাজ পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জ থেকেও পুনঃ আক্রমনের প্রস্তুতি নিত । এতে ব্যাপক ভাবে রক্ত ক্ষয় ও জীবনহানি ঘটতো । কারণ যুদ্ধ মানেইতো প্রাণহানি । তাই ঘুমল রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চমেই এই প্রাণহানি, রক্তময় দেখে বিচলিত হয়ে উঠে । ফলে চমেই অগ্রহ ঘুমল রাজকে রাজসভায় বিনীতভাবে আবেদন জানান এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য । এই কথা শুনে খুমল রাজ ক্ষিপ্ত হয়ে রাজসভা মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে পদাঘাত করে রাজ্য থেকে বহিস্কারের আদেশ দেন । বিনম্র চমেই অশ্রুজলে স্নাত হয়ে অপমান, লজ্জায় রাজ্যত্যাগে বাধ্য হয় । রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার বিদায় কালে রাজ সভামধ্যেই তাঁর পরিচারিকা "বেটি" সঙ্গে যাবার সংকল্প প্রকাশ করে । রাজসভার সকল পারিষদ বর্গ পরিচারিকা "বেটি" কে আশ্বস্ত করেও তার সংকল্প থেকে বিরত করতে পারেনি । রাজকুমার চমেই ওতাকে বার বার আপত্তি করেও সঙ্গ ত্যাগ করাতে পারেনি । বাধ্য হয়ে পারিচারিকা "বেটি"কে সাথে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন । অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁদের জীবন কাটতে লাগলো । গভীর অরণ্য মধ্যে বৃক্ষপত্র দিয়ে এক ছোট্ট কুটীর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন । বনের ফল মূলই তাদের আহার । সেই সময়ে পরিচারিকা "বেটি" র আত্মত্যাগ ও সহডোগিতার সন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমার চমেই তাকে স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নেন । পরবর্তীকালে তাদের উরস জাত এক পুত্র সন্তান হয় । নবজাতককে নিয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এক সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু করে ।এভাবে তিনটি বদর অতিক্রান্ত হয় । এদিকে চমেইর রাজ্য ত্যাগের পর থেকে সমগ্র খুমল রাজ্যে অনাবৃষ্টি শুরু হতে থাকে । দিন দিন সেই অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরার আকার ধারণ করতে লাগলো । ফসল শুন্য মাঠ, চারিদিকে খা-খা- বিস্তীর্ণ মাঠ । সবুজ গাছ পালা শুকিয়ে বিবর্ণ রক্ত, পশুপাখীও মানুষের মৃত্যার মিছিল । খুমল রাজ্যের উন্মুক্ত গগনে শকুনের অবাধ বিচরণ । রাজ্যের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠে । রাজ্যের এই দুর্যোগ পূর্ণ পরিবেশ থেকে পরিত্রান পাবার জন্য রাজা মন্ত্রি পারিষদরা নানা পূজা পার্বনের আয়োজন করেন । কিন্তু নিষ্ফল । কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই । অবশেষে রাজ পন্ডিতের ডাক, এই অনাবৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানের করে চালনের জন্য । 'রাজপন্ডিত নানা ধরণের পুঁথি পত্তর ঘেঁটে ঘোষণা দিলেন রাজকুমার

চমেইর অপমানে প্রকৃতি দেবতা পাহাংপা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত ।এর একমাত্র প্রতিকার রাজকুমার চমেই কে সসম্মানে রাজ্যে ফিরিয়ে আনলে এই বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে । বাজ জ্যোতিষেব ভবিষ্যৎ বাণী সোনাব পর খুমল রাজ কালক্ষেপ না করে বাজকুমার চমেই কে ফিরিয়ে আনার আদেশ দিলেন । মন্ত্রী পারিষদ বর্গ অনেক খোঁজাখুজির পর গভীর অরণ্য থেকে চমেই বেটি ও নবজাতক শিশুকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয় । তাঁর আগমনে রাজ্যের প্রজাগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যুথবদ্ধভাবে বৃষ্টির প্রার্থনা করতে লাগলেন বরুন দেবতাব কাছে । সেই প্রার্থনার গানটি "বরণ ডাহানির এলা" নামে পরিচিত । 'বরুন' শব্দটির উৎপত্তি বর্ষন থেকে । তাঁদের আহবানে রাজ্যে বর্ষন শুরু হয় । রাজ্যের প্রজারা আনন্দে কৃষি শুরু করে, শষ্য শ্যামলায় মাটি পুনরায় পরিপূর্ণ করে তোলে । পরবর্তীকালে "বরন ডাহানির এলা" অর্থাৎ বৃষ্টি আগমনীর গান বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে চিরাচরিত ভাবে প্রচলিত হয় ।

দেশে অনাবৃষ্টি হলে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীরা এই অনুষ্ঠান করে থাকে । সাধারণতঃ কৃষি মরশুমে অর্থাৎ চৈত্র -বৈশাখ মাসে যখনই অনাবৃষ্টি, খরা থাকে তখনই এই উৎসব করে থাকে । তবে অনাবৃষ্টির দীর্ঘায়িত না হলে বৃষ্টির জন্য সূচনা করে ঢেঁকি লুকানো দিয়ে অর্থাৎ এক গেরস্থের ঢেঁকি আর এক দেরস্থের পুকুরের জলে লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় । এতেও যদি বৃষ্টি না নামে তবে অন্তিম পর্যায়ে 'বরন ডাহানির এলা'র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির অঙ্গনে বৃষ্টি আবাহনীর উপর নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । যেমন গঙ্গাপূজা, উলঙ্গ শিশু স্নান, ব্যাঙের - বিয়ে, যুবতী মেয়েদের দিয়ে জোয়ালে বেঁধে লাঙল চালানো, ইত্যাদি নানধরনের সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে । সে দিক থেকে এ অনুষ্ঠানের এক ব্যতিক্রমী চিত্র ও প্রস্ফুটিত হয় । অনুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবারে রাত্রিকালে গ্রামের মধ্য বয়স্কা মহিলারা নবনব সাজে সজ্জিত হয়ে কৃষিভূমির মাঝখানে সম্মিলিত ভাবে একস্থানে ফুল -চন্দন-ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে নানা উপকরনে ফল ফসারি থালিতে সাজিয়ে প্রকৃতি দেবতাব উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় । পরের দিন সেই নির্দিষ্ট স্থানে গভীর রাতে গ্রামের মহিলারা কৃষি উপকরন নিয়ে হাজির হয় । সেই উপকরন গুলি যেমন কৃষি ছাতা (যা পাতা দিয়ে তৈরী, পাতলা) জলসেচের সামগ্রী, বাদ ধরার বিভিন্ন যন্ত্র ইত্যাদি । ঐ সময়ে মাঠের চৌহদ্দির ধারে কাছে কোন পুরুষ মানুষকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়না । সমগ্র এলাকাটি মহিলারা দখল করে নেয় । তারপর ঢাক ঢোল, করতাল, পেনা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের লহড়া শুরু করে । এই লহড়াকে মেঘ গর্জনের প্রতীক বলা হয়ে থাকে । এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সমবেত মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে পর্বের অন্তিমে নিয়ে যায় । বৃষ্টি দেবতার উদ্দেশ্যে অশালীন সুর তুলে গালাগাল শুরু করে; নানা ধরনের কৌতুকতায় মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠে । তারপর গভীর রাত পর্যন্ত সেই বরণ ডাহানির এলা গান করে । সেই সুর আকাশ বাতাস মুখরিত করে এক আবেগ পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে । গ্রাসের অন্যান্য লোক জনবোও দূর থেকে সমবেত ভাবে সেই গানের রস উপভোগ করে । এভাবে দীর্ঘ পর্ব চলার পর পুনঃ বস্ত্র পরিধান করে নদী বা পুকুরে পূর্ণ অবগাহন করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন । অনুষ্ঠান শেষে অবগাহনকে বৃষ্টি আবাহনের পর বৃষ্টিতে স্নাত হওয়ার প্রতীক বলা হয়ে থাকে । এই 'বরন ডাহানির এলা' অর্থাৎ বৃষ্টি আবাহনের গানে এক হৃদয় জুড়ানো সুর আছে। যা শ্রবনে এই জনগোষ্ঠির হৃদয়ে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নেচে উঠে । গানের মাধ্যমে মনিপুরের খুমেলের মাটিতে তাদের আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । গানের কলিটি এইরূপ ঃ-

খুমলের মাটি দুকেই লো লেইপাক পুক্কো কইল

সরালেতে রাজারো লেইপাক পুক্কো কইল

লকোঙ মাহেই নিকুলিল নিকুলিঙ্গ বরন দিয়াদে দৌরাজা

হরিয়ো রাম লেইমেলতে কুঙ্গয় পিত্ত করে

লেইমেল মানা নুংশিপা দনগো লয়া বেনুর আতে দিল

রাব নব পুস্তক বীরবাউ বীরবারে বুকুর ধিয়ান কইল

বুকুর ধিয়ান করের নায় লসমনে ফুলর লেইবাঙ দিলো

লেই কেইরো কালারো ডাহিয়াহ দেই কাদিয়াও ঘেউনারে ।

এ ধরণের বত্রিপটি পংক্তিতে গানটির সমাপ্তি । বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে দু একটি শব্দের পরিবর্তন দেখা যায় । পরবর্তীকালে গানটিতে কিছুটা নূতন কথাও সংযোজিত করে গাওয়া হয়ে থাকে । বাংলা ভাষায় তর্জমা কবলে এরূপ দাঁড়ায় ঃ-

বৃষ্টি দাও বরুন দেবতা । অনাবৃষ্টিতে খুমেলের মাটি শুকিয়ে গেছে । বৃক্ষলতা পাতা সবুজ বর্ণ হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে । মাঠ চৌচির - বৃষ্টি দিয়ে পরিত্রান করো । এখানে 'দীরাজা' বলতে দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করা হয়েছে ।

বিষ্ণু প্রিয়া মনিপুরীদের প্রাচীন কাল থেকে দৃঢ় বিশ্বাস এখনও এই অনুষ্ঠানের পর বৃষ্টি হয়ে থাকে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া লোকজীবনে বহুল প্রচলিত "বরন ডাহানির এলা" গানটির রচনা কাল নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মহেন্দ্র কুমার সিংহ তাঁর রচিত মনিপুরের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে গানটি দ্বাদশ শতকে মনিপুরের খুমেলে মাটিতে সৃষ্টি বা রচিত বলে উল্লেখ করেছেন । ঐ সময়ে খুমেল রাজ্যে এক প্রচন্ড খরা দেখা দিয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন । ডঃ কালীপ্রসাদ সিংহ তাঁর The Bishnupriya Manipuri গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । এগান পঞ্চদশ শতকের সৃষ্টি বলে । তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক প্রবন্ধকার সম্প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী বিশ্ব সম্মেলনের স্মরণিকাতে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ১৯৬৩ সনে জনৈক গবেষক মনিপুরে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী অধুষিত অঞ্চল নিংথৌখং গ্রামে এক বৃদ্ধার কণ্ঠে গানটি শুনেছেন । ঐ বৃদ্ধা ব্যক্ত করেছে । আমাদের পূর্ব পুরুষেরা দেবতার সাথে এই ভাষায় কথা বলতো একে মৈতে বা মনিপুরী ভাষায় লাই মারোন অর্থাৎ দেবভাষা বলে উল্লেখ করেছেন । ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঐতিহাসিক কারণে আজ মনিপুরের ছোট্ট এক অঞ্চল ভেদে এই ভাষা অবলুপ্তির পথে ।

"বরণ ডাহানির এলা" ছাড়াও আর একটি লোকসংস্কৃতি অঙ্গনে আজো প্রচলিত "মাদৈ সবালেলর এলা" (মাদই ইন্দ্রে গান) যা পূর্বোক্ত গানের অংশ বলা হয়ে থাকে । এ বিষয়ে আবার কেহ কেহ ভিন্ন মত পোষণ করে স্বতন্ত্রতার দাবী করে । তবে গানের ভাষায় বরন ডাহানির অলায় সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না যদিও ঐ গানের ইন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে । মূলতঃ "বরন ডাহানির এলায়" এক নারী কেন্দ্রিক কৃষি সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠে । আবার "মাদই সরালেখ এলা" কলিটি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পূর্বের আদি জীবন দর্শন চিত্রিত হয়েছে । বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী লোকজীবনে লোক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে মন্ডপ কেন্দ্রিক এক ধ্রুপদী সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে । না বৈষ্ণবীয় পরিমন্ডলে তৈরী হয়েছে এক নব্য সংস্কৃতি । এ ধরণের পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্টির জনজীবনে দেখা যায় । তবু বলা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদের লোক সংস্কৃতির আঙিনায় "বরন ডাহানির এলা" চিরন্তন ধারায় আজো প্রবহমান । যা সৃষ্টি ধর্মী মানসিকতাকে উৎসাহিত করে আগামী প্রজন্মকে নূতন আলোর দিশা দেবে ।

ত্রিপুরায় নৃত্যকলার সেকাল ও একাল

পদ্মিনী চক্রবর্তী

ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরার ছোট হলেও রাজ্যটি সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরপুর। বিশেষ করে ত্রিপুরা উপজাতি এবং অনুপজাতিদের ঐতিহ্যময় এবং বৈচিত্রপূর্ণ নৃত্যকলার সম্ভারে পরিপূর্ণ একদিকে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর নৃত্য এবং অন্যদিকে অনুপজাতিদের নৃত্য - এই দুইপ্রকার নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা এবং অঞ্চলগত পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বৈচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন অনুপজাতি, উপজাতি গোষ্ঠীর নৃত্যের সমন্বয় - যা ত্রিপুরার বক্ষে একটি ঐক্যের মালা গাঁথা হয়েছে। এই নৃত্যকলার সমন্বয় এবং একতা ত্রিপুরার পরম্পরাগত ঐতিহ্য। এই নৃত্যকলার সমাবেশ একদিনে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে যা শুরু হয়েছিল - তার অগ্রগতি আজও অব্যাহত।

ত্রিপুরার নৃত্যকলা নিয়ে আলোচনা করার আগে নৃত্যকলার গতি - প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা না করলে সম্যক ধারণা সম্ভব হবে না।

হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে যে নৃত্যকলা চলে এসেছে এবং যার গতি এখনও ব্যহত হয়নি, যে নৃত্যকলাকে রবীন্দ্রনাথ 'Living tradition' বলে অভিহিত এবং এই 'Living tradition' এর সূত্রটি ধরে ডঃ শংকরলাল মুখোপাধ্যায় 'জীবন্ত' ধারা বলে উল্লেখ করেছেন — সেই নৃত্যকলার জন্ম হয়েছিল মানুষের জন্ম লগ্নের সূচনা থেকেই । সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই নৃত্যের ও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকলারও উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ সমাজের বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে নৃত্যকলা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। ত্রিপুরার নৃত্যকলা ও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ এই 'জীবন্ত' নৃত্যধারার গতি এবং প্রকৃতি ত্রিপুরার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে যে নৃত্যকলার প্রচলন ছিল — সেই সময়ের গতির সাথে তাল রেখে নৃত্যকলার ও পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

ত্রিপুরার নৃত্যকলার এই গতি এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্বাধীনতা পূর্ব থেকে বর্ত্তমান পর্যন্ত ত্রিপুবাব নৃত্যের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে।

ত্রিপুরাব নৃত্যের রূপবেখা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ত্রিপুবাব জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে জানা দবকাব।

ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী ইন্দো - মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীব এই শাখাটিই উত্তর পূর্ব ভারতে বোড়ো, নাগা, কুকি, আহোম, খাসিয়া ইত্যাদি গোষ্ঠী হিসাবে প্রচিত। আসামের বোড়ো

গোষ্ঠীর এবং অংশ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। এই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার প্রধান জনগোষ্ঠী।

যারা ত্রিপুরার আদিবাসী হিসেবে পরিচিত, তারা হল যথাক্রমে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়। জুম চাষকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ তাদের নৃত্য গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদিকে ভিত্তি করে নৃত্যের সমাবেশ হয়।

কুকি, মিজো, মগ, চাকমা, হালাম ও গাবো এই উপজাতি সম্পরদায়ের জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার ভূখণ্ডের পার্শবর্ত্তী এলাকাতে বসবাস করত। কয়েকশো বছর আগে এই সম্প্রদায়ের একাংশ ত্রিপুরায় প্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এই জনগোষ্ঠীদের মধ্যেও জুমচাষ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব — এই দুইকে কেন্দ্র করে নৃত্যের প্রচলন ঘটেছিল।

এছাড়া বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার সময়ে জীবিকার সন্ধান উত্তর - পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য ও হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল থেকে কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ ত্রিপুরায় এসেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চলের এই উপজাতি জনগোষ্ঠীরা হল খাসিয়া, ভুটিয়া, লেপচা ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যভারত থেকে ও আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ জীবিকার সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছে। এরা হল ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল ও উড়িয়া।

যারা ত্রিপুরায় প্রথম থেকেই ছিল তাদের একপ্রকার নৃত্য, আর যারা বিভিন্ন সময়ে জীবিকার সন্ধানে, বিভিন্ন সূত্রে এসেছে তাদের নৃত্য ভিন্ন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নৃত্য নিজস্ব স্বকীয়তার বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। কিন্তু প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নৃত্য তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকা থেকে সংগৃহীত। সব সময় চোখের সামনে যা দেখছে বা ব্যবহারিক জীবনে যা কিছু করছে — তা সবটাই নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরছে।

ত্রিপুরায় ১৯টি উপজাতিদের মধ্যে চাইমল, ভুটিয়া, লেপচা সম্প্রদায় সংখ্যায় এত কম যে আলাদা করে এদের নৃত্যের কোন বিকাশ হয়নি। উপজাতি ভেদে নৃত্যের একটি তালিকা দেওয়া হল —

১। ত্রিপুরী সম্প্রদায় — গড়িয়া, জুম, লেবাংবুমানি, মামিতা হবাইমানি, মসক সুরমানি, মামিতা ওয়া মুসামো।

২। রিয়াং সম্প্রদায় — হুবতাংমা (জুম), খামচই মাইমি সামফ্লিং বাচামি, কুঁথেলাইম, তায়ীসান্নমি, লামচাকমি, নোকতার থেমি এবং হজাগরি বা মাইখুং মৌসামু।

৩। ডছুহ (রিয়াং সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা) হজাগিরি নৃত্য।

৪। জমাতিয়া সম্প্রদায় — গড়িয়া।

৫। নোয়াতিয়া সম্প্রদায় — জুম, গড়িয়া।

৬। হালাম সম্প্রদায় — জুম, সাপিতেদয় (ভায়লম, আরথন আনচু ও সাপিতেলা)।

৭। চাকমা সম্প্রদায় — বিজু, থানমানা।

৮। সাঁওতাল সম্প্রদায় — দাঁ - বাপলা, বাহা।

৯। ওঁরাও সম্প্রদায় — করম, ফাগুয়া, ঝুমুর।

১০। মুন্ডা সম্প্রদায় — যাদুর, লাসুর এবং গেণা।

১১। মগ সম্প্রদায় — ফোরাহিখো, পেদেসা, বিয়াসা এবং পংখু আঁকা। বর্ত্তমানে নৃত্যের পুনরুদ্ধারের ফলে আর ও দুটো নৃত্যের প্রচলন হয়েছে। যথা — ওয়া এবং সাংগ্রাই।

১২। খাসিয়া সম্প্রদায় — পাস্ - তি - এ।

"হালাম উপজাতিদের প্রশাখা"

১। কলই সম্প্রদায় — গড়িয়া।

২। মলশুম সম্প্রদায় — জুম।

৩। রূপিনী সম্প্রদায় — কের, গড়িয়া।

এছাড়া বিভিন্ন কাজের সূত্রে বা জীবিকার সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছে অনুপজাতি সম্প্রদায়। অনুপজাতিদের মধ্যেও তাদের নিজস্ব নৃত্যের সমাবেশ ছিল।

যথা — ১। গাজনের নাচ।

২। ঢাক ও ঢুলির নাচ।

৩। ধামাইল।

৪। বৌ নাচ।

৫। জারি গান ও নাচ।

৬। মহরমের গান ও নাচ।

৭। সারি গান ও নাচ।

৮। ঝুলনের নাচ।

৯। বালী কাচ নাচ।

১০। পুতুল নাচ।

ত্রিপুরার রাজারা সংস্কৃতিবান, বিদ্যোৎসাহী, উদার মনোভাব সম্পন্ন এবং গুনীজনের পৃষ্ঠপোষকতায় সতত সচেষ্ট হিসেবে সর্বজনবিদিত । নৃত্য ও গীতের সুধাসাগরে মহারাজারা শুধু নিজেরাই নিমজ্জিত ছিলেন না, রাজ অন্দরে পুরনারীদের সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলার চর্চায় প্রচণ্ড উৎসাহ দান করতেন। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের হতিবৃত্ত শ্রী রাজমালা (কালিপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ—

"ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমনি।।
ত্রিপুর সকলে সেই গীত ক্রমে গায়।
ছাগ অন্তে তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়।। .....[১২]"

অর্থাৎ মহারাজ ধন্যমানিক্য মিথিলা বা তিরহুত দেশ থেকে শিল্পী এনে রাজ্যে নৃত্য গীতের প্রচলন করেন।

মনিপুরে রাজপরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে গড়ে ওঠে মনিপুরী নৃত্যধারার পরিমণ্ডল এবং এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সর্বস্তরের মনিপুরী সম্প্রদায়ের ত্রিপুরায় আগমন ঘটে এবং প্রাসাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় প্রাসাদের বাইরেও গড়ে উঠে মনিপুরী নৃত্যচর্চার পরিমণ্ডল।

মহারাজাদের উৎসাহে হোলী, ঝুলন, রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজ অন্দরের মহিলারা রাজবাড়ীর অন্দরের মধ্যেই নৃত্য, গীতের অনুষ্ঠান করতেন । রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে হোলী এবং ঝুলন উপলক্ষে দুইদলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। সমস্ত নৃত্যই মনিপুরী নৃত্যের মাধ্যমে করা হত। মনিপুরী নৃত্য গুরুগণ বিভিন্ন সময়ে রাজকুমারীদের নৃত্য শিক্ষা দিয়েছেন।

মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সময় থেকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ — ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধনের সূচনা হয়। এবং এর ফলে ত্রিপুরার নৃত্যকলার ইতিহাসের মধ্যে একটি গৌরবান্বিত অধ্যায়ের সংযোজনা হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় সাত বার এসেছেন। শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলাকেন্দ্র সৃষ্টির মূল যে রবীন্দ্র মানস তার সঞ্জীবনী হচ্ছে ত্রিপুরার এই মনিপুরী নৃত্যকলাচর্চ্চা। এটাও অনেকে জানেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্ত রাস, মহারাস ইত্যাদি মনিপুরী নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। পরে যখন শান্তিনিকেতনে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, সেখানে নৃত্য শিক্ষা দেবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে অনুরোধ করেন ত্রিপুরা থেকে মনিপুরী নৃত্য শিক্ষক পাঠাবার জন্য। ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন সময়ে নৃত্য শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনিপুরী নৃত্য শিক্ষা দেন। বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরা থেকে সব নৃত্য শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনিপুরী নৃত্যশিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা হলেন যথা বুদ্ধিমন্ত সিং, নবকুমার সিং, বসন্ত সিং, কুমুদ সিং এবং চন্দ্রজিৎ সিং প্রমুখ। ত্রিপুরার এই মনিপুরী নৃত্যধারা পরবর্ত্তীকালে শান্তিনিকেতনের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিমণ্ডল ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছিল। ত্রিপুরার রাজ দরবারে সংগীতে ও নৃত্যের গুনী শিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। হোলী উৎসবকে উপলক্ষ্যে রাজ দরবারে লক্ষ্ণৌ ও কানপুর থেকে খ্যাতনামা কত্থক নৃত্য শিল্পীরা আসতেন। একবার অলকানন্দা নামে একজন কত্থক শিল্পী থালার উপর নাচ পরিবেশন করে দর্শকদের চমৎকৃত করেন। রাজপরিবারে মেয়েদের মনিপুরী নৃত্য শিক্ষা ব্যতীত কত্থক নৃত্য শিল্পীদের বৈঠকী বলা হত। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী কোন কোন রানীর সঙ্গে বিয়ের পর বৈঠকীদের দল ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে আসত। এদের বলা হত 'মস্ত বৈঠকী' । ত্রিপুরার রাজ দরবারে তাঁরা নৃত্য প্রদর্শন করতেন। রাজবাড়ীতে সেই সময়ে কনিজ, অলকানন্দা ও তাঁর বোন ত্রিবেনী প্রভৃতি কত্থক নৃত্য শিল্পীরা এসেছিলেন। একথা মহারাজ কুমারী কমলপ্রভা দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়। রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে সেই সময় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে ত্রিপুরায় মূলতঃ তিনটি সাংস্কৃতিক ধারা পরিলক্ষিত হয়।

"প্রাক স্বাধীনতা কালে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ধারা"

- পার্ব্বত্য অঞ্চলে উপজাতি সংস্কৃতিক ধারা
- রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতি ধারা
- সমতল লোক সংস্কৃতি-ধারা

মহারাজা বীরচন্দ্রের উৎসাহে ও প্রেরণায় রাজবাড়ী বীরবিক্রমের সময়ে পূর্ণতর রূপে বিকশিত হয়।

স্বাধীনতা পূর্ব্ব থেকে ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে যে জোয়ার এসেছিল, স্বাধীনতার পরেও তার বিকাশে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। সংগীত, নৃত্য, নাটক, বাদ্য ইত্যাদি শিল্পের সমন্বয়ে ত্রিপুরার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলাতে এর চর্চা ছিল বেশী এবং এর পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল।

নবকুমার সিং, বসন্ত সিং এর পরে মনিপুরী নাচের যে ধারাটি যাঁরা ধরে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিং, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিং প্রমুখদের তার ঠিক পরেই নৃত্যশিক্ষক অনন্ত দেববর্মণ শান্তিনিকেতন থেকে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করে আসেন। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের অভাবে ত্রিপুরায় কথাকলি নৃত্যের প্রচার করা যায়নি। তার কিছু দিন পর বিহাররঞ্জন সিংহ এবং অন্ত দেববর্মন মনিপুরে গিয়ে মনিপুরী নৃত্যে দুজনেই বিশেষ পারদর্শী হয়ে আসেন। শ্রী বিহাররঞ্জন সিংহ মনিপুর থেকে ফিরে এসে কয়েক বছরের মধ্যে কত্থক নৃত্য শিক্ষার জন্য জয়পুরে চলে যান এবং সেখান থেকে ফিরে কত্থক নৃত্যের শিক্ষকতা শুরু করেন।

রাজধানী আগরতলাতে পঞ্চাশের দশকে রবীন্দ্র নৃত্য নাট্য ত্রিপুরী ভাষায় রচিত নৃত্য - নাট্য ইত্যাদি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। রবীন্দ্র নৃত্য - নাট্য 'শ্যামা' এবং সুপ্রাচীন ত্রিপুরী লোক কাহিনী অবলম্বনে 'খুমপুই বারুক' নৃত্য-নাট্য অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল আগরতলায় এবং আগরতলা বাইরে ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে।

স্বাধীনতা লাভের পর যে নৃত্যধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, সেই ধারাটি বিভিন্ন নৃত্য চর্চার জন্য সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়কে কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। বিহাররঞ্জন সিংহ সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে কত্থক নৃত্য শিক্ষক হন এবং কত্থক নৃত্যকে ত্রিপুরায় সর্বত্র প্রচার ও প্রসার ঘটান।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ত্রিপুরায় বসবাসরত মনিপুরী সম্প্রদায় দ্বারা উচ্চাঙ্গ মনিপুরী নৃত্যকলা প্রাক্ স্বাধীনতায় শুধু রাজ অন্দরে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে রাজানুকূল্যে ত্রিপুরার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পরে। পাশাপাশি উচ্চাঙ্গ নৃত্য কত্থক ত্রিপুরার সর্বত্র বিশেষ করে রাজধানী আগরতলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রসারিত হয়।

ত্রিপুরার কত্থক ও মনিপুরী নৃত্যের যে জোয়ার শুরু হয়েছিল এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। ৭০ দশকে 'সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভরতনাট্যম নৃত্য চর্চা শুরু হয়। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে ধীরে ধীরে কিছু কিছু ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্যচর্চার আয়োজন শুরু হয়। যেমন অনিল সংগীত বিদ্যালয় (ব্যক্তি প্রচেষ্টা), রবীন্দ্র পরিষদ (প্রতিষ্ঠান গত প্রচেষ্টা) — এছাড়া রয়েছে গুরুমুখী নৃত্যচর্চার সুযোগ, যেমন রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিং, রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিং, অঙ্গন মৈত্রী সিং, রমেশ দত্ত, কুঞ্জেশ্বর দত্ত, বীর সিং (খোয়াই), মনি সিং (কৈলাসহর)। সুতরাং ত্রিপুরায় নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সরকারী প্রচেষ্টা, গুরুমুখী প্রচেষ্টা প্রভৃতির আয়োজন হয়েছিল।

এইভাবে একদিকে রাজধানী আগরতলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতিদের নৃত্য — গীতের বিপুল সম্ভার পাহাড়ে — পর্ব্বতের ভিতরেই সর্ব্বসাধারণের অগোচরে আবদ্ধ ছিল। এই সময় মহেন্দ্র দেববর্মণ ত্রিপুরার পাহাড়ে — পর্বতে ঘুরে ঘুরে ঐতিহ্যময় ত্রিপুরী সম্প্রদায় এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের উপজাতীয় নৃত্যগুলোকে সবসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন এবং বেশ কিছু উপজাতীয় নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

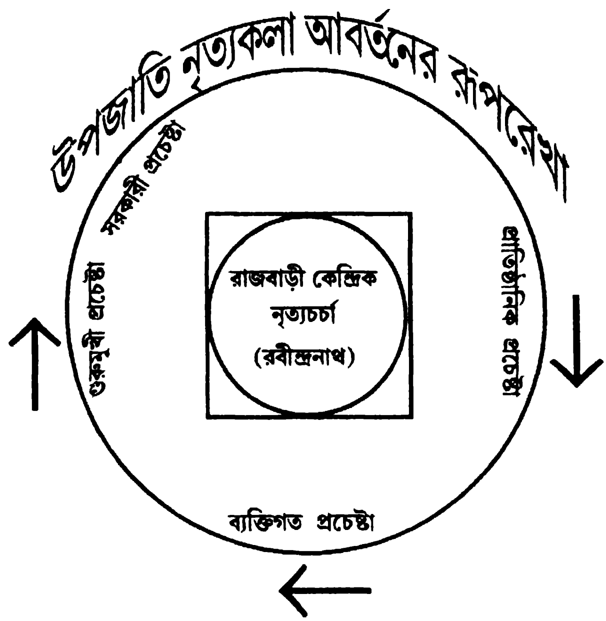
রাজ সিংহাসন পুষ্ট প্রাসাদকেন্দ্রিক নৃত্যকলার সঙ্গে উপজাতীয় ও লোক নৃত্যের ছিল আকাশ - পাতাল তফাৎ। ত্রিপুরার উপজাতিদের বেশীরভাগই জুম চাষ নির্ভর। এই জীবন - যাত্রায় স্বাভাবিক ভাবেই শষ্য উৎপাদন ভিত্তিক আচার — বিশ্বাস (Fertility cult) ও জড়বাদী চিন্তাধারার (Animatism) প্রতিফলন দেখা যায়। উপজাতিদের সমস্ত নৃত্যই জীবন ও জীবিকা ভিত্তিক। ত্রিপুরার ত্রিপুরী উপজাতিদের গড়িয়া, লেবাঙবুমানি, জুম, মামিতা, হুরাই মানি, রিয়াংদের হজাগিরি, চারমা উপজাতিদের বিজু ইত্যাদি নৃত্যে তাদের জীবন ও জীবিকার প্রতিফলন দেখা যায়।

রাজ আমলে উপেক্ষিত উপজাতি সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতি আশ্রয় নেয় লৌকিক জীবনে এবং তার

জীবনী শক্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তাব করে নগর সংস্কৃতিতে। রাজ আমলে উপেক্ষিত উপজাতি নৃত্য এবং লোক নৃত্য আরও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থাকে স্বাধীনতার পরেও। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লীতে এবং আগরতলায় অনুষ্ঠিত উপজাতি নৃত্য প্রদর্শনী ছাড়া তেমন ভাবে উপজাতীয় নৃত্যকলা আনুকূল্য লাভ করেনি।

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে স্বাধীনতালাভের পরে যে নৃত্যধারাটি প্রবাহিত হয়ে আসছিল, সেই ধারাটি বিভিন্ন নৃত্যচর্চার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সময় থেকে সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে নৃত্যকলার যে একটি আবর্তন বয়ে চলেছে তার একটি রূপরেখা দেওয়া হল ——

।। ত্রিপুরার নৃত্যকলা আবর্তনের রূপরেখা ।।



ত্রিপুরার সমগ্র নৃত্যের রূপরেখাটি বিচার কবলে দেখা যায় নৃত্যকলার মধ্যে তিনটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে ——

।। ত্রিপুরার নৃত্যকলায় তিনটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ।।

- আদিম জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের প্রতিফলন
- গ্রামীণ লোকায়ত সমাজ জীবনেব প্রতিফলন
- নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাচেতনার প্রতিফলন

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে উপজাতীয় নৃত্যগুলো যে আকারে বা রূপে পরিবেশন করা হত, সেই থেকে আজ পর্যন্ত নৃত্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় এসে পৌছেছে। পূর্বে নৃত্যগুলোর মধ্যে কোন প্রকার নৃত্য - নক্সা ছিলনা। খুব ঢিমে তালে উপস্থাপনা করা হত। ধীরে ধীরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নৃত্যকে কি ভাবে সুন্দ্র থেকে সুন্দরতর করা যায় — তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। বিভিন্ন

প্রতিযোগিতায় নিজেদের নৃত্যের মান উন্নত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা শুরু করে। কঠিন পরিশ্রমে নৃত্য শিল্পীরা অনুশীলন করতে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে নৃত্যের মধ্যে অনেক প্রকার নৃত্য নক্সা তৈরী হয় ও নৃত্যগুলি দ্রুতগতিতে পরিবেশন করা শুরু হয়। হাতের ভঙ্গি সুন্দর হয়ে যায়। পায়ের কাজ নিপুন হয। মুখের অভিব্যক্তির প্রকাস নৃত্যের গতি — প্রকৃতি বুঝে কবতে শুরু করে।

ফলে কিছু কিছু নাচ অসম্ভব দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে আসে — যা দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছে।

যেমন ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সবগুলো নৃত্যই অত্যন্ত জনপ্রিয়। নৃত্যগুলো হচ্ছে জুম, গড়িয়া, লেবাংবুমানি, মামিতা মুরাইমানি এবং মামিতা — ওয়া — মুসামী। মসক সুরমানি নামে একটি শিকার ভিত্তিক নৃত্য ও জনপ্রিয়। গড়িয়া নৃত্য হচ্ছে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্য। এটি কৃষি ভিত্তিক নৃত্য। এছাড়া জুম, লেবাং বুমানি, মামিতা হরাই মানি নৃত্য ও কৃষিভিত্তিক নৃত্য।

এই নৃত্যগুলোর পূর্ব্বে যে আকার বা Form ছিল, তা থেকে অনেক বেশী পবিশীলিত ও উন্নত হয়েছে। এই নৃত্যগুলোর মধ্যে গড়িয়া, মামিতা হরাইমানি এবং লেবাংবুমানি নৃত্যগুলো সম্পন্ন করে, তখন এক মনমুগ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সরকারী উদ্যোগে নৃত্যগুলো নিয়ে প্রচুর কর্মশালা হচ্ছে। এই নৃত্যগুলোর উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে আগামী দিনে। হয়তো এই নৃত্যগুলো Classico - Folk এর পর্যায়ে পৌছে যেতে পারে। জুম নৃত্যটি খুব সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করা হয় এবং জুম কিভাবে করা হয় তার প্রতিটি পর্ব্ব খুব সুন্দর ভাবে নৃতের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়। শিকার ভিত্তিক মাকে-সুরমানি নৃত্যটি মুখের অভিব্যক্তির প্রকাস এবং দেহের ভঙ্গীর সাহায্যে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করে। যে অভিব্যক্তির দ্বারা বা নৃত্যের মাধ্যমে যে ভাবে শিকারের ঘটনাটি উপস্থাপনা করে, ৫০/৬০ বছর আগে সেভাবে করা হত না। লেবাংবুমানি নৃত্যটিতে নৃত্য নক্সার প্রাচুর্য দেখা যায় এবং খুবই দ্রুত গতিতে নৃত্যটি সম্পন্ন করা হয়। আব মামিতা নৃত্যটিব গান, তাল এবং দেহভঙ্গী — নিয়ে উপস্থাপনা করার সময় পুরো নৃত্যটির মধ্যে এক নান্দনিক সৌন্দর্য্যেব সৃষ্টি হয়ে যায়, যা পূর্ব্বে নৃত্যটির মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।

রিয়াং সম্প্রদায়ের হজাগিরি নৃত্য শুধু দেশে নয়, বিদেশে ও খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। হজাগিরি নৃত্যটি যেহেতু ভারসাম্য রক্ষা করে করা হয়, সেইহেতু প্রথমদিকে খুবই ধীর লয়ে করা হত এবং এক একটি ভঙ্গীর পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাতে নৃত্যটির মধ্যে একটা এক ঘেয়েমীর সৃষ্টি হত। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এই হজাগিরি নৃত্যের মধ্যে কোরিওগ্রাফি বা নৃত্যনক্সা নিয়ে এসেছেন। ফলে নৃত্যটি খুবই দৃষ্টিনন্দন ও লাবণ্যময় হয়েছে। এছাড়া নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে ভারসাম্যের ভঙ্গীগুলো করার ফলে সমগ্র নৃত্যটি নয়নাভিরাম হয়ে উঠে।

তবে তাদের জুম নাচের পরিকাঠামো ততটা উন্নত নয়। তাছাড়া রিয়াং সম্প্রদায়ের আরও কিছু যে নৃত্য আছে সেগুলো খুব কমই চর্চিত হয়। আচার - অনুষ্ঠান মূলক নৃত্য বলেই সর্ব সমক্ষে উপস্থাপনা করা হয় না।

রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রশাখা উচ্চই সম্প্রদায়ও হজাগিরি নৃত্যটি চর্চা করে। মোটামুটি একটা উন্নত পর্যায়ে নৃত্যটির অবস্থান।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্যের পরিবেশন রীতি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের থেকে একেবারে আলাদা। এদের নৃত্যে খামের ব্যবহার আলাদা। নৃত্যের যে Style তা আলাদা, বলা যেতে পারে তান্ডব ভঙ্গীর একটি ছাপ পুরো নৃত্যটিতে দেখা যায়। তবে নিয়মিত চর্চার অভাবে নৃত্যটি আগের তুলনায় কিছুটা স্তিমিত।

নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য সর্ব পর্যায়ে উন্নত হয়ে ওঠেনি এবং গড়িয়া নৃত্যটিও অন্যদের তুলনায় নিষ্প্রভ। পূর্বে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়েব গড়িয়া নৃত্য বহুল প্রচলিত ছিল। নৃত্যটি পরিবেশন রীতিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু গড়িয়া নৃত্যটি বর্ত্তমানে পরিবেশিত হতে দেখা যায়না।

গত কয়েক বছরের মধ্যে চাক্‌মা সম্প্রদায়ের নৃত্য এবং মগ সম্প্রদায়ের নৃত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। চাক্‌মা সম্প্রদায়েব মধ্যে বিজু নৃত্য হচ্ছে প্রধান নৃত্য। 'বিজু' নৃত্যটি ত্রিপুবার অনেক ছন্দোবদ্ধভাবে করা হয় এবং খুবই গতিসম্পন্ন। লোক নৃত্যের মধ্যে প্রাণেব আবেগ স্বতস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ করার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা বিজু নৃত্যটির মধ্যে খুব সুন্দরভাবে নৃত্য শিল্পীবা পরিস্ফুট করে তোলে।

তবে নৃত্যটি নিয়ে নৃত্যশিল্পীরা আরও অনুশীলন করে এই নৃত্যটির হস্তমুদ্রা, পদসঞ্চালন। শারীরিক ভঙ্গী ইত্যাদিগুলিকে আরও পরিসীলিত করা দরকার। আশা কবা যায় ভবিষ্যতে নৃত্যটি Classico Folk এর পর্যায়ে পৌঁছাঁবে।

হালাম সম্প্রদায়ের 'জুম' এবং 'সাপিতেদয়' নৃত্যাদি একই সঙ্গে পরিবেশিত হয়। এই 'সাপিতেদয়' নৃত্যটি পরিবেশন রীতিতে অন্যান্যদেব নৃত্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নৃত্যটি খুব কম পরিলক্ষিত হয়।

মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে দশকের সময লক্ষ্য করা গেছে তাদের নৃত্য সবই বুদ্ধদেবের পূজা এবং বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যেই করা হত। কিন্তু সেই নাচের আকৃতি খুবই দুর্বল ছিল। কিন্তু ৯০ দশক থেকে তাদের সাহিত্য, নাচ, গান ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই জোয়াব বইতে শুরু করে। আরাকান থেকে নিজেদের সংস্কৃতির উপর লেখা বই নিয়ে এসে কিছু কিছু পুরানো নাচগুলো নূতন ভাবে পুনরুদ্ধার করে।

রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে সুসজ্জিত মেয়েরা খুব সুন্দর ভাবে একটি নৃত্য উপস্থাপনা কবে এবং কল্পতরু উৎসবে প্রদীপ নিয়ে 'ওয়া' নামে একটি নৃত্য করে। দুটো নৃত্যই অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। দুটো নৃত্যই ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাহরেও প্রশংসা অর্জন করেছে।

সাঁওতাল সম্প্রদায় 'দা-বাপ্‌লা' নামে একটি নৃত্য পরিবেশন করে। কিন্তু নৃত্যটির আঙ্গিকে খুবই দুর্বল এবং চর্চার ও অভাব লক্ষ্য করা যায়।

ওঁরাং সম্প্রদায় করমা, ফাগুয়া ও ঝুমুর নৃত্য করে । এদেব ফাগুয়া এবং করমা নৃত্যের উপস্থাপনা খুবই সুন্দর ভাবে করা হত। ইদানীং কালে এই দুটো নাচ বেশী একটা দেখা যায় না। তবে সরকারী সহায়তায় প্রতি বছর ঝুমুর নৃত্যের উৎসব করা হয়। এর ফলে ঝুমুর নৃত্যটি অনেক পরিশীলিত রূপে ওঁরাও সম্প্রদায়রা পরিবেশও করছে।

মুন্ডা সম্প্রদায়ের নৃত্য যাদুর, লামুর এবং গেনা ইত্যাদি নৃত্যগুলো বিলুপ্তির পথে।

খাসিয়া সম্প্রদায়ের একটি মাত্র দেখা যেত। তার নাম 'পাস্‌-তি-এ'। কিন্তু বর্ত্তমানে এই নৃত্যটি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।

ত্রিপুরার গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে জুম, রাংচুগালা, ওয়াংলা ইত্যাদি নৃত্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'ওয়াংলা' ছাড়া আর কোন নৃত্যই দেখা যায় না। 'ওয়াংলা' নৃত্যটি ও খুব কমই পরিবেশন করতে দেখা যায়।

সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় সংখ্যাল্পতার জন্যই হয়তো নৃত্যগুলো অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে ।

ত্রিপুরার কুকী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাংগডাম, থাইডর এবং দারলাম নৃত্য প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে শুধু 'তাংগডাম' নৃত্যটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এই নৃত্যটি মেয়েরা একটানা ছন্দে আবদ্ধ রেখে খুব সুন্দর ভাবে

নৃত্যটি উপস্থাপনা করে। কিন্তু 'থাইডর' এবং 'দারলাম' নৃত্য দুইটি উপস্থাপনার দিক দিয়ে অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে। বিশেষ করে 'থাইডর' নৃত্যটির মধ্যে যে কলা—কুশলতা এবং চমৎকারিত্ব দেখা যায়। নৃত্যটি অনুশীলন করলে আজ নৃত্যটি উন্নত স্তরে পৌছে যেত। চর্চার অভাবে দুটো নৃত্যই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

দারলং সম্প্রদায় কুকীদেরই একটি প্রশাখা। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের নৃত্য হচ্ছে 'জ্যাঠ লুয়াং'। নৃত্যটির বিশেষ বিশেষ জায়গার ভঙ্গী অসাধারণ, ছেলেদের একক ভাবে তিনটি নৃত্য হচ্ছে লাম্পালাক্, লুয়াল্লাম এবং ভৈমৈ। ছেলেরা যে ভাবে শরীরের ভঙ্গী করে তিনটি নাচ সম্পন্ন করে — ওই ভঙ্গীগুলো অনবদ্য। দারলং সম্প্রদায়ের নৃত্য বিদেশে ও প্রদর্শিত হয়েছে। ইদানীং কালে আগরতলা শহরে এই নৃত্যের উপস্থাপনা খুব বেশী দেখা যায় না।

হালাম সম্প্রদায়ের প্রশাখা যথাক্রমে কলই, মরশুম এবং রূপিনী।

কলই সম্প্রদায়রা গড়িযা নৃত্য নিয়মিত পরিবেশন করে। কলই সম্প্রদায়রা এই নৃত্যটি খুবই চর্চা করে। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম পর্য্যন্ত এই নৃত্যটিকে ধরে রাখে। নিযমিত চর্চ্চার জন্য কলইদের গড়িয়া নৃত্য খুবই লাবণ্যময় এবং সমগ্র নৃত্যটির মধ্যে নান্দনিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

মরশুম সম্প্রদায়ের মধ্যে জুম নৃত্য প্রচলিত। এই জুম নৃত্যটি অন্য সম্প্রদায়ের জুম নৃত্য থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। এই নৃত্যের জুমের গানের সুর ও অন্যান্যদের থেকে আলাদা। নৃত্যের তাল এবং ছন্দ ও আলাদা। গানের সঙ্গে এবং তাল ও ছন্দের সহযোগে, দেহকে ঐ ছন্দে ছন্দায়িত করে যখন নৃত্যটি করা হতে থাকে, তখন মনে হয় নদীর একটা ঢেউ এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। নৃত্যটির ছন্দ এবং লয়ের দোলায়িত প্রতিটি মাত্রা নৃত্যটির উপস্থাপনার দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। যদিও জুম নৃত্যটি খুবই সহজ, সরল কিন্তু নৃত্যটির ছন্দ অসাধারণত্বের দাবী রাখে। মলশুমদের এই জুম নৃত্যটি খুবই জনপ্রিয়।

রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়িয়া, কেরপূজা উপলক্ষ্যে নৃত্য প্রচলিত ছিল। কের পূজা উপলক্ষ্যে নৃত্য শুধুমাত্র রূপিনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। রূপিনী সম্প্রদায়ের নৃত্যগুলো নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় চর্চ্চার অভাবে নৃত্যগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার অনুপজাতিদের লোক নৃত্যের মধ্যে বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের গাজন নাচ সর্বজন বিদিত। গাজন নৃত্যটি ত্রিপুরার বাইরেও প্রশংসিত হয়েছে। গাজন নৃত্যটি খুবই চর্চা করা হয়। ফলে পূর্বের নৃত্যের যে আকার বা ছিল তার থেকে বর্ত্তমানের গাজন নৃত্যটি অনেক উন্নত হয়েছে। গাজন নৃত্যের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। যেমন শিবকে মাঝে রেখে গঙ্গা এবং পার্বতীর দ্বন্দ্ব, সতীর দেহত্যাগ করার পর শিব তান্ডব ইত্যাদি নৃত্যের চর্চা কিছু কম। শুধু দেবী দুর্গা সপরিবারে থেকে অসুরকে বধ করছে — এই গাজন নৃত্যটি সর্বাধিক প্রচলিত। এছাড়াও আছে কালী কাচ বা কালী নৃত্য। এই নৃত্যটি ও খুব কম দেখা যায় অথচ নৃত্যটির সাজসজ্জা, কাহিনীর বিন্যাস এবং দেহের ভঙ্গী বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করে।

বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধামাইল নাচ। ত্রিপুরার সর্বত্রই কম বেশী পরিমানে এই নৃত্যটি ছড়িয়ে আছে। যদিও নৃত্যটির চর্চ্চা খুবই দেখা যায়। কিন্তু নৃত্যটি সেরকম উন্নত স্তরে পৌছায়নি।

বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের দ্বারা চর্চিত বৌনাচ কোন কোন মহকুমায় করা হয়। খুব বেশী চর্চা হয় না বললেই চলে।

ঝুলন পূর্ণিমায় রাধা কৃষ্ণের যে নাচ হত। সেই নৃত্যের চর্চা এখন নেই। তবে বিশেষ স্থানে সারীগান ও নাচ প্রচলিত আছে।

মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জারী গান ও নাচ। তবে খুব বেশী না হলেও মোটামুটি

চর্চা আছে। মুসলীম সম্প্রদায় মহরম উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা বের করার সময় নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে। তবে নৃত্যটি এখন ও সেরকম উন্নত পর্যায়ে আসেনি।

রাজধানী আগরতলায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে কত্থক ও ভরতনাট্যম নৃত্য খুবই প্রচলিত। এছাড়া ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে কত্থক ও ভরতনাট্যম — বিশেষ করে কত্থক নৃত্যের খুবই চর্চা আছে ।

শাস্ত্রীয় মনিপুরী নৃত্য রাজ আমল থেকেই চলে আসছিল। মাঝে ৬০ এর দশক থেকে ৮- দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত মনিপুরী নৃত্য ত্রিপুরায় বিশেষ করে রাজধানী আগরতলায় চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে স্তিমিত হতে শুরু করে। এখন শুধু বিভিন্ন রাস নৃত্য ছাড়া আর অন্য নাচ খুব কমই দেখা যায়।

এছাড়া রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য প্রচুর মঞ্চস্থ হয়েছে এবং এই রবীন্দ্র নৃত্যের চর্চা ত্রিপুরায় সর্বত্রই আছে।

রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নজরুল, সুকান্তের গান, কবিতার উপর নৃত্যের প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজধানী আগরতলায় আধুনিক চিন্তা চেতনা এবং নান্দনিক সৌন্দর্য মন্ডিত যুক্ত যে সব নৃত্যালেখ্য বা নৃত্য - নাট্য পরিবেশিত হচ্ছে - তা ত্রিপুরার বাইরে যে কোন জায়গায় প্রদর্শন করলে তা স্বাতন্ত্র এবং প্রশংসার দাবী রাখে।

আগামী দিনে আশা করা যায় ত্রিপুরার উপজাতীয় কিছু কিছু নৃত্য এবং দুই একটা লোক নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যে পরিণত হবার পথে এগিয়ে যাবে। কারণ নৃত্যতত্ত্ব অনুযায়ী সব শাস্ত্রীয় নৃত্যই একদা উপজাতীয় নৃত্যের আকারে ছিল।

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্য, লোক নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, নৃত্যলেখ্য এবং নৃত্য - নাট্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের সমারেশ প্রমাণ করে যে গত ৫০/৬০ বছরের পূর্ব থেকে বর্ত্তমানে ত্রিপুরার নৃত্যকলা ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব গতিতে সামনে এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরার নৃত্যকলা ত্রিপুরার সংস্কৃতির জগতে একটি নূতন দ্বার খুলে দিয়েছে।

এই নৃত্যগুলির রূপরেখা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ত্রিপুরার এতগুলো বৈচিত্রপূর্ণ নৃত্যকলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মিশ্র নৃত্যকলার এক সম্ভার এবং মেলবন্ধন যা ত্রিপুরার উপজাতি ও অনুপজাতিদের মধ্যে এক সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলেছে।

বর্ত্তমানে রবীন্দ্র নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং উপজাতীয় নৃত্যকলা একই সঙ্গে পাশাপাশি পরিবেশিত হচ্ছে। এর ফলে ত্রিপুরায় নূতন জোয়ার এসেছে নৃত্যকলা চর্চায় এবং রাজ্যে নৃত্যকলার এক ত্রিধারার সমারেশ ঘটেছে। নৃত্যকলার এই ত্রিধারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃতির এই ত্রিমুখী চর্চ্চা ও বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার নৃত্যের পরিমণ্ডল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সুরে বাঁধা।

পিলাক-ইতিহাসের আবৃত অধ্যায়

দীপক ভট্টাচার্য

পিলাক নামের উৎস ঃ

পিলাক অঞ্চলে এখন পর্যন্ত কোন লেখ পাওয়া যায় নি। এমনকি এর আশেপাশে কোথাও এই নাম সম্বলিত ঐতিহাসিক কোন নিদর্শন পাওয়া হয় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এখানে যে সমস্ত বৌপ্রমুদ্রাগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোতে পিলাকের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থিত প্রাচীন রাজ্য বা উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত নামের পাশাপাশি [illegible]পক বা রেবক নামাঙ্কিত বেশকিছু বৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। পিলাক নামটি কোথাও পাওয়া যা[illegible] থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এ অঞ্চলের আশেপাশে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্যাদির আলোকে প্রতিষ্ঠিত, সে সব নিদর্শন সমূহেও মাত্র একবার এ ধরনের একটা নামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুদূর বর্মার আরাকান প্রদেশের ম্রোহাঙ অঞ্চলের সিখাউঙ প্যাগোডায় রক্ষিত একটি স্তম্ভের লেখ পাঠ করে পিলাকের কাছাকাছি একটি নামের হদিস পাওয়া যায়। আনন্দাচন্দ্র উৎসর্গীকৃত অষ্টম শতকের ঐ লেখটির মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে পিলাক বনক কথাটি। পিলাক্ক থেকে পিলাক হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। এছাড়া এধরনের স্থানের নাম অন্য কোন জায়গায় এখন অব্দি দেখা যায় নি। ময়নামতী, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর, বাঙলাদেশে অবস্থিত এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে পিলাক নামের অস্তিত্ব অন্তত আরাকান প্রদেশের মতও এখন অব্দি পাওয়া যায় নি। যদি ও সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মীয় ধ্যান ধারণার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় বঙ্গের শাসনভার ছিল পরাক্রমী পালদের হাতে। বঙ্গসহ সেই সময়ের অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনার সাহায্যে পিলাক ও পিলাক বনক ঘনিষ্ঠতা যাচাই করার চেষ্টা করা যাক।

প্রাচীনকালে সমগ্র বাঙলাদেশে দু'ধরনের মানুষের আদি বাসস্থান ছিল। উত্তরবঙ্গে ছিল পুণ্ড্র জাতীয়দের বাস এবং দক্ষিণ বাংলার মানুষদের বলা হতো বঙ্গ। মূলতঃ অনার্যদের বাসভূমি বাংলাদেশসহ সমগ্র পূর্বভারত সম্বন্ধেই আর্যদের একটা উন্নাসিকতা ছিল। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতক পর্যন্ত আর্যদের পক্ষে ভাগলপুর পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ঐতেরিয় ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে, পূর্ব ভারতে সে সময় অসভ্য মানুষরা বাস করতো

যাদেব দস্যু নামে অভিহিত কবা হয়েছিল। তাবো অনেক অসভ্য জাতিব সঙ্গে তখনই প্রথম উত্তববঙ্গেব উপজাতি হিসাবে পুন্ড্রদেব নাম পাওয়া গেল। বঙ্গ নামে প্রাচীন আবো একটি উপজাতিব নাম প্রথমবাবেব মত জানা গেল ঐতেবিয আবণ্যক থেকে। এ থেকে ধাবণা কবা সঙ্গত হবে যে আর্যবা মাত্র খ্রীষ্ট পূব সপ্তম শতকে বাঙলাব মানয সম্বন্ধে জানাতে পেবেছিল। একথাও এব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত যে, বঙ্গীয় মানুষেবা তখনও পর্যন্ত আর্যদেব সংস্পর্শ লাভ করে নি। এ সমস্ত অঞ্চল দখল কবাতে পারে নি বলে আর্যবা এই অঞ্চল সম্বন্ধে পববর্তী দুই তিন শতাব্দী জুড়ে পুবাণ সমূহে একথা বিবৃত কবেছে যে অসুববাজ বলীব স্ত্রী ও সংধু মহাত্মা দীর্ঘাত্মাব সংসর্গে পাঁচটি সন্তানেব জন্ম হয। এদেব নামকবণ কবা হয যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্মা। বলীব ঐ অবৈধ সন্তানেবা তাব উত্তবাধিকাবী হিসাবে সম্পত্তিব অধিকাব আইনত প্রাপ্ত হওযাব যোগ্য ছিলেন না। তখন মহাবাজা তাঁব সম্পত্তিব অধিকাব আইনত প্রাপ্ত হওযাব যোগ্য ছিলেন না। তখন মহাবাজা তাব সম্পত্তিব পূর্বভাগ তাদেব মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সে সমস্ত বাজ্যেব নাম তাদেব নাম অনুসাবেই পবিচিত হলো। অঙ্গ (ভাগলপুব জেলা, বিহাব) বঙ্গ (পূর্ববাংলা), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), পুন্ড্র (উত্তববঙ্গ) এবং সুহ্মা অথবা সুভভূমি (বাধা) ভাগীবথীব পশ্চিম অংশ বাধা নামে অভিহিত ছিল। উত্তববঙ্গেব প্রাচীন শহব পুন্ড্রনগব ছিল পুন্ড্রদেব আদিনিবাস (বর্তমান বাঙলাদেশেব বগুড়া জেলায, মহাস্থান)। বঙ্গেব সীমানা ছিল বর্তমানেব ঢাকা-ফবিদপুব অঞ্চল।

বঙ্গ ও পুন্ড্র উপজাতিগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেব কথা মহাভাবত ও বামাযণেব মত প্রাচীন মহাকাব্যেও পাওয়া যায। মহাভাবতেব বচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক অনুমান কবা হয়ে থাকে। পান্ডুপুত্র ভীম পান্ডবদেব পক্ষে সমর্থন সংগ্রহেব উদ্দেশ্যে বেবিয়ে পুন্ড্রদেব বাজা পুন্ড্রকাবাসুদেবকে যুদ্ধে পবাজিত ও হত্যা কবেন। বঙ্গেব অধীশ্ববাও তাঁব হাতে পবাজিত হন। তবে ঐ সময বঙ্গে আবো অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীব মানুষ বাস কবতো যাদেব মধ্যে অনেকে আবাব কুরুদেব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। অন্য মহাকাব্য বামাযণে বঙ্গদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, অযোধ্যাব উচ্চবংশীয প্রতিপত্তিশালীদেব সঙ্গে তাদেব বাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এ থেকে মনে হয সে সময বঙ্গেব সমীহ আদায কবাব মত সামবিক ক্ষমতা ও বাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। একই সঙ্গে ঐ সময থেকেই আর্যদেব বঙ্গে প্রবেশ ঘটে। বঙ্গেব উপজাতীয মানুষেবা আর্য আচাব ও সংস্কৃতিকেকখনই সাদবে গ্রহণ কবে নি। শুধু তাই নয আর্য সংস্কৃতিব প্রয়োগেব ক্ষেত্রে উত্তব ভাবতেব সঙ্গে এ অঞ্চলেব মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায এ কাবণে যে, এখানে স্থানীয সংস্কৃতিব প্রভাবযুক্ত হয়েই আর্য সংস্কৃতিব প্রসাব ঘটেছে।

উপবোক্ত বাজ্যদ্বযেব বাইবে অনার্যদেব বাসভূমি 'সমতট' নামেব একটি বাজ্যেব অস্তিত্ব প্রথম জানা যায চতুর্থ শতকে সমুদ্রগুপ্তেব এলাহাবাদ পিলাব লিপি থেকে। মেঘনা নদীব পূর্বতীবে অবস্থিত এ বাজ্যেব সীমানা বাঙলাব সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সুনির্দিষ্টভাবে তা নির্ধাবণ কবা অসম্ভব। সম্পূর্ণ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলাব বিভিন্ন সমযে কখনও বঙ্গ, সমতট আবাব হবিকেল নামে পবিচিত লাভ কবেছে। কেউ আবাব সমগ্র অঞ্চলটিকে বঙ্গ নামে অভিহিত কবেছেন যদিও বিভিন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমতট একটি আলাদা স্বাধীন বাজ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোব মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে চীনা পবিব্রাজক হি-ওযেন সাঙ-এব দেযা বর্ণনা। তিনি বাঙলা ভ্রমণ কবে সেখানকাব চাবটি বাজত্বেব নাম উল্লেখ কবেছেন। সেগুলো হলো পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ সমতট ও তাম্রলিপ্তি। ৬৩৭-৩৯ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে সমতট ঘুবে তাব দেযা বর্ণনা থেকে জানা যায যে, বাজ্যটি তিন হাজাব লি অর্থাৎ পাঁচশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত ছিল। যাব বাজধানী ছিল প্রায সাড়ে তিন মাইল এলাকা নিয়ে। এ বাজ্যেব সীমানা শেষ হয়েছে সমুদ্রে। নিম্নভূমি অঞ্চল হলেও এখানকাব ভূমি খুব উর্ব্বব এবং নিয়মিত চাষযোগ্য। এখানকাব সর্বত্র ফুল ও ফলেব প্রাচুর্য, মনোবম আবহাওযা এবং মানুষেব ব্যবহাব খুবই সুন্দব। এই এলাকাব মানুষ ক্ষীণতনু, পবিশ্রমী এবং গাযেব বঙ ঈষৎ কালো। এই বাজ্যেব মানুষ জ্ঞান আহবণে

আগ্রহী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এখানে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় মনোভাবাপন্ন মানুষ বাস করে। সমতটে সে সময় ত্রিশটির মত সংঘারাম ও প্রায় দুহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিল। তিনি তখন প্রায় একশ দেব মন্দিরও লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয় জৈন ধর্মাবলম্বী নিরগ্রন্থরাও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিলেন। উলঙ্গ নিরগ্রন্থদের তিনি পুন্ড্রবর্ধনেও দেখেছেন। সে সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম যে বঙ্গদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় অনেক বেড়ে যায় ও জৈন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুবই কমে যায়। হি-ওয়েন-সাঙ এর দেয়া বর্ণনা থেকে এটা বোঝা গেল যে তখন সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পাশাপাশি থেকে একই সঙ্গে ধর্মচর্চা করেছেন এবং শাসকরা অন্ততঃ এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। পরবর্তীকালে মহীপালের বগুড়া লেখ এবং খড়গদেবের আসরফপুর তাম্রফলক পাঠোদ্ধার করে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে সমতটের যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে মোটামুটিভাবে তা গঠিত হয়েছে বর্তমান ত্রিপুরার কিছু অংশ, কুমিল্লা এবং নোয়াখালি জেলা নিয়ে। ঐতিহাসিকদের নির্ণয় করা এই ভৌগোলিক সীমানার খুবই নিকটে অবস্থিত এই পিলাক।

ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত সমতট অঞ্চলের আলাদা কোন শাসক ছিলেন বলে এখনও পর্যন্ত স্থির নিশ্চয় করে বলা যায় না। যদি থেকেও থাকেন তাহলেও পঞ্চম শতকের শেষপাদ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৫০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের জারী করা তাম্রফলক যা কুমিল্লার আঠারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গুনাইঘর গ্রাম পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, এগারো পটাক জমি মহাযান মতাবলম্বী ভিক্ষুদের দান করা হয়েছে। এই দান থেকে বৈন্যগুপ্তর রাজ্য পরিচালনার স্বতন্ত্রতা ও সেই সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধবাদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে অনৈক্যের সূত্রপাত হয় যার পরিণতি স্বরূপ বৈণ্যগুপ্তের দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে আগমন ও কৃ-পুরে রাজধানী স্থাপন করে শাসনভার গ্রহণ। চালুক্যরাজা কিরিটবর্মণের হাতে পরাস্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত আরো তিনজন শাসক এ অঞ্চল শাসন করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়। ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার শক্তিশালী শাসক হিসাবে বিভিন্ন তাম্রপত্র, মুদ্রা ইত্যাদি থেকে যাঁদের নাম জানা যায় তাঁহা হলেন, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। এরূপ কিছুদিন সমগ্র বাংলা এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতায় পড়ে যায়। সে অবস্থ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সুস্থিতি ফিরে আসে সপ্তম শতকের গোড়ায়। তখন খড়গ-বংশ ক্ষমতা অধিকার করে প্রায় সত্তর বছর ধরে সমতট শাসন করে।

আসরফপুর তাম্রপত্র ও সারবর্ণীমূর্তি লেখ এবং বড়কামতা স্তূপের নিকট থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেব-দেবী মূর্তি ও মারীচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে, খড়গ-বংশীয়রা যে বৌদ্ধধর্মালম্বী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল তা বোঝা যায় চীনা পরিব্রাজক সেং-চির বর্ণনা থেকে। হি-ওয়েন-সাঙের ভ্রমণের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর সমতট এসে সেং চি লক্ষ্য করলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম এ অঞ্চলের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছে ও জৈনধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভিক্ষুদের সংখ্যা দ্বি-গুণ হয়ে চার হাজার হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক যে মধুর ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্মের উপাসক রাজরাজাভট্ট শাসন করছিলেন। খড়গ-বংশীয়রা তাদের ধর্মীয় সহনশীলতা ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যতদূর জানা যায়, রাজরাজাভট্ট ও তাঁর পিতা দেবখড়গ গোড়া বৌদ্ধ কিন্তু তাঁর মাতা প্রভাবতী ছিলেন একজন শৈব। ঐ সময় অবশ্য তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদ ও তান্ত্রিক হিন্দুবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নরম মনোভাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে হয়। খড়গ বংশের জারী করা বিভিন্ন তাম্রপত্র থেকে এটা জানা গেছে যে, ময়নামতী অঞ্চলের বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার শালবন- বিহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা জমি

দান করেছিলেন। শালবন বিহারের একটি কুঠুরী থেকে প্রাপ্ত তাম্রফলকের ওপর স্থাপিত সিল থেকে দেখা যায় একদিকে অর্ধশায়িত ষাঁড় ডানদিকে মুখ করা ও নীচে লেখা মহারাজা শ্রী বৈন্যগুপ্তস্য, এ থেকে মনে করা হচ্ছে যে শালবন বিহারের প্রধান অংশ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে বৈন্যগুপ্তের শাসনকালে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যা বিশাল আকার লাভ করে।

আরও কিছুদিন পর ময়নামতীর অদূরে কুটিলামুড়ায় বৌদ্ধত্রয়ী অবলম্বনে, বৌদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের কাজের নিদর্শন এই উপমহাদেশ জুড়ে এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়নি। বাঙলাদেশে অবস্থিত কুটিলামুড়ায় স্থাপিত এই ত্রিরত্ন স্তূপগুলোর মধ্যে মাঝখানেরটি ধর্মচক্রের অনুকরণে গঠিত। ইটের তৈরী বিশাল এই স্তূপের মধ্যে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব পূজিত হতেন। অন্য দু'টি স্তূপ বুদ্ধ ও সংঘের প্রতীকরূপে স্পষ্ট। ইটে ঠাসা ঐ স্তূপগুলোর বাইরে কুলুঙ্গি মত রয়েছে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য। এই ত্রিরত্ন স্তূপগুলোর কাছাকাছি আরো ছোট ছোট স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। কুটিলামুড়ায় অবস্থিত এই ত্রি-রত্ন সপ্তম শতক থেকে তেরো শতক পর্যন্ত মানুষের ভীড়ে গম গম করতো। মূল স্তূপের পেছনে পাওয়া বেশ কয়েকটি উনুন থেকে এই ধারণাই হয় যে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে সমাগত পূণ্যার্থীদের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো। দীর্ঘ এই সময়ে মধ্যে অন্ততঃ তিনবার ত্রিরত্নের সংস্কার সাধিত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে অন্য ধর্মাবলম্বী শাসকরাও যে অভূতপূর্ব এই সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করেছিলেন একথা বর্তমানে ত্রিরত্নের অবস্থান থেকেও বোঝা যায়। প্রাকৃতিক কারণে বিনষ্ট হওয়া ছাড়া এগুলোর অন্য কোনরকম ক্ষতি সাধন কেউ করেনি।

একই সময়ে ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলে এক সামন্ত প্রধান কর্তৃত্ব করতেন বলে জানা যায়। লোকনাথের জারী করা টিপেরা তাম্রফলক থেকে রাত বংশজাত সামন্ত, সপ্তম শতকের শেষ দিকে যে এই অঞ্চল শাসন করতেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও তাম্রফলকগুলোত লোকনাথ বা রাতদের উর্ধ্বতন শাসকদের নাম জানা যায় না তথাপি ঐতিহাসিকেরা প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এ মত প্রকাশ করেন যে, ওরা খড়্গদের অধীনে থেকেই শাসন চালিয়েছে। এরকম ধারণাও কেউ কেউ পোষণ করেন, যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে অষ্টম শতকের মধ্য পর্যন্ত, অর্থাৎ পাল বংশের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত যে অস্থিরতা চলেছিল সে জন্য খড়্গ বংশীয়রা বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। আর সে কারণে এ অঞ্চলে সামন্ত নিয়োগ করতে হয়েছিল, যাতের অস্তিত্ব পরবর্তী শতকে আর পাওয়া যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাতরা নিজেদের নামের পাশে সমতটেশ্বর শ্রীজীবধরণ রাত ও অধস্তনঃ আরো দুই রাতর নাম পাওয়া যায়। ঐ ফলক থেকে একথাও জানা যায় যে, বৌদ্ধবিহার নির্মাণের জন্য জমি দান করা হয়েছে যদিও তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রী ধারণ নিজে ছিলেন বৈষ্ণব এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক। কৈলান তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শ্রীধারণ রাত ছিলেন পরম কারুণিক একাধারে মধুর রচয়িতা, শব্দবিদ্যা পারঙ্গম এবং নানাবিধ বিদ্যা ও কলায় পরদর্শী। তাঁর পুত্র বলধারণ রাত শব্দবিদ্যা, শস্ত্র বিদ্যা, হস্তী ও অশ্ব বিদ্যায় সুনিপুণ। রাতরা ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

একেবারে অষ্টম শতকের গোড়ায় সমতট শাসন করতে এলেন দেববংশ, রাতদের পরাজিত করেহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই শাসকরা ক্ষমতা পেয়েছিলেন। ক্ষমতা দখল করার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল না নীরব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনভার পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাস এখনও আলোকপাত করতে পারেনি। দেববংশ তাদের রাজধানী দেবপর্বতে (ময়নামতী পাহাড়) স্থাপন করেন। দেবপর্বত নাম অবশ্য প্রথম জানা যায় জীবধরণ রাতর সময়। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে সমতট শাসন করা এবং

বংশের গরিমা ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল হয়ে যেতে থাকে। বস্তুতঃ অষ্টম শতকের শেষ দিকে তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ সময় পাল বংশের শাসক ধর্মপাল সমগ্র বাঙলা জয় করে তার অধীশ্বর হয়ে গেছেন। এরপর থেকে অর্থাৎ, ৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছরের সমতটের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। অল্প সময়ের রাজত্বের মধ্যে দেববংশীয় চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব শালবন বিহারটি সংস্কার ও নব কলেবরে নির্মাণ করেন।

যদিও পাল রাজা মহিপালের রাজত্বের আগে পর্যন্ত নিজেরা সরাসবি শাসন করেননি তথাপি তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি এতই ছিল যে, এই সময়ে যারা সমতটে কর্তৃত্ব করতেন তাদের কথা কেউ জানতে পারেনি সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে যে অস্থিরতা ও মাৎস্যন্যায় চলছিল পালদের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে। ছোট ছোট স্বাধীন সামন্তরা অতি দ্রুত তাদের অধীনতা প্রায় বিনা বাধায় মেনে নেয়। তারই ফলে বহির্বিশ্বের কাছে এই সমগ্র অঞ্চলটি বঙ্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। সমতট মন্ডলও সে সময় আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে বঙ্গের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। ঐ সময় পর্যন্ত সমতটের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত পিলাকও সঙ্গতভাবে বঙ্গের অধীন হয়ে পড়ে। যার সমর্থন পাওয়া যায় মধ্য-অষ্টম শতকের লেখটি থেকে। পিলাক অঞ্চলটি সে সময় বঙ্গের মধ্যে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানই শুধু নয়, পাশাপাশি আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অতি পরিচিত বৌদ্ধ চর্চার কেন্দ্র রূপের স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছাড়া সিখাউঙ প্যাগোডায় রক্ষিত লেখটির পেছনে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা ইত্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে যে, চতুর্থ শতক থেকে আরাকানে চন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। আবার সমতট মন্ডলেও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের উপস্থিতি দেখা যায় আরো পরে। দশম শতাব্দীর গোড়ায় যখন পাল সাম্রাজ্যের পতনের শুরু হয় সে সময় রোহিতগিরি চন্দ্র বংশীয়রা সমতটের হৃত গৌরব উদ্ধার করেন। রোহিতগিরির অবস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে রোহিতগিরি ও লালমাই পর্বত একই। দুটোর অর্থ লাল মাটি দিয়ে গঠিত পাহাড়। আবার কেউ বলেন, রোহিতগিরি হচ্ছে বিহারের রোহতাসগর। এ দুটো মতের বাইরে যে তৃতীয় মতটি মোটামুটি জনপ্রিয় তা হচ্ছে, যে চন্দ্ররা আরাকানের শাসক চন্দ্রদেরই বংশধর। রোহিতগিরি আরাকান প্রদেশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কারণ, আরাকানবাসীরা নিজেদের প্রদেশ আরাকানকে রখইয়াঙ বলে অভিহিত করে থাকে। সেই রখইয়াঙ চট্টগ্রামের অদিবাসীদের কাছে রোসাঙ্গ নামে পরিচিত। রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অধিকাংশ পন্ডিতগণ মনে করেন রাখাঙ্গ > রখঙ্গ > রাহাঙ্গ > রোসাঙ্গ হয়েছে। তাহলে দেখা গেল রোসাঙ্গ ও আরাকান সমার্থন। রোসাঙ্গগিরিই রোহিতগিরি হয়ে থাকতে পারে। এ ধারণার সমর্থনে আরাকানের রাজোয়াং থেকে জানা যায় যে, দশম শতকে ওখানকার এক রাজা সমতট অধিকার করেন ও দাপটের সঙ্গে শাসন পরিচালনা করে সমতটমন্ডলের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণে জমি দান করেছেন । শুধু তাই নয় ঐ সময়ের আরাকান শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

শ্রীচন্দ্র তাঁর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হরিকেল অধিকার করেন ও প্রাগজ্যোতিষের ম্লেচ্ছ শাসকদের আক্রমণ করে তাঁর কথামত চলতে বাধ্য করেছিলেন। এছাড়াও কমবৌজের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় গোপালকে সাহায্য করেছেন, যার ফলে হৃত রাজ্য উদ্ধার করা সহজ হয়েছিল। গৌর দ্বিতীয়বার পালদের অধিকারভুক্ত হলো। শুধু তাই নয়, তিনি পালদের শত্রু উৎকলদের, হুন ও বিনদের সঙ্গেও লড়াই করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী চন্দ্ররাও যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধি করেছেন। ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে

দক্ষিণ ভারতের চোলা শাসকদের হাতে গোবিন্দচন্দ্র ও পাল রাজা পরাজিত হন। তা সত্ত্বেও গোবিন্দচন্দ্র সমতট ও বঙ্গ শাসন করেছিলেন। কিন্তু ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে কালাচুরি রাজা কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ও সমতটের শাসনভার চলে যায় ব্রাহ্মণ বর্মণদের হাতে। ময়নামতী শালবন বিহার ও অন্যত্র প্রাপ্ত তাম্রফলক থেকে চন্দ্র বংশীয়দের যে বংশ তালিকা তৈরী করা হয়েছে তা অনেকটা এরকম (১) পূবর্ণচন্দ্র, (২) সুবর্ণচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৪) শ্রীচন্দ্র (৫) কল্যাণচন্দ্র (৬) লডহচন্দ্র (৭) গোবিন্দচন্দ্র। সমতটে রাজত্ব করা চন্দ্রদের যে তালিকা পাওয়া গেল সেখানে আনন্দচন্দ্রের নাম নেই। তাছাড়া উপরোক্ত চন্দ্রবংশীয়রা দশম শতকে সমতট শাসন করেছেন। ময়নামতী তাম্রফলক থেকে জানা যায় যে, কৌম্বজরা যখন গৌড় আক্রমণ করে সে সময় ত্রৈলোক্যচন্দ্র সমতট অধিকার করেন। সমতটের এই চন্দ্র বংশীয়দের আরো বহু আগে থেকে আরাকানে চন্দ্রবংশীদের উপস্থিতি থেকে একথা মেনে নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, অষ্টম শতকের আনন্দচন্দ্র আরাকানের শাসক বংশীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন। সেদিক থেকে পিলাক্ক যতই বনক বা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত হোক না কেন এর সঙ্গে আরাকানের যোগাযোগ যে নিবিড় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পিলাকে কোন রাজা শাসন করতেন কিনা, নিশ্চয় করে একথাও বলাও সম্ভব হচ্ছে না এ কারণে যে, এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ব্যাপক খনন করা হয়ে ওঠেনি। তবে যে সমস্ত প্রত্ন উপকরন পাওয়া গেছে এবং অংসখ্য স্তূপ ও ইটের ঢিবি চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো থেকে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে এখানে বেশ কয়েকটি বিহার, মন্দির ইত্যাদি ছিল। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখানকার সংঘরাম বা বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক জনপদ। যে জনপদের বাসিন্দাদের কাছে আরাকান প্রদেশের প্যাগোডা ও শালবন বিহার বা কুটিলামুড়ার ত্রিরত্ন অপরিচিত ছিল না মোটেও।

পিলাক অঞ্চলে নানা মাপের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা পাওয়া গেছে। রৌপ্য মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন স্থানের নাম লেখা রয়েছে যা থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে ঐ সমস্ত এলাকার মানুষদের যোগাযোগের ধারণা দৃঢ় সমর্থন পায়। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোর মধ্যে পীরক লেখা মুদ্রাও রয়েছে। পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পীরক স্থানটিতে হয়ত টাকশাল ছিল যেখানে মুদ্রা বানানো হতো। এবং ঐ টাকশালের নামই অঙ্কিত হয়েছিল রৌপ্যমুদ্রা সমূহে। সেই সমস্ত মুদ্রা সপ্তম শতকের বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। পীরক যে বর্তমান পিলাক হতে পারে একথা ভাষা বিবর্তনের স্বরূপ থেকে মেনে নেয়া যায়। বিবর্তনের যে রূপ ধরা পড়েছে তা হলো— পীরক > পীলক্ক > পীলক > পীলাক বা পিলাক। এর দ্বারা পীলক্ক যে এই পিলাক সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া, এই সঙ্গে পিলাকের প্রাচীনত্ব যেমন নির্ধারিত হলো তেমনি আরাকান, চট্টগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষ ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্রটি প্রমাণিত হল।

পিলাকে মূর্তি এবং অন্যান্য

পিলাক, জোলাইবাড়ী, দেবদারু, কলসী জুড়ে যে জনপদ গড়ে উঠেছে সেখানে ও সে অঞ্চলের বাইরে বিভিন্ন সময়ে নানা আকারের বিভিন্ন দেব- দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত দেবদেবী মূর্তিগুলোর বেশীরভাগই বেলেপাথরে তৈরী। এছাড়াও বেশকিছু ব্রোঞ্জের ছোট আকারে মূর্তি পাওয়া গেছে। ছোট হলেও ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোতে শৈল্পিক চেতনার ছাপ স্পষ্ট। এই অঞ্চলে বেলেপাথরে সৃষ্টি যে সকল দেব-দেবীর মূর্তি এখন অবধি পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, নৃসিংহ, মহিষমর্দ্দিনী, মহাদেব এবং সূর্য। এছাড়া, তারা, মারীচ, গণেশ, চুন্ডা এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত মূর্তিগুলোর বর্তমান অবস্থান একই রকম নেই। দীর্ঘকাল অনাদর, অবহেলায় প্রাকৃতিক নিয়মেই অধিকাংশ ভাস্কর্য স্বকীয়তা হারিয়েছে। আবার কোন মূর্তি পূজিত হতে গিয়ে নিজস্বতা হারিয়েছে। আবার কোনটার নাক, চোখ, মুখ হারিয়ে

গেছে। অনেক কষ্টকল্পনা করে সঠিক আকৃতি বুঝে নিতে হয়। এই সমস বড় মাপের ভাস্কর ছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে টেবাকোটার কিন্নর-কিন্নরী, পশু ও দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র। এইসব কাজের সঙ্গে ময়নামতী সংগ্রহশালায় রাখা টেবাকোটায় শুয়োর, মানব-মানবীর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয় এখানে পাওয়া নবম শতকের অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গেও ওখানকার একই সময়ের মূর্তির মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের সাদৃশ্য ব্রোঞ্জের ছোট মূর্তিগুলোতে আরো বেশী বলে মনে হয়। যেন, সব একটা ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হয়েছে। এই সাদৃশ্য এক বিশেষ ঘরানার দিক-নির্দেশ করে যা সমতট বঙ্গ থেকে এদিকেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

জোলাইবাড়ী বাজারে বাসুদেব বাড়ীতে, বাসুদেব বলে যিনি নিয়মিত পূজা পাচ্ছেন তিনি আসলে পিলাক এলাকা থেকে পাওয়া বেলেপাথর কেটে সৃষ্ট অবলোকিতেশ্বর। সমপদ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো নবম শতকের এই মূর্তিটি সিঁদুর তেল চর্চিত হয়ে এমন বিকট আকৃতি পেয়েছে যে তাঁর আসল স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এখানেই রয়েছে মারীচ। তিন মাথা ও ছয় হাত বিশিষ্ট মূর্তিটি অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূর্তিটির বাম পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করা ও ডান পা টান করে রাখা। অমৃতানন্দের ধর্মকোসা সংগ্রহে, ছয় হাত বিশিষ্ট মারীচের বর্ণনা রয়েছে, যার সঙ্গে এখানকার মূর্তিটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যদিও স্ব-রূপ অবিকৃত তিনিও রাখতে পারেননি। আগরতলা— সাব্রুম সড়কের এক পাশে দেবদারু বা দেবারু যা কিনা পূর্ব পিলাকের অন্তর্গত। এই দেবদারুতেই সমরেন্দ্র দেববর্মা আজ থেকে প্রায় বাহাত্তর বৎসর আগে আট হাত বিশিষ্ট শক্তির মূর্তি দেখেছিলেন। শক্তির যে মূর্তির তিনি তাঁর ত্রিপুরার স্মৃতিতে ছাপিয়েছেন তা দেখে মনে হয় দেবী আসলে মহিষমর্দ্দিনী। এই মূর্তিটি বর্তমানে মুহুরীপুর রাজেশ্বরী আশ্রমে পূজিত হচ্ছে। অষ্টম শতকের এই ভাস্কর্যটি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পিলাক থেকে মুহুরীপুর নিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ ছাড়া মূর্তিটি স্বকীয়তা এখন পর্যন্ত অনেকটাই বজায় রাখতে পেরেছে। দেবদারুর বেশ বড় স্তূপটি এখনও খনন করা হয়নি। অনেকটা জায়গা জুড়ে ইটের নীচে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদন রয়েছে সেগুলো শুধু খনন হলেই জানা সম্ভব। এখনও জৈবিক কোন প্রয়োজনে খোঁড়াখুড়ি হলে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কোন দেবমূর্তি বা রৌপ্য মুদ্রা আবার কখনও বা টেবাকোটার ছোট্ট সীলমোহর, যা এই সমগ্র অঞ্চলকে এক সূত্রে গাঁথতে সাহায্য করে। দেবদারুর একটু ভেতরে যেখানে পায়ে চলার সুবিধা বেশী— সেই পথের ধারে কাঠ মিস্ত্রীদের ঘরগুলি শুরু হওয়ার কিছু আগে, যে অল্প কয়েকটা মগবাড়ি রয়েছে— যাদের ছোট ছোট মেয়েরা মায়ের পাশে, উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে কোমর তাঁতে গামছা বোনে— সেখানে দরমার এক ঘরে দেখা যায় এক চালির মধ্যে একশ পাঁচটি বুদ্ধ মুখাবয়ব— পূজিত হচ্ছেন। উচ্চমানের কাজ নয় মোটেও, তবু বেশ কয়েকটা মুখের নাক, চোখ, এখনও অবিকৃত রয়েছে। লঙ্কার ক্ষেত তৈরী করার সময়, কোন এক মগ সুন্দরী ঐ শিল্প সৃষ্টিটি পেয়েছেন বলে শোনা যায়। এভাবেই লঙ্কার চাষ করতে গিয়ে অশ্বিনী দেবনাথ মাটির তলায় দেখেছিলেন ললিতাসনে উপবিষ্ট গণেশ। ঐখানেই রাশীকৃত ইট সরিয়ে পেয়েছেন বিষ্ণু। চার হাত বিশিষ্ট দাঁড়ানো ধাতুর মূর্তিটি সেখান থেকে চলে যায় বিলোনীয়ার বাসুদেববাড়ী। পরবর্তী সময়ে আরো দুটো বেলে পাথরের মূর্তি অশ্বিনীবাবুর আলু ক্ষেত থেকে পাওয়া গেছে। বালীর পাথরের পরিমল বৈদ্যের বাড়ীতে রয়েছে বেলেপাথরের সূর্য। বালীরপাথরেই জয়মঙ্গল করের বাড়ী। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর বাড়ীর পাশে এখন যেখানে ধানক্ষেত সেখানে উঁচু ইটের ঢিবি ছিল। তিনি ক্ষেতের মাটি চাষযোগ্য করার জন্য সেই ঢিবিটি ভেঙ্গে সমান করেছেন ও ইটগুলি তাঁর নিজ ব্যবহারে লাগিয়েছেন। তিনি একটি মস্তকহীন মূর্তি সেখানে পেয়েছিলেন। যে স্তূপটি তিনি ধ্বংস করেছেন—পুরাতত্ত্ববিদরা মনে করেন, সেখানে কোন বিহার বা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ধারণার সমর্থনে বিশেষজ্ঞরা শ্রী করের বাড়ীতে অবস্থিত দেব-মূর্তিটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই স্থান থেকে উদ্ধার করা— তাঁর বাড়ীতে শায়িত মূর্তিটি অবলোকিতেশ্বরের। অত্যন্ত নিম্নমানের বেলেপাথরের ভাস্কর্যটি সম্ভবত নবম শতকে

নির্মিত হয়েছিল। একই এলাকার ননী গোপাল দেবনাথ তাঁর ক্ষেত থেকে উদ্ধার করেছেন ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মূর্তিটির মুখাবয়ব নষ্ট হয়ে গেছে। ললিতাসনে উপবিষ্ট চার হাত বিশিষ্ট বুদ্ধ মূর্তিটি বর্তমানে আগরতলা সংগ্রহশালায় রয়েছে। এখান থেকে পাওয়া পশু আঁকা টেরাকোটার ফলক বর্তমানে সরকারী সংগ্রহশালায় রাখা আছে। পিলাকেরই মাঠ থেকে পাওয়া গেছে টেরেকোটার গোলাকৃতি সীলমোহর। একই ডাইস থেকে বানানো দুইখানা সীলমোহর আগরতলা সংগ্রহশালায় রয়েছে।

ঋষ্যমুখ গামী রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে ছোট্ট যে পাহাড়ী নদী তা পিলাক-ছড়া নামে পরিচিত। পিলাকছড়া পেরিয়ে আরো খানিকটা পথ যাবার পর ধানক্ষেতের মাঝখানে রাস্তার বামপাশে বেশ উঁচু একটি ইটের স্তুপ দেখা যায়। নানা ধরনের গাছে ঘেরা ঐ স্তুপটি বর্তমানে শ্যামসুন্দর আশ্রম টিলা নামে পরিচিত। কয়েকজন বৈষ্ণবী বাঁশের ঘর করে ঐ স্তুপটিকে শ্যামসুন্দর আশ্রমে পরিণত করেছিলেন। নানা আকৃতির প্রচুর ইট স্তুপটিকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন কোন ইটের মধ্যে সুক্ষ্ম কারুকাজ করা হয়েছে। এ ধরনের ইট সাধারণত বহির্প্রাচীরে লাগানো হতো। শ্যামসুন্দর আশ্রমটিলায় ওঠার সময় নজরে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকা এক বোধিসত্ত্ব। দুইহাত বিশিষ্ট সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন নবম শতকের এই মূর্তি আজ কতকাল ধরে এভাবে খোলা আকাশের নীচে রয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই স্তুপটির পাশে আরো একটি স্তুপ রয়েছে। যেটির ওপরে আকৃতিতে পূর্বোক্ত নিদর্শনটির প্রায় সমান একটি মূর্তির অংশ বিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকা এই বুদ্ধ মূর্তিটির মাথা নেই। এই শ্যামসুন্দর টিলার আশ্রম থেকে আরো তিনখানা বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। সেগুলো এখান থেকে সরিয়ে আগরতলায় রাখা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে জড়িত এতগুলো বেলে পাথরে নির্মিত নবম শতকের নিদর্শন এই কথা প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, এখানে একটি বড় বিহার ছিল। সে বিহার সেসময়ে লোক সমাগমে গম গম করতো। পিলাক-ছড়ার আশেপাশে ইটের ছড়াছড়ি থেকে নির্দ্ধিধায় বিশ্বাস করা যায় যে, এখানে বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল।

শ্যামসুন্দর টিলাকে বাঁদিকে রেখে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে ধান ক্ষেতের মাঝে বেশ বড় একটি স্তুপ, রাস্তা থেকেই নজরে পড়ে। নানা ধরনের গাছে ভরা এই স্তুপটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন সূর্যদেব। মূর্তিটি মাটির তলায় কোন কিছুর সঙ্গে আটকানো রয়েছে। গ্রামবাসীরা এই দেবমূর্তিটির উপর টিনের তৈরী একটি আচ্ছাদন দিয়েছেন। পূজাখোলা নামে পরিচিত এই স্থান মূর্তিটি নিয়মিত পূজা পেয়ে থাকেন তবে সূর্যরূপে নন— শিতলা দেবীরূপে। প্রমাণ সাইজের এই ভাস্কর্যটি নিয়মিত সিঁদুর ও তেল চর্চিত হয়ে স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। বেশ উঁচু এই স্তুপটির নীচে মন্দির রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতবড় মাপের নয় আরো ছোট আকারের সূর্য মূর্তি পাওয়া গেছে কলসী গ্রামের রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে। মুহুরী তীরে, শান্ত এক মগ পল্লীতে ছোট্ট ঝুপরি ঘরে তিনিও শিতলা বলেই পূজিত হচ্ছেন। পূজাখোলার সঙ্গে এখানকার পার্থক্য শুধু এইটুকু যে কলসীর মূর্তিটি তেল চর্চিত হন না। মূর্তিটিতে অবশ্য উন্নতমানের ভাস্কর্য শৈলীর ছাপ নেই।

পূজাখোলার পরই রয়েছে এখানকার বড় স্তুপটি । ঠাকুরাণীটিলা নামে চিহ্নিত এই স্তুপটি মাটি কেটে প্রায় সমান করা হয়ে গেছে। এভাবে মাটি কেটে এখানে তৈরী হয়েছিল এক বাজার । দীর্ঘদিন বাঁশ টিনের ঘর তৈরী করে এখানে বেশ জমজমাট ব্যবসা হয়েছে। বাজার তৈরী করার আতিশয্যে এখানকার অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নষ্ট করতে দ্বিধা বোধ করেনি কেউ। কিছু পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত নিদর্শন এখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, মহিষমর্দ্দিনী, নৃ-সিংহ ও শিব। বেলেপাথরে নির্মিত নৃ-সিংহ হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করা ভঙ্গিমার মূর্তিটি বেশ বড়। ধুসর রঙের পাথরের মূর্তিটির নিম্নাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বহু হাত বিশিষ্ট শিবমূর্তি। শিবের অন্ধকাসুর বধ রূপ ভিত্তি করে ধুসর পাথরে নির্মিত এই মূর্তিটির নির্মাণকাল নির্ণয় করা হয়েছে তেরো শতক। এখান থেকে উদ্ধারকৃত অন্যান্য দেবমূর্তিগুলো

বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। ঠাকুরাণীটিলার এক কোণায় সবচেয়ে বড় যে মূর্তিটি রয়েছে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেব। এতবড় মাপের সূর্যদেবের উপস্থিতি এই স্তূপটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন পশ্চিমমুখী কাত হয়ে শরীরের বেশীরভাগ অংশ মাটির তলায় রেখে এই দেবতা সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করছেন। খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে, প্রতিনিয়ত এই মূর্তিটি তার গুরুত্বপূর্ণ কারুকাজ হারিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি কিছুটা খনন করে, এখানে একটা মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ও সেই সঙ্গে মূর্তিটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। প্রায় দশফুট উচ্চতার সূর্য মূর্তিটি সমপাদ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এত বড় মাপের সূর্যমূর্তি, এই অঞ্চলে এখন অব্দি আর দেখা যায় নি। কিরিট -মুকুট পরিহিত মূর্তিটির কানে রয়েছে গোলাকৃতি দুল ও গলায় কারুকাজ করা অলঙ্কার। মূর্তির দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধর বিদ্যমান। পিলাক অঞ্চলে বিশাল এই মূর্তির উপস্থিতি এখানে বড়সড় একটি সূর্যোদেবের উপস্থিতি হয়ত এই ধারণা সমর্থন করতো না যদি না পশ্চিম পিলাক ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে নানা আকারের সূর্যদেবের মূর্তি পাওয়া যেতো। এখান থেকে প্রাপ্ত সব রকম দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো সৃষ্টিকলার এই নিদর্শনটিকে মুহুরীপুর আশ্রমের সেবাইতরা অবশ্য সূর্যরূপেই পূজা করছেন। এখনও তিনি স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন। সূর্যদেবের উপস্থিতি একথাই প্রমাণ করে যে এখানে তিনি অত্যান্ত জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন এবং মন্দিরের বাইরেও তার আরাধনা করা হতো। ঠাকুরাণীটিলার নীচে যে মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে যে সেটি একটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর মন্দির, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত। যদিও মানব সভ্যতার প্রথম যাত্রাপথে যে সমস্ত প্রাকৃতিক রূপকে মানুষ দেবতার আসনে বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে সূর্য অন্যতম তাহলেও সূর্য আরাধনা ও স্তোত্র পাঠ এবং কুষ্ঠ রোগগ্রস্তের নিরাময়ের জন্য সূর্যরশ্মির প্রয়োজনের কথাবার্তা সব বৈদিক সাহিত্যে থেকে জানা যায়। যার ফলে সূর্যদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের একজন দেবতা হিসাবে পরিচিত লাভ করলেন। সে যাই হোক, আদিকাল থেকেই সূর্যের প্রতি অধিকার সবার সমান। সে কারণে, এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে সূর্যোপাসনা যদি হয়ে থাকে তাহলেও তার দ্বার ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য যে অবারিত ছিল একথা মানতে হয়। ত্রিপুরার এই দক্ষিনাংশ জুড়ে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেশি। প্রাচীনকালে সূর্যোপাসনার জন্য এখানে ঐ রোগাগ্রস্তরা সমবেত হতেন। বর্তমানে মন্দিরের অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও এই স্থানের মাহাত্ম্যের কথা মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে যায় নি। হয়ত সেই বিশ্বাসের জোরে বিভিন্ন এলাকার কুষ্ঠরোগীরা এখনও সেখানে এসে রোগামুক্ত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করেন। তাছাড়া একথাও কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গে বলার চেষ্টা করেন যে, এই অঞ্চলের ওপর সূর্য থেকে এমন গুণান্বিত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের পক্ষে উপকারী। এই বিশ্বাসের যথাযর্থতা নিরূপণ করা হয় নি। যদিও এরকম ধারণা আমাদের কোনারকের সূর্যমন্দিরের কথা মনে পড়ায়—যেখানে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব, কুষ্ঠ মুক্ত হয়েছিলেন। তাহলে এখানেও যে একটি বড়সড় সূর্যোপাসনার কেন্দ্র ছিল, সে সম্ভাবনার কথা মেনে নিতে হয়।

ঠাকুররাণীটিলার গা ঘেঁষে যে পল্লীটি রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ছড়া পাওয়া যায়। সেই ছড়ার পাড়ে একটি ঝুপড়িতে পিলাক থেকে নেয়া পদচিহ্ন আঁকা একটি বেদীকে শিব বলে পূজা করা হচ্ছে। আরেকটু এগিয়ে গেলে বাঁশঝাড়ের মাঝে একটু খোলা উঁচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গণেশ। ক্লাবটিলা বলে পরিচিত এই স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে ঘন বসতি। গাছপালায় ঘেরা এই স্থানে ঘন বসতি। গাছপালায় ঘেরা এই স্থানে কেন যে মূর্তিটি রেখে নষ্ট করা হচ্ছে কে জানে। ললিতাসনে বসা গণেশটিতে খুব একটা উঁচু দরের কাজের ছাপ নেই। পশ্চিম পিলাক থেকেই আরেকটি গণেশ নিয়ে মুহুরীপুর আশ্রমে রাখা হয়েছে। ভঙ্গিমা ও গঠন শৈলিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মধ্যযুগের আদিপর্বে বর্তমান বাংলাদেশে অঞ্চলে গাণপত্য সম্প্রদায় বলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। ঐ সম্প্রদায়ের কাছে গণেশই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। যারা বিশ্বাস করতেন একমাত্র গণপতিই হচ্ছেন সব দেবতার সেরা এবং তাঁর আরাধনা করা

মানেই হচ্ছে অন্য সব দেবতার তৃপ্তি। এই গাণপত্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের চিন্তাধারার প্রসার বাঙলাদেশেই সার্থকভাবে করতে পেরেছিলেন। যে কারণে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে গণেশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, থেকে শালবন বিহার, পিলাক ঝেওয়ার্বা পর্যন্ত এমনকি জাপান, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশেও গণেশ মূর্তি দেখা গেছে। গণেশ তাঁর স্থান বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও করে ফেলতে পেরেছিলেন। যে কারণে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে গণেশ ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পেরেছিল। তবে বঙ্গ সমতটের কাছে কাছে অবস্থিত পিলাক অঞ্চলে গণেশ পূজিত হয়েছিলেন গাণপত্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রভাবযুক্ত হয়ে না বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এখনও শেষ হয়নি। শুধু জানা যায় যে, বৌদ্ধগণপতি মারজয়ী রক্তবর্ণ, দ্বাদশভূজ ও মুষিকাবাহন। পিলাকে পাওয়া মূর্তিগুলো চার হাত বিশিষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গণেশের সঙ্গে এখানকার গণেশ মূর্তির সাদৃশ্য বিশেষ নেই বলে গাণপত্য সম্প্রদায়ের উত্থানের কালে সেই প্রভাব এখানেও বিস্তৃত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

শুধুমাত্র বেলেপাথরে নির্মিত মূর্তি নয়, পিলাক অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি সংগ্রহ করা হয়েছে। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা এই ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলোর সঙ্গে বাঙলাদেশে পাওয়া ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোর যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে পাওয়া ব্রোঞ্জ নির্মিত দেবদেবীর মূর্তিগুলোর অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অষ্টম শতকের বুদ্ধ, নবম শতকের তারা, লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর ও তারা হরিতি, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর, বিষ্ণু এবং দশম শতকের একটি স্তূপের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই নিদর্শনগুলো, আগরতলা সরকারী সংগ্রহশালায় রয়েছে। ক্ষুদ্রাকৃতির এই সকল ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি থেকে তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দেবতা বহন করার যে প্রথা বর্তমান, এখানেও সেইরকম প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই প্রথা এদিক থেকে গিয়েছে না হিমালয়ের তরাই থেকে এদিকে এসেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে, ব্রোঞ্জের নির্মাণ শৈলী নিঃসন্দেহে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। সম্প্রতি ময়নামতী অঞ্চলে খনন করে পাওয়া ব্রোঞ্জের বিশাল বুদ্ধমূর্তি, ঐ সময়ের বঙ্গ, সমতটের শিল্পীদের কলা নৈপুণ্যের দক্ষতার কথা ঘোষণা করে। বসা অবস্থায় বুদ্ধদেবের ব্রোঞ্জ নির্মিত এতবড় মূর্তি এই উপমহাদেশে এখন পর্যন্ত আর দেখা যায় নি। নবম-দশম শতকে নির্মিত এই মূর্তিটির প্রতি ছত্রে কারিগরী কুশলতার ছাপ বিদ্যমান। চল্লিশ মন ওজনের ধাতু নির্মিত মূর্তিটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য যে বিশেষ কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন সে কথা অনস্বীকার্য্য। পিলাকের অল্প দূরত্বে অবস্থিত ময়নামতী অঞ্চলে যখন প্রকৌশলের প্রয়োগ নৈপণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে, সে সময় ঐ কার্যকলাপ দ্বারা এই অঞ্চলও প্রভাবিত হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই নতুন মাধ্যমে শিল্পকলা বিকাশ লাভ করে ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র দেবমূর্তি বা ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে নয় এমন কি, মন্দির বিহার চৈত্য, স্তূপ নির্মাণ শৈলীতেও এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একই ধারার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বিহার এবং মন্দিরের সম্পূর্ণ কাঠামো উন্মোচিত হলে এই ধারণার সত্যতা যাচাই করা যাবে। বাঙলাদেশে অবস্থিত পাহাড়পুর থেকে রূপবানামুড়া পর্যন্ত উন্মোচিত স্তূপ সমূহের একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে, যে ঐ সমস্ত কাঠামোর (স্তূপ, বিহার ও মন্দির) বহির্গাত্রের দেওয়ালে মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে জনসাধারণের কাছে পবিত্রময় করে তুলে ধরার লক্ষ্যে সাধারণত দেব দেবীর মূর্তি লাগানো হত। কেউ কেউ মনে করেন এতে করে, মন্দিরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেত। প্রথম দিকে স্তূপে মূর্তি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল না পরে চারদিকে মূর্তি রাখার ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য প্রকোষ্ঠ তৈরী করার প্রথা চালু হলো। এই ধরণের ব্যবস্থাকে স্তূপ ও মন্দিরের সংমিশ্রণ বলা চলে। এই ধরণের ব্যবস্থাকে স্তূপের গায়ে নবম শতকের যে অবলোকিতেশ্বর শায়িত রয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে এই দেবমূর্তিটি বিহারের বাইরের দেওয়ালের প্রকোষ্ঠে লাগানো ছিল। কারণ সাধারণ, বুদ্ধি বলে বিহার অভ্যন্তরের

মূর্তি হলে —ইটের ঢিবির নীচে চাপা পড়ে যাওযার কথা। একই কথা এই স্তূপ সংলগ্ন অন্য স্তূপটির ওপব প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বুদ্ধ মূর্তি প্রসঙ্গেও বলা চলে। পাহাড়পুরে খনন কার্য্যেব ফলে যে সমস্ত সংঘরাম, স্তূপ ইত্যাদি উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলোর বহির্প্রাচীর সমূহে শুধুমাত্র বৌদ্ধদেব দেবী নয় এমন কি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি লাগানো রয়েছে। বিশেষ করে কৃষ্ণ ও শিবের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মূর্তি রয়েছে। এখানেই বাঙলাদেশেব মধ্যে সর্বপ্রাচীন কৃষ্ণমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দির, বিহার, স্তূপ, ধর্মীয় ধন্যাধারণার সঙ্গে জড়িত উপাসনা, পূজা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট মিলনায়তনগুলোর বাইরের দেওয়ালে এইভাবে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপনের স্থাপত্য-শৈলীর প্রসার পাহাড়পুর থেকে শুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিয়মিত বাইরের লোক এখানে এসেছেন ও এখানকার বিদগ্ধজনেরা বাইরে গেছেন। এই প্রক্রিয়াতেই নির্মাণ শৈলী পৌছে গেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সবার অজান্তে সেই প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশেষ ধাঁচ — যা সমস্ত সংঘরাম, চৈত্যের ক্ষেত্রেও এই স্থাপত্য শৈলীর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পিলাকের সূর্যমূর্তি ও সূর্যোপাসক

পিলাকে পাওয়া মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মটি হল সূর্য। ঠাকুরাণটিলায় দীর্ঘদিন পশ্চিমমুখী হেলে থাকা এই শিল্পকর্মটিকে সম্প্রতি দাঁড় করানো হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রায় দশ ফুট উচ্চতার এই মূর্তিটি এখনও একটি মন্দিরের কাঠামোয় আটকে রয়েছে। কিন্তু খোঁড়াখুড়ি করার ফলে একটি মন্দিরের কাঠামো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দশফুট উচ্চতার দেবতার বিগ্রহ যে মন্দিরে পূজিত হতেন সে মন্দিরের আকৃতি ও আয়তন নিঃসন্দেহে যথেষ্ট বড় হওয়ার কথা। এই অঞ্চলে সমপদ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো এত বড় সূর্য ভাস্কর্য দীর্ঘদিন খোলা আকাশের নীচে থেকে তার সূক্ষ্ম শৈল্পিক সুষমা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। যে দেবতার জন্য বিশাল মন্দির স্থাপিত হয়েছিল কোন একসময় সেই দেবতার জন্য একটা আচ্ছাদান কেন আজও জুটলো না —সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতার অভাব যে কত প্রকট এটা তাব একটা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। মাথার কাছে দুই বিদ্যাধর নিয়ে সপ্তাশ্ববাহিত রথে দাঁড়ানো এই মূর্তিটি এখানে পাওয়া মূর্তিগুলোর মধ্যে অনন্য। এর নির্মাণশৈলী আমাদের স্মরণ করায় বরাহ মিহিরের দেয়া সূর্যের বর্ণনা, 'তাঁর বুক থেকে পা থাকবে উদীচ্যবেশে আবৃত, বিয়দগ নামে মেখলা, কন্দুকের দ্বারা আবৃত বক্ষ এবং প্রভামন্ডল অর্থাৎ শিরশ্চক্র হবে রত্নোজ্জ্বল'। উন্নত ভাস্কর্য্য শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মূর্তিটি ছাড়া আরও বিভিন্ন মাপের সূর্য মূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে। পূজাখেলায় যে দেবতা নিয়মিত তেল সিঁদুর চর্চিত হয়ে শিতলারূপে পুজিত হচ্ছেন তিনি আসলে সূর্য বলেই বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া লোকালয়ে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে ছোট মাপের মূর্তিটিও সূর্যেরই। এত সূর্যদেবের উপস্থিতি একথা বিশ্বাস করতে সাহায্য করে যে এখানে সূর্যদেব বেশ জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন এবং নিয়মিত পূজা অর্চনা পেতেন। ছোট আকারের মূর্তিগুলো এ ধারণাই পুষ্ট করে যে তিনি গৃহাঙ্গণেও পূজিত হতেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে একথা জানা গেছে যে, গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে বিষ্ণু-শিবের সঙ্গে সূর্যের এক ভক্ত সম্প্রদায় তৈরী হয়েছিল। সে ধরণের ইঙ্গিত মহাভারত, বরাহ মিহিরের বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ সংহিতা, সাম্ভপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ সমূহে পন্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর নিয়মিত পূজার জন্য মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। সেসব মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল পাঞ্জাবের (পাকিস্তানভুক্ত) মূলতানর মন্দির যার উল্লেখ পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, আল ইদ্রিস, আবু ইসহাসদের রচনায়। প্রকৃতপক্ষে সজীব সূর্যমন্দির বর্তমান সময়ে প্রায় নেই বললেই চলে এবং অধিকাংশ দিবাকর-গৃহ সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গেছে। শুধুমাত্র সূর্যদেবতাই সেই সঙ্গে স্থাপত্যও বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল যার নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া

যায়। কোনারকের সূর্যমন্দিরে, রাজস্থানের ও সিয়ানের, গুজরাতের মোঢেবার ও কাশ্মীরের মার্তন্ড মন্দিরগুলিতে। এর প্রভাব-নিশ্চয় পিলাকেও পড়েছিল।

ভারতবর্ষে সূর্যোপাসনায় প্রাচীনত্ব হরপ্পীয় সংস্কৃতির কাল পর্যন্ত বলে পন্ডিতরা মনে করেন। যদিও প্রকৃত সূর্যোপাসনায় জনপ্রিয়তা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে। আর সে কাজে পূর্ব ইরাণের মগ নামের মিত্রের বা ইরাণী মিথ্র—সূর্যের উপাসক পুরোহিতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করে থাকেন। ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বরাহ মিহির তাঁর বৃহৎ সংহিতায় স্পষ্টই বলেছেন, দেবালয়ে অর্চনার জন্য সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন মগ। আলবিরুনী ও সূর্য উপাসক পুরোহিতের এই নামে জানতেন। এছাড়াও প্রাচীন লেখমালা, মহাকাব্য পুরাণ-সাহিত্যে মগরা ভোজক, সূর্য-দ্বিজ, শাকদ্বীপিয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। এই সমস্ত তথ্যাদির সাহায্যে তারা সন্দেহহীনভাব বলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দিতে পারস্য থেকে আসা মগ ব্রাহ্মণেরা ভারতে সূর্য উপাসক মগদের বহু দেশে উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। খরোষ্ঠি লিপিতে উৎকীর্ণ একটি মৃৎপাত্রের মুখের দিকে বজত্র নামে একজন মগ ব্রাহ্মণের বিতর্ক বিজয়ের সংবাদ দেখে পন্ডিতরা জানতে পেরেছেন যে অন্ততপক্ষে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গে মগ ব্রাহ্মণের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। কারণ বজত্র নামের যে মগ ব্রাহ্মণটি বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি একজন পন্ডিত স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সে সময় পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিরাই বিতর্ক সভায় যোগদান করতেন। বর্তমান চন্দ্রাকেতুগড় সে সময় বঙ্গের অধীন ছিল। এই প্রামাণ্য দলিল থেকে একথাও বোঝা যায় সে পূর্ব ইরাণীয় মগ ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি শুধু নয়, বিদ্যায় পান্ডিত্যে অন্যের সমীহ আদায় করার মত অবস্থায় বাঙলাদেশে এদের অবস্থান ছিল। সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিরূপে যদি বজত্রকে স্বীকার করে নেয়া যায় তাহলে বঙ্গে মগদের উপস্থিতি যে বেশ প্রাচীণ ঘটনা তা বোঝা যায়। বঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে সূর্যোপসনার প্রসার ঘটাতে এইসব ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট অবদান ছিল, একথা মানা যেতে পারে। যাদের সাহায্যে বিশেষ সৌর উপাসক গোষ্ঠীর প্রভাব, প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পিলাক— বঙ্ক নামের মধ্যে পিলাকের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও একথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে পিলাকের সূর্য দেবতা ও সূর্যোপাসনার মন্দির গড়ে ওঠার পেছনে মগ ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিই প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছিল। তবে মগধ নামের সঙ্গে এই মগদের জড়িত করতে পেরেছিলেন পন্ডিতরা। পুরাণ বিশ্লেষণ করে পন্ডিতরা দেখিয়েছেন যে মগধ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল মগ-মক মগী জাতীয় মানুষদের গোষ্ঠীর নাম থেকে। গ্রীকে এই গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে মেগা, লাতিনে মগী বা ম্যাগনা, সংস্কৃতে মঘ।

আমাদের এই অঞ্চলেও মগ নামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখানকার মগ বাসিন্দরা নিজেদের পাইলেংসা নামে চিহ্নিত করেন বলে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জানা যায়। মগ নামটি বিজাতীয় এবং আরোপিত। এই নামকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হলো যে ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মগধ থেকে চন্দ্র সূর্য (চন্দ্রা -সূরিয় মণ্ড) নামে এক সামন্ত সৈন্য নিয়ে আরাকান অধিকার করেন। মগধ থেকে আগত মানুষেরা বৈশালীর স্মৃতিকে রক্ষা করার তাগিদে রাজধানীর নামকরণ করেন ওয়াথালি (বেশালি)। মগধের সৈন্যবাহিনী ও সামন্তপ্রভুরা সঙ্গে করে সে সময়কার ভারতীয় সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনা এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আরাকানে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সেইসব মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে যারা উন্নত জীবন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের সবাইকে স্থানীয় বাসিন্দারা মগ নামে চিহ্নিত করে। মগধের সামন্তপ্রভুর আরাকান অভিযানের সময় ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে প্রায় সে সময় বজত্র নামের মগ ব্রাহ্মণের বঙ্গে উপস্থিতির মাধ্যমে মগদের সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আবার একথাও সুবিদিত যে বঙ্গের

সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিন ধরেই ছিল। তাহলে, মগধ থেকে যারা আরাকান এসেছিলেন তারাই কি মগ ছিলেন? বঙ্গে মগ সম্প্রদায়ের সে সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে মাত্র। কারণ, পরবর্তীকালের আরাকান, বর্মার ইতিহাস ও বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি থেকে ইংরেজ পন্ডিতরা এটা দেখিয়েছেন যে মগরা যে ভাষার কথা বলেন তা বার্মিজ উদ্ভুত। ওদের চেহারা, খাদ্যাভাস, চাষাবাদ সবই এই অঞ্চলের অন্য জাতিগোষ্ঠীর প্রায় সমগোত্রীয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আরাকানে তিন লক্ষ একুশ হাজার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মগ জাতির মানুষ। আরাকানী বর্মীয়রা মিলেই সেখানকার জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের মায়নমা বলে পরিচয় দেয়। যা থেকে প্রদেশের নাম হয়েছেথ মাযানমার। তবে এ অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। আবার এই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিদদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে বাঙলাদেশে আর্যভাষা প্রসারের পূর্বে কোল আর দ্রাবিড় ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভোট চীনা এই এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্ব ছিল। সে কারণে ইরাণীয় মগ ও আরাকানীয় মগ একই গোষ্ঠীভুক্ত একথা এখনই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। (তবে, বিশাল সূর্যদেব, সূর্যোপাসনা, সূর্য মন্দির সমূহের পাশে মগ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের উপস্থিতি পিলাককে জানার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরো আগ্রহী করে তোলে।)

তবে, বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসী মগদের উপস্থিতিতে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ সমূহেব পাশে সূর্যদেবকে ঘিরে সৃষ্ট সূর্যোপাসকদের নিবিড় উপাসনা কেন্দ্র পিলাক —ধর্ম সমন্বয়ের এক আদিপীঠরূপে গভীর মনোনিবেশ দাবী করে। এই দৃষ্টিকোণ আরও দৃঢ়ভিত্তিক হয় এই অঞ্চলে প্রাপ্ত গণেশ, নৃ-সিংহ, মহিষমর্দ্দিনী, বিষ্ণু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর সহাবস্থান দেখে।

তথ্য সহায়তা

১। Ethnology of Bengal –Dalton

২। Pre-history of India, Tribal migration –Chandra Chakraborty

৩। Indian Museum Bulletin –1990 – Article of Pf. B.N. Mukharjee

৪। প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী —কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত।

৫। বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা —সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬। চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা —আবদুল হক চৌধুরী।

৭। রাজমালা —কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ

শ্যামলাল দেববর্মা

'ককবরক' তিব্বত - বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা। ত্রিপুরার আটটি জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা এ ভাষায় কথা বলেন । এঁরা হলেন দেববর্মা বা ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, মুড়াসিং, রূপিনী এবং উচই । ত্রিপুরা, আসাম এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ মিলিয়ে এ ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ । ত্রিপুরার ভাষা হিসাবে ভাষাটির নাম ত্রিপুরী, ত্রিপুর বা তিপ্রা । কিন্তু ভাষাটি 'ককবরক' হিসেবেই অধিক পরিচিত । যদিও ভাষাচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, গীয়ার্সন সাহেব, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রমুখ এ ভাষাকে তিপ্রাং বাদ্রু বলে উল্লেখ করেছেন । সুনীতি কুমার তাঁর বিখ্যাত O.D.B.L (The origin and Development of the Bengali Language)গ্রন্থে বলেছেন, "To the North-East, and East, Bengali used dialects of the Bodo group : Bodo (Bara) or Kachari (also known as koch, Mech and Rabha), Garo and Diamasa as well as Mrung of Tripura." (O.D.B.L. Introduction, page No-

৩. লেউইন সাহেবও এ ভাষাকে টিপেরা বা তিপ্রা ভাষা বলেছেন । একমাত্র এ ভাষাভাষি লেখক রাধামোহন ঠাকুর দেববর্মাই (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) এ ভাষার 'ককবরক' নাম লোকমঞ্চে প্রকাশ করেন । ত্রিপুরী ভাষা কক মানে কথা বা ভাষা, আর বরক অর্থে মানুষ । সাধারণ অর্থে মানুষের কথা বা ভাষা । কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ ভাষাভাষীগণ নিজেব বোঝাতে 'বরক' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। রি বরক = নিজেদের (তৈরী) কাপড়, চা বরক = নিজেদের খাদ্য; তাক বরক = নিজেদের বুনন পদ্ধতি ইত্যাদি । সেই অর্থেই ত্রিপুরীদের নিজেদের কথা বা ভাষা বোঝাতে 'ককবরক' শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন । এই ভাষার সহোদরা ভাষাগোষ্ঠীর গারো জনজাতিরাও তাদের ভাষাকে বলে 'মান্দে কুছিক' বা 'আচিক কুছিক' অর্থাৎ মানুষের ভাষা । এ সম্পর্কে Linguistic survey of India তে গীয়ার্সন সাহেবও লিখেছেন "The Garos call their language Mande Kusik i.e. the language of the men, or 'Achik-kusik' i.e. the language of the hill men." মণিপুরীরাও তাদের ভাষাকে মৈতৈ লোন বা নিজের ভাষা বলে থাকেন ।

ককবরক ভাষার কোন বর্ণমালা না থাকলেও শতাধিক বছর আগে থেকে বাংলা বর্ণমালাতেই এ ভাষা লেখ্যরূপের প্রকাশ পায় । ত্রিপুরার রাজমালার নিরিখে একশ চুরাশি জন রাজার রাজ্যশাসনেব সময়ে একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও ককবরক-এর উন্নয়ন সাধনে কোন রাজার এগিয়ে আসার সমর্থন পাওয়া যায় নি । যদিও এ ভাষাভাষী রাজারাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ভারত ভাস্কর' সম্মানে ভূষিত করে শিল্প-সাহিত্যে নিজেদের উন্নত মানসিকতার পরিচয় দেন । স্বাধীনোত্তর কালে ত্রিপুরা ভারত-ভুক্তির পরও প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে যথাযথ মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ ভাষার অবস্থান ছিল শত যোজন দূরে । কেবলমাত্র লোক সাহিত্যের প্রাণশক্তির জোরে অরণ্যকন্দরে টিকে থাকা এ ভাষা 'অন্যতম রাজ্যভাষা'র মর্যাদা পায় ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হবার প্রথম দিকে ।

ককবরক-এর লিখিত রূপের শতবর্ষ

আর্যদের মত সুপ্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর জীবনেও প্রাথমিকভাবে ভাষা ছিল মৌখিক স্তরে । শুধু স্মৃতি আর শ্রুতিবাহিত হয়েই চতুর্বেদ অস্তিত্ব রক্ষা করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী । মৌখিক ককবরক ভাষাও সেভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে লিখিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ দৌলত আহমেদ ও মহম্মদ উমরের লেখা 'ককবরমা' সেই ককবরকের প্রথম লিখিত রূপ বলা যায় । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা তারই পূর্ণ রূপ দেন তিনটি বই লিখে-একটি ব্যাকরণ, একটি অভিধান এবং একটি কথোপকথন শিক্ষার বই । তারই ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার ২০০০ সালে লিখিতরূপে ককবরকের শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ককবরক ঐতিহ্যের গৌরব প্রচারের যথাযথ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে।

অনুষ্ঠানে ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চব্বিশ জন লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে স্মারক এবং তেরো জনকে মরণোত্তর স্মারক উপহার প্রদান করা হয় । সেই উদ্দীপনাময় উৎসবের সাক্ষী হতে প্রতিবেশী রাজ্য আসাম থেকে সহোদরা ভাষাগোষ্ঠীর বড়ো ও ডিসামা ভাষাভাষী এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি স্থানীয় কবি-লেখক, শিল্পী সহ বুদ্ধিজীবীগণ অংশগ্রহণ করেন ।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'য়াখীতাং'-এ অনেকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেন ককবরক ভাষার লিখিত রূপের বয়স আসলে একশ বছর নয়, প্রায় তিনশ বছর । একথা ঠিক, ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদ নারায়ণ ত্রিপুরার মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্তুতি গেয়ে একটি বই লিখেছিলেন, যা জনসমক্ষে কোনদিন প্রকাশ পায়নি । ১৮৭৬-৭৭ সালেও যুবরাজ রাধাকিশোরের ককবরক অভিধান লেখার সমর্থন পাওয়া যায় । তদানীন্তন ত্রিপুরার ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট মি: টি. ই. কক্সহেডের Administraitive Report (No 134. dt 26th June 1876) এ উল্লেখ আছে - The Yubaraj has. moreover. at my suggestion, set about the Compilaion of a Tipperach vocabulary He is perfectly acquinted with the vernacular of the hill people. and I am in hopes that the result of his undertaking will have some scientific itself. মি. সি. ডব্লিউ বলচানের রিপোর্টও

সে কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় - The Yubaraj is still engaged in the compilation of a Tipperh-Bengali dictionary and lately he has become a member of the ASIATIC SOCIETY OF BENGAL - Administrative Report No. 196. dt 17th July. 1877. কিন্তু সাহেবদের রিপোর্ট ব্যতিরেকে যুবরাজের কোন কাজের অস্তিত্ব অদ্যাবধি কারোর দৃষ্টিতে আসেনি। রাজমালা ২য় লহরেও উল্লেখ আছে -

পূর্ব বাজমালা ছিল ত্রিপুব ভাষাতে ।
পযাব গাঁথিল সব সকলে বুঝিতে ।।
- ধন্যমাণিক্য খণ্ড ।

কিন্তু বাজ্যেব জনগণেব সমক্ষে সে বাজমালাও কোনদিন প্রকাশিত হযনি । তাই নি সন্দেহে বলা চলে 'ককববমা'ই ককববক ভাষাব প্রথম লিখিত গ্রন্থ । সুতবাং ককববকেব লিখিত বূপেব ইতিহাসও তিনশ বছব নয, একশ বছব । বর্তমান আলোচনায তাই একশ বছবে ককববক সাহিত্যেব ক্রমবিকাশ বিষযে পাঠকবর্গকে আলোকপাত কবাব চেষ্টা কবব ।

একশ বছরের প্রথম ভাগ

এই একশ বছবকে দু'ভাগে ভাগ কবে যদি আলোচনা কবা যায, তাহলে পাঠকেবা খুব সহজে ককববক ভাষা-সাহিত্যে উত্তবণেব বিষযে ধাবণা নিতে সক্ষম হবেন । ভাগটা হবে প্রথম পঞ্চাশ এবং দ্বিতীয পঞ্চাশ বছব । ঠাকুব বাধামোহন দেববর্মাব পব খুশিকৃষ্ণ ত্রিপুবা হলেন দ্বিতীয ব্যক্তি, যাঁব ককববক গ্রন্থ জনসমক্ষে প্রকাশিত হয । বিযাং বিদ্রোহেব অবিসংবাদিত নেতা বতনমণি ত্রিপুবাব অন্যতম প্রধান শিষ্য খুশিকৃষ্ণ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'খা কাচাং খুমবাব' নামে তেত্রিশটি আধাত্মিক গানেব সংকলন প্রকাশ কবেন । তাঁব সমসাময়িক কাল থেকেই অলিন্দ্রলাল ত্রিপুবা ককববক হবফ উদ্ভাবন বিষযে বিভিন্ন পবীক্ষা নিবীক্ষা সহ সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ কবলেও গ্রন্থ প্রকাশে এগিযে আসাব মত সামর্থ্য অর্জন কবতে পাবে নি ।

উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম চাব দশকে একদিকে সাবা ভাবত জুড়ে স্বাধীনতা লাভেব উদ্দাম লড়াই, অন্যদিকে পার্বত্য ত্রিপুবায জনজাতিদেব অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনেও চলতে থাকে আস্ত লড়াই । তা হল আদিম প্রথায লালিত জুম চাষ বনাম সমতল চাষ । পাশাপাশি দু-একজনেব শিক্ষাব প্রতি মনো নিবেশও । ১৯৪২ -এ সাবা ভাবত জুড়ে যখন 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনেব ঢেউ, তখন ত্রিপুবায শুরু হযেছে বতনমণিব নেতৃত্বে বিযাং বিদ্রোহ । বিযাং জনগোষ্ঠীব প্রতি বাজাব বৈষম্যমূলক আচবণেব পাশাপাশি বাজাব আনুকূল্যে গজিযে ওঠা 'চৌধুবী উপাধিধাবী নেতৃত্বেব প্রতি অনাস্থাই সেদিন বিযাংদেব উদ্বুদ্ধ কবে বিদ্রোহেব । কিন্তু বাজাব কঠোব হাত বাড়তে দেযনি সে বিদ্রোহ । বিদ্রোহী নেতা বতনমণিকে পাশবিকভাবে হত্যা কবে ছত্রভঙ্গ কবা হয বিদ্রোহীদেব । এব পবেই ১৯৪৫ -এ গড়ে ওঠে জনশিক্ষা সমিতি, যাব নেতৃত্বে ছিলেন সুধন্বা দেববর্মা, দশবথ দেব প্রমুখবা । অশিক্ষিত, কুসংস্কাবাছন্ন জনজাতিদেব মধ্যে শিক্ষা সচেতনা সৃষ্টিব লক্ষ্যে গঠিত সে সমিতি বিবাট জনজোযাব সৃষ্টি কবে সেদিন । নিজেদেব উদ্যোগে বাজ্যেব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে গড়ে তোলেন ৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয, পববর্তী সময যা সবকাবী অনুমোদনও পেযে যায ।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এ ভাবতেব স্বাধীনতা লাভ, ত্রিপুবাব শেষ বাজা বীববিক্রম কিশোব মাণিক্য বাহাদুবেব মৃত্যু, ভাবতেব অঙ্গীভূত বাজ্য হিসেবে ত্রিপুবাব যোগদান, দেওযানী শাসনেব প্রবর্তন ইত্যাদি স্মবণীয ঘটনা-উপঘটনাব কাবণে ককববক সাহিত্য চর্চাব দিকটা উপেক্ষিত থেকে যায এবং প্রায ফলশূণ্য আকাবেই কাটে লিখিত ককববকেব শতবর্ষেব প্রথম ভাগ ।

একশ বছরের দ্বিতীয় ভাগ

জনশিক্ষা আন্দোলনেব সময়ে লিখিত সাহিত্যেব সে বকম প্রকাশ না ঘটলেও সংস্কৃতিব জগতে এক নব আলোড়নেব সৃষ্টি হয । মহেন্দ্র দেববর্মা, নকুল দেববর্মা, অশ্বিনী দেববর্মা, বঞ্জন বায প্রমুখ সংস্কৃতি কর্মীগণ বিভিন্ন সংগীত বচনাসহ থিযেটাব, ছাযা নাটকাদিব মাধ্যমে সংস্কৃতিব অঙ্গন পুষ্ট কবে বাখেন । সে সময়ে গীত,

'হানি মায়া চুং নারুকনাই, লেখাপড়া চুং সুরুংনাই - যার বাংলা অর্থ, দেশকে মোরা ভালবাসব, লেখা পড়া শিখব - গানখানি দেশাত্মবোধের সাথে শিক্ষা সচেতনতা বাড়ানোর অন্যতম উৎকৃষ্ট সৃষ্টি । সহজ-সরল ভাষায় রচিত এ ধরণের অসংখ্য সঙ্গীত ত্রিপুরার আকাশ বাতাস-মুখরিত করে রাখত সেদিন । লেখাপড়া শেখার যে সুপ্ত আকাঙ্খা একদিন পোষণ করত ত্রিপুরার জনজাতিরা, জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই অর্গল-মুক্তি পাহাড়ি জনজীবনে যেন বয়ে আনে সহস্র স্রোতস্বিনীর ধারা । নতুন এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে পাহাড় জুড়ে । পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড । কিন্তু সে উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে খুব সহসাই । ভারত বিভাগের অভিশপ্ত ফলের বিষাক্ত রসের ভাগ যেন ত্রিপুরাতেই পড়ে অতিমাত্রায় । ১৯৪৮ - এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর ঢল নামতে থাকে ত্রিপুরায় এবং অচিরেই তা ছাড়িয়ে যায় মূল জনসংখ্যাকে । ত্রিপুরাকে তিন দিক ঘিরে অধুনা বাংলাদেশ বেষ্টিত বলেই স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাকেই এ ভার সইতে হয় বাধ্য হয়ে । ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় ভূমির ভারসাম্যে সংকট এবং ক্রমে তা আঘাত হানে রাজ্যের অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় চল্লিশ দশকের শেষের ভাগে ত্রিপুরার আকাশ বাতাস কতটুকু উত্তাল ছিল । রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যে দেওয়ানী শাসন প্রবর্তন হলে জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর জারি হয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । নেতৃবৃন্দ খোঁজার নামে পাড়ায় পাড়ায় চলতে থাকে মিলিটারী অত্যাচার । গ্রামবাসীদের বেধড়ক মারধর, অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা থেকে শুরু করে শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া চলতে থাকে । তখন জনজাতি পল্লীগুলোকে সে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গঠিত হয় গণমুক্তি পরিষদ । শুরু হয় প্রতিরোধ আন্দোলন । সে আন্দোলন রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পান নি । সুদূর বিহারের হাজারিবাগ কারাগারে ঠাঁই দেওয়া হয় তাঁদের। জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুধন্ব দেববর্মার কাছে সেই কারাজীবনই হয়ে ওঠে সৃষ্টির উৎকৃষ্ট স্থান । সেখানেই সৃষ্টি হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাচুক খুরুও' (পাহাড়ের কোলে।

এল ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন । সে নির্বাচনে ত্রিপুরার দুজন - দশরথ দেব ও বীরেন দত্ত বিপুল জনসমর্থন পেয়ে নির্বাচিত হন । লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার পর দশরথ দেবের প্রত্যক্ষ তদারকীতে তুলে নেওয়া হয় নেতৃবৃন্দের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । কারামুক্তির অব্যবহিত পর সুধন্বা দেববর্মা প্রথম প্রকাশ করেন ককবরক সাহিত্য জগতে সূচিত হয় নতুন প্রাণের ধারা । এগিয়ে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন লেখক । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর, সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মা, জিতেন্দ্র দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখরা এগিয়ে আসেন ককবরক ভাষার প্রাণ সঞ্চারে । অজিত বন্ধু দেববর্মা, শান্তিময় চক্রবর্তী, ক্ষীরোদাপ্রভা দেবী, যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, সোনাচরণ দেববর্মা, কুমুদরঞ্জন দেববর্মা প্রমুখরা তাতে যুক্ত হয়ে পরিপুষ্ট করেন লিখিত ককবরকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম দশক ।

পরবর্তী দশকের প্রথম দিকে ভাটার টান পড়ে ককবরক সাহিত্যাকাশে। শেষের দিকে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন । আত্মপ্রকাশ শুরু হয় নবীন লেখকদের ' আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র এগিয়ে আসে নিয়মিত ককবরক সাহিত্য প্রচারে । হরিদাস দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা, মণীন্দ্র দেববর্মা, শুক্রারাণী দেববর্মা, সুকুমার দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, মণিগোঁসাই জমাতিয়া নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন আকাশবাণীর ককবরক সাহিত্য বিভাগে । ইতিমধ্যে লামা, সাচলাং, আইতরমা, হানি কক, হজলাই, খুমবার ইত্যাদি সাহিত্য সাময়িকীরও প্রকাশ ঘটে । যদিও গণমুক্তি পরিষদ প্রকাশিত 'লামা' সাময়িকী ছাড়া কোনটারই জীবনীশক্তি বেশিদূর এগোয়নি ।

সত্তরের দশকের প্রথমভাগে ককবরক সাহিত্য সভা এবং ককবরক উন্নয়ন পরিষদ নামে দুটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে । ককবরক উন্নয়ন পরিষদের সাড়া আহবানে দিয়ে কলকাতার ভাষা বিজ্ঞানী ড: সুহাস

চট্টোপাধ্যায় ককবরককে লিখিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস নেন। তাঁর যোগ্য শিষ্য কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর সহায়তার তিনি প্রকাশ করেন 'ত্রিপুরায় ককবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ'। ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের নিরীখে ককবরক বানান পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নির্ণয় করেন তিনি।

১৯৭৮ সালে রাজ্যে গঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক ককবরক পত্রিকা - ত্রিপুরা কথমা (সম্পাদক প্রবন্ধকার)। তাতে মাসে দুদিন বরাদ্দ সাহিত্য পাতার। প্রবীন নবীন অনেক কবি সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন ত্রিপুরা কথমার সাহিত্য-পাতা পুষ্ট করার কাজে। শিক্ষাদপ্তর গঠন করে ককবরক এডভাইসারি বোর্ড এবং ককবরক পাঠ্যবই লেখক কমিটি। প্রথম শুরু হয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ককবরক মাধ্যমের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ।

আশির দশকের প্রথম ভাগ থেকে সংগঠিত হয় আগরতলা বইমেলা। বাংলা ভাষার কবি-লেখকের পাশাপাশি ককবরক কবি লেখকরাও এগিয়ে আসেন বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে। ১৯৮৩ সালে নরেশচন্দ্র দেববর্মা ও শ্যামলাল দেববর্মা যৌথ সম্পাদনায় ছত্রিশ জন কবির একানব্বইটি কবিতার বই 'ককবরক কথমা বীচাপ' প্রকাশ অন্য মাত্রা সংযোজন করে ককবরক সাহিত্য পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে সাহিত্যপত্র ও সম্পাদকের নাম নিচে দেওয়া হল ঃ

জবা (সময়)	সম্পাদক	সুনীল দেববর্মা
হাচুকনি খবাঙ	,,	চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং
আইদরপ (প্রভাত)	,,	কমলিয়া দেববর্মা
চেথুয়াং (ছাতিম গাছ)	,,	বিকাশ রায় দেববর্মা
হুকুম (সংস্কৃতি)	,,	দর্শিরাম দেববর্মা
ইয়াখীরায় (সেতু)	,,	নিতাই আচার্য
চাতি (প্রদীপ)	,,	চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং
খাকামুঙ (ভাবনা)	,,	বুধরায় দেববর্মা
সিচাখা (জাগরণ)	,,	রাধাচরণ দেববর্মা

এ সময়ে 'ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ও 'ককবরক হুকুমু মিশন' নামে দুটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ককবরকের বিভিন্ন বই প্রকাশে সংগঠনদ্বয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের পাশাপশি আরো কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থাও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করে ককবরক - সাহিত্য ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটায়।

ককবরক সাহিত্য সভা

সত্তরের দশকে গঠিত হলেও এই সংস্থা ককবরক গ্রন্থ প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরার ভাষা সংক্রান্ত কিছু বই, বিনয় দেববর্মা ও নন্দকুমার দেববর্মার কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশ ছাড়া নাটক এবং বিভিন্ন সেমিনার সংগঠিত করে চলেছে এই সংস্থা।

ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ

আশির দশকে গঠিত এই সংস্থা পরবর্তী সময়ে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাদ দিয়ে ককবরক সাহিত্য সংসদ নামে অদ্যাবধি ককবরকের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে। সংস্থাটি গল্প সংকলন তেরটি, কবিতা গ্রন্থ ষোলটি, উপন্যাস তিনটি, অভিধান, গান, ভাষাশিক্ষা সহ অন্যান্য বিষয়ে পনেরটি -সর্বমোট সাতচল্লিশটি গ্রন্থ প্রকাশ করে ককবরক ভাষাসাহিত্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সাহিত্য একাডেমির ভাষা পুরস্কারে সম্মানিত চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং, সঙ্গীতকলা একাডেমির পুরস্কার প্রাপ্ত হেমন্ত জমাতিয়া, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত সুধন্বা দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা, সুধন্য ত্রিপুরা, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন পুরস্কার প্রাপ্ত হরিপদ দেববর্মা, সুনীল দেববর্মা, স্নেহময় রায়চৌধুরীর, কুঞ্জবিহারী দেববর্মাদের গ্রন্থ প্রকাশ এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ককবরক সাহিত্য চর্চার বজায় রাখার জন্য সাহিত্য সাময়িকী 'চাতি' (প্রদীপ) প্রকাশনাও এই সংস্থার উল্লেখনীয় পদক্ষেপ।

ককবরক তাই হুকুম মিশন

জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থা অদ্যাবধি উনত্রিশটি ককবরক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। গল্প-কবিতা সিনেমা-নাটকের নয়টি গ্রন্থ ছাড়া বাকি সমস্ত গ্রন্থ অন্যান্য বিষয়ের। এসবের মধ্যে অভিধান, ককবরককে গণনা পদ্ধতি, প্রবাদ প্রবচন, রাজমালা, রূপকথা ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

হাচুকনি খরাং (পাহাড়ের স্বর) প্রকাশনী

মৌলিক রচনা ছাড়াও প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদের কাজে ককবরক কবি - সাহিত্যিকেরা মনযোগ দিচ্ছেন। ইদানীং হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদের প্রতিও তাঁদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অদ্যাবধি প্রকাশিত কিছু অনুবাদিত গ্রন্থ অনুবাদকের নাম সহ উল্লেখ করা হল ঃ

তাখুসমা বদল (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা') - নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, নকারিনি কথমা (প্রতিবেশী গল্প) শ্যামলাল দেববর্মা, ব্রজলাল অধিকারীর গান -চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং ও নিতাই আচার্য, -বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' -নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, রবি ঠাকুরের দশটি গল্প -মনোরঞ্জন মজুমদার, অনিল সরকারের 'ব্রাত্যজনের কবিতা' - নন্দকুমার দেববর্মা, সাঁমাই কাঁতাল (নিউ টেস্টামেন্ট) - ত্রিপুরা ব্যাপটিস্ট মিশন, রবি ঠাকুরের নির্বাচিত কিছু গান- ত্রিপুরা সরকার, ককবরকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা - নন্দকুমার দেববর্মা, অ ভারত তা পকদি (হে ভারত ভুলিও না) -রামকৃষ্ণ মিশন, ডাঃ হেডগেওয়ার - ডঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, স্বামী বিবেকানন্দ - নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, ককবরক বাই রামায়ণ (ককবরক রামায়ণ) - প্রভাস চন্দ্র ধর।

উপরিউক্ত প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ বাদেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনা সহ তামিল - তেলেগু ভাষার বিভিন্ন গল্পকারের গল্প এবং রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের অসংখ্য কবিতা ও গান অনুবাদিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা সে সমস্ত বিষয়গুলো প্রকাশনার প্রচেষ্টায় আছেন।

সবশেষে, একথা বলে আলোচনা শেষ করতে চাই, পঞ্চাশের দশকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা বেয়ে ককবরক সাহিত্য আজ আরো যেন জীবনমুখী। জীবন-জীবিকা অনুসন্ধান

থেকে শুরু করে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা, জাতীয় সংহতি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা সম্ভার নিয়ে ককবরক সাহিত্য আজ বিকাশোন্মুখ। ককবরক প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি অ-ককবরকভাষী পরিচালিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধাররাও উদারতর সাথে তাই এগিয়ে আসছেন ককবরক সাহিত্য বিকাশের গতি সঞ্চারের মহৎ কাজে। আর সবার পরশে তাই ভরে উঠবে মঙ্গলঘট।

লোকসংস্কৃতি ভাবনা ঃ প্রেক্ষিত ত্রিপুরা

নির্মল দাশ

।। ১ ।।

অরণ্যকুন্তলা ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের তিনদিকে বাংলাদেশ, একটি মাত্র দিক দিয়ে রাজ্যটি ভারতভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। এক সময় রাজ্যটি রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল, আর এই রাজ্যের সীমানা কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে আবার কখনো কমেছে। পাশাপাশি বঙ্গভূমির ত্রিপুরা রাজ্য সন্নিহিত বৃহৎ অঞ্চলে বঙ্গের রাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাই এখানে রাজতান্ত্রিক সংঘর্ষও নিতান্ত কম হয়নি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা সমতলভূমির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে আসতে চাইতো না। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে এখানে আসার খুব একটা দরকার আছে বলে ও মনে করতো না তারা। বাঙ্গালীদের বৃহত্তর জনমন্ডলী তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই নিজস্ব বৃত্তে আবদ্ধ থেকে জীবনরক্ষার জন্য যেমন শ্রমদান করেছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলও। সে সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব ভাবনা, সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফসল। বিজ্ঞজনেরা এই সংস্কৃতির ধারাকে বলেছেন লোকসংস্কৃতি। শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্যই নয়, পৃথিবীর তাবৎ জাতি-উপজাতি মানুষেরা যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতি চর্চাকে সচল ও জীবন্ত রেখেছে।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জন থমস্ এই সংস্কৃতির ধারাকে FLOKLORE অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'লোকসংস্কৃতি'। তবে একসময় একেরা 'Popular Antiquites' 'জনপ্রিয় পুরাতত্ত্ব'[১] ও বলা হত। কিন্তু লোকসংস্কৃতিবিদ্গন বিষয়টিকে জনপ্রিয় পুরাতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি শিক্ষাগত শৃংখলায় রূপদানের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী রয়েছেন। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সাফল্যও অর্জন করেছে। তাছাড়া এর জগৎও যে বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক তা পন্ডিতজনেরা বলেছেন।

সুতরাং, কোন স্থানের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রসঙ্গজাত হওয়া প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতির 'প্রকৃতি' (Characteristics)[২] প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদেরা ছয়টি প্রকৃতির কথা বলেছেন। যথা ঃ

১. ঐতিহ্যশ্রয়ী (Traditional),
২. মৌখিক (Oral/Verbal),
৩. পাঠভেদ (Variation),

৪. চক্রমনশীলতা বা পর্যটনবৃত্তি (Transmission),
৫. নৈর্ব্যক্তিকতা বা সমষ্টিমনন (Impersonality),
৬. সূত্রকৃত (Formularised).

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যগত সৃষ্টির ফসল। লোকসমাজ একে নির্দ্বিধায় গ্রহন করে ও পালন করে। যদিও এর মৌখিক রূপটি আপেক্ষিক, তবে একে লিখিতভাবে ধরে রাখার একটা জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু পূর্বসূত্র ধরে বলা যায়, লোকসংস্কৃতি মৌখিক। মুখে মুখে এই সংস্কৃতির পাঠান্তর ঘটে। আবার পাঠান্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষন করে মোটিফ (Motif) গুলির তথা মূল পাঠের সন্ধান মেলে। লোকসংস্কৃতির উপাদানের চক্রমনশীলতা বা পর্যটনবৃত্তি এর সজীবতা বৃদ্ধি করে। এই পর্যটনবৃত্তির মাধ্যম হল ব্যবসায়ী বা বনিক, পর্যটক, সৈন্য, গবেষক প্রমুখ। লোকসংস্কৃতির উপাদান ব্যক্তির সৃজন হলেও সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল। তাছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব এখানে আবিষ্কার করা কঠিন। পক্ষান্তরে, লালন ফকির, হাসন রাজা, পাগলা কানাই প্রমুখের সৃষ্টিও লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁদের সৃষ্টি কর্ম সমষ্টিমননের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত এবং গোটা সমাজ মানসেরই সম্পদ। লোকসংস্কৃতি সূত্রকৃত, কেননা এখানে নির্দিষ্ট ছক বা সূত্র অনুসরন করা হয়।

বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সত্য তত্ত্বাকারে স্বীকার করে নিয়েছেন দেশী ও বিদেশী বহু লোকসংস্কৃতিবিদ্। তাঁদের মতে বাংলার বহু লোকউপকরণ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু উপরোক্ত প্রকৃতি অনুসারে সেগুলির রূপবদল ঘটেছে। থিওডোর বেন্‌ফে স্পষ্টতই বলেছেন যে, দশম শতাব্দীর আগেই ভারতের বহু গল্প লোক মুখে মুখে ইউরোপে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীর পর সেগুলি আরো বিস্তৃতি পায় বাইজানটাইন, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে। বৌদ্ধদের মাধ্যমে সে সব ছড়িয়ে পড়েছিল চীন দেশ ও তিব্বত এবং সে সব স্থান থেকে আরো বহুদূরে।[৫]

বাংলার লোকসংস্কৃতিকে চতুর্দশ পর্বে বিভাজনের[৬] কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে ঃ

- ছড়া
- গীতি বা গান বা সঙ্গীত
- ধাঁধা
- প্রবাদ প্রবচন লোকনিরুক্তি
- কথাঃ রূপকথা, উপকথা, পুরানকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা
- গীতিকা/গাথা
- লোকনৃত্য
- লোকউৎসব ঃ অনুষ্ঠান, মেলা
- আচার-মন্ত্র-তন্ত্র
- লৌকিক দেবদেবী
- লোকনাট্য
- লোকশিল্পী
- লোকভাষা
- লোকাচার
- লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার
- লোকদর্শন
- লোকক্রীড়া
- লোকঔষধ/চিকিৎসা
- কিংবদন্তী
- লোকবাদ্য
- লোক অলঙ্কার-সজ্জা
- লোকচিত্র
- লোকযানবাহন
- লোকঐতিহ্য

বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো নিয়ে বিভাজনের কাজটি আরো অনেকেই করেছেন। তবু এই বিভাজনটি ধরে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে অগ্রসর হতে পারলে সে কাজটি সহজতর হতে পারে।

লোককাহিনী নিয়েও আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সময়ের হিসেব ধরে এগুলোকে তিনটি ভাগে বিভাজন করা যায়। যথাঃ লোকপুরান বা Myth, লোককথা বা Tale এবং কিংবদন্তী বা Legend. 'এই

তিনটি বিভাজনকে সামনে রেখে কাহিনীগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিন্যাস্ত করতে পারলে এ ব্যাপারে সমস্যা অনেক লাঘব হয়ে যায়।

লোকসংস্কৃতি গবেষক-পন্ডিতেরা সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে লোকউপাদান বিশ্লেষণের কয়েকটি পদ্ধতি[৬] উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলো জ্ঞাত হবার আবশ্যকতা রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

ক. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Process)
খ. টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি (Type & Motif Index Process)
গ. মনঃ সমীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি (Psychoanalytical Process)
ঘ. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Morphological Process)
ঙ. ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি (Dialectical Materialism Analysis)

অধুনা, এইসব লোকউপাদান বিশ্লেষণগত পদ্ধতির সঙ্গে গুরুত্বসহ যুক্ত হয়েছে সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞান পদ্ধতি (Socio-Linguistics)।

সর্বোপরি, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা-শৃংখলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার জড়িত থাকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'Anthropology Today' সংকলিত গ্রন্থে (সম্পাদনা ঃ A. L. Krober) আমেরিকান লোকসংস্কৃতিবিদ্ স্টিথ থমসন্ (Stith Thomson) তাঁর Advance in American Folklore নামে একটি প্রবন্ধে বলেন, " Folklore and Anthropology have always had so intimate and well recognized a relationship that it is not possible to draw exact boundries between them." আবার সমাজ ও মানুষ নিয়েই সমাজবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তথ্য বিশ্লেষিত হয় এবং গবেষণায় সবচেয়ে বেশী তথা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজে লাগায়।[৭]

পৃথিবীর তাবৎ লোকসমাজ টোটেম বা কূলদেবতাকে[৮] মান্য করে এসেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন মানবেতর প্রাণীকে নিজেদের গোষ্ঠীদেবতা হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। এই মানবেতর প্রাণীর মৃত্যুর পরও সেটির আত্মা মরে যায় না। সেই আত্মার দ্বারা ইষ্ট বা অনিষ্ট হতে পারে। সুতরাং সমীহ বা সম্মান লাভ করে কূলদেবতা। বাঙ্গালী জনজীবনে টোটেম মান্য করার প্রবনতা এখনো রয়েছে। টোটেম ধরে এগোলে লুপ্ত পরিচিতির সন্ধানও মিলতে পারে।

।। ২ ।।

একসময় যারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পূর্ববঙ্গের গ্রামে তথা নগরে বাস করত এবং যাবতীয় তরঙ্গাভিঘাতমুক্ত যে জীবনধারা, একদিন সেখানেও স্বাধীনতা আন্দোলনের যাবতীয় ফলাফল পৌঁছাতে শুরু করল। স্বাধীনতা এল, কিন্তু বাঙ্গালী জাতর জন্য তা কোন সুখসংবাদ বহন করে আনলো না। দ্বিখন্ডিত হল মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি। বাস্তুহারা হল অসংখ্য মানুষ। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই বঙ্গভূমিতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। বহু হিন্দু ধর্মবলম্বী মানুষ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিল। পক্ষান্তরে বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ পূর্ববঙ্গকেই তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহন করলো। একটি জাতির প্রতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফল স্বরূপ ঐতিহাসিক বঞ্চনাকে মাথায় নিয়ে ত্রিপুরায় এসে ভীড় করলো লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী মানুষ। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য তারা ব্যাকুল হল। এখানকার অনাবাদী মাটিকে তারা আবাদী করার প্রযত্ন গ্রহণ করলো। "এভাবেই একটা স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করেছিল। ত্রিপুরার মাটিকেই

মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করে. আজন্ম লালিত লোকসংস্কৃতি চর্চাকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী হলো তারা।"[১০]

যখন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা সমাধান হতে শুরু হল, তখনই আবার ফেলে আসা জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্কৃতি চর্চার জন্য তারা ব্যাকুল হল। পাহাড়সঙ্কুল রাজ্যের আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণসহ অপরাপর বিবিধ কারনে পূর্ববর্তী লোকসংস্কৃতি বলয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার পর্বতসঙ্কুল রূপ মেলে না। আবার একইসঙ্গে বহুকাল ধরে যে সব মানুষদের সঙ্গে আত্মার নিবিড় বন্ধনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, স্বাধীনতার বিষময় ফলশ্রুতিতে এক বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির সৃজন ঘটল। তাই শুরু হল গ্রহণ বর্জনের পালা। নতুন করে লোকবৃত্ত সৃজন ঘটাতে শুরু হল গভীরে গভীরে।

সঙ্গত কারণেই এই লোকসংস্কৃতি বলয় সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত একটা খসড়া নির্মানে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। যথা ঃ

১. ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) আন্তর্জাতিক সীমানা বাংলাভাষাভাষী মানুষদের নতুন করে একটি লোকসংস্কৃতি বলয়ের বাসিন্দা হতে স্বভাবতঃই বাধ্য করেছে।

২. রাজ্যের সর্বত্র যাতায়তের সুবিধা তথা প্রচার মাধ্যমের সুবিধার ফলে লোকসংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন-বলয় অনেক আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে বিবিধ রীতি-নীতি, সংস্কার, ট্যাবু ইত্যাদির মধ্যে একটা সমঝোতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। সেরূপ সাদৃশ্য নির্মতির কাজ এখনও চলছে।

৩. আবার কুলদেবতা ভিন্ন হবার ফলে অতীতে আচরনীয় রীতি-নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নিজস্বতা রক্ষার প্রবণতাও দৃষ্ট হয়।

৪. অর্থনৈতিক অগ্রসতার ফলে এ রাজ্যের অনেকেই লোকসংস্কৃতি ভাবনাকে অতীতের অনুন্নত সাংস্কৃতিক ভাবনা মনে করে থাকেন।

৫. এই রাজ্যে জীবনযাত্রা অত্যান্ত গতিশীল মানুষ তাই অতিদ্রুত অবস্থান পরিবর্তনে অভ্যস্ত হবার শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে।

৬. গতিশীলতার জন্য সময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে লোকসংস্কৃতি বলয় অতিক্রম করে মানুষ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে চাইছে।

৭. বর্তমান প্রজন্ম লোকসংস্কৃতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, এ বিষয়ে তাদের উদাসীনতা রয়েছে।

এখানে তাই সঙ্গত কারণে যে প্রশ্ন উথ্যাপিত হয়, তা হলো, লোকসংস্কৃতির প্রবাহ কি এ রাজ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

"লোকসংস্কৃতি যে বিলুপ্ত হয়না তা কিন্তু নয়। তাসমানিয়া দেশটি ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ ছিল। কিন্তু সীমাহীন অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার কারণে তাসমানিয়ার শেষ আদিবাসী পুরুষটি মারা গিয়েছিল ১৮৬৫ সালেও নারীটি ১৮৭৭ সালে। সেখানকার লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটি এখানেই গতিরুদ্ধ হয়, তথা বিলুপ্তি ঘটে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার ছামোরের আদিবাসীদের সংখ্যা ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ছিল একলক্ষ। ৪২ বছর পর ১৭১০ সালে আদিবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাড়ে তিন হাজার। নির্বিচারে হত্যার কারণে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। লোকসংস্কৃতির বলয় থেকে ছিটকে বেড়িয়ে গেল মানুষেরা। শুধু বেঁচে থাকাই হল সবচেয়ে বড় কথা। সেখানকার লোকসংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল চিরতরে। পলিনেশিয়ার পূর্বদিকে ইষ্টার দ্বীপের অধিবাসীরা আমেরিকার চিলির শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়ে জাহাজ চেপে বসল। একদিন ইষ্টার দ্বীপের লোকসংস্কৃতি আর সে দ্বীপে অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হলনা।"[১১]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির ধারা বিলুপ্ত হতে হলে গুরুতর কারণ দরকার। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসংস্কৃতির

ধারা বিলুপ্ত হবার স্বপক্ষে এমন কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি কি? স্বাধীনতার পর ত্রিপুরায় একটি দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরফলে বাঙ্গালী মানসিকতা তাদের বাসস্থান সম্পর্কে আবাব নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিল। প্রায় থিতু হয়ে আসা জীবন প্রবাহে আবার ঢেউ জেগেছিল। অর্থনৈতিক চাপ ক্রমশঃ মানুষের উপর চেপে বসেছে। বিশ্বায়ন ব্যাপারটা সরাসরি আঘাত না করলেও মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব-সংকট অনুভব করতে শুরু করেছে। ফলে, সংস্কৃতি চর্চার থেকেও জীবনরক্ষার তাগিদই প্রধানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। নয়া প্রজন্মের কাছে ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন-লোককথা-লোকবিশ্বাস ইত্যাদি গুরুত্ব হারাচ্ছে।

কিন্তু সে সব কি শুধু হারিয়েই যাচ্ছে? এরমধ্যে কি কোন সৃজনশীলতা নেই? এ সম্পর্কে বলা যায়, "Folklore material is no longer looked for solely in the country or in the records of the past. The products of the folkmind working under present conditions in urban as well as rural areas and the effect of ideas upon the birth of new folk-traditions from an important part of the study today."[১১]

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কালের প্রবাহে হারিয়ে যাচ্ছে যেমন, তেমনি এর সৃজনও ঘটেছে। সুতরাং যা হারিয়ে যেতে বসেছে, একে পূর্বাস্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আবার লোকসংস্কৃতির উপাদান সৃজন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। হারিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টি হওয়া দুটোই সমান সত্য। তাই কালের গতিকে অবহেলা না করে, যাঁরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে ভাবেন তাঁদের কিছু করনীয় রয়েছে।

।।৩।।

প্রশ্ন আসছে, লোকসংস্কৃতির সৃজন ও কি ঘটেছে? এখানে গ্রাম-শহরের পার্থক্য নিয়েও একটা ভাবনা রয়েছে পন্ডিত মহলে। কেননা গতানুগতিক ধারণা হল গ্রামই হল লোকসংস্কৃতি সৃজনের প্রকৃত পরিবেশ। কিন্তু এ ধারনাটিও যথার্থ নয়। তবু এবার আরো সচেতনভাবে এ জগতে আমরা অনুপ্রবেশ করতে আগ্রহী। যা মুছে যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে যেমন ধরে রাখতে হবে, তেমনি যা গতি পরিবর্তন করে ভিন্ন একটি চেহারা প্রাপ্ত হয়েছে তাকেও তুলে ধরতে হবে। আবার লোকসংস্কৃতির নতুন কোন উপাদান সৃষ্টি হতে যাচ্ছে কিনা তাকেও চিহ্নিত করার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

সঙ্গত কারনেই ক্ষেত্রসীমাক্ষার কাজটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ। একজন ক্ষেত্রসমীক্ষক যেমন ক্ষেত্রসমীক্ষা করবেন, তেমনি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে তথ্যানুসারে বিভাজন ঘটাবেন, সংরক্ষণ ও সংকলন করবেন এবং অনুশীলন করবেন।

একজন লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক তথা গবেষক লক্ষ্য রাখবেন লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডলে বিবিধ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির নিম্নরূপ ধারাকে, যথাঃ

১. লোকসংস্কৃতি (Floklore)
২. লোকায়তকৃতি বা লোকায়ত সংস্কৃতি (Parafloklore)
৩. লোকবিকৃতি (Fakelore)

সরাসরি লোকসংস্কৃতি বা উচ্চসংস্কৃতি নয়, অথচ বিকৃতমূলক সৃষ্টি বা লোকবিকৃতিও নয়, এই প্রকার মধ্যবর্তী স্তরের বহুবিধ উপাদান বিশেষ-বিশেষ সমাজ পরিবেশে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গতিধারায় এইরূপ বিশিষ্ট লৌকিক প্রকাশকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করা যায়। বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতির যে সমস্ত অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, তার মধ্যে কবি গান, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, বাউল, মুর্শিদী প্রভৃতি তত্ত্বসঙ্গীত প্রধান।[১৪]

লৌকিক ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে রক্ষা করে লোকায়ত সংস্কৃতি পরিবর্তনকে আত্মসাৎ করে নেয়। কিন্তু লোকবিকৃতি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। "বঙ্গ-ভারতীয় বাংলাব অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বলা যায় যে, এখানে পাশ্চাত্য দেশের মতো লোককৃতি ও লোকবিকৃতির দ্বৈত মেরুতে লোকসংস্কৃতি অবস্থান করে না।" [১৩]

যিনি তথ্য সংগ্রাহক বা ক্ষেত্র সমীক্ষক তাঁদের সম্পর্কে একটি প্রাচীন ধারনা ছিল যে, ক্ষেত্র সমীক্ষক হবে অক্ষর জ্ঞানহীন অথবা মোটামোটিভাবে লিখতে-পড়তে জানেন। কিন্তু এ ধারনা সম্প্রতি ভ্রান্ত বিবেচিত হয়েছে। তাই ক্ষেত্র সমীক্ষকদের চারটি বিষয়ে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

১. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সাধারণ তত্ত্বমূলক জ্ঞান,

২. অনুসন্ধেয় বিষয়গত জ্ঞান,

৩. সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানক্ষেত্র সংক্রান্ত আঞ্চলিক জ্ঞান,

৪. প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রগবেষণা সংক্রান্ত পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান।

এসব বিষয়গুলির প্রয়োজনে "ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্মীর সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান, বিশেষ বিষয়গত উপলব্ধি, নির্দিষ্ট বস্তু বা স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান, ক্ষেত্র গবেষণা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতিগত জ্ঞান অপরিহার্য।"[১৪] যদি ক্ষেত্র সমীক্ষকের এ সব জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, তবে লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ কর্ম বাধাপ্রাপ্ত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে; সর্বোপরি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার সম্ভবনাই প্রবল।

একজন ক্ষেত্র গবেষক লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করেন, সংশয় নেই। ক্ষেত্র গবেষক তাঁর বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সংগ্রহ কার্যকে সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

অধুনা ত্রিপুবা রাজ্যে "মিশ্র সংস্কৃতি" বলে একটি কথা বেশ চালু হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন্ সংস্কৃতির দ্বারা কোন্ জনমন্ডলীর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল কতদুর প্রভাবিত হয়েছে তা তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষকের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায়, মিশ্র সংস্কৃতি পদবন্ধ নিতান্ত কথার কথাই থেকে যাবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত ভাষারূপকে আঞ্চলিক ভাষাই বলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন কথ্য ভাষার রূপটি ত্রিপুরা রাজ্যে এসে একটি পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছে। সর্বোপরি, এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন চেহারায় যে কথ্য রূপ তা অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এখানে যে 'লোকভাষা'র স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে সে বিষয়টি নিয়ে একজন ক্ষেত্র গবেষকের তথা লোকসংস্কৃতির গবেষকের কাজ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা, ঐতিহ্যবাহিত এই কথ্যভাষা রূপের মধ্যে ধরা পড়ে গোষ্ঠীজীবনের স্বরূপ। "প্রাণের স্বতঃস্ফূর্তআবেগে রচিত হয় যে সাহিত্যে গোষ্ঠীজীবনের সেই লোকজীবনের পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়ে।"[১৫]

অনেক লোকগায়ক, লোকশিল্পীরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারা শুধু জীবিকার প্রয়োজনে একদিন তাদের শিল্পচর্চাকে কাজে লাগিয়েছেন এমন নয়। এখনো তাদের কেউ কেউ রয়েছেন যারা জীবনের অন্তিমে উপনীত হয়েছেন। তাদের মুখোমুখী হবার প্রয়োজন রয়েছে। আপাত ভাবে বাউলেরা ত্রিপুরার বুক থেকে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বাউলের পোষাক না পড়েও অনেক বাউল গৃহী জীবনযাপন করছেন। বাউলগানের

আসরে তারা অবতীর্ণ হচ্ছেন। সে সব লোকশিল্পীদের চিহ্নিত করার কাজটি যেমন জরুরী, তেমনি তাঁদের সংগ্রহে রয়েছে মূল্যবান অনেক গানের সংগ্রহ যেগুলি এখনো অমুদ্রিত, সেগুলিও উদ্ধার আবশ্যক।

অনেক সাধু-সন্ত বৈষ্ণব সাধক-সাধিকাদের দেখা যায়, যাদের ঘিরে রয়েছে কিছু সাধারণ মানুষ, লোকসংস্কৃতি গবেষকের দৃষ্টিতে তারাও অবহেলিত নন। তারাও ঘিরে থাকা এইসব সাধারণ মানুষদের কিছু দিতে চান। তাদের কিছু কথা অমৃত বর্ষণ করছে, স্বস্তি-তৃপ্তি দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের, তাই তাদের কথাগুলিও মূল্যহীন নয়। এক্ষেত্রে ঝাড়াই-বাছাই এর কাজটা নিখুঁত হওয়া চাই।

রাজ্যের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য স্থাপত্য কীর্তি, মন্দির, মসজিদ, দরগা, থান, আশ্রম, মাজার প্রভৃতি। সেগুলোর কোন তথ্য এখনো পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। সেগুলোকে কেন্দ্র করে কোন মিথ্, টেল্স্ বা লিজেন্ড রয়েছে কিনা, সেগুলো উদ্ধার করা আবশ্যকতা আছে।

পুজোপার্বণ কমে গেছে বললেও মানুষ কি দৈব-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? এককথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা মুক্তির জন্য মানুষ কি মন্দির -মসজিদের দরজায় ধর্না দিচ্ছেনা? লৌকিক দেবতা শনিঠাকুরের গৃহস্থের উঠান ছাড়িয়ে ক্রমশঃ সার্বজনীন হয়ে উঠছে। লৌকিকতাব প্রাঙ্গন টপকে শনিঠাকুরের আর্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে গছে। সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পাঠটি এখানে গুরুত্ব পাবার অবকাশ রয়ে গেছে।

সাপের উৎপাত তেমন নেই আর, তবু দেবী মনসার আধিপত্য ক্রমেই বাড়ছে। লোকজীবনে দেবী মনসার অপ্রতিহত গতি। মনসামঙ্গলের পুঁথিতো একটি সুদীর্ঘ কবিতার বই। মানুষের কবিতার প্রতি এই আসক্তি, ধর্ম ভাবনায় আপ্লুত হওয়া, হেসে, গান গেয়ে, নেচে-কুঁদে একটি মাস মনসার পুঁথি পাঠ আর মাসান্তে কেঁদে-কেটে পুঁথি পাঠ শেষ করার মধ্যে লোকজীবনের গভীরতম সত্তার সন্ধান মেলে। আর পাঠক ও কবি-কর্মের এমন আশ্চর্য সংযোগ আর কোথাও আছে কি?

লোকজীবনে এখন জাঁকিয়ে বসেছে কীর্তনের আসর। এর একটি উজ্জ্বলতম অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। আবার একে কেন্দ্র করে একটি লৌকিক মেলাও জায়গা দখল করে নিয়েছে। এটাই কেন্দ্রবিন্দু। শহর-গ্রাম নিরপেক্ষভাবে মানুষ মনের মধ্য থেকে নাগরিকতার অহমিকা ঝেড়ে ফেলে কি আশ্চর্য অদ্ভুতভাবে লোকবৃত্তের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। হাসে-কাঁদে আবেগে আপ্লুত হয়। এটা লোকজীবনেবৃত্তে ঘরোয়া কীর্তনের আসরের বৃহত্তর একটি রূপ মাত্র। কিন্তু লোকজীবনবৃত্তকে ভাঙ্গতে আগ্রহীও নয় উদ্যোক্তারা। তাহলে কীর্তনের আসরে এরূপ নির্বিশেষ জনজমায়েত কখনোই সম্ভব হবেনা।

এ সবই হল লোকজীবনবৃত্তের সাংস্কৃতিক বর্ণময়তার কিছু উল্লেখ মাত্র, কেননা এ তালিকা আদৌ পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই যাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংস্কৃতি নিয়ে ভাবেন, তাঁদের সামনে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি।

১. ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর অশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

২. ত্রিপুরায় লোকসংস্কৃতির বহুবিধ উপাদান রয়েছে। সে সব উপাদানের সম্ভাব্য তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৩. একজন ব্যক্তির পক্ষে সারা রাজ্যে কাজ করা কঠিন। তাই অঞ্চল ভাগ করতে হবে। সে বিভাগটি রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। জেলা-মহকুমা, ব্লক-মৌজা ইত্যাদি অনুসারে ভাগ করা যেতে পারে।

৪. ক্ষেত্রবন্ধু নির্ধারণ করতে হবে। তারা যে নিষ্ঠাবান ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫. ক্ষেত্রবন্ধুরা কি কি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হবেন অর্থাৎ কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করবেন তার জন্য ছাপানো সংগ্রহ - পত্র (Proforma) প্রয়োজন।

৬. ক্ষেত্রবন্ধু তথা ক্ষেত্র গবেষক লোকসংস্কৃতির তথ্য প্রদানকারীর ছবি সংগ্রহ করবেন। তার কথা বলার ভঙ্গী লক্ষ্য রাখবেন, লিপিবদ্ধ করবেন। তার কথ্য ভাষাও টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখবেন।

৭. সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক।

৮. নিয়মিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা, সেমিনার, নতুন তথ্য সবার সামনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৯. রাজ্যের লোকসংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজনে রয়েছে।

১০. ক্ষেত্র সমীক্ষার পর তথ্য বিভাজন, সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজটি গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করতে হবে।

১১. রক্ষণযোগ্য লোকউপাদান সংগ্রহের জন্য সংরক্ষণশালা (মিউজিয়াম) দরকার।

বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিদি্ ক্ষেত্র সমীক্ষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আদর্শ হিসেবে সেগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। এরূপ একটি মূল্যবান কাজ হল অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা'।[১০] ক্ষেত্র সমীক্ষক একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও বটে। সুতরাং, ক্ষেত্র বুঝেই সমীক্ষার কাজে অগ্রসর হবেন একজন ক্ষেত্র গবেষক।

সমাজের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই সাহিত্য সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন হয়। সুতরাং, যে সাহিত্য আপনা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে একে সৃজনের দায়িত্ব কারো উপরেই বর্তায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা যদি আপনাব উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ সব সাধারণ লোকেদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙ্গাকুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। ...... চিরদিন লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। ... অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না; তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন।"[১১]

লোকসংস্কৃতি একটি জাতির সংস্কৃতির শেকড়, তথা একটি জাতির পরিচিতির বাহক। সর্বোপরি, এই ভাঙ্গনের যুগে একটি জাতির সঙ্গে অন্য এক জাতির মেল-বন্ধনের সেতু গড়ার কাজটি করবে এই লোকসংস্কৃতি। তাই বিষয়টি নিয়ে যাঁরা ভাবনা-চিন্তা করছেন বর্তমান যুগও আগামী প্রজন্মের কাছে তারা দায়বদ্ধ। তাদের শ্রমের ফসলই অদূর ভবিষ্যতে কোন জাতি আত্মপরিচিতির মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। অনাবাদী ত্রিপুরার মাটি ও মানুষ কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে তুলে আনার জন্য এই হল প্রকৃষ্ট সময়।

।। উদ্ধৃতিপঞ্জি ।।

১. আশারাফ সিদ্দিকী — লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড) [মুক্তধারা, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৬৭]

২. চিত্ত মন্ডল — ফোকলোরের স্বরূপ [পুস্তক বিপনি, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮৩; পৃষ্ঠাঃ ৫১]

৩. আশরাফ সিদ্দিকী — লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড) [বাংলাদেশ, ১৯৬৭]।

৪. দুলাল চৌধুরী — বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি [লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা; সম্পাঃ সনৎ কুমার মিত্র; প্রথম বর্ষ/ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃঃ ২০]।

৫. পল্লব সেনগুপ্ত — লোককাহিনীর বিশ্লেষণ ঃ উপাদান, আঙ্গিক ও উপলব্ধি [প্রবন্ধ]।

৬. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাঃ)— লোকসংস্কৃতি গবেষণা (১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা/পদ্ধতিবিদ্যা)।

৭. ঐ — ঐ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃঃ ক্রোড়পত্র ৭; প্রবন্ধ ঃ নৃবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি - পারস্পরিক সম্পর্ক; রেবতী মোহন সরকার)।

৮. ঐ — ঐ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৮,পৃঃ ক্রোড়পত্র ১৫; প্রবন্ধঃ সমাজবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতি - পারস্পরিক সম্পর্ক; সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৯. নির্মল দাশ — ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ [অক্ষর আগরতলা, ২০০২; পৃঃ২২]।

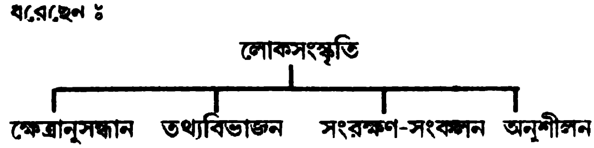
১০. ঐ — ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতিচর্চাঃ সমস্যা ও উত্তরণ [গোমতী, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৪১০; পৃঃ ৬৮]।

১১. ঐ — ঐ (পৃঃ ৬৮)

১২. Encyclopedia of Britanica, — Vol. - 9, USA. P-518

১৩. ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় — লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান [কলকাতা, ১৯৮৫; পৃঃ ৩৬৫]

ডঃ চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি চর্চার কর্মপরিধি নিম্ন ছকে তুলে ধরেছেন ঃ



১৪. ঐ — ঐ [পৃষ্ঠা ঃ ৩১০]।

১৫. ঐ — ঐ [পৃষ্ঠা ঃ ৩১০]।

১৬. ঐ — ঐ [পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৯]।

১৭. উদয় কুমার চক্রবর্তী — ঢাকার লোককাহিনী ঃ মৌখিক ধারার অনুশীলন প্রবন্ধ।

১৮. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাঃ)— লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা [প্রথম বর্ষ/দ্বিতীয় সংখ্যা; শ্রাবন-আশ্বিন, ১৩৯৫]

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় — লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান [লোকসংস্কৃতি ঃ ক্ষেত্রানুসন্ধান - প্রয়োজন ও পদ্ধতি অধ্যায়] কলকাতা; ১৮৯৫

অশোক মিত্র (সম্পাদিত) — পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (১৯৭৪)

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — লোকহিত (প্রবন্ধ) [রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড. বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ]।

লেখক পরিচিতি

।।মোক্ষদাকুমার বসু।।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ভ্রাতা। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি। কলকাতার বিভিন্ন সাময়িকীতে লিখেছেন। বর্তমান নিবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০৭ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪৭) প্রকাশিত হয়েছিল।

।।নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র। শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এই মহারাজকুমার ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী 'রবি'র সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থে মুদ্রিত নিবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, ৭ম ভাগ) প্রকাশিত হয়েছিল।

।।কালীপ্রসন্ন সেন।।

ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাস 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন তিনি। গ্রন্থের প্রতি লহরে যুক্ত 'মধ্যমণি' ত্রিপুরার ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। 'পঞ্চমাণিক্য' নামে একটি মূল্যবান রচনা সে সময়কার 'বার্ষিকী' পত্রিকায় (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে বঙ্গীয় কবি (প্রবন্ধ; ১৯০৬) কিরাত দেশ ও তাহার অবস্থান (প্রবন্ধ) মন্নিত্যানন্দচরিত (গ্রন্থ) ইত্যাদি অন্যতম। গ্রন্থে মুদ্রিত রচনাটি 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় (১ম ভর্ষ, ২৯ শ সংখ্যা, সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

।।শীতল চক্রবর্তী।।

জন্ম ১৮৮৬ খ্রীঃ। মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের আহ্বানে মহারাজা প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য ত্রিপুরায় আসেন। কলেজ স্থায়িত্ব লাভ না করায় উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক হন। ১৯৩২

সালে কবিগুরু আগরতলায় এলে তিনি 'কিশোর সাহিত্য সমাজের, সংবর্ধনার জন্য কবির উদ্দেশ্যে মান পত্রটি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি আদি আর্যভূমি, ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, আর্য ও অনার্য জাতির ইতিহাসের রহস্য ইত্যাদি। তিনি লিখতেন রবি, বঙ্গদর্শন, সাধনা, মানসী, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্র পত্রিকায়। বর্তমান রচনাটি সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় (৭ বৈশাখ, ১৩৪৩ ত্রিপুরাব্দ ১ম বর্ষ, ২২ তম সংখ্যা) মুদ্রিত হয়েছিল।

।।নিবারণচন্দ্র ঘোষ।।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, সুবক্তা, আইনজীবী, দেশপ্রেমী। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় (অবিভক্ত বাংলাদেশে) প্রচুর লিখেছেন। তাঁর বর্তমান নিবন্ধটি 'ত্রিপুরা' (শারদীয় সংখ্যা, ১৯ বর্ষ ১৩৭৩ বাংলা) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরা শাখার সভাপতি।

।।ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা।।

ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চায় অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রাজন্যযুগের ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে তিনি জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত (১৯২৬) করেন। তিনি 'ত্রিপুরাসারং' নামে একটি রাগের স্রষ্টা। 'ত্রিপুরা ঐকতান সমিতি' নামে একটি বিদ্যালয়ের (অবৈতনিক) প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩২-৩৪ ইং এলাহাবাদে সারাভারত সঙ্গীত সম্মেলনেও যোগদান। ডাজিড় বাড়ির লোক। শিল্পীর এই লেখাটি 'সমাজ' পত্রিকায় (প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৯৫৮, ত্রিপুরা) মুদ্রিত হয়েছিল।

।।নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।।

মহারাজা বীরবিক্রমের আমলে রাজ অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্তি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি যোগদান করেছিলেন। তাঁর পরিচিতি ছিল ক্যাপ্টেন নামে। তিনি মহারাজের সঙ্গী হিসাবে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রচুর লিখেছেন। কিন্তু কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর বর্তমান গ্রন্থটি 'শারদীয় সীমান্ত' তে (১৯৭৫) মুদ্রিত হয়েছিল।

।।সত্যরঞ্জন বসু।।

(১৮৯৪-১৯৭৪)

পিতা মোক্ষদা কুমার বসু। ত্রিপুরা থেকে প্রেরিত শান্তিনিকেতনে প্রথম ছাত্র। সেখানে পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছেন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'রবি' পত্রিকার নেপথ্য পরিচালক ছিলেন। 'রবি'তে তিনি স.র.ব. ছদ্মনামে লিকতেন। আত্মপ্রচারে বিমুখ এই সাহিত্যসেবী প্রচুর লিখেছেন। ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৬১) তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত 'রাজমালা' গ্রন্থের শেষে পরিচ্ছেদটির সংযোজন করেছেন তিনি। 'ত্রিপুরার ভাষা ও সংস্কৃতির একদিক' প্রবন্ধটি বীরেন দত্ত সম্পাদিত 'ত্রিপুরার কথা' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৬২, ১৯৫৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল।

।।ঠাকুর সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মা।।

১৯০৫ খ্রীঃ উজিড় বাড়িতে (ত্রিপুরা) জন্ম। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাষাবিদ্। বহু 'হোলি সঙ্গীত' প্রণেতা। তাঁর রচিত বই 'ককতাং ও 'সুরুংমা ইয়াফ্রি'। 'শ্রীশ্রী ত্রিপুরাসুন্দরী' গ্রন্থটি উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ইতিহাস। বর্তমান নিবন্ধ 'সমাজ' পত্রিকায় (প্রজাতন্ত্র দিবস ১৯৫৮) মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

।।শ্রীমতি।।

এটি ছদ্মনাম। নিবন্ধটি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। 'ভারতী' পত্রিকায় (৩৩শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) এটি মুদ্রিত হয়েছিল। আমাদের অনুমান, নিবন্ধটির মুখবন্ধ ও নিবন্ধ একই ব্যক্তির রচনা এবং তিনি হলেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০)। তিনি অনেক লিখেছেন, এর মধ্যে তাঁর সাক্ষরবিহীন বহু রচনাও রয়েছে।

।।ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা।।

(১৯০২-১৯৯৫)

ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের উজীড় ব্রজকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র। ১৯১১ থেকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। অনেক দেশে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আকাদেমি পুরস্কার লাভ, ১৯৮২ সালে অবনীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৮৫ তে বিশ্বভারতীর অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র পুরস্কার, ১৯৯৩ বিশ্বভারতীর আশ্রমবতী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে ত্রিপুরা সরকার শিল্পীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেন। তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী বর্তমান রচনাটি ভাস্কর (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।।কৃষ্ণপদ দত্ত।।

ত্রিপুরার প্রশাসনে বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মীও সুদক্ষ শাসক ছিলেন তিনি। ত্রিপুরার পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত'। তাঁর বর্তমান রচনাটি শারদীয়া 'ত্রিপুরা' (১৫ বর্ষ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।।হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।।

হরিকর্তা নামে পরিচিত। মহারাজার দেহরক্ষী বাহিনী একজন সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ল্যাফট্যানেন্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রিয়াং নেতা রতনমণি রিয়াং-র বিদ্রোহ দমনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। 'কৃষ্টিসংসদ' নামে সাহিত্য সংস্থার জন্মদাতা তিনি। এর মুখপত্র ছিল 'সারথী'। পরবর্তী সময়ে, ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তির পর তিনি, ত্রিপুরা সরকারের প্রচার দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মী চিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি প্রয়াত হন। 'আদিম ত্রিপুরার জনকৃষ্টি' প্রবন্ধটি গোমতী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) তে মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নেই।

।। তড়িত মোহন দাশগুপ্ত।।

(১৯১১-২০০৪)

ত্রিপুরার সোনামুড়া শহরে জন্ম। ১৯৩৯ সালে স্কটিশ চার্চ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক। রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর (১৯৪৮-৪৯) প্রগতি বিদ্যাভবনে শিক্ষকতা। পরে শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে চলে আসেন। বর্ণময় রাজনৈতিক জীবন। ত্রিপুরার মন্ত্রীও হয়েছেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। তাঁর রচিত গ্রন্থ আকাশের তারা, ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি, বিদ্রোহী নেতা রতনমণি। তৈদাম্প কেন্দ্রিক এই প্রবন্ধটি গোমতী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।। অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্য সামলোচক। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের কর্মী ছিলেন। নাটক বিষয়ে বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। ত্রিপুরার সংস্কৃতি-জগতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নেই। নাট্য বিষয়ের বর্তমান রচনাটি 'শারদীয় গণ অভিযান' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।। রমাপ্রসাদ দত্ত।।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সংগ্রাহক সমাজসেবক। অন্ততঃ সহস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে তাঁর সিংহভাগ প্রবন্ধ ত্রিপুরাকেন্দ্রিক যে কোন ধরণের গবেষণার মূল্যবান উপাদান। আটাত্তর বছর বয়স্ক এই গবেষক এখনো লিখছেন। সম্পূর্ণ একক প্রয়াসে তিনি গড়ে তুলেছেন 'রমাপ্রসাদ গবেষণাগার'। এখানে বসে ত্রিপুরা বিষয়ক যে কোন গবেষণা করা সম্ভব। তিনি বহু পুরস্কারের সম্মানিত হয়েছেন। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে পেয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ত্রিপুরায় রবীন্দ্রসংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটে ত্রিপুরা ১ম ও ২য় খণ্ড, ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। বর্তমান লেখাটি তাঁর 'ত্রিপুরার রবীন্দ্র সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

।। অপরাজিতা রায়।।

জন্ম ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনাধর্মী লেখা প্রচুর লিখেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বাইরে বাউল', 'ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা'। গল্পগ্রন্থ 'একনো অন্ধকার'। সমালোচনা গ্রন্থ 'সাহিত্যে বিবর্জিত বাস্তব'। ত্রিপুরার পত্র-পত্রিকায়, গোমতীর মতো সাময়িকীতে এখনো লিখছেন। সাহিত্য সৃজনে উৎকর্ষতার জন্য তিনি ২০০২ সালে ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি 'গোমতী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

'শক্তি হালদার '

(১৯৩২-২০০১)

কলকাতায় পড়াশোনা। ১৯৫৩ সালে আগরতলায় প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাঁর আঁকা বহুচিত্র আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ ও বুদ্ধমন্দিরে রয়েছে। ত্রিপুরার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লোকশিল্পী সংসদ, কৃষ্ণরোপ নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ১৯৭০ সালে ত্রিপুরায় শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক হিসাবে সম্মানিত হন। ১৯৭৭ সালে 'অন্বেষক সংস্কৃতি সংস্থা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সম্পাদক। ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্য সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক। তাঁরা গ্রন্থ বিদ্রোহী শচীন্দ্রলাল, নীলপাহাড় সোনালী ঢেউ (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ), রতনমণি রিয়াং, ত্রিপুরা তোমাকে (কাব্যগ্রন্থ) কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), অজান (উপন্যাস), ত্রিপুরা নাট্যচর্চার ইতিহাস (২০০২)। তাঁর বর্তমান রচনাটি ভাস্কর (২য় বর্ষ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

।। বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ।।

(১৯৩০ - ১৯৯২)

গুয়াহাটি কলেজে সাময়িকভাবে অধ্যাপনার কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান। ত্রিপুরার রবীন্দ্র পরিষদের জন্য তাঁর সবিশেষ অবদান রয়েছে তিনি ছিলেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থ জলপ্রপাতের কাছে নতজানু (১৯৯৩), সেতুবন্ধ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ' (১৯৮৮)। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবন্ধ সংগ্রহ (২০০১)। উক্ত গ্রন্থে বর্তমান প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত। এই প্রবন্ধটি 'গোমতী' (বৈশাখ/১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)তে মুদ্রিত হয়েছিল।

।। রবীন সেনগুপ্ত ।।

জন্ম ১৯৩০ সাল, ঢাকা, বাংলাদেশে। ১৯৫৬-৬২ সালে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন নিয়ে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম রঙ্গীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি। ১৯৫৯ সালে ব্রাজিলে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ও সম্মানিত হন। ১৯৬২ সালে সোভিয়েতে যান। ত্রিশটিরও বেশী ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাতা তিনি। তাঁর গ্রন্থ চিত্র সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে সংহতি ও মৈত্রীর বন্ধনে ত্রিপুরা। তিনি প্রচুর লেখেন। শ্রী সেনগুপ্তের বর্তমান নিবন্ধটি আগরতলা প্রেসক্লাব স্মরণিকা (২০০৩) তে মুদ্রিত হয়েছিল।

।। সরোজ চন্দ ।

জন্ম ১৯৩০ সাল, আগরতলায়। উমাকান্ত একাডেমি, মুনশীগঞ্জ কলেজ (ঢাকা), বীরবিক্রম কলেজে পড়াশোনা। সে সময় থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। প্রথমে ত্রিপুরা স্টেট ছাত্র-কংগ্রেসের সম্পাদক, পরে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে কমুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বহুবার

কারান্তরীত হয়েছেন। ১৯৫১ সাল থেকে পুরোপুরি রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যান। তিনি ছিলেন বীরেন দত্তের (ত্রিপুরার বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম পুরোধা পুরুষ ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী) ছায়াসঙ্গী। একসময় New Age পত্রিকায় লিখেছেন। বীরেন দত্তের সম্পাদিত 'ত্রিপুরার কথা' (সাপ্তাহিক) তে নিয়মিত লিখতেন। বেনামেও লিখেছেন অনেক। একসময় এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। বর্তমানেও রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে চলেছেন। এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি 'পূর্বাভাস' (শারদ ২০০১) সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়েছিল।

।।ড. কার্তিক লাহিড়ী।।

অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী কর্মসূত্রে তিনদশকেরও বেশী সময় ত্রিপুরায় কাটিয়েছেন। প্রচুর লিখেছেন। সাহিত্যের প্রতিটি পথে তাঁর অবাধ বিচরণ। বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর বর্তমান রচনাটি 'গোমতী' (শারদ সংকলন, অক্টোবর, ১৯৭৪) তে মুদ্রিত হয়েছিল।

।।শিশু সেনগুপ্ত।।

ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরের কর্মচারী। ত্রিপুরার নাট্যজগতের সুদক্ষ অভিনেতা। বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা হল 'কৃষ্টিগোষ্ঠী'। লোকশিল্পী সংসদের সদস্য ছিলেন তিনি। ত্রিপুরার নাট্যচিত্র বিষয়ে তিনি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। কোন মুদ্রিত পুস্তক নেই। গোমতী (বৈশাখ, ১৩৯৯) সারয়িকীছে তাঁর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

।।সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।।

ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প বিভাগের মুদ্রণ দপ্তরের অধিকর্তা। অবিভক্ত বাংলাদেশে তাঁর বহু রচনা মুদ্রিত হয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে বহু প্রবন্ধ ও লিখেছেন এবং বহু গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। তার 'ইতিহাসশ্রিত বাংলা কবিতা', পুবপাহাড়ী রূপকথা, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, টিপরা, চাকমা, রিয়াং প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন তিনি। তাঁর বর্তমান রচনাটি শারদীয় নাগরিক (আশ্বিন ১৩৭৭) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।।ড. রমেন্দ্র বর্মণ।।
(১৯৪১-২০০৩)

শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে আমৃত্যু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি মহাবিদ্রোহ, বিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস (১৯৮১), রাজনীতির প্রেক্ষিতঃ ভাষা ও সাহিত্য (১৯৮৭), রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস (১৯৮৯), মাতৃভাষা ও চিন্তা প্রসঙ্গ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (২০০০) মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ঃ রাজনারায়ণ বসু (২০০১), মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গঃ বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় (২০০২)। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য গাজিনামা ঃ শেখ মনুহর (২০০১) মহাজীবন ঃ সুকান্ত সমীক্ষা (২০০২), শ্রীরাজমালা (৪ খণ্ড একত্রে) ঃ কালীপ্রসন্ন সেন (২০০৩)। গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি তাঁর 'রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

।। ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী।।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা। বর্তমানে ঐ বিভাগের প্রধান। তাঁর গবেষণাপত্র "ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র" গ্রন্থাকারে (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বহু মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ত্রিপুরার ও বহির্ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান আলোচনার প্রথমাংশ 'বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির'র মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়াংশটি তাঁর পরবর্তী সংযোজন।

।। ডঃ শিশির কুমার সিংহ।।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। রবীন্দ্র সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের গবেষক। ত্রিপুরা ও বহির্ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লেখেন। তাঁর গ্রন্থ আকাঙ্খার মৃত্যু নেই (সম্পা. কবিতা), রবীন্দ্র সাহিত্য ঃ মৃত্যুর অমৃত পাত্রে, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও রবীন্দ্রনাথ, চলিতভাষার বিবর্তন ঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, কল্লোলের স্রোতাবর্তে পাঁচ তরুণ অভিযাত্রী (সম্পাদিত) , শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (সম্পা.) প্রভৃতি।

।। ডঃ সিরাজদ্দীন আমেদ।।

ডঃ আমেদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রাক্তণ বিভাগীয় প্রধান। ত্রিপুরা সরকারের প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদি বন্দী জেগে উঠো, স্বপ্নের ক্ষেতে দ্বিখণ্ডিত চাঁদ। গবেষণাগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা, রবীন্দ্র, নজরুল - সুকান্ত- মাণিক ঃ বার্বসীয় বীক্ষা, রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, মীর মোশারফ হোসেন।

।। ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য।।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যে শিল্প তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রেখেছেন। তাছাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ভট্টাচার্য একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থের মধ্যে 'নিবিড় পাঠের নন্দন' (অক্ষর, ২০০২), 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' (২০০০), 'স্বখাত সলিলকথা' (২০০৪), 'বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ' ইত্যাদি।

।।ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী।।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর গবেষণার বিষয় 'উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য'। রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লিখিত মননশীল প্রবন্ধ সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

।।ডঃ যূথিকা বসু ভৌমিক।।

পিতা সত্যরঞ্জন বসু। ড. বসু ভৌমিক ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ বাংলা পুঁথির পুষ্পিকা''। এই রাজ্যের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তিনি বহু মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

।।ড. মহাদেব চক্রবর্তী।।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। ত্রিপুরার ইতিহাস চর্চায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডঃ চক্রবর্তীর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাঁর গ্রন্থ হল Administration Report (চারখণ্ডে, ১৯০৩-৪৯)। ত্রিপুরার বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

।।কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী ।।

জন্ম ১৯৪৮ সাল। ১৯৬৭ সালে ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ককবরক ভাষা নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। বর্তমানেও তিনি এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ককবরক লিপি বানান বিতর্ক, ককবরক ভাষা ও সাহিত্য, কেরেঙ কথমা, গবেষকের ডায়েরী ইত্যাদি। তাঁর বর্তমান প্রবন্ধটি গোমতী পত্রিকায় ৯শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত হয়েছিল।

।।করবী দেববর্মণ।।

মহিলা কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষা। নারী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বহু কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ প্রবন্ধ সংগ্রহ; কবিতা আমার সময় অসময়, কিছু স্বগতোক্তি ঃ কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ, মেরুদণ্ড দাও কবিতা সমগ্র ইত্যাদি। তাঁর রচিত প্রবন্ধটি দৈনিক গণঅভিযান (শারদীয় সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।।জগৎ জ্যোতি রায়।।

হিসাব নিরীক্ষক অফিসের কর্মচারী এবং রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর বই হল 'বিদ্রোহ বিবর্তন ও ত্রিপুরা' ইত্যাদি। গ্রন্থে মুদ্রিত বর্তমান প্রবন্ধটি শারদীয়া ত্রিপুরা দর্পণ (১৩৮৯) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।। ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ।।

শিক্ষক - শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। তার মুদ্রিত গ্রন্থ হল ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর, রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গে, আধুনিক ত্রিপুরা ঃ প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (১৩১৯ - ১৩৩৩ ত্র) প্রভৃতি। বর্তমান নিবন্ধটি গোমতী (শরৎ ১৪০০) তে মুদ্রিত হয়েছিল।

।। সুবিমল রায় ।।

ত্রিপুরা সরকারের হস্ত ও কারুশিল্প দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। রাজ্যের বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর গ্রন্থ হল ত্রিপুরায় রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা, হস্ত ও কারু শিল্প, বিবর্ণ যাত্রী (গল্পগ্রন্থ), আবীর (গল্পগ্রন্থ) ইত্যাদি। বর্তমান নিবন্ধটি গোমতীতে মুদ্রিত হয়েছিল।

।। রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ ।।

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপণা করেছেন। পুনা থেকে ফোনোলজীতে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস কমিটিতে আছেন। তাঁর সম্পাদনায় বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরা মণিপুরী সাহিত্য সংস্কৃতির কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ত্রিপুরী মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। তাঁর বর্তমান প্রবন্ধটি তিনি সম্পাদকের অনুরোধে রচনা করেছেন।

।। বিজয় কুমার দেববর্মণ ।।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়াম বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ত্রিপুরার জনসেবা আয়োগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান নিবন্ধ 'নন্দিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

।। বিমল সিংহ ।।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, তথা মন্ত্রী ছিলেন।। উপজাতি জনজীবনে অবাধ মেলামেশার সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতা গল্প, উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের বিশিষ্ট গল্পকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি 'বিমল সিংহ রচনা সমগ্র' শীর্ষনামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'চলচ্চিত্র' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনাটি 'আমিতাক্ষর' লিটল ম্যাগাজীনে প্রকাশিত হয়েছিল।

।। ডঃ গোপেন্দু ভূষণ চৌধুরী ।।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক ছিলেন। কর্মজীবনে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পশু চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পশু চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধটি শারদীয়া ত্রিপুরা দর্পণ (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

।। ডঃ নলিনীকান্ত চক্রবর্তী ।।

সরকারী শিক্ষক-শিক্ষন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ত্রিপুরার গাছপালা নিয়ে তিনিই প্রথম একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ ত্রিপুরার গাছপালা, উদ্ভিদ বিদ্যার গোড়ার কথা, উপকারী আগাছা ইত্যাদি। তাঁর বর্তমান প্রবন্ধটি 'কোরক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

।। অনুকূল সিংহ ।।

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ত্রিপুরা চে' এর সম্পাদক। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজকর্মে দীর্ঘদিন যাবৎযুক্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। তাঁর বর্তমান নিবন্ধটি সম্পাদকের অনুরোধে তিনি রচনা করে দিয়েছেন।

।। ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী ।।

বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। ত্রিপুরায় উপজাতি নৃত্য বিষয়ে গবেষণা করে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল ত্রিপুরার নৃত্য ও নৃত্যকলাচর্চা প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁর প্রকাশিত ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য ঃ একটি সমীক্ষা (১৯৯২) সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর বর্তমান প্রবন্ধটি তিনি সম্পাদকের অনুরোধে রচনা করেছেন।

।। দীপক ভট্টাচার্য ।।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্র-পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় বিমল সিংহের গল্প 'লংতরাই'কে অবলম্বনে করে ককবরক ভাষায় তাঁর প্রথম কাহিনী চিত্র মুক্তি পায়। এছাড়া তিনি ত্রিপুরার অন্যতম প্রত্নমহল পিলাকের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার সম্পর্ক নিয়ে তৈরী তথ্য চিত্র In search of a relation সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচিত তথ্য নির্ভর মূল্যবান গ্রন্থটি হল 'পিলাক কথা (১৯৯৯)। বর্তমান প্রবন্ধটি স্মরণিকা পিলাক উৎসব-এ (২০০২, ২৯-৩১ জানুয়ারী) মুদ্রিত হয়েছিল।

।। শ্যামলাল দেববর্মা ।।

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রকাশনা বিভাগের আধিকারিক। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ভাষার পত্রিকা 'ত্রিপুরা ককতুন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ককবরক ও বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত ককবরক গ্রন্থ নকারিনী কথমা, খং, আদং, সামপিলী, ইত্যাদি। তিনি ত্রিপুরা সরকারের দ্বারা প্রকাশিতব্য ককবরকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কাব্যের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি ককবরকে

ভাষাও সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' (১৯৯৯), সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যচর্চার অন্যতম সংগঠন ককবরক সাহিত্য সংসদের সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও ত্রিপুরা সরকারে দ্বারা গঠিত উপজাতি ভাষা কমিশনের অন্যতম সদস্যও তিনি। তাঁর বর্তমান রচনাটি 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা) থেকে গৃহীত হয়েছে।

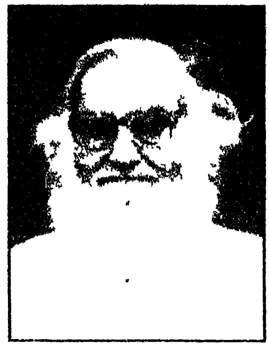
।।নির্মল দাশ ।।

লোক সংস্কৃতি (বাংলা) বিষয়ে এম. ফিল., ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি. এইচ. ডি. গবেষণারত। ২০০০ইং সনে দিল্লীস্থ আম্বেদকর একাডেমি থেকে সম্মানিত হয়েছেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি নিয়মিত লেখেন। ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুরা শাখা, বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (অক্ষর, ২০০৩), ত্রিপুরার লোককথা (অক্ষর, ২০০৪), শতাব্দীর ত্রিপুরা (অক্ষর, সম্পা. ২০০৫) তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ত্রিপুরা। বর্তমান নিবন্ধটি 'ফোকডেভ' (লোকধাত্রী) আয়োজিত 'লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা চক্রে পাঠের জন্য লিখিত হয়েছিল।



নির্মল দাশ

লোকসংস্কৃতি (বাংলা) বিষয়ে এম ফিল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি এইচ ডি গবেষণারত। ২০০০ইং সনে দিল্লীস্থ আম্বেদকর একাডেমি থেকে সম্মানিত হয়েছেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তিনি নিয়মিত লেখেন। ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুবা রাজ্য শাখা, বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (অক্ষর, ২০০৩), ত্রিপুরার লোককথা (অক্ষর, ২০০৪)। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ত্রিপুরা।



রমাপ্রসাদ দত্ত

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সংগ্রাহক ও সমাজসেবক। কমপক্ষে সহস্র প্রবন্ধ রচনা কবেছেন ত্রিপুরাকে কেন্দ্র কবে। তাঁর সিংহভাগ প্রবন্ধ ত্রিপুরাকেন্দ্রিক, যা যে কোনো ধরনের গবেষণার মূল্যবান উপাদান। আটাত্তর বছর বয়স্ক এই গবেষক এখনো লিখছেন। সম্পূর্ণ একক প্রযাসে তিনি গড়ে তুলেছেন 'রমাপ্রসাদ গবেষণাগার'। যেখানে বসে ত্রিপুরা বিষয়ক যে কোনো গবেষণা করা সম্ভব। তিনি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ২০০০ সালে ত্রিপুরা সরকারেব 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—ত্রিপুরায রবীন্দ্রসংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটে ত্রিপুরা (১ম ও ২য় খণ্ড), ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। বর্তমান লেখাটি তাঁর 'ত্রিপুরার রবীন্দ্র সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

ISBN : 81-86802-89-4